পরলোক

পণ্ডিত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ অনূদিত

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্নের ভূমিকা-সমন্বিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

[তৃতীয় সংস্করণ]

কলিকাতা,
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

মূল্য [illegible] টাকা।

উৎসর্গ

আমি

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

মাদ্রাজ-হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ভকিল

উদার-হৃদয়, দেব-চরিত,

আমার

অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু

শ্রীযুত বনয়ারিলাল মিত্রের

পবিত্র

কর-কমলে

উৎসর্গ

করিলাম

গ্রন্থকার।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমার উপদেষ্টা, পরিচালক, উৎসাহদাতা, গুরু, অশেষগুণসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, প্রথিতনামা মনীষী, আমার অগ্রজকল্প, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের উপদেশে বিগত ১৩২৪ সালের বৈশাখ মাসে আমি মহাত্মা লেড্‌বিটারের On the other side of Death নামক পুস্তক অবলম্বন করিয়া, এই গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। ১৩২৬ সালের ১১ই চৈত্র বহিখানি শেষ করি। ঐ সময় কলিকাতায় মেট্রপলিট্যান্ ইন্‌ষ্টিটিউশনের বহুবাজার শাখা স্কুলে বাঙ্গালা ভাষার প্রধান শিক্ষকপদে নিয়োজিত থাকায় পুস্তকখানিতে ইচ্ছামত সময় দিতে পারি নাই। একে ম্যালেরিয়ার মক্কেল, তাহাতে রাত্রি জাগিয়া বহিখানি লিখিয়াছি, এ অবস্থায় স্থানে স্থানে অসঙ্গতি থাকা অসম্ভব নহে। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠক সেরূপ স্থলে আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। আত্মা, পরকাল, ভূতযোনি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয় লইয়া, একাল-সেকাল তর্ক-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। ইহা লইয়া সকল দেশেই তর্ক-যুদ্ধ! তাই জগতের প্রথিত-নামা বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এই পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইল। অতি বড় নাস্তিককেও এখন হেঁটমুণ্ড হইয়া ভূত-প্রেত প্রভৃতি মানিয়া লইতে হইবে। অনেকের মনের ধাঁধা ইহাতে মিটিয়া যাইবে। ইহাতে দেশের ও দশের যদি কিছু কল্যাণ সাধিত হয়, তবে তাহার ষোল আনা গৌরবই মহাত্মা হীরেন্দ্র বাবুর প্রাপ্য ; কারণ, এরূপ পুস্তকের প্রণয়নে প্রধান উৎসাহদাতাই তিনি।

ইহাতে যদি কিছু নিন্দার বিষয় থাকে, তবে সে জন্য একমাত্র আমিই দায়ী ; আমি অযোগ্য বলিয়া সকল ত্রুটিই আমাতে সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। এই পুস্তক প্রণয়নে আমি একটা খেয়ালের পরিচয় দিয়াছি। "এবং" শব্দটি

আমি একবারও ব্যবহার করি নাই। এটি আমার খাঁটি খেয়াল! প্রথম দশ অধ্যায়ের ভাষাটা একটু "পণ্ডিতী" রকমের হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে উহাকে সরল করিয়া দিবার ইচ্ছা রহিল। পুস্তকের কাহিনী পাঠকগণের নিকটে তৃপ্তিদায়িনী হইলে, শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব। ইতি

গোস্বামি-দুর্গাপুর,
জেলা—নদীয়া
২৮শে ভাদ্র, ১৩৩৩

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

মহাকবি সেক্সপীয়র পরলোক-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ও সেই অজানা দেশ যার প্রান্ত থেকে কোন পান্থ কোন দিন ফেরে নাই—that undiscovered country from whose bourne no traveller returns, পরলোক সাধারণের অবিজ্ঞাত দেশ বটে, কিন্তু ঐ মুলুক থেকে কেহ কখনও ফেরে নাই, এ কথা কি ঠিক? সেক্সপীয়রের নিজের নাটকেই—হ্যামলেট, জুলিয়াস্‌সিজার প্রভৃতিতে—দেখিতে পাই, প্রেত (Ghost) পরলোক হইতে ফিরিয়া ইহলোকে শুধু বিচরণ করিতেছে না—এই পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে। সেক্‌স্‌পীয়র রাণী এলিজ্যাবেথের সমসাময়িক—প্রায় ৩৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। এই ৩৫০ বৎসরে পরলোক সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান আলোচনা হইয়াছে—অনেক সমীক্ষা পরীক্ষা চলিয়াছে। অনেক প্রেতাত্মা মানুষের আবাহনে—কখন কখন বা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া স্বপ্রয়োজনে—Medium বা মধ্যস্থের বাহনে অথবা নিজের সূক্ষ্মশরীর-অবলম্বনে ইহলোকে প্রত্যাগত হইয়া, নরনারীর ইন্দ্রিয়-গোচর হইয়াছে এবং স্বমুখে পরলোকের সংবাদ প্রচারিত করিয়াছে। যাঁহারা প্রেততত্ত্ববিদ্‌দিগের (spiritualists) অথবা Psychical Research Societyর প্রচারিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে বিস্তার করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহারা ঐ সাহিত্যের সহিত অপরিচিত, তাঁহাদিগকে ফ্রেডরিক মায়ার্সের Human Personality (Two volumes), Sir William Crooksএর Spiritualism, Sir Oliver Lodgeএর Survival of Man এবং অধ্যাপক ফ্লামেরিয়নের গ্রন্থাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। যে পাঠক ঐ সকল পুস্তক পাঠের আয়াস স্বীকার করিবেন, তিনিই দেখিবেন যে, বার্ত্তাবহ প্রেতেরা পরলোক

সম্বন্ধে এত সংবাদ বহন করিয়া আমাদের গোচর করিয়াছে যে, পরলোক আর অজ্ঞাত দেশ (undiscovered country) নাই—ঐ বেজানা মুলুক এখন আমাদের সুজ্ঞাত হইবার সুযোগ হইয়াছে।

তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, ইহা অনেকটা পরের মুখে ঝাল খাওয়া, যাহাকে আমরা Hearsay evidence বলি—জানা কথা নহে, শোনা কথা। প্রেত যে সঠিক সংবাদ দিতেছে, সে যে সত্যবাদী, অনেকটা ভ্রম-প্রমাদশূন্য—এ কথার প্রমাণ কি? প্রেতকে পরলোক হইতে না নামাইয়া, ইহলোকবাসী আমাদের পক্ষে পরলোকে গিয়া সেখানকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা সম্ভবপর কি না? যেমন করিয়া লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যান্‌লি, হ্যান্‌সেন প্রভৃতি সাহসিক পর্য্যটক আয়াস ও অধ্যবসায় দ্বারা এই ভূমণ্ডলের সঙ্কটসঙ্কুল অবিজ্ঞাত স্থানসমূহে পর্য্যটন করিয়া তাহার সংবাদ সকলের গোচর করিয়াছেন, পরলোকমণ্ডলের এমন অসমসাহস ভ্রমণকারী আছেন কি না? যদি থাকেন, তবে তাঁহারা ঐ ভূমিকার হ্যানসেন লিভিংষ্টোন।

এ দেশে যাঁহাদের যোগী বলে, যাঁহারা সাধনা দ্বারা যোগমার্গে কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা ঐরূপ পুরুষ। ইহলোক ছাড়া যদি পরলোক থাকে, তবে সেই লোকে গতিবিধি তাঁহাদের পক্ষে অনায়াসসাধ্য। আমার ধারণা—এইরূপ যোগী পূর্ব্বেও ছিলেন, এখনও আছেন। পাশ্চাত্য দেশে ইঁহাদিগকে occultist বলে। যাঁহারা য়ুরোপীয় mysticismএর ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যয় হইবে যে, এরূপ যোগী পুরুষ শুধু এ দেশে নয়, ইউরোপেও একেবারে বিরল নহেন। সেণ্টপল্, ফ্রান্সিস্, সোয়েডেন্‌বর্গ প্রভৃতি ইহার পাশ্চাত্য উদাহরণ। এ দেশেও এইরূপ যোগীর বৃত্তান্ত আমরা অনেকেই শুনিয়াছি। এইরূপ যোগী পুরুষের নিকট পরলোকের বৃত্তান্ত 'করকবলিত-কুবলয়বৎ' প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নিউইয়র্ক সহরে যে তত্ত্ববিদ্যামণ্ডলীর (The Theosophical society) সূচনা হয়, সম্প্রতি যাহার প্রধান কেন্দ্র মান্দ্রাজের

উপকণ্ঠস্থ আদিয়ারে—এই থিওসফিক্যাল্ সোসাইটীর উদ্দেশ্যত্রয়ের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য মানবের মধ্যে সুপ্ত শক্তির প্রবোধ ও বিকাশ। থিওসফিক্যাল সোসাইটীর মধ্যে এমন সব সাধক আছেন, যাঁহারা যোগের পথে অগ্রসর হইয়া যোগারূঢ় হইয়াছেন। তাহার ফলে তাঁহাদের দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশ্রুতি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা যোগপথের অন্যতম বিভূতি। পাশ্চাত্য দেশে ইঁহাদিগকে Clairvoyance ও Clairaudience বলে। ঐ সম্বন্ধে অনেক প্রামাণিক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই ইহার যাথার্থ্য প্রমাণিত করিতে পারেন। থিওসফিক্যাল সোসাইটীর মধ্যে যাঁহারা এই সকল যোগ-বিভূতি লাভ করিয়া পরলোক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সি, ডব্লিউ, লেড্‌বিটার তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। ঐ সম্বন্ধে তিনি স্বীয় প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন,—যথা Astral Plane, Devachanic Plane, The Hidden Side of things, Clairvoyance, Science of the Sacraments এবং The other side of death। পরলোক সম্বন্ধে যত যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমার বিশ্বাস, এই Other side of deathই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে spiritualist এবং Psychic Research Society এবং অন্যান্য পূর্ব্বতন লেখকদিগের আলোচনা ও গবেষণার সার সংগ্রহের সহিত লেড্‌বিটার সাহেব নিজের প্রত্যক্ষ ও অনুভূত ঘটনাগুলির বৃত্তান্ত অতি সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য ও নিদান কি, তাহারও বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার ফলে পরলোক সম্বন্ধে একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ গ্রথিত হইয়াছে।

ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এই অমূল্য গ্রন্থ এত দিন অনধিগম্য ছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রভূত যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এই

পরলোক গ্রন্থ সেই অনুবাদ। কিন্তু বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এরূপ নিপুণ-ভাবে এই অনুবাদকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ প্রায়ই মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থ যাহাতে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট আদরণীয় হয়—ইহা আমার বিশেষ আগ্রহ।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যোগ্য ব্যক্তি। সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গালাতে তিনি বেশ পারদর্শী। অধ্যাত্ম সাহিত্যে তাঁহার বেশ প্রবেশ আছে এবং বাঙ্গালা রচনায় তাঁহার বেশ সুযশঃ আছে। অতএব গ্রন্থ যে উপাদেয় হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু এই পরলোক গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের আলোচনা আছে, তাহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা উচিত। অবশ্য যাঁহারা চার্ব্বাকের মন্ত্রশিষ্য—যাঁহারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যাঁহারা বলেন, চেতনা ও চিন্তা মস্তিষ্কেরই ব্যাপারমাত্র (Thought is a function of the brain), যাঁহাদের মতে যকৃৎ হইতে পিত্তনিঃসরণের ন্যায় মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা নিঃসৃত হয়, সেই সকল মাস্তিষ্কিক জড়বাদীর (cerebralisctic materialists) এই পরলোক গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনই আগ্রহ হইবে না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারেন—"তেষাং প্রতি নৈষঃ যত্নঃ!" আমি নিজে সময়ে সময়ে এই জড়বাদের নিরাস করিবার উদ্দেশ্যে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে 'মনোবিজ্ঞানের নূতন ধারা' এই নাম দিয়া ব্রহ্মবিদ্যা পত্রিকায় কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে মনোবিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত তথ্য সকলের উল্লেখ করিয়া আমি Myer (মায়ার) সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করি। সে উক্তিটি এই :—"Our method has rovealed to us a hidden world within us and this hidden world has revealed to us an invisible world without!" অর্থাৎ "মনোবিজ্ঞানের নূতন ধারা জীবের অভ্যন্তরে এই অ-দৃষ্ট রাজ্যের সন্ধান দিয়াছে এবং সেই রাজ্য আবার বাহিরের এক অ-দৃষ্ট

রাজ্য প্রকটিত করিয়াছে।” সেই বাহিরের অ-দৃষ্ট রাজ্য কি, তাহার আভাস দিয়া মায়ার (Myer) বলিয়াছেন :—‘জীব এক নহে, তিন লোকের অধিবাসী—পৃথিবীলোক, সূক্ষ্ম ইথিরিয় লোক এবং অতি সূক্ষ্মলোক (ধর্ম্মগ্রন্থে যাহাকে স্বর্গলোক বলে)।’ বলা বাহুল্য, মায়ারের এই তিন লোক আমাদিগের পরিচিত ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ অর্থাৎ Physical Plane, Astral Plane এবং Mental Plane এবং পাশ্চাত্য মনো-বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত brain, consciousness and deep sleep consciousness—আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি।

সম্প্রতি প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক জেমস্‌এর Human Immortality নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমার হস্তগত হয়। যাঁহারা আত্মার অমরত্বে প্রত্যাখ্যান করিতে চান, তাঁহাদিগের ঐ পুস্তকখানি যত্ন করিয়া পাঠ করা উচিত। তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, চিন্তাকে মস্তিষ্কের ব্যাপার মানিয়া লইলেও দেহাত্মবাদ বজায় হয় না। কারণ, অধ্যাপক জেমস্ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, চিন্তা মস্তিষ্কের জন্য-জনক ব্যাপার নহে; কিন্তু বিমোচক বা সঞ্চারক ব্যাপার (Transmissive function)। তিনি দেখাইয়াছেন যে, হঠকারী বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা চেতনাকে যে মস্তিষ্কের জন্য-জনক ব্যাপার (productive function) বলিয়াছেন, তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। বরং ইহা বলাই সঙ্গত যে, অখণ্ড চৈতন্যের অপ্রাকৃত আত্ম-জ্যোতিঃ সাধারণতঃ এই স্থূল, জড়, প্রাকৃত বিশ্বের আচ্ছাদনে অবরুদ্ধ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, কদাচিৎ ক্বচিৎ কোন মস্তিষ্কের সাহায্যে সেই জ্যোতিঃ প্রাকৃত জগতে প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ আমাদের মস্তিষ্ক চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশের উপাধি মাত্র। উপাধির তারতম্যে, সূক্ষ্মতা ও স্থূলতার ভেদে, স্বচ্ছতা ও আবিলতার অনুপাতে চৈতন্যের প্রকাশও ভিন্ন হয়; কিন্তু চৈতন্য যে এক ও অখণ্ড বস্তু, তাহার ভেদ বা পরিচ্ছেদ হয় না—“উপাধিভিন্ন্যতে ন তদ্বান্।”

অতএব দেহের নাশে চিন্তার বিলোপ হয়, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই—এরূপ ভাবিবার কোনই সমর্থক যুক্তি নাই। বরং জার্ম্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্টের সহিত সুর মিলাইয়া বলিতে হয় যে, মস্তিষ্ক আমাদের চিন্তার জনক নহে, নিরোধক উপাধি মাত্র। ভৌতিক অনুভূতির পক্ষে মস্তিষ্ক অবশ্য-স্তাবী যন্ত্র বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভূতির পক্ষে ইহা আবরক যবনিকা মাত্র। কারণ, যখন এই আবরক তিরস্করণী তিরোহিত হয় এবং আত্মা বিদেহ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ব স্বরূপ লাভ করে, তখন তাহার যে মহিমা ও ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হয়, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? সে অবস্থা বচনের—লক্ষণের—মননের অতীত।

৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৩ } হীরেন্দ্র নাথ দত্ত
কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যু-বিষয়িণী কতিপয় ভ্রান্তি	১
১। মৃত্যুই পরিণাম ...	৩
২। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মত ...	৪
৩। প্রেতলোক-তথ্য ...	৭
৪। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে প্রার্থনা ...	১০
৫। একটি অদ্ভুত মত ...	১২
৬। মৃত্যু-ভয় ...	১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারাবাহিক জীবনের প্রমাণ	১৬
১। ভূতযোনি ...	১৭
২। প্রেততত্ত্ব ...	১৯
৩। আর একটি নিঃসংশয় পদ্ধতি ...	২১
৪। নিদ্রাকালে আমাদিগের অবস্থা ...	২৪
৫। পর্য্যবেক্ষণ শিক্ষা ...	২৬

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অন্যায় সংস্কার	২৯
১। মৃত্যুর নিমিত্ত আয়োজন	৩১
২। সৈনিকের মৃত্যু ...	৩৪

চতুর্থ অধ্যায়

মৃত্যু-বিষয়ে আমাদিগের ভাব	৩৮
১। জীবাত্মার ভ্রমণ-বৃত্তে একটি প্রয়োজনীয় বিন্দু ...	৪০
২। জ্ঞানের উপকারিতা ...	৪২
৩। বিলাপ ও শোককরণ...	৪৪
৪। উচ্চতর বাস্তবিকতা ...	৪৬
৫। পার্থিব দেহের প্রয়োজনীয়তা ...	৪৭

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকৃত ঘটনাবলী ...	৫২
১। পারলৌকিক জীবন একটা অভিনব ব্যাপার নহে ...	৫৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
অদৃষ্ট ব্যাপার মিথ্যা নহে, সত্য	৫৯
১। মানুষ প্রেতলোকে যাইয়া কি দেখে? ...	৬১

সপ্তম অধ্যায়

কয়েকটি প্রেতাত্মার বিবরণ	৬৭
১। অসাধারণ ঘটনাবলী ...	৭১
২। ধন-লিপ্সা ও ঈর্ষ্যা ...	৭৩
৩। প্রতিহিংসা ...	৭৫
৪। সূক্ষ্ম-জগতে চিন্তার মূর্ত্তি	৭৮

অষ্টম অধ্যায়

ব্যভিচারিণীর পরিণাম	৮১
১। পাপের পরিণাম ...	৮২
২। প্রতিভাশালী ব্যক্তি ...	৮৪
৩। নিঃস্বার্থ শ্রমিক	৮৭

নবম অধ্যায়

সূক্ষ্ম-জগতের পারিপার্শ্বিক	৯০
১। মনোহর সৃষ্টিপুঞ্জ ...	ঐ
২। কৃত্রিম দৃশ্য ...	৯৩
৩। মূর্ত্তিমৎ স্বর্গ ...	৯৫
৪। বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিবর্গ...	৯৬

দশম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাসনা-উপাদান ...	১০০
১। জীবাত্মার জন্ম-পরিগ্রহ-প্রণালী ...	১০১
২। মনোময় উপাদান বা তেজস্তত্ত্ব ...	১০৫
৩। অপ্-তত্ত্বে প্রকট হইবার প্রণালী ...	১০৭
৪। জীবৎ-উপাদান ...	১০৮
৫। একটি অস্থায়ী পদার্থ ...	১১০
৬। বিপরীত স্বার্থ ...	১১২
৭। বাসনা দমন করিবার উপায় ...	১১৪
৮। অপন্যস্ত মমতা ...	১১৬
৯। পুনর্গঠন ...	১১৭
১০। পুনর্গঠনের কুফল ...	১১৯
১১। বাসনা-উপাদানের প্রত্যাখ্যানে সুবিধা ...	১২১

একাদশ অধ্যায়

নূতন মাপের কথা ...	১২৪
১। সূক্ষ্ম-জগৎটাকে বুঝিয়া লইবার একটা ভাল উপায় ...	১২৬

বিষয় পৃষ্ঠা
২। উঁচু বুঝে না, শুধু লম্বা-চৌড়া দিক্ বুঝে, এমন প্রাণীর আলোচনা ... ১৩১
৩। নূতন মাপের কথা ... ১৩৬
৪। ঐ অদ্ভুত চারি পরিসরযুক্ত মূর্ত্তিটির কাল্পনিক নাম—"টেসার‍্যাক্ট" ... ১৪০
৫। একটি সুন্দর উপমা ... ১৪২
৬। চতুর্থ মাপ বুঝিবার পক্ষে আরও কয়েকটি সঙ্কেত ... ১৪৫

দ্বাদশ অধ্যায়

সহায়কদিগের কার্য্য ১৪৮
১। পরলোক আমাদিগের খুবই পরিচিত স্থান ... ১৪৯
২। প্রেতাত্মাদিগের সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক ... ১৫০
৩। নিঃস্বার্থ প্রেতাত্মা ... ১৫৩
৪। সহায়ক হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ... ১৫৪
৫। পারলৌকিক জীবনে আরও অনেক সুবিধা আছে ১৫৭
৬। একটি তৃপ্তিকর ঘটনা ১৫৮

বিষয় পৃষ্ঠা
৭। আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ ... ১৬০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রেত-মূর্ত্তিতে দেখা দেওয়া ১৬৪
১। সূক্ষ্ম-জগতের প্রথম আভাস ... ১৬৭
২। জীবিত ব্যক্তির প্রেতদেহে পরিভ্রমণ ... ১৬৯
৩। পোস্ত গাছ ... ১৭০
৪। অচৈতন্য অবস্থায় সাহায্যের অন্বেষণ ... ১৭১
৫। "উত্তর-পশ্চিমমুখে জাহাজ চালাও" ... ১৭৩
৬। দ্বি-মাস্তলবিশিষ্ট মোহক নামক একখানি জাহাজ ১৮৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বেই প্রেতাত্মা আসিয়া দেখা দেয় ... ১৮৫
১। মিসর হইতে তুরস্ক ... ঐ
২। প্রেতাত্মা মরণের একটু আগে একই রাত্রে দূরবর্ত্তী পুত্রকে তিনবার দেখা দিয়াছিল ... ১৮৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
অদৃষ্ট ব্যাপার মিথ্যা নহে, সত্য	৫৯
১। মানুষ প্রেতলোকে যাইয়া কি দেখে? ...	৬১

সপ্তম অধ্যায়

কয়েকটি প্রেতাত্মার বিবরণ	৬৭
১। অসাধারণ ঘটনাবলী ...	৭১
২। ধন-লিপ্সা ও ঈর্ষ্যা ...	৭৩
৩। প্রতিহিংসা ...	৭৫
৪। সূক্ষ্ম-জগতে চিন্তার মূর্ত্তি	৭৮

অষ্টম অধ্যায়

ব্যভিচারিণীর পরিণাম	৮১
১। পাপের পরিণাম ...	৮২
২। প্রতিভাশালী ব্যক্তি ...	৮৪
৩। নিঃস্বার্থ শ্রমিক	৮৭

নবম অধ্যায়

সূক্ষ্ম-জগতের পারিপার্শ্বিক	৯০
১। মনোহর সৃষ্টিপুঞ্জ ...	ঐ
২। কৃত্রিম দৃশ্য ...	৯৩
৩। মূর্ত্তিমৎ স্বর্গ ...	৯৫
৪। বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিবর্গ...	৯৬

দশম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাসনা-উপাদান ...	১০০
১। জীবাত্মার জন্ম-পরিগ্রহ-প্রণালী ...	১০১
২। মনোময় উপাদান বা তেজস্তত্ত্ব ...	১০৫
৩। অপ্‌-তত্ত্বে প্রকট হইবার প্রণালী ...	১০৭
৪। জীবৎ-উপাদান ...	১০৮
৫। একটি অস্থায়ী পদার্থ ...	১১০
৬। বিপরীত স্বার্থ ...	১১২
৭। বাসনা দমন করিবার উপায় ...	১১৪
৮। অপন্যস্ত মমতা ...	১১৬
৯। পুনর্গঠন ...	১১৭
১০। পুনর্গঠনের কুফল ...	১১৯
১১। বাসনা-উপাদানের প্রত্যাখ্যানে সুবিধা ...	১২১

একাদশ অধ্যায়

নূতন মাপের কথা ...	১২৪
১। সূক্ষ্ম-জগৎটাকে বুঝিয়া লইবার একটা ভাল উপায় ...	১২৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
২।	উঁচু বুঝে না, শুধু লম্বা-চৌড়া দিক্ বুঝে, এমন প্রাণীর আলোচনা ...	১৩১
৩।	নূতন মাপের কথা ...	১৩৬
৪।	ঐ অদ্ভুত চারি পরিসরযুক্ত মূর্ত্তিটির কাল্পনিক নাম—"টেসার‍্যাক্ট" ...	১৪০
৫।	একটি সুন্দর উপমা ...	১৪২
৬।	চতুর্থ মাপ বুঝিবার পক্ষে আরও কয়েকটি সঙ্কেত ...	১৪৫

দ্বাদশ অধ্যায়

	সহায়কদিগের কার্য্য	১৪৮
১।	পরলোক আমাদিগের খুবই পরিচিত স্থান ...	১৪৯
২।	প্রেতাত্মাদিগের সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক ...	১৫০
৩।	নিঃস্বার্থ প্রেতাত্মা ...	১৫৩
৪।	সহায়ক হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ...	১৫৪
৫।	পারলৌকিক জীবনে আরও অনেক সুবিধা আছে	১৫৭
৬।	একটি তৃপ্তিকর ঘটনা	১৫৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
৭।	আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ ...	১৬০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

	প্রেত-মূর্ত্তিতে দেখা দেওয়া	১৬৪
১।	সূক্ষ্ম-জগতের প্রথম আভাস ...	১৬৭
২।	জীবিত ব্যক্তির প্রেতদেহে পরিভ্রমণ ...	১৬৯
৩।	পোস্ত গাছ ...	১৭০
৪।	অচৈতন্য অবস্থায় সাহায্যের অন্বেষণ ...	১৭১
৫।	"উত্তর-পশ্চিমমুখে জাহাজ চালাও" ...	১৭৩
৬।	দ্বি-মাস্তুলবিশিষ্ট মোহক নামক একখানি জাহাজ	১৮৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

	মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বেই প্রেতাত্মা আসিয়া দেখা দেয় ...	১৮৫
১।	মিসর হইতে তুরস্ক ...	ঐ
২।	প্রেতাত্মা মরণের একটু আগে একই রাত্রে দূরবর্ত্তী পুত্রকে তিনবার দেখা দিয়াছিল ...	১৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩। প্রেতাত্মা আফিসে যাইয়া ফটোগ্রাফ চাহিয়া বসিল	১৯৫

পঞ্চদশ অধ্যায়

চিন্তার মূর্ত্তি ...	১৯৭
১। উদ্বেগের ফল ...	১৯৮
২। ট্রিপ্লিন নামক এক ব্যক্তির প্রেতাত্মা ...	১৯৯
৩। সরিফের কার্য্যাধ্যক্ষ ...	২০০
৪। সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি প্রায়ই দেখা দিত ...	ঐ
৫। রোমের একটি অদ্ভুত গল্প ...	২০১
৬। পুরোহিতের একটা সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি ...	২০২

ষোড়শ অধ্যায়

ভূত-যোনি আসিয়া মৃত্যু-সংবাদ দিয়া যায় ...	২০৪
১। জনৈক কর্ম্মচারীর প্রত্যাগমন ...	২০৫
২। ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ	২১৩
৩। খালাসী বালকের প্রত্যাগমন ...	২১৫
৪। এক জন পরোপকারী সাধুর প্রেতমূর্ত্তি ...	২১৮
৫। একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা	২২১
৬। ষোল জনে ভূতটিকে দেখিয়াছিল ...	২২৫

সপ্তদশ অধ্যায়

মরা মানুষ সাহায্য করিতে আইসে—মায়ের স্নেহ	২২৯
১। ভূতে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল ...	২৩০
২। ভূতে এক জন পুরোহিতকে ডাকিয়া আনিয়াছিল	২৩২
৩। ভুবর্লোকে থাকিয়া একটি ভূত পরোপকার করিত ...	২৩৪
৪। গ্যাস্পার নামক একটা ভূতের কথা ...	২৩৬
৫। জনতাপূর্ণ বড় রাস্তার উপর ভূত আসিয়া দেখা দিল ...	২৩৮
৬। মরা পিতা আসিয়া মরণের কথা বলিয়া গেল ...	২৪২
৭। বংশগত ভূতের কাহিনী	২৪৪
৮। লর্ড ব্রাউহ্যামের কাহিনী	২৪৬

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠা
	ভূতেরাও অনেক সময় মানুষের কাছে সাহায্য চায় ...	২৪৯
১।	সেনাপতি ব্লম্‌বার্গের ভূত-যোনি ...	২৫০
২।	আচ্ছা, ভূতেরা সর্ব্বদা দেখা দেয় না কেন? ...	ঐ
৩।	ভূতে খড়াং খড়াং করিয়া শিকলের শব্দ করিল ...	২৫৪
৪।	অষ্ট্রেলিয়াবাসী জনৈক পশু-পালকের ভূতযোনি ...	২৫৬
৫।	দিনের বেলায় একটা ভূত আসিয়া হাজির ...	২৫৯

ঊনবিংশ অধ্যায়

	ভূতের অনুতাপ ...	২৬২
১।	চুরি করিবার ফলে ভূত হইয়া অনুতাপ ...	ঐ
২।	পাপ-স্বীকার ...	২৬৫
৩।	পুরোহিত ভূতের উপাসনা ...	২৭৪

বিংশ অধ্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠা
	অনেকে ভূত হইয়া পৃথিবীর উপর ঘুরিয়া বেড়ায়	২৮০
১।	ওয়ের-নাম্নী একটা প্রেতিনীর কথা ...	২৮১
২।	তিন শিলিং দশ পেন্স দেনার জন্য এক জন ভূত হইয়াছিল ...	ঐ
৩।	আর্‌ল অব্‌ বুকানের খানসামা ...	২৮৩
৪।	এক জন কৃপণ রমণী মরিয়া প্রেতিনী হইয়াছিল ...	২৮৪
৫।	প্রেতিনী একটা বদমায়েসকে উপযুক্ত প্রতিফল দিয়াছিল	২৮৬
৬।	হতাশ প্রেমিকের কাহিনী ...	২৮৮
৭।	মরা আত্মীয়ের জন্য শোক করিও না ...	২৯২

একবিংশ অধ্যায়

১।	এক জন পুরোহিত ভূত হইয়াছিল ...	২৯৫
২।	এক জন পদস্থ ব্যক্তি ভূত হইয়া অস্থির হইয়া বেড়াইত ...	২৯৭

বিষয় পৃষ্ঠা

ঈশট বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব ... ৩০১

৪। স্যামফোর্ড নামক স্থানে ভূতের উপদ্রব ... ৩০২

৫। ২৪ ঘণ্টা ভূতের উপদ্রব হইতেছে, এমনও দেখা যায় ... ৩০৩

৬। অনেক সময় রসিকতা করিয়াও ভূত মহাশয়রা উপদ্রব করিয়া থাকেন ঐ

৭। ওয়ার্কশপ নামক স্থানে ভূতের উপদ্রব ... ৩০৫

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আরও কয়েকটা পূর্ব্ববৎ গল্প ৩০৮

১। ভূতেরা ঢিল ছুড়িয়া মারে ঐ

২। এক জন অধ্যাপকের উপর ভূতের অত্যাচার ... ৩০৯

৩। ভূতেরা কোন কোন সময় ঘণ্টার ধ্বনি করিয়া থাকে ... ৩১০

৪। কোন মতলব নাই, অথচ অনেক ভূত দেখা দিয়া থাকে। মহাত্মা বাকের বীণা-যন্ত্র ... ৩১২

বিষয় পৃষ্ঠা

৫। প্রেতিনীর মুখে একটা আঁচড়ের দাগ ... ৩১৫

৬। সেনানী বার্টারের গল্প ৩১৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নূতন রকমের ভূত ... ৩২১

১। একটা রাক্ষস ভূত ... ৩২৩

২। কখন কখন ভূত সর্ব্বদাই দেখা দিয়া বিরক্ত করিয়া তুলে ... ৩২৬

৩। ভূত কুকুর হইয়া আসিয়া আবার স্থূল হাতে বিছানা টানিল ... ৩২৭

৪। পাখী ভূত ... ৩৩০

৫। একটা প্রেতিনীর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় ... ৩৩৩

৬। করিন্থ সহরের কুমারী ঐ

৭। মরিয়াও অনেকে মরণের কথা টের পায় না ... ৩৩৬

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ভূতের সঙ্কেত ... ৩৪০

১। একটা ভয়ের শব্দ ... ৩৪২

২। মানুষের পায়ের শব্দ ৩৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩। দারুণ দুর্ঘটনার ছাপ	৩৪৭
৪। "পিউরিট্যান" ব্যাপারের ছাপ ...	৩৪৮
৫। কটা রঙ্গের ঘোড়া ...	৩৪৯

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ভূত দেখা ...	৩৫৫
১। যাঁহারা ভূত খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহাদের ব্যবহারও ভাল নহে ...	৩৫৭
২। একটা হারান আংটীর কথা ...	৩৫৮
৩। অদ্ভুত রকমের কাগজের কথা ...	ঐ
৪। সন্দিগ্ধচিত্ত লোকেরাও এখন আমাদের কথা মানিয়া লইতেছে ...	৩৫৯
৫। একটা হঠাৎ অসুখের দোহাই দেওয়া ...	৩৬০

ষড়্বিংশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূত-নামান ...	৩৬৫
১। পরা-বিদ্যার মতে বৈঠকি কাণ্ডের ব্যাখ্যা ...	৩৬৭
২। ভূতের বৈঠক ...	৩৭০
৩। আরও উপদ্রব ...	৩৭৪
৪। একটা অজ্ঞাত শক্তির প্রমাণ ...	৩৭৬
৫। ভূতের দ্বারা আলোর সৃষ্টি ...	৩৭৭
৬। ব্যবসায়ী "মিডিয়ম"দের ব্যবহার ...	৩৭৯

সপ্তবিংশ অধ্যায়

জীবিত মানুষের ঘাড়ে ভূত ...	৩৮১
১। ভূতে ধরা লোকের কথা-বার্ত্তা ...	৩৮২
২। ভূতের লিখিয়া দেওয়া	৩৮৪
৩। মিডিয়ম না হইলেও কখন কখন পরীতে পায় ...	৩৮৫
৪। ভূত কখন কখন চিত্র করিয়া দেয় ...	৩৮৮
৫। ব্যবসায়ীর প্রতারণা	৩৮৯
৬। অতি সহজেই স্থূল-শরীরের পরিবর্ত্তন হয় ...	৩৯০

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূতের বৈঠকে দিব্যদৃষ্টির বিষয় ...	৩৯১
১। কতকগুলি হারানো কাগজের ব্যাপার ...	৩৯৪
২। একখানা হারানো উইলের ব্যাপার ...	৩৯৫
৩। তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি দিব্যদৃষ্টি-প্রভাবে কত কি বলিতে পারে ...	৩৯৬
৪। মিডিয়মের আর একটা পরীক্ষা ...	৩৯৮

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

প্রেতের আংশিক মূর্ত্তি-পরিগ্রহ ...	৪০০
১। একখানি দীপ্তিশালী হাত ...	৪০২
২। ভূতে লেড্ বিটারকে টানিয়া ছাদের কাছে তুলিয়াছিল	৪০৬
৩। শূন্যে গুরুভার জিনিসের অবস্থান ...	৪০৮
৪। শ্লেটে লিখিবার ব্যাপার	৪০৯
৫। ভূত এক ঘণ্টা ধরিয়া লিখিল ...	৪১৪

ত্রিংশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূতে ছবি আঁকিতেও পারে ...	৪১৬
১। ভূতের বাদ্য-যন্ত্র বাজান	৪১৭
২। ভূতে টেলিগ্রাফ্ করিয়াছিল ...	৪১৮
৩। ভূতে ঠিক মানুষের মত গলার স্বর করে ...	৪১৯
৪। একটা ভূতের ফটো ...	৪২১

একত্রিংশ অধ্যায়

নানাবিধ ভূতুড়ে কাণ্ড	৪২৩
১। ভূতে নানাপ্রকার আলোক দেখায় ...	৪২৫
২। আকারটা কি করিয়া থাকিতে পারে? ...	৪২৭
৩। ঐ শক্তির প্রভাবে খুব দূরদেশের দ্রব্য আনা যায় ...	৪৩০
৪। একটা আগুনের কাণ্ড	৪৪৩
৫। অগ্নি-উৎপাদন ...	৪৪৪

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

বিষয় — পৃষ্ঠা

ভূত মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয় ... ৪৪৬
১। ছায়া-মূর্ত্তি ... ৪৪৭
২। ম্যাডাম্ ডি এস্‌পারান্স ৪৫২
৩। অ্যানা না আমি ... ৪৫৩
৪। ভূতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা ... ৪৫৭
৫। একটা লজ্জাকর বলপ্রয়োগ ... ৪৫৮
৬। ভূতের কাপড় ... ৪৬৪
৭। ভূতের সুস্পষ্ট মূর্ত্তি ... ৪৬৫
৮। তামাকের কু-ফল ... ৪৭০
৯। ভূতেরা কখনও কখনও মানুষের সঙ্গে তামাসা করে ... ৪৭১

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

প্রেত-তত্ত্বের সুফল-কুফল ... ৪৭৫
১। ভূতের বৈঠকে যাওয়ার বিপদ ... ৪৭৯
২। ভূতের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দৃঢ়সংকল্পের প্রয়োজন ... ৪৮০

বিষয় — পৃষ্ঠা

৩। সূক্ষ্মজগতের আলোচনায় প্রতারণার সম্ভাবনা আছে ... ৪৮১
৪। মিডিয়মের অপকার সাধিত হয় ... ৪৮৬
৫। প্রেত-তত্ত্বের ফলে জীবাত্মারও ক্ষতি হয় ... ৪৮৮
৬। প্রেত-তত্ত্বের স্থান ও কার্য্য ... ঐ
৭। পূর্ব্বজন্মের কথা ... ৪৯১

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

স্বর্লোক ... ৪৯৫
১। "স্বর্গ" কল্পনা নহে, খাঁটী সত্য ... ৪৯৭
২। চিন্তা-রাজ্য ... ৪৯৯
৩। ঐশ মন ... ৫০২
৪। স্বর্গে সুখভোগের প্রণালী ... ৫০৩
৫। আত্মার জ্ঞান-গবাক্ষ ৫০৭
৬। স্বর্লোকে মানুষের অবস্থা ... ৫০৯
৭। সঙ্গীত-গবাক্ষ ... ৫১১
৮। তিন প্রকার সুর ... ৫১২
৯। স্বর্গে চিত্র-বিদ্যা ... ৫১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
১০। স্বর্গে গেলে আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে থাকে কি না ...	৫১৪
১১। স্নেহের প্রভাব ...	৫১৫
১২। স্বর্গে যাইবার পর কিরূপে আত্মার উৎকর্ষ হইতে পারে ...	৫২০
১৩। আত্মার প্রকৃত মূর্ত্তি	৫২১

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরলোকের প্রমাণ...	৫২৩
১। পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে ব্যক্তিগত জ্ঞান ...	৫২৪
২। প্রকৃত জ্ঞান কিরূপ করিয়া পাইলাম ...	৫২৬
৩। উন্নতির সম্ভাবনা ...	৫২৯
৪। পরলোকের ব্যাপার ভ্রান্তি নহে ...	৫৩১
৫। প্রাচী ধর্ম্মমতের প্রমাণ	৫৩৩
৬। অলৌকিক ঘটনা ...	৫৩৬
৭। একটা দার্শনিক মত	৫৩৮
৮। আমাদের মনোবিজ্ঞান	৫৩৯
৯। সূক্ষ্ম জগতের অপ্রত্যাশিত প্রমাণ ...	৫৪২
১০। থিয়সফির ভাবে অনুপ্রাণিত এক জন বৈজ্ঞানিকের কথা ...	৫৪৩
১১। অন্ধ বিশ্বাস নহে ...	৫৪৪

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
দিব্য-দৃষ্টিলাভের উপায়	৫৪৮
১। দিব্য-শক্তিলাভের অ-বাঞ্ছনীয় প্রণালী ...	৫৫০
২। শ্বাস-প্রশ্বাস সংযত করিয়া যোগসাধনের কথা...	৫৫৫
৩। মেস্‌মিরিজম্ বা মোহিনী-বিদ্যা ...	৫৫৬
৪। দিব্য-দৃষ্টিলাভের একটি ভাল উপায় ...	৫৫৮
৫। সাধনার প্রথম অনুষ্ঠান	৫৬১
৬। চতুর্থ মাপ ...	৫৬২
৭। আর একটি কার্য্য...	৫৬৩
৮। একাগ্রতা বা ধারণা	৫৬৫
৯। পারিষদবৃন্দ ও জলের কলসীর গল্প ...	৫৬৮
১০। ধ্যান ...	৫৬৯
১১। নিদিধ্যাসন ...	৫৭২
১২। সাধন-মার্গে যাইবার পূর্ব্বে প্রস্তুত হইতে হয় ...	৫৭৪

পরিশিষ্ট

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ছোট ছোট ছেলে-পুলের মৃত্যু ...	৫৭৯
২। প্রকৃত তথ্য কেমন করিয়া জানা গেল ...	৫৮০
৩। পুনর্জ্জন্ম ...	ঐ
৪। শৈশবকালে মরা একটা সৌভাগ্য ...	৫৮২
৫। পরিবর্ত্তিত জীবন ...	৫৮৩
৬। ছোট ছোট ছেলেপুলে মরণের পর কিরূপ অবস্থায় থাকে ? ...	৫৮৫
৭। ভুবর্লোকে যাইবার পর কি ছেলেপুলেরা বড় হয় ? ...	৫৮৮
৮। ঃ,	
৯। চমৎকার প্রবোধ ...	৫৯১

পরলোক

প্রথম অধ্যায়

মৃত্যু-বিষয়িণী কতিপয় ভ্রান্তি

মৃত্যু-বিষয়িণী আলোচনা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটেই হৃদয়গ্রাহিণী। প্রত্যেকের ভাবী জীবনেতিহাসে মৃত্যু-ব্যাপারটি একটি সুনিশ্চিত ঘটনা। জগতে এমন ব্যক্তি কেহই নাই, যিনি একটি না একটি আত্মীয়কে না হারাইয়াছেন। যাহারা অতীব শিশু, তাহারা ইহার আস্বাদ না পাইতে পারে; কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অবগত আছেন। ইহা সার্ব্বজনীন ব্যাপার, অথচ, সর্ব্বসাধারণে ইহার সম্বন্ধে গুরুতর ভ্রম পোষণ করিতে-ছেন। ইহা একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। সাধারণে ইহার তথ্য জানেন না। সেই কারণে পৃথিবীতে যে কত নিরর্থক দুঃখ, যাতনা ও ভয় মানুষকে নিপীড়িত করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। মৃত্যু সম্বন্ধে সকলেরই একটা কুসংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে রাশি রাশি অলীক ও অজ্ঞজনোচিত বিশ্বাস বর্ত্তমান আছে। তন্নিমিত্ত মানুষকে অতীত যুগে অপরিমিত ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে; বর্ত্তমানেও অনির্ব্বচনীয় যাতনা পাইতে হইতেছে। ভাবি-কালে মানুষ যে সকল উপাদেয় কল্যাণ সম্ভোগ করিবে বলিয়া আশা করা যায়, উপরি-উক্ত অলীক বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম।

তত্ত্ববিদ্যা-বিষয়িণী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা অতীত জীবনাবলীর তথ্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ঐ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে—ভ্রম অপসৃত হইয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে তত্ত্ববিদ্যার বিঘোষিত তথ্য গ্রহণ

করিতে প্রস্তুত। ইহার প্রভাবে মৃত্যুকে লোকে আর দারুণ বিভীষিকার চক্ষে দেখিতেছে না। মৃত্যুজনিত শোকাবেগও অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে। এই তথ্য পরিজ্ঞাত হইয়া আমরা মৃত্যুর প্রকৃত মূর্ত্তি অবলোকন করিতে ও ক্রমোন্নতিব্যাপারে উহার স্থান জানিতে সমর্থ হইতেছি।

আমরা একটি একটি করিয়া মৃত্যু-বিষয়ক প্রধান ভ্রমগুলির অসারতা প্রতিপাদন করিব। কতকগুলিকে ধর্ম্মজ ভ্রম বলা যাইতে পারে। প্রাচীন ধর্ম্মমত কলুষিত হইয়াই এবম্প্রকার ভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। মৃত্যু-বিষয়ে সাধারণের মধ্যে যে সকল ভ্রম অতীব প্রচলিত, তাহাই এক্ষণে আমাদিগের আলোচ্য।

কখন কখন লোকে মনে করে যে, মৃত্যুব্যাপারটা সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান না থাকিলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। তাহাদিগের ধারণা এই যে, যে ব্যক্তি মরিবে, সে মরণান্তে নিজেই হাতে-কলমে মৃত্যু-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবে; জীবিতকালে যদি তাহার ভ্রমই থাকে, তাহাতে কি আসে যায়? এ কথায় দুইটি আপত্তি হইতে পারে। মৃত্যু-রহস্যটি অপরিজ্ঞাত থাকায় সর্ব্বসাধারণেই মৃত্যুর নামে একটি অদ্ভুত ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে। উপরি-উক্ত কথায় ঐ ভয় কিছুমাত্র বিদূরিত হয় না। মানুষ মরিয়া গেলে তাহার জীবিত আত্মীয়-স্বজনেরা তাহার জন্য দারুণ শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। তাহার দশা পরলোকে কিরূপ হইতেছে ভাবিয়া তাঁহারা সাতিশয় উদ্বেগভোগ করিতে থাকেন। উপরি-উক্ত কথায় সেই শোক বা উদ্বেগও কিছুমাত্র উপশমিত হয় না। এই গেল একটি আপত্তি। অপর আপত্তিটি এই যে, ঐ কথায় একটি গুরুতর তথ্য উপেক্ষিত হইয়াছে। মানুষ মরিবামাত্রই বুঝিতে পারে না যে, সে মরিয়াছে। কাজে-কাজেই মৃত্যুবিষয়ক ভ্রমগুলিও খুব শীঘ্র শীঘ্র বিনষ্ট হয় না। সত্যের আলোকে তাহার হৃদয় তখন-তখনই আলোকিত হয় না। তাই, তাহার পূর্ব্ব-ভ্রমগুলি আপাততঃ থাকিয়া যায়। তন্নিমিত্ত মৃত ব্যক্তিকে সাধারণতঃ অনেকটা ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

মৃত্যুই কি পরিণাম ?

মৃত্যু-বিষয়ক যাবতীয় অন্যায় সংস্কারের মধ্যে প্রথম ও অতীব মর্ম্মান্তিক ভ্রমটি এই যে, উহা সমুদয় বস্তুর অবসান। মানুষ মরিয়া গেলে সব ফুরাইয়া যায়, আর কিছুই থাকে না। এইটিই সাংঘাতিক ভুল ধারণা। অনেকের ধারণা আছে যে, এই লজ্জাজনক দেহাত্মবাদ আমাদিগের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, উহা গত শতাব্দীর প্রারম্ভে মানসিক পীড়ারূপে প্রকট হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর নাই। ব্যাপার যদি এইরূপই হইত, তবে খুব মঙ্গলের কথা। সেইটুকুই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমার মনে হয়, যিনি সমসাময়িক চিন্তার আলোচনা করিয়াছেন, তিনি উপরি-উক্ত ধারণা অনুমোদন করিবেন না। সুখের বিষয়, ঐ কথাটি সত্য যে, এই দেহাত্মবাদরূপ অপকারক আগাছা আর উচ্চে মস্তক উত্তোলন করিতে পারিতেছে না। পূর্ব্বে উহার উপর লোকের যেরূপ আস্থা ছিল, এখন আর সেরূপটি নাই। কেন না, যাঁহাদের মতামত শ্রদ্ধার্হ, তাঁহারা দেহাত্মবাদ অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীতে এখনও দারুণ অজ্ঞতার বিপুল স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আরও দুঃখের বিষয়, এক এক জন ঘোর মূর্খ ব্যক্তি দুই চারিটিমাত্র বিজ্ঞান-বহুল শব্দ সংগ্রহ করিয়া আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হইয়া মনে করে যে, সে প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের ন্যায় জ্ঞানরাশি আয়ত্ত করিয়াছে। এবম্প্রকার মূর্খের সংখ্যা অল্প নহে। এরূপ মূর্খতা অতীব দোষাবহ। যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি ঐ প্রকার মানসিক দাসত্বের অধীন, তাহাদের মধ্যে এখনও বহুল পরিমাণে অতি ভয়ানক দেহাত্মবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

তথাচ আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে আশা করিতে পারি যে, ঐ প্রকার বিশ্বাস নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। আর এক শ্রেণীর দেহাত্মবাদী আছেন, তাঁহারা এতটা উচ্চরাবী নহেন, কিন্তু অধিকতর কুটিল।

তাঁহাদের সংখ্যা কমিতেছে বলিয়া আমার মনে হয় না। বিস্তর স্ত্রী-পুরুষ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহারা নামতঃ কোন একটি ধর্ম্ম মানিয়া চলেন, ইঁহাদিগকে কেহ জড়বাদী বলিলে, ইঁহারা রোষ-প্রকাশপূর্ব্বক সে কথা অস্বীকার করেন। তাহা হইলেও ইঁহারা কার্য্যতঃ এরূপভাবে জীবন যাপন করিয়া থাকেন, যেন এই সংসারই ইঁহাদের একমাত্র ধ্যেয়। কখন কখন ইঁহাদের মুখে ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতির অস্তিত্বসূচক শব্দ ও বাক্যাংশ শুনা যায় বটে, কিন্তু ইঁহাদের চরিত্রমূলে তাদৃশ বিশ্বাস আদৌ দৃষ্ট হয় না। এই ব্যবহারিক জড়বাদে মূঢ়তার ভাবটি একটু প্রচ্ছন্ন থাকে মাত্র। ইহাতে জড়বাদীর প্রতিবেশীরাও বড় একটা অসন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু মৃত্যুরূপ তোরণদ্বার অতিক্রম করিলে ইঁহাদেরও যে দশা, উচ্চরাবী দেহাত্মবাদীরও সেই দশা।

মৃত্যু সম্বন্ধে আর একটি অন্যায় সংস্কার আছে। সেটি আরও প্রশস্ত-রূপে বিস্তৃত হইয়াছে দেখা যায়। সংস্কারটি এই :—একটা মহা অবিদিত অন্ধকারে অবগাহনের নামই মৃত্যু ; মানুষ এই ভূর্লোক পরিত্যাগ করিয়া গেলে তাহার দশা যে কি হয়, তাহা নিশ্চিতরূপে এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। বাস্তবিক অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এতদ্দশা সম্বন্ধে অনেক সত্য সংবাদ প্রচারিত আছে, অথচ ঐ সকল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই উহাতে বিশ্বাসবান্ নহেন। উঁহারা ঐ সকল সংবাদকে সম্পূর্ণরূপে অলীক বলিয়া মনে করেন। অন্ততঃ উঁহাদের কার্য্যকলাপে বা বাক্যালাপে তাদৃশ বিশ্বাসের আদৌ পরিচয় পাওয়া যায় না। বাস্তবিকই অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতগুলির আলোচনা করিলে মনে হয় যে, তদনুসরণে শুভ অপেক্ষা অশুভ ফল ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা। কেন না, ঐ মতগুলি বড়ই বিসদৃশ।

ক্যাথলিক (নৈষ্ঠিক) সম্প্রদায়ের মত

পাশ্চাত্য জগতে যতগুলি ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ক্যাথলিক সম্প্রদায় অন্যতম। মাত্র এই সম্প্রদায়ই পরলোকস্থ অবস্থাদির বর্ণনা

করিয়াছেন। এই মতে পরলোক-ব্যাপার রূপকে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণে রূপকের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া উহাকে জড়-ধর্ম্মান্বিত মনে করেন। কিন্তু উহাতে প্রকৃত ব্যাপার সুন্দররূপেই পরিব্যক্ত হইতেছে। যাঁহারা ইহা মানিয়া চলেন, তাঁহারা মৃত্যুর পরে নিজেদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা অনেকটা জানিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু এ সম্প্রদায়েও সত্যের একটা দিক্ পাষণ্ডতাপূর্ণ ধর্ম্মমতের অলীক ছায়ায় তিমিরাবৃত দেখা যায়। পার্থিব পাপের ফলে অনন্ত যাতনা ঘটে—এইটিই সেই ভ্রান্ত মত। সত্যের অপর দিক্‌টাও অনেকটা মর্য্যাদাহীন হইয়া পড়িয়াছে। পরলোকে একটা তথাকথিত সুখ-উপভোগের উপহাস্য ব্যবস্থা এই মতে প্রবিষ্ট হওয়ায় সত্যমর্য্যাদা বিনিষ্ট হইয়াছে। ক্যাথলিক-মতটি মোটামুটি এই—যে ব্যক্তি মহাপাপী, সে নরকে পতিত হয়; যিনি মহাপুণ্যাত্মা, তিনি পুণ্যশ্লোকা ভার্জ্জিনের ন্যায় স্বর্গে গমন করেন। সাধারণ শ্রেণীর সৎ ব্যক্তিগণ একেবারে নির্দ্দোষ নহেন; মৃত্যুকালে তাঁহাদের বিস্তর ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া যায়। এই কারণে তাঁহারা ঈশ্বর-সমীপে একেবারে গমন করিতে অসমর্থ। কাজে কাজেই তাঁহাদিগকে একটি মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় অল্পাধিককাল অতিবাহিত করিতে হয়। এই মধ্যবর্ত্তী অবস্থার স্থানটিকে প্রেতলোক বলে। এখানে যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। এখানে তাঁহাদিগকে বড় অধিক দিন থাকিতে হয় না, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত-প্রণালীটি কষ্টদায়ক। এইরূপে যাতনার নিষ্পেষণে নির্দ্দোষ হইয়া তাঁহারা স্বর্গে সুখভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়েন।

যাঁহারা পরাবিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ক্যাথলিক-মতের উপরি-উক্ত কথাগুলি বাস্তব ব্যাপারের সহিত অতীব ঘনিষ্ঠরূপে সমঞ্জস। মানবীয় ক্রমোন্নতিব্যাপারে কখন কখন এমন একটি সময় আসে, যখন মানুষ আর উন্নতির দিকে প্রধাবিত হয় না। তখন সে সত্য সত্যই পতিত হয়, স্খলিত হয়। সেই পতন অনন্ত নরকে নহে (কারণ, ইহা কতিপয় ক্রূরকর্ম্মা নৃশংস রাক্ষসের

বিকৃত মস্তিষ্কের কিম্ভূত কল্পনা)। কিন্তু চৈতন্য-শক্তির অপেক্ষাকৃত একটি স্থগনাবস্থা এই পতনে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই পতনকাল কোটি কোটি বৎসরব্যাপী না হইলেও মানবের বিবর্ত্ত-ব্যাপারে ইহা সময় সময় দেখা যায়। তখন মানুষ ক্রমোন্নতি ধারার পরবর্ত্তী যুগের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এই নবীন কল্পের প্রারম্ভেই সে স্বীয় ক্ষীণশক্তির আয়ত্তের মধ্যে উন্নতির একটি প্রকৃষ্ট সুযোগ দেখিতে পায়।

তদবস্থায় তাহাকে একটি ছাত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ছাত্র যেন সহাধ্যায়ীদিগের সহিত পাঠে সমানভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। পাঠ্য-পুস্তকে সমপাঠীরা অনেকটা পড়িয়া ফেলিয়াছে, সে যেন পারিয়া উঠিতেছে না। কাজে-কাজেই, পর-বৎসরের প্রারম্ভে নূতন ছাত্রেরা আসিয়া যত দিন না তাহার অনধিগত পাঠ আরম্ভ করে, তত দিন তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। নূতন ছাত্রের সহিত যোগ দিয়া পঠিত বিষয় তাহাকে পুনরায় পড়িতে হয়। তাহা হইলে সে গন্তব্য পথে চলিতে সমর্থ হয়। পথের কঠিনতা নিবন্ধন যেখানে তাহাকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল, এই নবীন ব্যবস্থার সুযোগে সে এখন ঐ স্থল অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হয়। অতএব "অনন্ত নরক"রূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যার পরিবর্ত্তে আমরা এখন "সাময়িক স্থান"রূপ করুণাসিক্ত সত্যের সন্ধান পাইলাম। পক্ষান্তরে, যাঁহারা পার্থিব জীবনে সম্পূর্ণভাবে নিকৃষ্টবৃত্তি, ইন্দ্রিয় ও বাসনা দমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অত্যুন্নত জীবাত্মা ঐ সংযমবলে অতি শীঘ্র প্রেতলোক ত্যাগ করিয়া যান। স্বর্গলোকে জাগরণ ঘটিলেই ইঁহার সমক্ষে স্বর্গলোকের অনির্ব্বচনীয় মহিমা ও পরমানন্দ উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে।

কিন্তু এক জন সাধারণ ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে কোনরূপেই সম্পূর্ণভাবে পার্থিব বাসনা ও ইন্দ্রিয়-দমনে সমর্থ হয় না। তাই ভুবর্লোকেও (Astral plane) তাহার একটি বলিষ্ঠ বাসনাদেহ থাকিয়া যায়। ভূর্লোকে স্থূলশরীরে অবস্থানকালে সে নিজেই ঐ বাসনা-দেহটি গঠন করিয়াছিল। যত দিন না ঐ বাসনা-দেহ কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়,

তত দিন তাহাকে দেহধারী হইয়াই বাস করিতে হয়। বাসনাই বাসনা-দেহের জীবন। এই বাসনা লোপ পাইলেই বাসনা-দেহের ক্ষয় হয়। এই প্রকার লোপ ও ক্ষয়ের সংঘটনে সর্ব্বদাই যাতনা ঘটে। ঐ যাতনার সঙ্কেতস্বরূপই প্রেতলোকের নরকাগ্নি কল্পিত হইয়াছে। এ কল্পনাও সুসঙ্গত।

প্রেতলোক-তথ্য

প্রেতলোকে নরকভোগব্যাপার বুঝাইতে হইলে সাধারণতঃ মদ্যপায়ীর উদাহরণ দেওয়া হয়। অবশ্য একটা উৎকট মাতালের কথাই বুঝিতে হইবে। সকলেই অনুমান করিতে পারেন যে, পানাসক্তি কতই ভীষণ-রূপে বলবতী। যাহার মনে এই পানেচ্ছা উদিত হয়, তাহার যাবতীয় ভদ্রতার ভাব অভিভূত হইয়া পড়ে। যাহারা তাহার সহিত অতি নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত, অতি সুমিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ, তাহারাও তাহার স্বাভাবিক স্নেহে বঞ্চিত হয়। তখন সেই বাসনা-পীড়িত ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার অনশনেও ভ্রূক্ষেপ করে না। সে তখন স্বীয় ঘৃণিত বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের পরিহিত বস্ত্র পর্য্যন্তও উন্মোচন করিয়া বিক্রয় করত অর্থ সংগ্রহ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই ব্যক্তি মরিয়া গেলে, মৃত্যু-প্রভাবে ইহার স্বভাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় না। সেই ভয়ঙ্করী পানেচ্ছা তখনও তাহার নিকট সেইরূপ বলবতী থাকে। শুধু তাহাই নহে, তখন সেই ইচ্ছা পূর্ব্বাপেক্ষাও বলশালিনী হইয়া দাঁড়ায়; কেন না, তখন আর বাসনা-স্পন্দনকে দুর্ব্বহ স্থূল জড়ের নোদন করিতে হয় না; মাত্র সূক্ষ্ম দেহেই বাসনার উপভোগ ঘটিয়া থাকে। তাই ঐ ব্যক্তির তখন স্থূল দেহ বিদ্যমান না থাকায় ঐ পানেচ্ছা চিরদিনের জন্য অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। এতাবদ্ব্যাপারে আমরা প্রকৃত প্রেতলোকের বেশ একটি চিত্র দেখিতে পাই। অতএব পাপক্ষালনকারী নরকাগ্নির কল্পনা অসঙ্গত নহে।

সুখের বিষয়, উহা পাপের ক্ষালন-ভূমি—প্রায়শ্চিত্ত-স্থল। উহা সেই নরক নহে, সেই অর্থ-শূন্য অনন্ত নরকের নিরর্থক কল্পনা নহে। দায়িত্ব-বিহীন দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তির কঠোর বৈর-চরিতার্থতার নিমিত্তই তাদৃশী কল্পনার সৃষ্টি। নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম-তত্ত্ব আমাদিগকে ঐ প্রকার নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে আদেশ করে। পরন্তু, উহা কু-বাসনা পরিবর্জ্জনের প্রয়োজনীয় একমাত্র ফলোৎপাদক, সুতরাং অতীব কল্যাণকর পন্থা। এখানে ভয়ঙ্কর যাতনা হইলেও বাসনা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায়। এইরূপে বাসনাক্ষয় হইলেই মানুষ স্বর্লোকের উচ্চতর জীবনে আরোহণ করিতে পারে। অন্যথায় পারে না। বাসনা যখন এইরূপে ক্ষয় হইয়া যায়, মানুষ যখন পূর্ণরূপে বাসনামুক্ত হইয়া থাকে, তখন পুনর্জ্জন্ম হইলে তাহার আর ইচ্ছা করিয়া পুনরায় বাসনার বোঝা স্কন্ধে করা কর্ত্তব্য নহে।

বাসনা এইরূপে বিলুপ্ত হইয়া গেলেও চরিত্রে একটা দুর্ব্বলতা থাকিয়া যায়। যে দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পূর্ব্বে বাসনা আসিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল, এ দুর্ব্বলতাও তদ্রূপ। ঐ বাসনামুক্ত ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম হইলে তাহার যেমন একটি স্থূলদেহ হইবে, সেইরূপ একটি সূক্ষ্মদেহও থাকিবে। এই সূক্ষ্ম-দেহটির উপাদানপুঞ্জের মধ্যে বাসনাস্ফুরণোপযোগী সামগ্রী বিদ্যমান থাকে। যেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনার সাজ-সরঞ্জাম সবই ঐ সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান থাকে। এই সকল সরঞ্জামের সাহায্যে ঐ ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বজন্মের পুনরভিনয় করিতে সমর্থ। ঐ ব্যক্তি সূক্ষ্মদেহস্থ ঐ সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, কারণ, পূর্ব্বজন্মে ঐ ব্যক্তি ঐ বস্তুর অন্বেষণ ও উহার ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু এই নবীন জন্মে যদিও ঐ সকল বস্তু উহার সূক্ষ্ম শরীরে সঞ্চিত থাকে, তথাপি উহার ব্যবহার করা ঐ ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে যদি ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যক্রমে সুযোগ্য ও সতর্ক পিতামাতার নিকটে প্রতিপালিত হইতে পায়, যদি মন্দ বাসনাগুলিকে বুঝিতে ও সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে শিক্ষা পায়, তাহা হইলে উপরি-উক্ত সামগ্রী অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের বাসনা-বীজগুলি অঙ্কুরিত না হইয়া বন্ধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। পরে

অব্যবহৃত থাকা প্রযুক্ত আমাদিগের অব্যবহৃত দৈহিক পেশীর ন্যায় ক্রমান্বয়ে বিশুষ্ক হইয়া যাইবে।

স্থূল-দেহের ন্যায় সূক্ষ্মদেহের সামগ্রীও মৃদুমন্দভাবে, কিন্তু অনুক্ষণই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। আবার নিরন্তরই নবীন সামগ্রীর সমাবেশ ঘটিতেছে। বিশুষ্ক উপাদান ক্ষয় পাইলেই তাহার স্থানে উৎকৃষ্টতর উপাদান সংগৃহীত হইবে। এই নবীন উপাদান সেই স্থূল ইন্দ্রিয়-ঘটিত বাসনার তীব্র, রুক্ষ পরিস্পন্দে সাড়া দিতে অসমর্থ। কাজেই ঐ নিকৃষ্ট ব্যাপারটি তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। বস্তুতঃ ঐ ব্যক্তি যখন উহাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে; উঠিয়া, পরিশেষে উহাকে জয় করিয়া ফেলিয়াছে। এতদ-বস্থায় ঐ কুপ্রবৃত্তি উহার শত শত ভাবী জীবনেও আর পুনরাবির্ভূত হইবে না। কেন না, উহার জীবাত্মায় কুপ্রবৃত্তির স্থানে এখন সম্পূর্ণ আত্ম-সংযমরূপ একটি বিপরীত ধর্ম্ম সংগঠিত হইয়াছে। বাসনার বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম করিয়া জীবনাতিবাহিত করিতে হইবে। তাহা হইলে অবশ্যই উহাকে পরাভূত করা যাইবে। এইরূপে কু-বাসনার পরাভব ঘটিলে আর সংগ্রামের আবশ্যকতা হইবে না; কেন না, তখন বাসনা-বিজয়ী ব্যক্তি পাপ-বাসনার উলঙ্গ মূর্ত্তি—প্রকৃত ছবি দেখিতে পাইবে। তখন আর ঐ ব্যক্তি উহার প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হইবে না। অতএব দেখা গেল, ভুবর্লোকের যাতনাকে পূর্ব্বে বড়ই ভয়ানক বলিয়া বোধ হইত, আর বাস্তবিক ভয়ানকও বটে; কিন্তু বস্তুতঃ উহা ছদ্মবেশী অনুগ্রহমাত্র। কেন না, উহার সাহায্যেই মানুষকে উপরি উক্ত প্রকার বিপুল নৈতিক জয়লাভ করিতে হয়। উহার সাহায্যেই সে ক্রমোন্নতির পথে দৃঢ়পাদবিক্ষেপে সমর্থ। আমাদের মনে হয় যে, তাদৃশ যাতনা ব্যতীত মানুষের পক্ষে ঐরূপ সুন্দর ফললাভ করিবার উপায়ান্তর নাই।

অতএব আমরা দেখিলাম যে, প্রেতলোক-তথ্যের অন্তরালে একটি অতীব আর্য্য সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আরও দেখিলাম যে, যখন পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মসংস্কার ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন বিস্তর সুন্দর

সুন্দর সত্য ও প্রয়োজনীয় জিনিষও সেই সঙ্গে পরিবর্জ্জন হইয়াছিল। প্রচলিত রীত্যনুসারে ঐ পরিবর্জ্জন-ব্যাপারকে "ধর্ম্মসংস্কার" আখ্যা দেওয়া হয়। এই ধর্ম্মসংস্কারটা একটা অসাধারণ বিকৃত ধর্ম্মোপপ্লব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রার্থনা

ঐ ধর্ম্মসংস্কার-কালে আমাদিগের বিস্তর ক্ষতি হয়। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে ভগবৎসমীপে মঙ্গলকামনা একটি প্রচলিত রীতি ছিল। ঐ সময়ে এই রীতিটি পরিবর্জ্জিত হয়। ইহাতে একটি গুরুতর ক্ষতি হইল। ঐরূপ মঙ্গলকামনা-প্রভাবে মৃত ব্যক্তি ভুবর্লোকে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হয়। ঐ রীতির পরিবর্জ্জনে মৃত ব্যক্তিকে নিঃসহায় অবস্থায় প্রতিকূল ব্যাপারের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়। যাহারা অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া প্রার্থনা-রীতিটি পরিত্যাগ করে, তাহারা নির্ব্বুদ্ধিতার ফল পাইয়া থাকে; কেন না, তাহাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন দুঃসহ যাতনা পায়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মানুষ ইচ্ছা করিয়া মৃত আত্মীয়ের সাহায্যে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। ঐরূপ সাহায্য করা কার্য্যটিকে ক্রূর কর্ম্ম ভাবিয়া থাকে। বাস্তবিকই দেবতারাও নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া উঠিতে অসমর্থ।

প্রার্থনা বস্তুটি কি? যাহারা আমাদিগের সাক্ষাতে দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগের অনুকূলে তীব্র ইচ্ছা ও প্রীতিপূর্ণ চিন্তা প্রকাশ করিবার নামই প্রার্থনা। যাঁহারা পরাবিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা উত্তমরূপে অবগত আছেন যে, ঈদৃশী ইচ্ছা ও চিন্তা সূক্ষ্ম জগতের খুব বাস্তব ব্যাপার। এগুলি যেন আধ্যাত্মিক শক্তির ভাণ্ডার, যেন তাড়িতাধার। এই ইচ্ছা বা চিন্তা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রেরিত হইলে উহার শক্তি তাড়িতশক্তির ন্যায় বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। যে ব্যক্তি স্থূলদেহী, তাহার উপরেই ইচ্ছা ও চিন্তার প্রভাব যখন এতটা, তখন মৃত ব্যক্তির উপর তাদৃশ প্রভাব পতিত না হইবে কেন? কোন এক জন মৃত

ব্যক্তির জন্য উপাসনা কি না প্রীতিপূর্ণ চিন্তা করিলে, উহা তাঁহার নিকটে পৌঁছায় ও তাঁহার উপকার-সাধন করে। যখন বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যকারণবিধি-সংশ্লিষ্ট, তখন উপরি-উক্ত ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী। যাবতীয় মৃত ব্যক্তিদিগের মঙ্গলার্থ সাধারণভাবে ব্যগ্র প্রার্থনা ও সদ্-ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার শক্তি ততটা ফলপ্রসবিনী না হইলেও ফল নিতান্ত কমও হয় না। মোটের উপর এই সাধারণ প্রার্থনার শুভফলও এত বেশী যে, ইহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। ইউরোপের বিস্তর ধর্ম্মসম্প্রদায় দিবারাত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ মৃত ব্যক্তি-বর্গের নিমিত্ত অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতেছেন। ইউরোপবাসীরা এই মহা-মহিম সম্প্রদায়গুলির নিকটে চিরঋণী।

যিনি মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরলোকে কি দশা ঘটিয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি, কতকটা অবগত হইলেও অধিকাংশ স্থলে সম্যক্ অবগত নহি। প্রশ্ন হইতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার জন্য কীদৃশী প্রার্থনা করিতে হইবে? তাঁহার কোন্ বস্তুর অভাব জানিতে না পারিয়া আমরা এমন প্রার্থনা করিয়া বসিলাম, যাহার প্রভাবে হয় ত তাঁহার অনিষ্টই ফলিল। এরূপ কার্য্য কি কর্ত্তব্য? এরূপ সংশয় হইলে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একটি উপদেশের আশ্রয় লইতে হইবে। উপদেশটি সুন্দর স্বরলহরীতে গ্রথিত। উহা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপদেশটি এই—"হে ভগবান্, চির-বিশ্রাম দাও তাহারে, রেখো হে চির আলোকপাথারে।" মৃত ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ যদি আমরা জানিতে পারি, তবে সে ত ভাল কথা। সে ক্ষেত্রে তদনুরূপ প্রার্থনা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি তাঁহার অভাবাদি আমরা অবগত হইতে না পারি, তবে সেরূপ স্থলে উপরি-উক্ত উপদেশ-অনুযায়ী প্রার্থনা ব্যতীত উৎকৃষ্টতর কামনা আর হইতে পারে না। বহুকাল পূর্ব্বে ঐ প্রার্থনা রচিত হইয়াছে। বহু শতাব্দী যাবৎ ঐ প্রার্থনা-পরিখার মধ্য দিয়া আবেগময় স্নেহের পবিত্র অভিব্যক্তি-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। তাহাতে কত আকুল প্রাণের যাতনা গিয়াছে! কতই উপকার সাধিত হইয়াছে!

যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি যে, উহাতে মৃত ব্যক্তির যাবতীয় অভাবেরই সম্যক্ মোচন হইতেছে, তাহা হইলে প্রতীতি হইবে যে, যিনিই ঐ প্রার্থনা-গীতিটি রচনা করুন না কেন, তিনি বিশেষ জানিয়া শুনিয়াই উহা রচনা করিয়াছিলেন, কিংবা হয় ত ঐশজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বীয় জ্ঞানের অতিরিক্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। মৃত ব্যক্তির যাহা আবশ্যক, তাহা উহার দুইটি কথায় অতীব যথার্থভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ, সমুদয় পার্থিব-চিন্তা ও উদ্বেগ হইতে "সম্পূর্ণ বিশ্রাম" বাঞ্ছনীয় ; কেন না, তদ্দ্বারা মৃত ব্যক্তির স্বর্গারোহণ বিঘ্নশূন্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভগবৎস্নেহের "চির আলোক" তাহার প্রয়োজন ; কারণ, তাহার স্বকীয় প্রকৃতির উচ্চতর ও অধিকতর আধ্যাত্মিক অংশ হইতে উহা তাহার উপরে সুস্পষ্টরূপে বর্ষিত হইলে ঐ ব্যক্তি ক্রমে উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে, তাহাতে উহার অগ্রগতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। মৃত ব্যক্তির নিমিত্ত ঈদৃশী প্রার্থনা নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইলে তাহার আর কোন পার্থিব সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে, এখানে ধর্ম্ম (ধর্ম্ম বলিতে খৃষ্টান-ধর্ম্মের "প্রোটেষ্ট্যাণ্ট" সম্প্রদায়ের কথা মনে স্থান দিতে হইবে না ; কেন না, ইহারা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যও গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ) মৃত ব্যক্তির উপকারার্থ অনেকটা কাজ করিয়াছে। অন্ধভাবে নহে, লোকে যদি ধর্ম্ম জিনিসটি বুঝিয়া বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে মৃত্যু-বিষয়ে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে, উহা সে সকলের সংশোধনপক্ষে অনেকটা কার্য্যকর হইত। তাহা হইলেও উহা স্বকীয় কয়েকটি অন্যায় সংস্কারের জন্য দায়ী। পরে সেগুলির আলোচনা করা যাইবে।

একটি অদ্ভুত মত

বিস্তর ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ভক্তিমান্ ব্যক্তির একটি অদ্ভুত ধারণা এই যে, মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থার বিষয় কিছুই নিশ্চিতরূপে জানা যায় না, মানুষ পরলোক

সংক্রান্ত ব্যাপার অবগত হয়, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, পরলোকের গুহ্য ব্যাপার দৈব রহস্য, ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্ব্বক মানব-চক্ষু হইতে ইহাকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, ইহা অবগত হইতে চেষ্টা করা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। ইহাপেক্ষা মূঢ়তাব্যঞ্জক বিবৃতি আর সম্ভবপর নহে। কেন না, পরলোকজ্ঞানোপযোগী বৃত্তিনিচয় যদি আমাদিগের আয়ত্তাধীন থাকে, তাহা হইলে কি এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, তত্রত্য ব্যাপারগুলির সমক্ষে আমাদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক চক্ষু নিমীলিত করাই ভগবানের অভিপ্রেত? প্রতিপদেই আমরা পরলোকের অস্তিত্ব অনুভূত করিতেছি, পরলোকবাসী বন্ধু-বান্ধবের মরণাতিরিক্ত জীবনের পরিচয় অনুক্ষণই পাইতেছি। আমাদিগকে কি এতদ্ব্যাপারগুলি উপেক্ষা করিয়া অষ্ট্রীচপক্ষীর ন্যায় বালুকার মধ্যে মুখ লুকাইতে হইবে? আমরা যে সকল শ্রেষ্ঠ সাধু মহাত্মাদের বিষয় জানি, তাঁহারা সকলেই এই অদৃষ্ট জগতের কথা বলিয়াছেন; তাঁহারা ইহাকে যেরূপটি দেখিয়াছেন, সেইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ও এতদ্বিষয়ে স্বস্ব অভিজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে কি আমাদিগকে মনে করিতে হইবে যে, যখন তাঁহারা পরলোকব্যাপারের পরীক্ষায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন পাষণ্ডতাপূর্ণ কৌতূহল তাঁহাদিগের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল? যখন তাঁহারা এই উচ্চতর জীবনের সত্যনিচয় বর্ণনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের চিত্ত নাস্তিকতা ও প্রতারণায় কলুষিত হইয়াছিল? কিন্তু এবম্প্রকার স্পষ্টতঃ ঘৃণার্হ ধারণার নিরসনার্থ তর্ক উপস্থাপিত করা নিশ্চয়ই নিরর্থক বাক্যব্যয়মাত্র।

যদি আমরা লক্ষ্য করি যে, আমাদিগের মধ্যে অনেকেই এই সূক্ষ্ম-জগৎ দেখিতে সমর্থ (কোন একটি বিশেষ প্রকার উৎকর্ষ প্রযুক্তই সূক্ষ্মজগৎ দেখিবার ক্ষমতা জন্মে বটে), তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি যে, এই শক্তি আমাদের সমুদয় মানব ভ্রাতার সাধারণ সম্পত্তি। তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, যেমন এক্ষণে কেহ কেহ সূক্ষ্মজগৎ

দেখিতে পাইতেছেন, সেইরূপ সমুদয় মানবজাতি এক দিন উহা দেখিতে পাইবে। কাজে-কাজেই এরূপ দৃষ্টিশক্তিলাভ মানবীয় ক্রমোন্নতির ঘটনা ও মহতী জাগতিক ব্যবস্থার সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবংবিধ উৎকর্ষই বাঞ্ছনীয় ও ব্যবহার্য্য। ইহা অস্বাভাবিক ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। এই শক্তি লাভ করিয়া যখন আমরা ফল পাইতে থাকি, যখন আমরা দেখি যে, এই শক্তির প্রভাবে মানুষ সত্যদর্শী হইলে তাহার নিজের মৃত্যু-ভয় থাকে না, পরলোকগত বন্ধু-বান্ধবের অবস্থা কি হইতেছে ভাবিয়া তাহার কোনরূপ উদ্বেগচাঞ্চল্যই দেখা যায় না, যখন আমরা বুঝিতে পারি যে, যিনি এই সূক্ষ্ম জগতের বিষয় অবগত আছেন, তিনি অজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অপেক্ষা অত্যধিক পরিমাণে মৃত ব্যক্তির উপকারসাধন করিতে পারেন, যখন আমরা এইগুলি লক্ষ্য করি, কেবল তখনই পরলোক সম্বন্ধে সংশয়শূন্য হইয়া থাকি। দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে আমাদিগের জ্ঞানের অধিকতর পরিপুষ্টি ঘটে, আমাদিগের আশা-ক্ষেত্রও অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাদৃশ জ্ঞান ও আশা নিবন্ধন আমাদিগের প্রভূত উপকারই সংসাধিত হয়, কদাচ কোন ক্ষতি উহার নিমিত্ত আমাদিগকে ভোগ করিতে হয় না। এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের অন্তরালে শাশ্বত সত্য বিরাজ করিতেছেন। যাহা আমাদিগকে ঐ সত্যের সমীপবর্ত্তী করে, আমরা জানি, তাহা কদাচ অনর্থকর হইতে পারে না।

মৃত্যু-ভয়

পরলোক সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না, ইহা একটি অন্যায় সংস্কার। যে মৃত্যু-ভয় বহু লোকের জীবনে অতীব দেদীপ্যমান, তাহা ঐ সংস্কার-সংশ্লিষ্ট ও বহু পরিমাণে উহারই প্রসূত ফল। সাধারণ্যে এতদ্বিষয়ের আলোচনা হয় না বটে, কিন্তু ধর্ম্মযাজকের ন্যায় যাহারা বহুলোকের হৃদয়ের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, বাস্তবিকই অনেকে

এই দারুণ ভয়ে সতত ভীত। ভূতযোনির মত এই বিভীষিকা অনুক্ষণই ইহাদিগের অনুসরণ করিতেছে; আহার-বিহার কোন সময়েই ইহারা মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি বা স্বাধীনতা পায় না।

যে ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুর জন্য এতদূর ভীত, সে তদীয় বন্ধু-বান্ধবের মরণের জন্য শঙ্কিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? ঐ ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে উহার শোকের অবধি থাকে না। তাহা ছাড়া মৃত আত্মীয়ের শোচনীয় দশা মনে করিয়া উহার হৃদয় উদ্বেগ ও যাতনায় পূর্ণ হইয়া পড়ে। মৃত্যুবিষয়ক প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলে কাহারও আর ভয় ও উদ্বেগ থাকে না। উহা তখন অচিরাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। যিনি এতদ্বিষয়িণী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি মৃত্যুকে জীবনের একটি ঘটনামাত্র মনে করেন। তিনি ভাবিয়া থাকেন যে, ইহ-জীবন যাপন যেরূপ ভয়ের বিষয় নহে, পারলৌকিক জীবনও তদ্রূপ আশঙ্কার বিষয় হইতে পারে না। একটা অস্পষ্ট অনিশ্চয়তার ও একটা অপূর্ণ নিয়মের অনুভূতিই তাদৃশী ভীতির প্রসূতি। মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই একটা ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিবে, এরূপ নিশ্চিত ধারণা উপরি-উক্ত ভয়ের ততটা কারণ নহে। সূক্ষ্ম-জগৎ সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ যখন নির্ভয় হয়, তখন তাহার প্রত্যয় দেখা দেয়, তখন সে সৌম্যভাবে স্বীয় অদৃষ্টের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হয়। যদি আমরা ধারণা করি যে, সূক্ষ্ম-জগৎগুলি ঠিক আমাদিগের এই পৃথিবীসুলভ পরিজ্ঞাত নিয়মে নিয়মিত হইতেছে, তাহা হইলে উহাদিগের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইলে উহাদের আলোচনা আমাদিগকে অনেকটা স্বস্তি-শান্তি প্রদান করিবে। বস্তুতঃ, ইহলোক ও পরলোক সর্ব্বত্র আমরা ঐশী শক্তির তত্ত্বাবধানে অবস্থান করি। সুতরাং সকল লোকেই আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা ও আমরা তুল্যরূপে নিরাপদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারাবাহিক জীবনের প্রমাণ

একটি প্রবাদ আছে যে—"সেই অনাবিষ্কৃত দেশের প্রান্ত হইতে কোন পথিকই ফিরিয়া আসে না।" এই ভ্রমসঙ্কুল ধারণাটি কেন যে আমাদিগের মধ্যে এরূপ প্রশস্তভাবে বিস্তৃত ও দৃঢ়মূল হইয়া পড়িল, তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। যখন আমরা মনে রাখি যে, পৃথিবীর যাবতীয় দেশেই আমাদিগের পরিজ্ঞাত প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগেই, সেই দেশের "প্রান্ত" হইতে পথিকবৃন্দ নিরন্তরই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, তখন ঐ আশ্চর্য্য সার্ব্বজনীন ভ্রমটির কারণানুসন্ধান করা আরও সুকঠিন হইয়া পড়ে।

ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, এই প্রসিদ্ধ, অযথা সংস্কারগুলি বহুপরিমাণে আমাদিগেরই বৈশিষ্ট্যসূচক। আমরা যে সভ্যতা-গর্ব্বে গর্ব্বিত, ঐগুলি তাহারই একটি প্রসূত ফল। যে সকল সঙ্করজাতি সামরিক-শক্তি, বাণিজ্য-বৈভব, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যান্ত্রিক উদ্ভাবন-বলে ভূমণ্ডলে আধিপত্য করিতেছে, ইউরোপখণ্ডই তাহাদের জন্মভূমি। কাজেকাজেই এই ইউরোপখণ্ড নিজেকেই একটা সমগ্র পৃথিবী মনে করিয়া ভাবিতে থাকে যে—ইহার স্বকীয় মতামত ও শিক্ষাই একমাত্র প্রণিধানযোগ্য। সম্ভবতঃ এরূপ চিন্তা করা উহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। তাহা হইলেও এ কথাটি সত্য যে, উহা পৃথিবীর একটি অতীব ক্ষুদ্র কোণ মাত্র। ইউরোপবাসিগণ এখনও অতীব নবীন জাতি। উহাদের যৌবনসুলভ সামর্থ্য থাকিলেও ঐ কালোচিত প্রগল্‌ভতা ও অপরিপক্বতা প্রচুর-পরিমাণেই উহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। উহারা কোন বিষয়-বিশেষে আপনাদিগের দারুণ অজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত দৃঢ়তার সহিত একটা মত প্রচার করিয়া থাকে যে, ঐ বিষয়টির সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই

যথার্থরূপে জানা যায় নাই বা জানিবার উপায়ও নাই। এরূপ আচরণ উহাদের নিত্যনৈমিত্তক ব্যাপার। ইহা উহাদের রীতি। পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে উহারা যে মতামত প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতেই উহাদের ঐ জঘন্য কদভ্যাসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

অতীব দুর্ভাগ্যক্রমে মানবের একটি প্রধান ব্যাপার—জন্মান্তর—যদি প্রচলিত ধর্ম্ম-মতের বিরোধী না হইত, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ মৃত্যু-বিষয়ে সাধারণের ধারণা স্বভাবতঃ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিত। যিনি প্রণিধান করেন যে, ইতঃপূর্ব্বে তিনি অনেকবার মরিয়াছেন, এতদ্ব্যাপারে তিনি অধিকতর প্রশান্তভাব ধারণ করিতে সমর্থ। যাঁহার ধারণা এই যে, ইহা একটি সম্পূর্ণরূপে নবীন ব্যাপার, যাবতীয় অনিশ্চিত ও অদ্ভুত সম্ভাবনা-সঙ্কুল, মৃত্যু-ব্যাপার স্মরণ হইলে তাঁহার ততটা প্রশান্ত-ভাব থাকে না। এই জন্মান্তর-ব্যাপারের দিক্ দিয়া দেখিলে কথাটি সত্য হইয়া দাঁড়ায় যে, সকল পথিকই সেই অজানা দেশের পথ হইতে ফিরিয়া আইসে। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অধিকতর উন্নত, তাঁহারা সচরাচর দেড় হাজার বৎসরের পরে জন্মগ্রহণ করেন। পথিকগণ আবার অন্য প্রকারেও প্রত্যাবর্ত্তন করে। এরূপ ক্ষেত্রে উহারা অতি অল্পদিন পরেই নানা কারণে নিরন্তরই ফিরিয়া আইসে। তখন তাহাদিগকে ভূতযোনি বলা হয়।

ভূতযোনি

যাহারা সূক্ষ্ম-জগতের অধিবাসীকে দেখিতে পায়, তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও একটি রীতি ছিল। কিন্তু উহাদিগের সাক্ষাৎ-কার লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়। সে কালে যেমন উহারা দৃষ্টিগোচর হইত, এখনও তদ্রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু সে কালে অর্থাৎ সেই ঠাট্টা-বিদ্রূপের সময়ে যাহারা উহাদিগকে দেখিয়া ফেলিত, তাহারা সে কথা কাহাকেও বলিত না, কথাটা খুব গোপনে রাখিত; কেন না, ঐরূপ ঘটনা

প্রকাশ করিলে তাহাদিগের প্রত্যক্ষবাদ-সভার বিজ্ঞ সভ্য বলিয়া যে খ্যাতি, তাহা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধারণের হৃদয়ে একটা কল্যাণকর পরিবর্ত্তন আসিয়া দেখা দিয়াছে। অধুনা যদি কেহ অতীন্দ্রিয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে উপহাস করে, তবে লোকের নিকটে সে নির্ব্বোধ, অজ্ঞ ও অহঙ্কারী বলিয়া বিবেচিত হয়। এখন আধ্যাত্মিক-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্যার উইলিয়ম ক্রুক্স্ ও স্যর অলিভার লজের ন্যায় প্রথিতনামা বৈজ্ঞানিক এবং মিঃ আর্থর ব্যাল্‌ফোরের ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ঐ সমিতির সদস্য। ঐ সমিতি সূক্ষ্ম-জগতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ গবেষণার বিপুল গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছে। সদস্যেরা ভাবিতেছেন যে, ঘটনাবলী সতর্ক ও ধারাবাহিক অনুসন্ধানের যোগ্য। ব্যাপার যখন এইরূপ, তখন যদি কেহ প্রচলিত রীত্যনুসারে উহাদিগকে "কুসংস্কার" এই চিরাভ্যস্ত, মূঢ়তাব্যঞ্জক "কাকাতুয়া"-বুলি বলিয়া উঠে, তবে তাদৃশ আচরণ এখন আর তাহার পক্ষে কল্যাণকর নহে।

ভূতযোনি-বিষয়ে পক্ষপাতশূন্য অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় দেশেই মৃতব্যক্তির সময় সময় পুনরাগমন সম্বন্ধে সু-পরীক্ষিত বিবরণ বিদ্যমান আছে। ঐ প্রেতযোনিরা যে লোকে বাস করিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে প্রচুর সংবাদ উহাদিগের নিকট হইতে আমরা পাই না। কিন্তু বিবিধ বিবরণগুলির তুলনা ও ঐক্যকরণ দ্বারা আমরা সূক্ষ্ম-জগতের বিস্তর ব্যাপার অনুমান করিয়া লইতে পারি। ঐ সকল বিবরণ দ্বারা আর কিছু না হউক, অন্ততঃ উহাতে নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি-মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, মৃত্যুর পর মানুষ সত্য সত্যই বাঁচিয়া থাকে।

মিঃ ডাব্‌লিউ, টি, ষ্টেড্ তদীয় "প্রকৃত ভূতের কাহিনী" নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের একটি ইতর কুসংস্কার এই যে, ভূত বলিয়া কোন কিছু নাই। উহাদিগের এই সংস্কারটি কিছুতেই যাইতে চাহে

না। ধর্ম্ম, কাব্য, বিজ্ঞান এ সকলের বিশেষজ্ঞগণ, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও যাঁহারা এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত হইয়াছেন যে, বাস্তবিকই ভূতযোনি বিদ্যমান আছে। ভূতযোনি কিরূপ, এ সম্বন্ধে অসংখ্য প্রকার মত প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু উহারা যে প্রকারই হউক, উহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্যসন্ধ অনুসন্ধানকারীদিগের মধ্যে গুরুতর বাদ-বিতণ্ডা আর নাই। এ বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ জন্মে, সে নিজে অনুসন্ধান করিয়া দেখুক। ছয় মাসে, সম্ভবতঃ ছয় সপ্তাহে অথবা ছয় দিনেই সে বুঝিতে পারিবে যে, ভৌতিক ব্যাপারের অস্তিত্ব সত্য, উহা অস্বীকার করা অসম্ভব। ঐ ব্যক্তি ভূতযোনির উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শত শত সুপ্রয়োগসম্পন্ন ব্যাখ্যার অবতারণা করিতে পারে, কিন্তু উহার বিদ্যমানতা সম্বন্ধে তাহার আর সংশয় থাকিতেই পারে না।

প্রেত-তত্ত্ব

অনাবিষ্কৃত দেশের প্রান্ত হইতে বহু পথিক আর একভাবেও ফিরিয়া আইসে। আধুনিক প্রেততত্ত্ব তাহাদিগের ফিরিয়া আসিবার একটি পন্থা প্রকাশ করিয়াছে। এই পন্থায় বিস্তর প্রতারণা ও চাতুরী আছে। তত্রাচ ধৈর্য্যশালী অক্লান্ত সাধক এ পথেও সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন। কিন্তু কোন অন্বেষক যদি উচ্চতর দিব্যদৃষ্টি-স্ফুরণে বিশেষরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়েন, তবে তিনি নানাবিধ ছদ্মবেশী প্রেতের সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাধীন হইয়া পড়েন। অপরঞ্চ, এই গবেষণা পথটিতে বিস্তর আবর্ত্ত-গর্ত্ত বিদ্যমান আছে। অনবহিত ব্যক্তিগণ নিমেষমধ্যেই উহাতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পতিত হয়েন। পরে আমরা প্রেত-বিষয়ক কয়েকটি ঘটনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু এখানে আপাততঃ এইটুকু বলিতে চাই যে, যাঁহারা মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী, তাঁহারা এবম্প্রকার ব্যাপার হইতেও বিস্তর সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

কথিত হইতে পারে যে, প্রেতদর্শকবৃন্দ যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত করেন, তাহার মূল্য অতীব অল্প ; কেন না, সেগুলি সর্ব্বদা সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হয় না। তা ছাড়া, প্রেতগণের প্রমুখাৎ যে সমুদয় বিবরণ বিবিধ সময়ে ও বিবিধ স্থানে পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির মধ্যেও ঘোর অনৈক্য। সত্য-সত্যই এই অনৈক্য দেখা গিয়াছে। অতএব প্রেত-প্রদত্ত প্রমাণ যে সকলগুলিই গ্রাহ্য, তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। কিন্তু এ কথাটি দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, যে প্রেতটি সংবাদ দিতে বসে, সে নিজে যতটুকু জানে, ততটুকু সত্যই বলে। দুইটি প্রেতের প্রদত্ত বিবরণে পার্থক্য ঘটিবার সাধারণ কারণ এই যে, তাহারা উভয়েই সম্যক্ অবগত নহে। তাহারা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রতারণা করে, তাহা নহে।

একটা উদাহরণ দেখা যাউক। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে সকল প্রেত ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির মুখে কথা-বার্ত্তা বলিয়া থাকে, তাহারা মৃত্যুর পরপারস্থ অবস্থার বর্ণনা করিতে বসিয়া বলে যে—পরবর্ত্তী জীবনটা ঠিক যেন একটা গ্রীষ্মকালীন আরাম-ভূমির উন্নতিশীল জীবন। বস্তুতঃ ঈদৃশী বর্ণনা মহিমামণ্ডিত একটি পার্থিব-ভাবেরই পুনরুক্তিমাত্র। ইহারা ধর্ম্মবিষয়ে যাহা কিছু বলিয়া থাকে, সে সবই খৃষ্টধর্ম্মবিষয়ক। কিন্তু উহাদের প্রদত্ত মতগুলি প্রাচীন মত অপেক্ষা অধিকতর উদার ও ততটা কঠোর নহে। সচরাচর মতগুলি লক্ষ্যহীন, কিন্তু স্পষ্টতঃ খৃষ্টধর্ম্মাত্মক। পার্থিব জীবনের ধর্ম্মভাবে তাহারা এইরূপই ভাবিত। সিংহলের প্রেততত্ত্ববাদীদিগের একটা বৈঠকে লেড্‌বিটার সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এবম্প্রকার সমিতিতে ইহা তাঁহার প্রথম উপস্থিতি। তিনি দেখিলেন যে, যতগুলি প্রেত ঐ বৈঠকে আহূত হইয়া সূক্ষ্ম-জগতের বিবরণ প্রদান করিতে লাগিল, তাহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিবিধ খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের সদস্য-দিগের ন্যায় পার্থিব ধর্ম্ম-বিশ্বাসটি উহাদিগেরও পরলোক পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান। তখনও পূর্ব্বের বিশ্বাস অটল—দৃঢ়মূল। এইরূপ ব্যাপার

দেখিয়া উক্ত মহাত্মা অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন। কোন প্রেত খৃষ্টান-মত, কেহ বা বৌদ্ধ-মত প্রচার করে, এবম্প্রকার বৈষম্যের হেতু সহজেই অনুমেয়। যে যেরূপ, সে সেইরূপ চায়। মৃত্যুর পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক—সর্ব্বকালেই এই রীতি। এটুকু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। তাহা হইলে আর উপরি-উক্ত বৈষম্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে ক্লেশ পাইতে হইবে না। জাতি, ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় অনুসারে পরলোকেও প্রেতগণ দল বাঁধিয়া বাস করে। ইহজীবনেও যেরূপ দলাদলি, পরলোকেও তদ্রূপ।

আর একটি নিঃসংশয় পদ্ধতি

বিবিধ প্রেত-প্রদত্ত প্রমাণগুলির ঐক্যকরণ দ্বারা আর ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মুখে যে সকল তথ্য নির্গত হইয়া থাকে, তৎসমুদয় হইতে আমরা পরলোকের অবস্থা-সংক্রান্ত বিস্তর সংবাদ প্রাপ্ত হইলেও তাদৃশী প্রাপ্তির পক্ষে তদপেক্ষাও সুনিশ্চিত ও সন্তোষজনক উপায় বিদ্যমান আছে। এই উপায়টির সাহায্যে আমরা পারলৌকিক জীবনের যাবতীয় বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ প্রাপ্ত হই। স্থূল-জগতে থাকিয়া সূক্ষ্ম-জগতের সংবাদ গ্রহণ করা আমাদিগের পক্ষে যতটা সম্ভবপর, তাহা ঐ উপায়টি দ্বারা হইতে পারে। স্থূলদেহী হইয়াও মানুষ অবসরক্রমে সূক্ষ্ম-জগতে প্রবেশ করিয়া তথাকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে ও তত্রত্য অধিবাসী-দিগের সহিত কথাবার্ত্তা করিবার পর বর্ত্তমান দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যাহা যাহা সেখানে দেখিয়া আসিল, সে সমুদয়ের বর্ণনা করিতে পারে। এ ব্যাপার মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। কিরূপে সম্ভব, তাহা এখনই বলিতেছি।

আমাদিগের এই স্থূলদেহটির সহিত আমরা খুবই পরিচিত। শুধু এই দেহটিতেই যে মানবাত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা নহে; বহির্জগতের সংবাদ গ্রহণের পক্ষে যে ইহার ইন্দ্রিয়গুলিই একমাত্র দ্বার, তাহাও নহে। বহু দিন পূর্ব্বে মহাত্মা সেণ্ট্ পল বলিয়া গিয়াছেন—"দেহ দুইটি,

একটি প্রাকৃতিক ও অপরটি আধ্যাত্মিক।” তাঁহার ঐ কথায় বুঝা যাইতেছে যে, তিনি মনুষ্যদেহ-গণনায় যে আধ্যাত্মিক দেহটির কথা বলিয়াছেন, পরাবিদ্যানুশীলনকারিগণ অবগত আছেন যে, সেটি ভুবর্লোক-সুলভ দেহ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর ও উচ্চতর। তাঁহার কথাটি বড়ই সুন্দর; কেন না, উহাতে নিম্নতর অর্থাৎ স্থূলতর অবস্থারও বর্ণনা আছে। বাস্তবিকই প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্থূলদেহ ছাড়াও ভিতরদিকে সূক্ষ্মদেহ আছে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জীবাত্মার কয়েকটি কোষ (দেহ) আছে। এই কোষগুলি একটি অপরটির অন্তর্গত, এইরূপে বিন্যস্ত। কোষগুলির প্রত্যেকটির স্ব স্ব ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি-প্রণালী আছে। উহারা নিসর্গের বিশেষ বিশেষ স্তরের পক্ষে বিশেষ বিশেষরূপে উপযোগী।

নিসর্গের স্তর আছে—এই মতটির ব্যাখ্যা পরাবিদ্যানুশীলনকারী ব্যক্তির পক্ষে অনাবশ্যক। কিন্তু যিনি তত্ত্ববিদ্যায় প্রথমে দীক্ষিত হইতে যাইতেছেন, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রেই বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে যে, আমাদিগের ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অতীব সুস্পষ্ট, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তর বা লোক-শ্রেণী বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জড় উপাদান। এই উপাদানের নিবিড়ত্ব-পরিমাণও পৃথক্ পৃথক্ প্রকার। আমাদিগের সতত-অনুভূত এই সমগ্র পৃথিবীটা উপরি-উক্ত লোকগুলির অন্যতম। এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তর। মানুষের দেহাভ্যন্তরে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম এইরূপ নানা প্রকারের জড় উপাদান বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে যে সকল স্তর বা লোকের কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল লোকের বিশেষ বিশেষ জড়াংশ মানুষের স্থূলদেহের ভিতরে আসিয়া পুঞ্জীকৃত হয়। স্থূলদেহে অবস্থান-কালেই ঐ সকল লোকশ্রেণীর অভিমুখে মানুষের বিবর্ত্তন-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। স্থূল ইন্দ্রিয়নিকরের স্বাভাবিক তৎপরতা নিবন্ধন মানুষ স্থূল-জগতের স্পন্দন গ্রহণে সমর্থ; তদ্রূপ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াশীলতাপ্রযুক্ত চতুর্দ্দিকস্থ সূক্ষ্মজড়োদ্ভূত লোকগুলি হইতেও সে স্পন্দন পরিগ্রহে সমর্থ হইয়া থাকে। অবশ্য, সূক্ষ্ম

ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্রিয়াশীল করিতে হইলে উহাদিগকে জাগরিত করিবার প্রয়োজন।

মৃত্যু হওয়ায় মানবাত্মা যখন এই স্থূলদেহের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধহীন হইয়া পড়ে, তখন সে অভিনব অবস্থার উপযোগী হইয়া চলিবার প্রয়াস পায়। তখন সে একটা সূক্ষ্ম-দেহে বিরাজ করে। সেই দেহকে আতিবাহিক দেহ বলা যাইতে পারে। এই দেহধারী হইয়া জীবাত্মা এই দেহের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে। আমাদিগের এই স্থূল পৃথিবীর অর্থাৎ এই ভূর্লোকের অব্যবহিত পরেই (ঊর্দ্ধদিকেই হউক আর ভিতরের দিকেই হউক) ভুবর্লোক। আতিবাহিক দেহযুক্ত জীবগণ ভুবর্লোকে অবস্থান করে। তাই মৃত্যুর পর আতিবাহিক দেহ-প্রাপ্ত জীবাত্মা ভুবর্লোক অনুভূত করিতে সমর্থ হয়। তখন উহার দৈহিক জড় উপাদানের ঘনত্বও ভুবর্লোকের অনুরূপই হইয়া থাকে। মৃত্যুর পরপারস্থ এই ভুবর্লোকের প্রাথমিক অবস্থাটা যদি আমাদিগের এই পার্থিব জীবনেই জানিবার বাসনা হয়, তবে আতিবাহিক-দেহ-সুলভ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার শিক্ষা করা আমাদিগের একান্ত প্রয়োজন।

ভূঃ, ভুবঃ প্রভৃতি যাবতীয় লোকের পদার্থানুভূতি-শক্তি নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে প্রত্যেকের ভিতরেই নিহিত আছে। কিন্তু আমাদিগের অধি-কাংশের পক্ষেই ঐ সকল সূক্ষ্মজগতের অভিজ্ঞতা দীর্ঘকালব্যাপী ও ধীর-গতি ক্রমাভিব্যক্তি-সাপেক্ষ। ভুবর্লোক-সম্ভব আতিবাহিক দেহের জড়-উপাদান একটু স্বতন্ত্র প্রকার; কেন না, পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহের মধ্যে যে সমুদয় ব্যক্তি সুশিক্ষিত, তাহারা ভুবর্লোক-সুলভ সূক্ষ্ম জড় উপাদানবাহী যাবতীয় পরিস্পন্দে সাড়া দিতে সমর্থ—এরূপ জ্ঞানে পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞানবান্। শুধু তাহাই নহে, উহারা তাদৃশ জ্ঞান-প্রভাবে স্ব স্ব সূক্ষ্মদেহকে নির্দ্দিষ্টভাবে যন্ত্র ও সাধনস্বরূপ ব্যবহার করিতে সমর্থ।

নিদ্রাকালে আমাদিগের অবস্থা

মানুষ যে কেবল মৃত্যু হইলেই স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মশরীরে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহা নহে। নিদ্রিত হইয়া পড়িলেও এবম্প্রকার ব্যাপার ঘটে। নিদ্রাবস্থায় সূক্ষ্মদেহে অবস্থান-কালে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটি দেহের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সংযোগ থাকে। তাই, নিমেষের মধ্যেই সূক্ষ্মদেহ হইতে স্থূলদেহে প্রত্যাগমন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে। বস্তুতঃ, সাধারন স্থলে সূক্ষ্মদেহের এই প্রয়াণ-ব্যাপারটিকেই স্থূলদেহের নিদ্রা বলা হয়। কেন না, স্বভাবতঃ মানুষ নিদ্রা যায় না, তাহার স্থূলদেহটিই নিদ্রিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে আমরা যে সমুদয় সুশিক্ষিত ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাদিগের সূক্ষ্মদেহোপযোগী ইন্দ্রিয়গুলির যথেষ্ট উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন। সুতরাং নিদ্রাকালে আমরা যে সমুদয় বাস্তব ঘটনাবলীর দ্বারা পরিবৃত হই, তাঁহারা যদি সেগুলির পরীক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়েন, তবে সেগুলির গবেষণা ও তাহা হইতে বিস্তর তথ্য সংগ্রহ করিতে তাঁহারা সমর্থ। কিন্তু খুব বেশী সময়েই উঁহারা সচেষ্ট হয়েন না, একরূপ অন্যমনস্কভাবেই রাত্রি অতিবাহিত করেন। যে চিন্তা মনে প্রবলা, কেবল সেইটিই গভীরভাবে পুনঃ পুনঃ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়েন। উঁহাদের সূক্ষ্মদেহোপযোগী বৃত্তি আছে, কিন্তু ক্বচিৎ সেগুলির ব্যবহার করেন। উঁহারা নিশ্চয়ই সূক্ষ্মজগতে জাগরূক থাকেন, কিন্তু জাগরূক হইয়া উহাতে প্রবেশ করেন না। কাজে কাজেই সূক্ষ্মজগতের পারিপার্শ্বিকগুলির কথা উঁহাদের বড় একটা মনে থাকে না।

উঁহাদের পূর্ব্বে বহু বহু জন্ম হইয়া গিয়াছে। একটা আবহমান-কালের রীত্যনুসারে উঁহারা ঐ ঐ জন্মে সূক্ষ্মদেহস্থ সুলভবৃত্তিগুলির ব্যবহার করেন নাই। কেন না, তখন ঐ বৃত্তিগুলি ক্রমে ক্রমে ও ধীরে ধীরে একটি 'খোলার' মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। ডিম্বের মধ্যে কুক্কুট-শাবক

যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ঠিক তদ্রূপ। ঐ খোলাটি স্বার্থাভিমুখী চিন্তা-রাশিতে গঠিত। সাধারণ মানব ঈদৃশী চিন্তায় এরূপভাবে নিমগ্ন থাকে যে, তাহার আর উদ্ধারের উপায় দেখা যায় না। এই স্বার্থচিন্তা তাহার স্ব-নির্ম্মিত প্রাচীরস্বরূপ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে। ইহা এত স্থূল যে, ইহার অপর পার্শ্বে যে কি ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা ঐ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কিছুই অবগত হইতে পারে না। কখন কখন, (সেটা বড়ই কদাচিৎ), বাহিরের কোন প্রচণ্ড সংক্রমিতবল কিংবা নিজেরই কোন আভ্যন্তরীণ উদ্দাম বাসনা ক্ষণকালের নিমিত্ত এই কুজ্ঝটিকার যবনিকা অপসৃত করিয়া থাকে। তখন ঐ ব্যক্তি কিছু প্রকৃত জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। কিন্তু আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে গাঢ় কুয়াসা তাহার চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত হইয়া উঠে। তখন ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বের ন্যায় বে-হুঁসভাবে স্বপ্ন দেখিতে থাকে। সুদূর-ভবিষ্যতে মানবের সুধীর কিন্তু সুনিশ্চিত ক্রমাভিব্যক্তি ক্রমান্বয়ে এই কুয়াসা-তিমির বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। তখন সে ক্রমে ক্রমে নিজের চতুর্দ্দিকস্থ অতীত কর্ম্মজীবনে পূর্ণ একটি বিশাল জগৎ অনুভূত করিতে সমর্থ হইবে। অথবা সে নিজেই প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া, স্বীয় আভ্যন্তরীণ দৃঢ় ও অবিচলিত উদ্যম-প্রভাবে উপরি-উক্ত কুয়াসা-জাল অপসারিত করিয়া ক্রমশঃ নিশ্চেষ্টতার যুগ-সম্ভূত অবসাদ দূর করিতে সমর্থ হইবে, প্রাকৃতিক কার্য্য একটু দ্রুতভাবে চালাইতে হইলেই এরূপ ব্যাপারের প্রয়োজন হয়। এরূপ উদ্যম-প্রকাশে যদি অন্যদিকের তুল্যরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহাতে ক্ষতি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভের পূর্ব্বে মানসিক বল, জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করিবার প্রয়োজন। যদি কোন ব্যক্তি মানসিক বল প্রভৃতি লাভ করিতে পারিল না, অথচ তাহার পূর্ব্ব-জীবনের স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল, তবে সেরূপ স্থলে তাহার দ্বিগুণ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ সে ব্যক্তি দিব্যজ্ঞানসম্ভূত শক্তি-নিচয়ের অপব্যবহার করিয়া বসিবে; দ্বিতীয়তঃ ঐরূপ বিবিধ শক্তি নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদের প্রকৃতি

অনুধাবন বা তাহাদিগকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে।

পর্য্যবেক্ষণ-শিক্ষা

যিনি নিয়মিতরূপে গুহ্য-তত্ত্ববিষয়িণী শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকে সাধারণতঃ প্রথমেই তাঁহার অভ্যস্ত চিন্তা-প্রণালীটি পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে নবীন ও সুন্দর জগৎ বিদ্যমান আছে, সেইটি তাঁহাকে দেখিতে হইবে; দেখিবার শিক্ষা করিতে হইবে। কেন না, তাহা হইলে তিনি ঐ নবীন জগতে প্রতিভান্বিতভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন। এতটুকু শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেই যে তিনি জাগরিত অবস্থায় সূক্ষ্মদেহসুলভ জ্ঞানের কোন স্মৃতি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা নহে। তিনি ঐরূপভাবে সমর্থ হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু নিশ্চয়ই যে হইবেন, তাহার কোন স্থিরতা নাই। সূক্ষ্ম-জগতের ব্যাপার স্মরণ করিয়া বলা একটি গুরুতর ক্ষমতা। যিনি সূক্ষ্ম-জগতের জ্ঞানটিকে স্থূল-জগতে অবিচ্ছিন্নভাবে বরাবর বহন করিয়া আনিতে পারেন, তিনিই ঐ ক্ষমতা লাভ করেন। জ্ঞানটিকে বহন করিয়া আনিবার শক্তির উপরেই ঐ ক্ষমতা নির্ভর করিয়া থাকে। সূক্ষ্ম-জগতে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার শক্তির সহিত এই ক্ষমতার কোনই সংস্রব নাই। ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইতে শক্তিও ক্রমে আসিয়া পড়ে। তখন মানুষ স্থূল-দেহী হইয়াই সূক্ষ্মদেহ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান প্রকাশে সমর্থ হয়। সুতরাং মানুষ তখন জাগ্রত ও নিদ্রিত উভয় অবস্থাতেই সূক্ষ্ম-দেহের ইন্দ্রিয়নিচয় ও শক্তিরাজির ব্যবহারজনিত উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সে চতুর্দ্দিকে নিরন্তরই মৃতব্যক্তিবর্গকে দেখিতে পায়। সুতরাং তখন সে তাহাদিগের তত্রত্য অবস্থাদি পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়। এতদবস্থায় ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা পারলৌকিক জীবন-সংক্রান্ত প্রচুর সত্য ও বিশদ সংবাদ পাইতে

পারি। এতাদৃশ দর্শকবৃন্দের নিকট হইতেই আমরা সূক্ষ্মজগতের সন্তোষজনক জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হই।

এ কথাটি সত্য যে, ঐ সকল ব্যাপার ঐ প্রকার ব্যক্তির নিকটেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অন্যের নিকটে নহে। কিন্তু উহার উক্তিনিচয় অন্যেও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। অন্ততঃ উক্তিগুলির মূল্য আছে; কেন না, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর উহাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ঐগুলি সোজাসুজিভাবে উৎপাদকের নিকট প্রাপ্ত, এ জন্যও উহাদিগকে মূল্যবান্ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যখন এরূপ ব্যাপার ঘটে যে, অনেকগুলি তত্ত্ব-অন্বেষক পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ধারাবাহিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিল যে, তাহাদের গবেষণার ফলগুলির মধ্যে মূলতঃ খুব সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তাহাদিগের প্রদত্ত সেই সাক্ষ্য যেন যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ়ীভূত বলিয়া বোধ হয়। আবার যখন দেখা যায় যে, তাহাদিগের গবেষণা এতদ্ব্যাপার সম্বন্ধে পৃথিবীর প্রাচীন ধর্ম্মমতগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন বা কোন কোন স্থলে উহাদিগের ব্যাখ্যা করিতেছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাহাদিগের কথা স্পষ্টতঃ সত্য। সেরূপ ক্ষেত্রে পরলোক সম্বন্ধে আলোচনায় তাহাদিগের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করা নির্ব্বোধের কার্য্য। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে নিরন্তরই সূক্ষ্মজগতের ঘটনাবলীর সংঘটন হইতেছে। এ সকল ঘটনা আমাদের আলোচ্য। উপরি-উক্ত প্রত্যক্ষদর্শীরা যে অনুমান করিয়া থাকে, আমাদের মনে হয়, কেবল তাহাই ঐ আলোচ্য ঘটনার একমাত্র সন্তোষজনক হেতু-নির্দ্দেশক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, খৃষ্টধর্ম্মের প্রাচীন ও সত্য উপদেশগুলির মধ্যে ঐ অনুমানের পরিপন্থী কোন কিছুই নাই।

যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর পরাবিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সর্ব্বদাই সূক্ষ্ম-জগতের কার্য্যে ব্যাপৃত, তাঁহাদিগের নিকটে সূক্ষ্মজগতের অস্তিত্ব একটা খাঁটি সত্য, একটা দৈনন্দিন ব্যাপার, স্থূল দেহের

মত একটা বাস্তব পদার্থ। তাই পরাবিদ্যা সমিতির কোন ব্যক্তির নিকটেই ঐ সকল ব্যাপার আর কল্পনার সামগ্রী নহে, উহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত। দিন দিন এখন ঐ সমিতির সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সূক্ষ্ম-জগতের আলোচনায় উঁহারা বিস্তর তথ্য জানিতে পারিয়াছেন। আমরা পরে সেগুলির আলোচনা করিব। তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, আবিষ্কৃত তথ্যগুলি আমাদিগের প্রাণে অনেকটা উৎসাহের সঞ্চার করে। কেন না, উহাদের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, মৃত্যু-ব্যাপারটি অমর-জীবনপথে একটি ঘটনামাত্র—এই ঘটনার জন্য কিছু-মাত্র বিলাপ বা ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। পরন্তু উহাকে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর অবস্থায় উপনীত হইবার একটি সোপান বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অন্যায় সংস্কার

আমরা এক্ষণে যে সকল অন্যায় সংস্কারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যাইতে পারে যে, প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে সেগুলির উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃত খৃষ্ট-ধর্ম্ম হইতে আদৌ তাহারা উদ্ভূত নহে। অধুনা আমরা ঐ ধর্ম্মে যে সকল নিরর্থক জড়-বাদ আনিয়া ফেলিয়াছি, তাহাই ঐ কুসংস্কারের প্রসূতি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ ধর্ম্মে একটা যুক্তি-বিরুদ্ধ মত প্রচলিত আছে। সেটি এই—মৃত্যু হইবামাত্র মানুষ হয় অনন্ত স্বর্গে, নয় অনন্ত নরকে গমন করিয়া থাকে। খৃষ্টধর্ম্মের কতিপয় সম্প্রদায় এই মতের পৃষ্ঠপোষক। উহাদিগকে বড় একটা কেহ চিনে না। এই মতটি নানা প্রকারে বিস্তর অনিষ্টসাধন করিয়াছে। তা ছাড়া, উহাতে সুস্পষ্ট অসঙ্গত কথা থাকা প্রযুক্ত উহার উপর লোকের কার্য্যতঃ একটা ঘোর অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। যাহারা এই মতাবলম্বী সম্প্রদায়ভুক্ত হইবে, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐ দুইটি দশার একটি গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ হয় স্বর্গে, নয় নরকে যাইতেই হইবে, তাহার আর গত্যন্তর নাই। এবম্প্রকার ব্যবস্থা যদি হয়, তবে সেটি নিতান্তই গর্হিত। এরূপ হওয়া ঘোর অসম্ভব। যাঁহারা এই মতটির প্রবর্ত্তক, হয় ত তাঁহারা পারলৌকিক ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতেন না। সমগ্র ব্যাপারটিই তাঁহাদের নিকটে রহস্য-জড়িত ও অর্থশূন্য বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। তাই অশান্তিকর সংশয়ে তাঁহারা অনাশ্বাসিতপূর্ব্ব দৈবানুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ভগবান্ দয়া-পরবশ হইয়া অবশ্যই অনুগ্রহ করিবেন, এইরূপ একটা ক্ষীণ আশা তাঁহাদের হৃদয়ে আসিয়া জাগিত। অথবা ঐ মত-প্রবর্ত্তকগণ একটা অদার্শনিক সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে, মৃত্যু হইলে একটি আকস্মিক ও ষোলকলাপূর্ণ

পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ভাবিলেন,এই পরিবর্ত্তন-নিবন্ধন মৃতব্যক্তির যাবতীয় কদভ্যাসগুলি নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হয়, আর তখনই ঐ ব্যক্তি এক জন দেবদূত হইয়া উঠে; কাজে কাজেই তখন সে স্বর্গবাসের উপযোগী হইয়া থাকে। কিম্বা ঐ মতপ্রচারকগণ ভাবিয়াছিলেন যে, মৃত্যুকালে সঞ্চিত পুণ্য স্খলিত হইয়া পড়ায় মৃত ব্যক্তি একটা বিকট দানব হইয়া উঠে। মৃত্যুকালে যে পুণ্য স্খলিত হইয়া যায়, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ঐটি তাঁহাদের অনুমান। এই শেষোক্ত ধারণাটি সম্বন্ধে সচরাচর বড় একটা হৈ-চৈ শুনা যায় না।

এই মতটি যে মূঢ়জনোচিত ও ভ্রমসঙ্কুল, তাহা প্রতিপন্ন করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতি কদাচ ঐন্দ্রজালিক চাতুরী প্রকাশ করেন না। তাঁহার কাছে সকল প্রকার উন্নতিই ক্রমানুবর্ত্তিনী। কোন অনভিপ্রেত ব্যাপার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিংবা দুর্ব্বলকে সবল করিতে হইলে, সে কার্য্য ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া হইতে থাকে। সে কার্য্যটি স্বাভাবিক-ভাবে (এই কথাটিই খুব সুসঙ্গত), ধীরগতিতে সংঘটিত হয়। উহা যে আশ্চর্য্যরূপে বা অতীন্দ্রিয় সংস্রব নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে। বস্তুতঃ আমরা দেখিয়া থাকি যে, মৃত্যু হওয়ায় মৃত ব্যক্তির প্রকৃতির আদৌ কোন পরিবর্ত্তনই ঘটে না। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন ঐ ব্যক্তি যেরূপটি ছিল, মৃত্যুর পরবর্ত্তী দিনেও সে ঠিক সেইরূপটিই থাকে। একটুও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। জীবিত-কালে যদি ঐ ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ, ভক্তিমান্ বা অলৌকিক ধীরশক্তিসম্পন্ন থাকেন, তবে মৃত্যুর পরেও উঁহার ঐ সকল গুণরাশি বিদ্যমান থাকিবে। অপরঞ্চ, যদি উনি পার্থিব জীবনে নীচ ও সঙ্কীর্ণ-হৃদয়, কুচিন্তারত ও ইন্দ্রিয়-সেবাসংক্রান্ত বাসনায় বিব্রত থাকেন, তবে মৃত্যুর তোরণ অতিক্রম করিয়া গেলেও ঐ সকল অসদ্গুণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। প্রকৃত কথা এই যে, মৃত্যু হওয়ায় প্রকৃত মানুষটির কোনরূপ পরিবর্ত্তনই ঘটে না। পরিচ্ছদা-বৃত ব্যক্তির বহিরাবণটি উন্মোচনের ন্যায় স্থূলদেহপরিত্যাগে দেহীর প্রকৃতি-গত কোন পরিবর্ত্তনই হয় না। যখনই মানুষ এই ব্যাপারটি অনুভব

করিতে পারে, অমনই সে বুঝিতে পারে যে, মৃত্যুও আমাদিগের পরিজ্ঞাত অন্যান্য নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের ন্যায় একটা পরিবর্ত্তনমাত্র। তখন সে মনে করে যে, অলৌকিক রূপান্তরের প্রতীক্ষায় সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। সে বুঝিতে পারে যে, যাহা তাহার হইবার ইচ্ছা, নিজেকে সেইরূপটি গড়িয়া তুলিতে হইবে, ধীরে ধীরে অথচ অটলভাবে এই গঠন-ক্রিয়া পরিচালনের প্রয়োজন। কেন না, তাহার কার্য্যকলাপ একটি শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনীয় বিধির অন্তর্গত। এই বিধির প্রভাবে কোন ব্যক্তি বিনা পরিশ্রমে কিছুই প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু পরিশ্রম করিলে তাহার পুরস্কার কড়া-ক্রান্তি হিসাবে পাওয়া যায়; তাহার কদাচ অন্যথা হয় না। যে সূক্ষ্ম-জগৎ তাহার নিকটে একটা অস্থিরচিত্তের কল্পিত রাজ্যের সামগ্রী বলিয়া মনে হইত, এখন তাহা জাগতিক বিধি-নিয়মিত সু-পরিজ্ঞাত সাম্রাজ্যের বিষয়ীভূত হইয়া উঠিল। এরূপ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি যথাযথভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণে সমর্থ।

মৃত্যুর নিমিত্ত আয়োজন

মৃত্যুর নিমিত্ত একটা বিশেষ প্রকার আয়োজনের প্রয়োজন আছে, এই কথাটি পুনঃ পুনঃ খৃষ্টধর্ম্মী মানবের আর একটি অহিতসাধন করিয়াছে। মূলধর্ম্মটি চিরকালই সাম্প্রদায়িক মতাপেক্ষা অধিকতর পরিণামদর্শী ও উহার মূলধর্ম্মে নানাবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানের সুস্পষ্ট বিধিব্যবস্থা আছে। যিনি সমর্থ, তাঁহাকেই ক্রিয়াদি করিতে হইবে—ব্যবস্থা এইরূপ। কিন্তু যিনি অধম, যিনি ঐ অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়া ঘটনাচক্রে অন্যত্র জীবলীলা সাঙ্গ করেন, তাঁহার উপর মূলধর্ম্ম কোন প্রকার প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করে নাই। পরন্তু অনেকগুলি সম্প্রদায়ের মত এই যে, মানুষের মৃত্যুকালীন মানসিক অবস্থার উপর তাহার শাশ্বত কল্যাণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যদি তিনি মৃত্যুসময়ে "করুণা" বা "ভগবদনুগ্রহ" প্রাপ্ত হইলেন, তবে আর ভাবনা নাই; মনে করিতে হইবে, তিনি অতি সহজে আনন্দধামে যাইবার টিকিট

পাইয়া বসিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি যদি ঐরূপ ত্রাণ প্রাপ্ত না হইলেন, তবেই মুস্কিল। সেরূপ ক্ষেত্রে, তাঁহার পরবর্ত্তী অবস্থার বর্ণনা যত না করা হয়, ততই ভাল। এবংবিধ বায়ুরোগাত্মক অদ্ভুত মুক্তি-ব্যাপারটি (মৃত্যু-কালে পাপী মনে করিল, আমি "ত্রাণ" প্রাপ্ত হইলাম আর অমনি ত্রাণ হইয়া গেল, এই অদ্ভুত মতটি) সম্ভবতঃ মানববুদ্ধির অতীব বিস্ময়জনক একটা বিকৃতিমাত্র। ঐ কুসংস্কারটির মধ্যে আদৌ কোন বুদ্ধির পরিচয় নাই, যদিই কিছু থাকে, তবে তাহা ঐরূপ বিকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই অদ্ভুত প্রতারণার ফল বিশেষরূপ নির্ম্মম। কেন না, যদি কোন ব্যক্তি সংগ্রামরত সৈনিকের ন্যায় বিদেশে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুকালীন মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা অবগত হওয়া তাহার আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। কাজে কাজেই তাহার নিমিত্ত একটা অনাবশ্যক ভয় ও উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হয়। যেমন সকল প্রকার লৌকিক কুসংস্কারের মধ্যেই অতি সামান্য একটু সত্য নিহিত থাকে, সেইরূপ এই অদ্ভুত ধারণাটির তলদেশেও অতি ক্ষুদ্র একটি সত্যের কণিকা বিদ্যমান আছে। এই সত্যটুকুর উপর একটি সুবিপুল গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র ভিত্তি ঐ প্রকাণ্ড গৃহের ভার ধারণ করিতে অসমর্থ।

ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, এইটুকুই মৃত্যু-উদ্দেশে একমাত্র আয়োজন। এই আয়োজনই একমাত্র ফলোৎপাদক ও প্রয়োজনীয়। মানুষ যদি সারাটি জীবন ধর্ম্মপথে কাটাইয়া থাকে, তবে বন্দুকের গুলী বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুকালে তাহার মানসিক অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা দেখিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। আর জীবিতকালের ধর্ম্মাচরণ যদি তাহার পারলৌকিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া না থাকে, তবে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত থাকিয়া একটা ক্ষণিক প্রবলীভূত অনুতাপ দ্বারা সে ব্যক্তি কখনই স্বীয় ভবিষ্যতের পরিবর্ত্তন ঘটাইবার আশা করিতে পারে না। কুপথগামী ব্যক্তিরও মতি-পরিবর্ত্তন ঘটে। কোন না কো

সময়ে সে সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। আসন্ন মৃত্যুর আবেগে যদি তাহার ঐরূপ পরিবর্ত্তন দেখা দেয়, তবে সেটা খুবই ভাল। এরূপ স্থলে তাহার কর্ম্মের পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। ভোগ দ্বারা তাহাকে কর্ম্মক্ষয় করিতে হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী জগতেও যদি তাহার ঐরূপই সদিচ্ছা থাকিয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই তাহার সঞ্চিত কর্ম্মের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, ঐ সদিচ্ছাপ্রভাবে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের নূতন কর্ম্মও সদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া উঠে।

মৃত্যুর পূর্ব্বে মনে যে চিন্তার উদয় হয়, সেটি একেবারেই নিষ্ফল, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। পক্ষান্তরে, ঈদৃশী চিন্তা অনুন্নত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরবিস্থার মতে মানুষ নিদ্রিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার মনে যে চিন্তাটি থাকে, সেটি কিরূপ, তাহা বিশেষরূপে দেখা আবশ্যক। কারণ, আমরা এখন ক্রমোন্নতির যে ক্রমে অবস্থিত, তাহাতে ঐরূপ চিন্তাটি লইয়াই—উহারই আলোড়ন-বিলোড়ন করিয়াই প্রায় সারারাত্রিটা অতিবাহিত করিয়া থাকি। যিনি সূক্ষ্মজগৎ দেখিতে পান, নিদ্রার পূর্ব্বকালীন চিন্তায় তাঁহার তত প্রয়োজন নাই; কেন না, চিন্তা হইতে চিন্তান্তরে যাইবার ক্ষমতা তাঁহার করায়ত্ত। তাই তিনি ইচ্ছামাত্রই নিদ্রার পূর্ব্ব-বর্ত্তী চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহার চিন্তার সাধারণ উন্মুখতা কোন্ দিকে, কেবল সেইটুকুই লক্ষ্য করিতে হইবে; কেন না, এরূপ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির মন অভ্যস্ত প্রণালীতে দিবারাত্র সমভাবে প্রধাবিত হইয়া থাকে।

সাধারণ উন্নত মানবেরও ঐ প্রকার দশা। তাঁহাদেরও পার্থিব জীবনে মনের যে সাধারণ প্রবণতা থাকে, সূক্ষ্মজগতেও সেইটি তাঁহাদের কার্য্যের মূলসূত্র হয়। অতএব ইঁহাদেরও মৃত্যুকালীন বিশেষ কোন একটি চিন্তা তত প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু যাহারা একেবারে অনুন্নত, সূক্ষ্মজগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যাহাদের এখনও অতীব অস্পষ্ট ও অভিনব,

তাহাদের নিকটে মৃত্যুকালীন চিন্তাটির মূল্য খুব বেশী। কেন না, এই চিন্তাটি তাহার মনে অনেকটা সময় থাকিবার সম্ভাবনা। ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিলেও তাহা অতি ধীরে ধীরে ঘটে। অতএব এই চিন্তাটিকেই প্রধান সুর মনে করিয়া তাহার সূক্ষ্ম-জীবনের অন্যান্য সুরগুলি ইহার সহিত মিশাইয়া বাঁধা যায়। যাহাতে এই চরমকালীন চিন্তাটি অসৎচিন্তা না হইয়া একটি সৎচিন্তা হয়, সে বিষয়ে একটু যত্ন লইলে সে যত্ন নিশ্চয়ই নিষ্ফল হয় না।

সৈনিকের মৃত্যু

যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে, কর্ত্তব্যের আহ্বানে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহার অদৃষ্ট সম্বন্ধে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা সংশয় থাকা উচিত নহে। অপর ব্যক্তিবর্গের ন্যায় তাঁহার ভবিষ্যৎও তাঁহার জীবনের উপরই নির্ভর করে, মৃত্যুর উপর নহে। কিন্তু তাঁহার ঐ মৃত্যুটিও তাঁহার ক্রমাভিব্যক্তির একটি মূল সাধন। কর্ত্তব্য জিনিসটি তাঁহার নিকট একটি মনঃকল্পিত ব্যাপার। মাত্র ইহার নিমিত্তই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ। ততদূর সাহস—ততদূর বীরত্ব পর্য্যন্ত তাঁহার স্ফুরিত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, তিনি পূর্ব্ব-অবস্থা হইতে অনেকটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। তিনি ন্যায়তঃ যত্ন করিলেন কি অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি মনে করেন যে, তিমি ন্যায়ের পক্ষেই আছেন। তাঁহার নিকটে ঐ যুদ্ধ কর্ত্তব্যের আহ্বান, তাঁহার জন্মভূমির আদেশ। তাই তিনি যাবতীয় স্বার্থচিন্তা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, মৃত্যুকে ধ্রুব সত্য জানিয়াও ঐ আদেশ প্রতিপালনে কৃতসঙ্কল্প। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যে শ্রেণীর মনুষ্য হইতে সাধারণ সৈনিক বাছিয়া লওয়া হয়, তাহাদের গার্হস্থ্য জীবনে সাধারণতঃ ঐরূপ বিস্ময়কর সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার উৎকর্ষসাধন পক্ষে কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অথচ ঐ উৎকর্ষ সমরাঙ্গনে

সাধিত হইয়া থাকে। ঐরূপ লক্ষ্য করিতে করিতে ইহাও দৃষ্টি-গোচর হইবে যে, যুদ্ধব্যাপারটি ভয়াবহ হইলেও উহাতে নির্দ্দিষ্ট ক্রমে একটা সুস্পষ্ট ক্রমোন্নতি ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানগণের ধারণা এই যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে রণভূমিতে শয়ন করে, সে পরবর্ত্তী জগতে অচিরাৎ সুখ-সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাই দেখা গেল, এই ধারণাটির মূলেও একটি সত্য কথা বিদ্যমান রহিয়াছে।

দীর্ঘজীবনে মানুষের যতটুকু ক্রমোন্নতি ঘটে, যুদ্ধে মরিলে কতিপয় স্থলে তাহা অপেক্ষা অধিক ঘটিয়া থাকে। তথাচ, মূল ধর্ম্মে একটা কথা আছে যে—"হে প্রভু! আমাদিগকে আকস্মিক মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করুন।" এই প্রার্থনাটির মধ্যে সাধারণতঃ একটি যুক্তি দেখা যায়। মানুষ বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে, ইহজীবনেই তাহার অধিকাংশ ইতর বাসনা স্বভাবতঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার চরিত্রে ইতরবৃত্তি আর থাকে না। সুতরাং পরিশুদ্ধির নিমিত্ত ভুবর্লোকে আর তাহাকে ততটা খাটিতে হয় না। দীর্ঘকাল পীড়ায় ভুগিলেও অনেকটা ঐরূপ ফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ণ যৌবনচ্ছটার মধ্যেই অকস্মাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, তাহার অবস্থা একেবারে স্বতন্ত্র প্রকার হইয়া থাকে। ইহার বাসনানিচয় তীব্র ও উদ্যম থাকা প্রযুক্ত ইহাকে সূক্ষ্মজগতে দীর্ঘ-কাল অবস্থিতি করিতে হয়। কিন্তু তথায় যদি এই ব্যক্তি বেশ সদ্ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে শিক্ষা করে, তবে তাহাতে এত অধিক সুন্দর কর্ম্মফল প্রসূত হইবে যে, জীবিত থাকিলেও সে ঐ সময়ের মধ্যে অতটা সুফল অর্জ্জন করিতে পারিত না। অতএব আকস্মিক মৃত্যু-ব্যাপারটিরও আমরা দুইটা দিক্ দেখিতে পাই।

মানুষ যদি অকস্মাৎ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভুবর্লোকে যাইয়া উঠে, তবে সেরূপ স্থলে কখন কখন তাহাকে সুখস্বপ্ন-পুলকিত নিদ্রায় দীর্ঘকাল যাবৎ অভিভূত থাকিতে হয়। জ্ঞান-চৈতন্য আদৌ থাকে না। খৃষ্ট-ধর্ম্মের একটি প্রাচীন উপদেশে ঐ কথাটি ব্যক্ত হইয়াছে। আবার

কখন কখন তাহার জ্ঞানের বিপর্য্যয় ঘটে না। স্থূলদেহের জ্ঞান-সূত্রটি আদৌ বিচ্ছিন্ন হয় না। এইরূপ বৈষম্য ঘটে কেন, তাহা অবধারণ করা সকল সময় সহজ নহে। মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে, মানুষ জীবিতকালে যেরূপ কার্য্যাদি করিয়া থাকে, মৃত্যুর পরে সে তদনুরূপ দশা প্রাপ্ত হয়। পারলৌকিক অবস্থাটা খুব বেশী পরিমাণে পার্থিব জীবনের কার্য্যকলাপের উপরই নির্ভর করে। একটা উদাহরণ দেখা যাউক। অধিকাংশ যুবক প্রেত-দেহেও নিকৃষ্ট জড়াংশে দেহ-রচনা করিতে সমুৎসুক। কিন্তু উহারা যদি যথাসময়ে নানাবিধ ইন্দ্রিয়বাসনা সংযত করিবার শিক্ষা করিত, তাহা হইলে উহাদিগের জ্ঞান ঐ সকল নিকৃষ্ট জড়াংশের ভিতর দিয়া স্ফুরিত হইতে চাহিত না। মৃত্যুর পরে নূতন উপাদান-বিন্যাসে একটি সূক্ষ্ম-দেহ রচিত হয়। ঐ সকল যুবক পার্থিব জীবনে যদি সংযমী হইত, তাহা হইলে উহাদের অভিনব সূক্ষ্ম-দেহে ঐ নিকৃষ্ট জড়াংশ বিদ্যমান থাকিত না। উহা কেবল বাহ্য প্রভাবেরই বিষয়ীভূত হইয়া থাকিত। সে ক্ষেত্রে ঐ সকল সূক্ষ্ম-দেহী যুবক বাহ্য জগতের পরিস্পন্দে সাড়া দিতে অনভ্যস্ত থাকা প্রযুক্ত তাহাদের ইতর ইন্দ্রিয়-বৃত্তি পরিস্ফুট হইতে পারিত না। কাজে কাজেই স্থূল-জগতের ব্যাপারে তাহাদিগকে অশান্তি ভোগ করিতে হইত না। সূক্ষ্ম-জগতে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই থাকিতে পারিত।

যাহারা আকস্মিক মৃত্যুর কবলে কবলিত হয়, তাহাদিগের আর একটি বিশেষ সুবিধা ঘটে। যুদ্ধেই হউক বা কোন দৈব ঘটনাতেই হউক, আকস্মিক হইলেই সে সুবিধাটি আইসে। সেটি এই—এক দল অদৃশ্য সহায়ক আসিয়া উহাদিগের সেবায় প্রবৃত্ত হয়। শুনা যায়, প্রাচীন কালে উচ্চ শ্রেণীর দেব-যোনিরাই ঐ সেবা-কার্য্য করিতেন। কিন্তু বিগত অল্পদিন হইতে যে সকল মানুষ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় জ্ঞানতঃ ভুবর্লোকে কার্য্য করিতে সমর্থ, কেবল তাঁহারাই এই প্রেম-ব্যঞ্জক সেবা-ধর্ম্মে যোগ দিতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহারা অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা ঐ প্রকার সেবা-কার্য্যে বিশেষরূপে উপকৃত

হইয়া থাকে, তাহাদিগের ঐ প্রকার সহায়কের নিতান্ত প্রয়োজন। কেন না, তাহাদের প্রেত-দেহটি অতীব দুর্দ্দমনীয় হইয়া থাকে, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে উহাকে দমন করা অসম্ভব। শুধু তাহাই নহে, আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় তাহারা স্বভাবতঃই দারুণ বিচলিত হইয়া থাকে, এমন কি, অনেক স্থলে অতিশয় ভীতও হইয়া পড়ে। সুতরাং তখনও সহায়ক আবশ্যক। তাই ঐরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল সাহায্যকারীরা আসিয়া উহাদিগকে আশ্বস্ত ও শান্ত করেন, যতদূর সম্ভব উহাদিগকে উহাদের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া উহাদের শ্রেয়ঃ নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। সেই-টুকুই উঁহাদের কার্য্য। ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি যাবতীয় সূক্ষ্ম-জগতের অভিজ্ঞ-তার পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সকল প্রকার সঙ্গত স্থলেই প্রকৃতির ব্যবস্থা আমাদিগের অনুকূল, সকল ঘটনায়ই প্রকৃতি পূর্ণমাত্রায় আমাদের সাহায্যকারিণী। তাই যে সকল বিঘ্ন আমাদিগের উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া অনুমিত হয়—যে সকল বাধা নিরন্তরই আমাদিগের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়, সে সমুদয় সত্ত্বেও আমা-দিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, প্রত্যেক ব্যবস্থাটিই আমাদিগের আনুকূল্য-অনুসারিণী, প্রাতিকূল্য-বিধায়িনী নহে। আর একটু বুঝিতে হইবে যে, মহীয়সী জাগতিক বিধির বিধানে আমাদিগের অগ্রগতি সুখসাধ্যই হইয়া আসিতেছে। আমাদের উন্নতি-পথে একটা বাধা ঘটে, তাহা ঐ বিধির অভিপ্রেত নহে। উন্নতির একটা প্রতিবন্ধক ঘটিলেই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ক্ষেত্রে মানুষ হয় ভগবদিচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিয়াছে, কিংবা ভগবদভিপ্রায়টি ঠিক বুঝিতে পারে নাই। এই দুইটির একটি নিশ্চয়ই ঘটে। একটি প্রাচীন বাক্য আছে যে—"যাঁহারা ভগ-বান্‌কে ভালবাসেন, যাবতীয় ব্যাপার তাঁহাদের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে।" স্থূলজগতের অস্থায়ী গোলযোগ একবার অতিক্রম করিয়া গেলেই আমরা উপরি-উক্ত প্রাচীন বাক্যটির যাথার্থ্য অনুভূত করিতে সমর্থ হইয়া থাকি।

চতুর্থ অধ্যায়

মৃত্যু-বিষয়ে আমাদিগের ভাব

মৃত্যু-বিষয়ে বিবিধ লৌকিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অন্যায় সংস্কারের আলোচনা-কালে তত্ত্ব-বিদ্যাপন্থিগণ মৃত্যু ব্যাপারটিকে কি ভাবে দেখিয়া থাকেন, তাহা আমি স্বভাবতঃই বহুল পরিমাণে নির্দ্দেশ করিয়াছি। যাঁহারা পরা-বিদ্যার আলোচনায় নিরত, তাঁহারা সাধারণের ন্যায় মৃত্যুকে তত গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে করেন না। পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ ব্যক্তিমাত্রই মনে করে যে, পার্থিব জীবনটি যেন একটি সরল রেখা, হঠাৎই জন্ম-সময়ে উহার উৎপত্তি হয় ও মৃত্যু-দিনে উহার আকস্মিক তিরোভাব ঘটে। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যাবিদ্‌গণ ভাবেন যে, যদি পুনর্জন্ম না-ও ঘটে, তত্রাচ পার্থিব জীবনটা যেন একটা বিপুল বৃত্তের রেখাচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রাংশ, আর জন্ম ও মৃত্যু যেন ঐ বৃত্ত-পরিধির দুইটি বিন্দু! একটি সরল রেখা যেন ঐ বিন্দুদ্বয়কে ভেদ করিয়া গিয়াছে। ঐ রেখাটির এক পার্শ্বে ভূর্লোক, অপর পার্শ্বে ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সূক্ষ্মজগৎ।

স্থূলজগতে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সূক্ষ্মজগতের অনেকটা পথ আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হয়। সে সম্বন্ধে আমাদের প্রচুর জ্ঞান না থাকায় আমরা একটা ক্রমযুক্ত চিত্র অঙ্কিত করিতে অসমর্থ। সূক্ষ্ম জগতের তাদৃশ জ্ঞান থাকিলে আমরা জীবাত্মার অন্ততঃ একটা মোটামুটি গতিবিধির নির্দ্দেশক চিত্র প্রদান করিতে পারিতাম। চিত্র দ্বারা যদি জীবাত্মার গতিবিধি বুঝিতে হয়, তবে মনে করিতে হইবে যে, জীবাত্মা যেন একটি বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে। বৃত্তটির ৩০ ভাগের এক ভাগ যেন স্থূলজগতে আর ২৯ ভাগ যেন সূক্ষ্মজগতে। যেন একটি

রেখা বৃত্তটিকে স্থূল ও সূক্ষ্মজগতের মধ্য দিয়া ভেদ করিয়া গিয়াছে। ঐ রেখাটির উপরের অংশ সূক্ষ্মজগৎ, নিম্নের অংশ স্থূলজগৎ। এই বৃত্তের কেন্দ্র স্থির করিয়া উহার ভিতর দিয়া একটি সরল রেখা অঙ্কিত কর। ঐ রেখা ঊর্দ্ধদিকে পরিধির যে স্থলে সংযুক্ত হইবে, সেইটি যেন জীবাত্মার বিশ্রাম-স্থান। নিম্নদিকে পরিধির যে স্থানে ঐ রেখা আসিয়া মিলিবে, সেইটি যেন পার্থিব জীবনের মধ্যবয়স। ঐ বিশ্রামস্থল হইতে জীবাত্মা ক্রমেই নিম্নগামী হইয়া স্থূল হইতে ক্রমেই স্থূলতর হইতে হইতে পরিশেষে উপরি-উক্ত রেখা-চিহ্নিত পার্থিব জীবনে প্রকটিত হয়, অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে। আবার ক্রমেই উহার ঊর্দ্ধগতি হইতে থাকে। পরে রেখা-চিহ্নিত পরিধির অপর স্থলটি, অর্থাৎ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মজগতের ভিন্ন ভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতে করিতে, যেন সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্মতর হইতে হইতে পরিশেষে সেই বিশ্রামস্থলে যাইয়া পুনর্মিলিত হইয়া থাকে। এই মহাভ্রমণের পূর্ব্বে জীবাত্মা এই বিশ্রামস্থলে অর্থাৎ কারণশরীরে বিদ্যমান থাকে। তাহার কিয়দংশমাত্র এইরূপ গতাগতি করিয়া শেষে সেই কারণশরীরী মূল আত্মার সহিত সংমিলিত হয়। বৃত্তের দ্বারা বুঝাইলে ব্যাপারটা ঠিক বুঝান হয় না; কেন না, আরোহণ অপেক্ষা অবরোহণ-গতিটি দ্রুত হইয়া থাকে। বৃত্ত কল্পনা করিয়া সমান সমান ভাগ বুঝিয়া লইলে ঐ আরোহণ-অবরোহণ-সময়ের তারতম্য ধরা পড়ে না। ঠিক বৃত্তাকার না হইলেও জীবাত্মা যে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বক্রভাবে ঘুরিয়া পুনরায় আবার সেই স্থানে যাইয়া মিলিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর এই বক্রগতিতে কোন প্রকার কোণ নাই। সে গতিটি একটি সুশৃঙ্খল শ্রেণী কি না progression স্বরূপ। আকস্মিক-ভাবে এ গতির একটা দিক্-পরিবর্ত্তন ঘটে না।

আচ্ছা, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, জীবাত্মার ঐ ভ্রমণ-কক্ষটি বৃত্তেরই অনুরূপ, তাহা হইলে ঐ বৃত্তের কতটুকু অংশ সূক্ষ্মজগতে আর কতটুকু অংশই বা স্থূলজগতে অবস্থিত? সামান্য একটু হিসাব করিলেই দৃষ্ট

হইবে যে, জীবাত্মার ইহলৌকিক জীবনপথের ৩০ ভাগের এক ভাগমাত্র। অনেক স্থলে তার অপেক্ষাও অল্প। যখন আমরা এই তথ্যটুকু পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি, কেবল তখনই স্থূলজগতের সহিত সূক্ষ্মজগতের কতটুকু অনুপাত, তাহা আমরা অল্প অল্প হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করি। বর্ত্তমান যুগ পৃথিবীর ইতিহাসে একটা উন্নতির অব্দ-প্রবর্ত্তক কাল। তত্রাচ উপরি-উক্ত ধারণা ব্যতীত সূক্ষ্মজগতের ব্যাপার বুঝিবার যো নাই।

জীবাত্মার ভ্রমণ-বৃত্তে একটি প্রয়োজনীয় বিন্দু

সূক্ষ্ম-জগৎ ও স্থূল-জগতের মাঝামাঝি যেন একটি সরল রেখা টানা আছে। ভ্রমণবৃত্তের ২৯ ভাগ যেন রেখাটির ঊর্দ্ধদিকে সূক্ষ্মজগতে অবস্থিত। অপর ১ ভাগ যেন উহার নিম্নদিকে স্থূলজগতে বিন্যস্ত। ঐ সরল রেখাটি বৃত্তটিকে যেন দুইটি স্থানে ছেদ করিয়া গিয়াছে। একটি স্থানে যেন জীবাত্মার জন্ম, অপর স্থানে যেন উহার মৃত্যু সূচিত হইতেছে। বৃত্তের ঐ ছেদ-বিন্দু দুইটিই যে খুব প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। বরং যে বিন্দুটি ঐ ছেদবিন্দুদ্বয় হইতে সমদূরবর্ত্তী ও রেখাচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রতর পরিধির মধ্যে অবস্থিত, সেইটিই সমধিক প্রয়োজনীয়। এই বিন্দুটি হইতে সমগ্র কক্ষটির কেন্দ্রের ভিতর দিয়া সরল রেখা অঙ্কিত করিলে কক্ষটি কি না বৃত্তটি দ্বিভাগে বিভক্ত হয়। এই সরল রেখা ঊর্দ্ধদিকে পরিধিকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেখানে জীবাত্মার আদি স্থান কল্পনা করিতে হইবে; তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, পূর্ব্বকথিত সমধিক প্রয়োজনীয় বিন্দুটি ঐ ঊর্দ্ধস্থ বিন্দু কি না জীবাত্মা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী বিন্দু অতিক্রম করিলেই ভ্রমণ-কক্ষের বক্রগতি নিম্নাভিমুখী না হইয়া ঊর্দ্ধমুখী হইতে থাকে। চিত্রস্থ ঐ সমধিক প্রয়োজনীয়—ঐ সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী বিন্দুটি মানব-জীবনের একটি গুরুতর সমস্যা-নির্দ্দেশক স্থল। জীবাত্মা ঐহিক জীবনের ঐ বিন্দুতে আসিলে তাহার বৈরাগ্যের ভাব দেখা দেয়, পার্থিব ব্যাপারে তখন সে আর জড়িত থাকিতে চাহে না, তখন তাহার চিন্তা উচ্চতর বিষয়াভিমুখে

প্রধাবিত হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, ঐ বিন্দুটি তাহার জীবন-বৃত্তের পার্থিব জন্ম-মরণ-বিন্দু অপেক্ষাও গুরুতর; কেন না, ঐ স্থলেই জীবাত্মার বহিরাসক্তির পরাকাষ্ঠা ঘটে—ঐ স্থলেই চিত্তবৃত্তি বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অতএব স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, যদি উপরি-উক্ত (জীবাত্মার) ভ্রমণকক্ষটির বক্রিমা বেশ সমানভাবে ব্যবস্থাপিত হয়, তবে প্রোক্ত পরিবর্ত্তন অর্থাৎ জীবাত্মার বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতের প্রতি আসক্তি পার্থিব জীবনের ঠিক মধ্যভাগেই ঘটিয়া থাকে। একটি গ্রহ স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে কক্ষের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অর্থাৎ সূর্য্য হইতে চরম দূরে যাইয়া পড়ে। গ্রহের ঐ গতিটি বেশ ক্রমান্বয়ে হইতে থাকে। তদ্রূপ মানুষও ক্রমে ক্রমে বিষয়াসক্তির চরম স্থানে আসিতে থাকে। সে নিজেও ততটা বুঝিতে পারে না যে, তাহার তাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে। কিন্তু এতদাসক্তির চরম স্থলটি জন্ম-মৃত্যু-বিন্দুদ্বয় হইতে সমদূরবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। প্রাচ্য-দেশীয় মনীষিগণ প্রজ্ঞাবলে পার্থিব জীবনের যাদৃশ বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, উপর্য্যুক্ত ব্যাপার তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে সমঞ্জস। উহাদের ব্যবস্থা এই যে, মনুষ্যকে প্রথম ২১ বৎসর শিক্ষায় ও দ্বিতীয় ২১ বৎসর গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য সম্পাদনে অতিবাহিত করিতে হইবে। তাহার পরে অর্থাৎ ৪২ বৎসর বয়সে তাহার জীবন মধ্যভাগে উপস্থিত হইবে। তখন যাবতীয় সংসার-চিন্তা ত্যাগ করিয়া, পুত্রের হস্তে গৃহ ও সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া তাহাকে সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে যাইয়া একটি ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে হইবে। তথায় ২১ বৎসরকাল তাহাকে ধর্ম্মালাপ ও ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত করিয়া শান্তি ভোগ করিতে হইবে। ইহার পরে জীবনের চতুর্থ ভাগের সূত্রপাত। এতদবস্থায় উপনীত হইলে মানুষ ইচ্ছা করিলে সংসার-সংস্রব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া ভগবচ্চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। কিন্তু জীবনের মধ্যস্থলটিই প্রকৃত নিবৃত্তিস্থান। প্রাচীন

পেরুবাসীরাও মনে করিতেন যে, ৪৫ বৎসর বয়সে যাবতীয় সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষ অভীপ্সিত বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয়।

পাশ্চাত্য জগতে জীবন-ধারণ ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে যে, বার্দ্ধক্যেও তত্রত্য মনুষ্যগণ সাংসারিক কার্য্যনিচয়ের ঝঞ্ঝাট ও প্রতিযোগিতায় মহা আগ্রহের সহিত ব্যাপৃত থাকে। তাই তাহাদের পার্থিব জীবনের বিভাগ সুস্থতাহীন; তাই তাহাদের জীবন-যন্ত্রের কলকব্জা অসংলগ্ন। চরিত্রের নির্ম্মলতা-সম্পাদন ও বৈরাগ্য-সাধন মধ্যজীবনেই অনুষ্ঠেয়। এতদ্ব্যাপারে লিপ্ত না হইতেই পাশ্চাত্যগণকে মৃত্যু আসিয়া আলিঙ্গন করে। কাজে কাজেই তাঁহাদিগকে ঐ কার্য্য ভূ-লোকের পরিবর্ত্তে ভুবর্লোকে যাইয়া সম্পাদন করিয়া লইতে হয়। ইহাতে উন্নতির পথে অনাবশ্যক বিলম্ব ঘটে। জীবন-ব্যাপারের যথার্থ তাৎপর্য্য অপরিজ্ঞাত থাকায় মানুষের উন্নতি এইরূপ মন্থরগতি হইয়া থাকে।

জ্ঞানের উপকারিতা

ঐ সকল তথ্য অবগত না থাকিলে মানুষ পার্থিব জীবনে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। পারলৌকিক জীবনে তাহার ক্ষতির পরিমাণ আরও অধিক। অতএব যিনি এই গুহ্য-তত্ত্ব-বিষয়িণী শিক্ষার অনুভূতি কিঞ্চিন্মাত্রও করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারও বিপুল লাভ। তখন তিনি পার্থিব জীবন ও পারলৌকিক জীবনের পরিমাণ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। তাই সমগ্র জীবন-বৃত্তের ত্রিশ ভাগের এই এক ভাগের নিমিত্ত কার্য্য করিয়া সমুদয় সময় তিনি নষ্ট করেন না। অপর ঊনত্রিশ ভাগ অপেক্ষা না করিয়া বিচক্ষণতার সহিত জীবন যাপন করেন। পারলৌকিক জীবনে উপনীত হইলে তিনি ভীত বা বিব্রত হয়েন না। কারণ, তত্রত্য পারিপার্শ্বিকনিচয় তাঁহার পরিচিত। তিনি উহাদের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া উহাদের উপকার গ্রহণেও সমর্থ হয়েন। পারলৌকিক জ্ঞান লাভ করিলে মানুষের প্রাণে সাহস ও প্রত্যয় জন্মে; ভয় ও উদ্‌ভ্রান্ত-ভাব আর থাকে না।

এই জ্ঞান তাহাকে পরলোকে ক্ষমতায় ও উপায়-উদ্‌ভাবন-পটুতাগুণে ভূষিত করিয়া তুলে। ইহার বিহনে তথায় সে অরিত্রবিহীন অর্ণবযানের ন্যায় নিরুপায় হইয়া পড়িত।

ভূয়োদর্শনে জানা গিয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বক্তৃতা শুনিতে গিয়া পাঁচ কথার মধ্যেও ঐ সত্যজ্ঞানের বিষয় শুনিয়া থাকেন, উহার সত্যতা তাঁহার প্রাণে সুস্পষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়া যদি তাঁহাকে ঐ তথ্যানুসরণে উদ্‌বুদ্ধ না-ও করে, তথাচ তাঁহার বিপুল লাভ ঘটিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তি পার্থিব জীবনে পূর্ণ পারলৌকিক জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ পাইয়া উহা উপেক্ষা করিলেও পারলৌকিক জীবনে যাইয়া তাঁহার মনে পড়ে যে, তিনি পার্থিবদেহে এক দিন এবম্প্রকার অবস্থাবিষয়ক জ্ঞানের আলোচনা শুনিয়াছিলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, সেই বক্তা প্রকৃত কথাই বলিয়াছিল। পারলৌকিক জীবনে কিরূপ আচরণ অনুষ্ঠেয় বলিয়া সেই বক্তৃতায় উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তখন তিনি তাহাই স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কারণ, তিনি তখন উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সমর্থ। এইরূপে পৃথিবীর সহিত তাঁহার একটি সম্বন্ধসূত্রও থাকে। যাঁহারা পারলৌকিক জ্ঞানে একেবারে বঞ্চিত, তাঁহারা মৃত্যুর পর যেন অকূল সমুদ্রে বায়ু-বিতাড়িত হইয়া চলিতে থাকেন, তাঁহার পরিচিত যাবতীয় ভূ-সীমাই যেন অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন তাঁহাদের মনে অব্যক্ত ও নিরাকার ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় একটা ভয়ঙ্করী উৎকণ্ঠা আসিয়া দেখা দেয়। উপরি-উক্ত ব্যক্তিকে এই উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে হয় না।

পরলোক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মৃত্যুর পরে বিব্রত হইয়া পড়িব না বলিয়া অনেকটা ভরসা ও বিশ্বাস থাকে। এইটুকুই যে একমাত্র লাভ, তাহা নহে। যিনি ঐ তথ্য অবগত হয়েন, তিনি অপরের প্রতিও সাহায্যের হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যাহারা সম্প্রতি ইহলোকের সীমা অতিক্রম করিয়া অ-দৃষ্ট জগতে প্রবেশ করিয়াছে, এমন শত শত ব্যক্তির পক্ষে তিনি সুখ ও শান্তির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিতে

পারেন। এই পরোপকার ও সুখশান্তির বিধান প্রভৃতি কার্য্যের সম্পাদনে তাঁহার নিজেরও বিপুল পুণ্যকর্ম্মের নবীন অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহাতে তাঁহার স্বীয় ক্রমোন্নতি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

বিলাপ ও শোককরণ

মৃত্যু-সম্বন্ধীয় এই প্রাথমিক ভ্রমগুলির নিরসন ও উহার প্রকৃত তথ্যের উদ্ঘাটন হইলেই প্রতীতি জন্মে যে, মৃত্যুজনিত শোককরণপ্রথা সর্ব্বতোভাবে ঘোর নিরর্থক। প্রথানুসারী শোককরণের যাবতীয় বিকট ও কিম্ভূত বসন-ভূষণ শুধু যে অসঙ্গত কালব্যতিক্রমের আনুসঙ্গিক ব্যাপার, শুধু যে মধ্যযুগের কুসংস্কারের ইতর উদ্বর্ত্তন, তাহা নহে। কিন্তু ঐ সকল বসন-ভূষণের ব্যবহারে যথেষ্ট শোক প্রকাশ করা হইল, এইরূপ একটা বালকবৎ ধারণা জন্মে। এই অতিরঞ্জিত দুঃখ একটি সাংঘাতিক ভ্রম। অতি ঘোর অজ্ঞতা ও অবিশ্বাস হইতেই এই ভ্রমের উদ্ভব হইয়া থাকে। যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার প্রিয়বন্ধু ভগবানের সমক্ষে আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তিনি সেই বন্ধুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ কৃষ্ণপোষাক পরিধান বা কৃষ্ণরেখাঙ্কিত চিঠির কাগজ ব্যবহার করিবেন কেন? একজন প্রকৃত তত্ত্ববিদ্যাবিৎ ঐরূপ করেন না। তিনি জানেন যে, তাঁহার আত্মীয় মৃত্যুর পর উচ্চতর ও অধিকতর সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ভুবর্লোক ত্যাগ করত স্বর্লোকে আরও মহীয়ান্ জীবন যাপন করিতে অগ্রসর হইতেছেন।

শুধু ইহাই নহে। আমরা মৃত আত্মীয়ের জন্য যে প্রবল দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি, একটি সম্পূর্ণ অপবোধই তাহার ভিত্তি। এতাদৃশ শোকে নিতান্ত অনাবশ্যক যাতনারাশিই ঘটিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, উহা অপেক্ষাও অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার ঘটে। শোকের ঐ সকল উৎকট উচ্ছ্বাস, দীর্ঘকালব্যাপী ঐ অতৃপ্ত বিলাপ আমাদিগের সেই প্রাণপ্রিয় গতায়ু আত্মীয়ের ঘোর যাতনা উৎপাদন করিয়া থাকে। মৃত ব্যক্তি স্বভাবতঃ

একটি শান্তিময়ী তন্দ্রায় নিমগ্ন হইতেছেন। ইহার পরেই স্বর্লোকেই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাঁহার জাগিবার কথা। এমন সময়ে—এই সুখের তন্দ্রার মধ্যে আমাদিগের শোক ও বিলাপের ফলে তাঁহাকে বারংবার জাগরিত হইতে হয়। তখন পার্থিব জীবনের সুস্পষ্ট স্মৃতি তাঁহার মনে উদয় থাকে। আমরা যতই শোক করি, সেই শোকের একটা ঐক্য-সম্পন্ন পরিস্পন্দ তাঁহার সূক্ষ্মশরীরে ততই অনুভব হইতে থাকে। ইহার ফলে তিনি একটি সুতীক্ষ্ণ অশান্তি ও সুদীর্ঘ অবসাদ অনুভব করেন। তাহা ছাড়া তাঁহার অগ্রবর্ত্তী প্রয়াণ পক্ষে ইহাতে দারুণ বিলম্ব ঘটে। যাঁহারা মৃত ব্যক্তির শুভ কামনা করেন, সংযমাভাব তাঁহাদিগের ঘোর পরিপন্থী। বহুক্ষণ ধীরভাবে চেষ্টা না করিলে তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন না। যাঁহারা পৃথিবীতে জীবিত থাকিয়া শোক করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য শুভ হইলেও তাঁহারা অজ্ঞ। তাঁহাদের প্রবল শোকে মৃত আত্মীয়েরা যথেষ্ট বিব্রত হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে পরে কয়েকটি গল্প বলা যাইবে। ইংলণ্ডের কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ গল্পগুলি প্রচলিত আছে।

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে যেন কেহ এরূপ অনুমান না করেন যে, স্নেহপরায়ণ বিয়োগ-বিধুর ব্যক্তিবর্গের উপর পরাবিদ্যাবিদ্‌গণের সহানুভূতি নাই, কিম্বা তাঁহারা মৃত আত্মীয়গণকে ভুলিয়া যাইতে পরামর্শ দিতেছেন। তাঁহাদের পরামর্শের যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, মৃত আত্মীয়গণের স্মৃতি প্রাণে এরূপভাবে জাগরিত রাখিতে হইবে, যেন তাহা অনিষ্টকর না হইয়া ইষ্টকর হয়। তাঁহাদের উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, স্বার্থজৃম্ভিত অকার্য্যকর দুঃখের পরিবর্ত্তে একাগ্র ও স্নেহসিক্ত শুভ বাসনাগুলিকে মৃত আত্মীয়ের উদ্দেশে হৃদয়ে পোষণ করাই আমাদিগের উচিত। উপদেশচ্ছলে তাঁহারা শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে বলেন, তোমার চিন্তাকে উচ্চতর সমতলে উত্থিত কর—আপনাকে ভুলিয়া যাও, আত্মীয়বিয়োগজনিত তোমার বাহ্য ক্ষতির ভ্রম বিস্মৃত হও। তাহা হইলে তোমার মৃত আত্মীয়ের মহোপকারের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি পাইবে, সন্দেহ নাই।

মৃত্যু সম্বন্ধে আর একটি ধারণা আছে। সেটি বড়ই প্রশস্তভাবে বিস্তৃত। ধারণাটি এই যে, মৃত্যুব্যাপারটি নিতান্ত যাতনাপ্রদ। মৃত্যুকালীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আক্ষেপ-বিক্ষেপ ও গলার ঘড়ঘড়ানি সম্বন্ধে অতি ভীষণ গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সমুদয় গল্প উপরি-উক্ত ধারণার পোষক। ঐ ধারণা-টিকে কুসংস্কারমধ্যে পরিগণিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে; কারণ, দেহ হইতে চৈতন্য তিরোহিত হইলেই ঐ সকল ব্যাপার ঘটিতে থাকে। উহা জড় দেহেরই চরমকালীন আক্ষেপিক গতি। প্রায় সর্ব্বত্রই প্রকৃত মৃত্যু-ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণভাবে যাতনাশূন্য বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, যিনি বহুদিন ধরিয়া পীড়ায় ভয়ঙ্কর কষ্ট পাইয়া আসিতেছেন, ঠিক মৃত্যুর সময়টিতে তাঁহারও কষ্ট থাকে না। মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির মুখ-শ্রীতে দিব্য শান্তির ভাব প্রকাশ পায়। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, মৃত্যুব্যাপারটি যাতনাদায়ক নহে। তাহা ছাড়া বিস্তর মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই—মৃত্যুর স্মৃতি তাঁহাদের অন্তরে সম্পূর্ণরূপ জাগরূক থাকিতে থাকিতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে যে, উহা দুঃখজনক নহে। তাঁহাদের কথাও এ সম্বন্ধে জ্বলন্ত প্রমাণ।

উচ্চতর বাস্তবিকতা

আমাদিগের প্রত্যেকের জীবন-বৃত্তের কত ক্ষুদ্র অংশ আমরা এই ভূলোকে যাপন করি, তাহা যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেও পারি, তবুও সমগ্র জীবনের সহিত তুলনায় পার্থিব জীবনের ক্ষুদ্রত্বটুকু ধারণা করিতে আমরা যথার্থরূপে সমর্থ হই না। যথার্থরূপে ঐ ধারণাটি করিতে হইলে সূক্ষ্মজগতের জীবনের বাস্তবিকতা যে খুব উচ্চতর, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে ও সতত স্মরণ করিয়া চলিতে হইবে। এই কথাটি অতীব প্রয়োজনীয়। ইহার প্রয়োজনীয়তা শত মুখে বলিলেও বলা হয় না; কারণ, এখনও অধিকাংশ ব্যক্তি স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রামের এমনই শাসনাধীন যে

তাঁহারা অপ্রকৃত ঘটনাবলীকে প্রকৃত ও প্রকৃত ব্যাপারকে একেবারে অলীক, দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে করেন।

সূক্ষ্মজগৎকে তাঁহারা কাল্পনিক জগৎ বলিয়া থাকেন। এরূপ বলিবার তাঁহাদের হেতু আছে। কাল্পনিক হইলেও উহা জড়জগৎ অপেক্ষা এক ধাপ উচ্চতর, সুতরাং বাস্তবিকতার এক ধাপ নিকটে। ভ্রমাত্মক বস্তু সূক্ষ্মজগতে বিস্তর থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু ভূলোক-সম্ভব স্থূলতর অবগুণ্ঠনে আবৃত হইলে ঐ সকল বস্তুর মিথ্যাত্ব অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। মানবাত্মার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সর্ব্বগ্রাসিনী। সূক্ষ্মদেহযুক্ত জীবাত্মার দৃষ্টি ঐরূপটি না হইলেও উহা অন্ততঃ স্থূল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ও অধিকতর নির্ভরযোগ্য। জড়জগৎ অর্থাৎ ভূর্লোক অপেক্ষা ভুবর্লোক উচ্চতর; ভুবর্লোক অপেক্ষা স্বর্লোক উচ্চতর। জীব ভূর্লোক অপেক্ষা ভুবর্লোকে ও স্বর্লোকে অধিক দিন অবস্থান করে। শুধু তাহাই নহে। ঐ সকল সূক্ষ্মজগতে অবস্থানকালে জীব এত বেশী কাজ করিতে সমর্থ হয় যে, পৃথিবীতে বাস করিবার সময় সেই সময়ের মধ্যে তাহা দ্বারা তত বেশী কাজ হওয়া অসম্ভব।

পার্থিব দেহের প্রয়োজনীয়তা

উপরি-উক্ত তথ্য এতই সত্য ও সুস্পষ্ট যে, উহার গুরুত্বের সহিত তুলনা করিতে গেলে পার্থিব জীবন তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয় ব্যাপার বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু পার্থিব জীবনেরও একটি উপযোগিতা আছে। পার্থিব দেহের জড়াংশ অধিকতর স্থূল ও গুরু। ইহার স্পন্দন-বেগ সুমন্থর। আমরা বিবর্ত্তনের যে বর্ত্তমান ক্রমে উন্নীত হইয়াছি, তাহাতে ঐ সুমন্থর পরিস্পন্দের সাহায্যে আমরা বিস্তর বিষয় শিক্ষা করিয়া লইতে পারি। এই হিসাবে পার্থিব জীবন আমাদিগের প্রয়োজনীয়।

এতদ্বিষয়ে আরও দুই একটি কথা এখানে বলা সঙ্গত মনে হয়। নচেৎ কুসংস্কার অপনোদনার্থ আমরা পরে কিছু বলিতে গেলে লোকে

হয় ত আমাদিগের কথার যথার্থ তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে অসমর্থ হইবে। কোন কোন ব্যক্তি এরূপ ভাবেন যে, যখন মৃত্যু একটা উৎকৃষ্টতর জীবনের দ্বারস্বরূপ, আর উহা যখন সুন্দর ও বাঞ্ছনীয় ব্যাপার, তখন আমাদিগের উহা পরিহার করিতে চেষ্টা করিবার প্রয়োজন কি! আর পার্থিব জীবনটাকে রক্ষা করিবার জন্যই বা এত আয়াসস্বীকার কেন? বাস্তবিকই উপরি-বিবৃত ব্যাপারে মনে হয় যে, মানুষ যত সত্বর মরে, ততই মঙ্গল। উপরি-উক্ত জ্ঞান যেন আত্মহত্যার প্রশ্রয়দাতা। যদি আমরা মাত্র আমাদিগের নিজের কথা, মাত্র আমাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা করিয়া থাকি, তবে ঐরূপ চিন্তা বাস্তবিকই আসিতে পারে। কিন্তু ভগবৎসমীপে ও অন্যান্য মানবগণের নিকটে আমরা যে কর্ত্তব্যসূত্রে আবদ্ধ আছি, তাহা যদি চিন্তা করি, তাহা হইলে আর ঐ সকল কূট তর্ক মনে স্থান পায় না।

যিনি এই পৃথিবীতে চরিত্রবান্ হইয়া নানা প্রকার শুভকার্য্য সম্পাদন করত জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার পারলৌকিক জীবন আরও সুখের, আরও পূর্ণাঙ্গ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগের পার্থিব জীবনেরও একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যের সিদ্ধি—মাত্র এই স্থূল পৃথিবীতেই সম্ভবপর। আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তি অতীব কল্যাণময়ী। ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়ে ঐ প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। ঘটনাপুঞ্জের ঘাত-প্রতিঘাতে যতদূর সম্ভব পার্থিব জীবনটাকে রক্ষা করিয়া উহার চরম উপভোগ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। আমরা এই স্থূলজগতে এমন সকল শিক্ষালাভ করিতে পারি, যাহা অন্যত্র শিখিবার উপায় নাই। যত শীঘ্র আমরা সেই সকল বিষয় অধিগত করিতে পারি, ততই আমাদিগের মঙ্গল। কারণ, উহা অবগত হইলে এই সংকীর্ণ নিম্নস্থ জীবনে প্রত্যাবৃত্ত হইবার আমাদিগের আর আবশ্যক হইবে না। বর্ত্তমানে ভূলোকই আমাদিগের বিবর্ত্তের প্রধান রঙ্গালয়। এখানকার অবস্থানিচয় স্থূল ও অনভিলষিত হইলেও মা

উহাদিগের সাহচর্য্যে বিস্তর প্রয়োজনীয় উন্নতি করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বহিরাগত সংঘাতে সাড়া দিবার নিমিত্ত যদি আমরা আমাদিগের ভিতরে একটা স্পন্দন জাগাইতে শিক্ষা করিতে পারি, তবেই আমাদের অন্তর্নিহিত গুণগ্রামের বিবর্ত্ত সংসাধিত হইবে। নিদ্রিত গুণের বিকাশসাধন পক্ষে ঐইটি প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু জীবাত্মা যে সমতলে অবস্থিত, সেখানে স্পন্দননিচয় অতীব সূক্ষ্ম ও দ্রুত। সে স্পন্দন উপরি-উক্ত বহিরাগত স্পন্দনের সাড়া দিতে পারে না। বর্ত্তমানে ঐরূপ সাড়া দেওয়া অসম্ভব। ঐরূপ সাড়া দিবার স্পন্দন প্রাণে জাগাইতে হইলে, যাহা স্থূলতর ও দৃঢ়তর, সেই সমুদায় বস্তু লইয়া আরম্ভ করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে উহাদের সাহায্যে নিদ্রিত বৃত্তিনিচয় ক্রমে ক্রমে উদ্‌বুদ্ধ হওয়ায় আমরা সহজ বিকার্য্য হইয়া উঠিতে পারি। এবম্প্রকার উপায়ে আমরা যাবতীয় ক্ষেত্রের যাবতীয় প্রকার স্পন্দনে সাড়া দিতে সমর্থ হই। এতদ-বস্থায় সকলের উপরেই আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি ও অনুকম্পা নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই মহীয়সী অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে ভূলোকেই সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে। প্রতি জন্মেই জীবাত্মাকে আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞানলাভার্থ প্রস্তুত হইতে বিশেষরূপে আয়াস স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ প্রতিজন্মেই বাল্যকালটি বড়ই কষ্টকর, কেন না, বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া ঐ সময় নবীন স্থূলদেহের উপর অধিকার-বিস্তার করিতে হয়। সুতরাং বহু পরিশ্রম করিয়া যখন আমরা স্থূলদেহ ও অন্যান্য কয়েকটি দেহকে আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করি, তখন ঐগুলিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া উহাদিগকে যথাযথ উপভোগ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। তাহাতে আমাদের স্বার্থও আছে। "মহতী বিধি" যত দিন না আমাদিগকে দেহত্যাগে বাধ্য করে, তত দিন নিশ্চয়ই কাহারও দেহ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। তবে একটি কথা এই যে, যদি কোন উচ্চতর বাধ্যকারী কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিয়া পড়ে, তবে সে ক্ষেত্রে দেহপাত বাঞ্ছনীয়। স্বদেশরক্ষার্থে সৈনিকেরা এইরূপে রণশয্যায় শায়িত হইয়া থাকে।

অতএব নিরূপিত সময় না আসিলে কাহারই মরিতে সাহসী হওয়া উচিত নহে। কিন্তু মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইলে আমাদিগের আনন্দিত হওয়া কর্ত্তব্য, কেন না, তখন আমরা শ্রমের ক্ষেত্র হইতে বিশ্রামের নিকেতন—তমিস্রা হইতে আলোক, সসীমত্ব হইতে অসীমত্বে উপনীত হইতে উদ্যত। তখন আমাদের প্রাণে উল্লাসের ফোয়ারা স্ফুরিত হওয়া উচিত। কবি তাই বলিয়াছেন :—

"প্রাণের উল্লাস, আত্মার প্রকাশ,
ত্যজে যবে দেহ-কারাগারে ;
ভূ-চিহ্ন-নিচয়, ছাড়ি সমুদয়,
যেন চলি যায় পারাবারে।"

যে সকল কথা বলা হইল, সে সমুদয় পারলৌকিক জীবনের ঐশ্বর্য্যের পা... হীনপ্রভ বলিয়া প্রতীত হয়। স্বর্লোকের সুখৈশ্বর্য্য অতি চমৎকার। ভুবর্লো... প্রায়শ্চিত্তভূমি ; স্বর্লোক অক্ষয়, আনন্দের নিকেতন। সাধু-সন্ন্যাসীরা ... আনন্দেরই সুখস্বপ্নে পুলকিত থাকেন। এই আনন্দই কবিদিগের সঙ্গী... তরঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। মোটের উপর এই আনন্দটি স্বপ্নের ন্যায় অলী... নহে। উহা সজীব ও মহীয়ান্ সত্য। পার্থিব জীবনের কর্ম্মানুসারে পা... লৌকিক জীবন কাহার কাহার ভাগ্যে সুখের ও কাহার কাহার পক্ষে দুঃ... হইয়া থাকে। আমাদের সকলকেই পারলৌকিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হই... হইবে। পারলৌকিক জীবন অর্থে এখানে ভুবর্লোকের কথা বুঝিতে হইবে... ভুবর্লোকের পরবর্ত্তী স্থানে অনন্ত সুখ। সকলেই সেই সুখের অধিকারী... সে সুখ সকলেরই হৃদয়গ্রাহী। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সে সুখের কথা বলা হইবে...

অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্থূল ইন্দ্রিয়যুক্ত মানব সূক্ষ্মজগতে ক... করিবার মত উন্নত হইতে এখনও সমর্থ হয় নাই। অন্ততঃ খুব ... লোকই সে শক্তি লাভ করিতে পারে নাই। স্থূল ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া মানুষ ... কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট দিকে উন্নতি করিয়া থাকে। কিন্তু আত্মার সম্যক্ চৈ... সম্পাদন ঘটাইতে পারিলে স্থূলদেহেই মানুষ উচ্চতর জগতের কার্য্য-কা...

করিতে পারে। পার্থিব জীবন ছায়া-চঞ্চল হইলেও ইহাকে এক অর্থে বপনকাল বলা চলে; কেন না, এই পার্থিব জীবনেই আমরা এমন সকল শক্তিপুঞ্জের সূত্রপাত করিতে পারি, যাহার ফল উচ্চতর জগতের উৎকৃষ্ট-তর অনুকূল ও ফলপ্রসবিনী অবস্থার অধীনে আমাদিগের ভোগে আইসে।

এই কথাটিতে উপরি-উক্ত কথাগুলি রূপান্তরিত হইল, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। উপরে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সত্য সত্যই ভুবর্লোক, স্বর্লোক প্রভৃতি সূক্ষ্মজগৎ বিদ্যমান আছে ও সেগুলি ভূলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আর একটি মহান্ সত্যের ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মৃত্যু সকলের পক্ষেই বস্তুতঃ উৎকৃষ্টতর জীবনে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ। মৃত্যু আমাদিগকে যে স্থানে লইয়া যায়, সেখানকার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের তুলনায় আমাদিগের পরিজ্ঞাত বর্ত্তমান সৌন্দর্য্যাদি অতীব অকিঞ্চিৎকর। এই সকল তথ্যের কোন প্রকার রূপান্তর করা হইতেছে না। আমরা মৃত্যুর দ্বার দিয়া যখন যাই, তখন আমাদিগের সম্মুখে অনেকগুলি আবরক পর্দ্দা আসিয়া পড়ে; অন্ততঃ খুব একটা নিবিড় কৃষ্ণবর্ণের আবরণ সম্মুখে ঝুলিয়া পড়ে। যিনি সৌন্দর্য্য ও মহিমার প্রতিকৃতি, জীবন ও মৃত্যুর সেই সর্ব্বব্যাপী নিয়ন্তা শ্রীভগবানের নিকট হইতেই ঐ আবরণ আসিয়া দাঁড়ায়।

পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। এই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা বড়ই সাংঘাতিক। ভুবর্লোক, স্বর্লোক প্রভৃতি উচ্চতর জগৎগুলি বাস্তবিকই আছে। জড়জগৎ অপেক্ষা উহাদের বাস্তবিকতা অধিকতর, এই মহান্ সত্য যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর ঐ সাংঘাতিক সংশয় থাকে না। পাশ্চাত্য ভূ-ভাগের অধিকাংশ ব্যক্তি এত দিন ধরিয়া ঐ নিরুপায় সংশয়ে ক্লিষ্ট ছিলেন। জীবনের ব্যবহার ও সার্থকতার যথার্থ উপলব্ধি পক্ষে ঐ সংশয় অপেক্ষা ভীষণতর শত্রু আর নাই। দুর্ব্বুদ্ধিদিগের হস্তে উহা অপেক্ষা দৃঢ়তর শস্ত্র আর নাই। যিনি পরা-বিদ্যা আলোচনা করিয়া থাকেন, ঐ সকল তথ্য অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে আদৌ কঠিন নহে। পরাবিদ্যা সমিতির সভ্যমাত্রেই ঐ সকল তথ্যের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকৃত ঘটনাবলী

মানুষের অন্তরে কতকগুলি নিদ্রিত বৃত্তি আছে। উহাদের সাহায্যে সূক্ষ্মজগতের সুস্পষ্ট অনুভূতি ঘটে। পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই পার্থিব জীবনের বস্তুনিচয় আমাদিগের যেমন স্পষ্ট জ্ঞানের বিষয়ীভূত, উপরি-উক্ত অপ্রবুদ্ধ বৃত্তিগুলির সাহায্যে পারলৌকিক জীবনও তদ্রূপ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকি। পরা-বিদ্যার অনুশীলনকারী কতিপয় ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ঐ সকল আন্তর বৃত্তির উন্মেষ সাধন করিয়াছেন। পরলোক সম্বন্ধে এই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহারা যথাযথ সংবাদ দিতে সমর্থ, বিবেচনা করা যায়। পরলোকের যথাযথ সংবাদ দিবার সামর্থ্য বড় সহজ ব্যাপার নহে। পাশ্চাত্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন প্রাচীন আচার্য্যই তাদৃশ সামর্থ্যের গর্ব্ব করিতে পারেন না; তাঁহারা পরলোক সম্বন্ধে এক একটা মত প্রকাশ করিতে পারেন মাত্র। স্ব স্ব উক্তির সমর্থনের নিমিত্ত এই বলিতে পারেন যে, আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থে এই কথা আছে, বাইবেলে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, ইত্যাদি। কিন্তু কোন আচার্য্যই আমাদিগের সমক্ষে এইরূপ বলিতে সমর্থ নহেন যে,—"আমি তোমাদিগের নিকটে যে স্বর্গ বা নরকের বর্ণনা করিতেছি, আমি নিজে তথায় গমন করিয়াছিলাম। আমি উহা দেখিয়া আসিয়া বলিতেছি যে, উহা যথার্থ ব্যাপার।" কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌গণ বাস্তবিকই ঐরূপ বলিতে সমর্থ। কারণ, তাঁহারা যাহার বিবৃতি করেন, তাঁহারা বাস্তবিকই তাহা অবগত আছেন। যে সকল বিষয় ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই বিষয়েরই আলোচনা করেন। সেই জন্য তাঁহাদিগের কথা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; তাঁহাদের কথাগুলি প্রত্যক্ষজ্ঞানসম্ভূত। তাঁহারা এতই নিঃসংশয় যে, পারলৌকিক

ব্যাপারের বিবৃতিকালে তাঁহারা এরূপও বলিয়া থাকেন :—"আমাদিগের কথা যদি তোমাদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত না হয়, তবে মাত্র আমাদের কথায় তোমরা সন্তুষ্ট থাকিও না ; ঐ সকল ব্যাপার পরিজ্ঞাত হইবার পক্ষে তোমাদিগের সমক্ষে বিস্তর পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে ; তোমরা নিজে উহার সাহায্যে যথাসাধ্য উত্তমরূপে ব্যাপারগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। তাহা হইলে তোমরাও আমাদিগের ন্যায় অপরের নিকট এইরূপ দৃঢ়তার সহিতই মন্তব্য প্রচার করিতে সমর্থ হইবে।"

মৃত্যুর পর জীবের কিরূপ অবস্থা দাঁড়ায়, সে সম্বন্ধে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে। কিন্তু অনুসন্ধানে যে অপরটিকে বাস্তবিক বলিয়া বুঝা গিয়াছে, তাহা ঐ সকল প্রচলিত মতের অধিকাংশ অপেক্ষাই সঙ্গত। এরূপ দেখা যায় না যে, মরণের পর মানুষের একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটে, কিংবা মরিতে মরিতে সে হাওয়ার মত নক্ষত্রনিকরের পশ্চাতে কোন সুদূর স্বর্গে চলিয়া যায়। বরং বিপরীতই দেখা যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে যেমনটি ছিল, মৃত্যুর পরেও ঠিক সেইরূপটিই থাকে। তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার গুণাবলী ও ক্ষমতা-নিচয় ঠিক একই প্রকার থাকে। পৃথিবীতে জীবিতকালে সে নিজের জন্য যেরূপ অবস্থা প্রস্তুত করিয়াছিল, মৃত্যুর পরে সে ঠিক তদ্রূপ অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। পার্থিব জীবনে সে যে সকল চিন্তা ও বাসনাগুলিকে হৃদয়ে প্রশ্রয় দিত, সেইগুলি এখন সুস্পষ্ট সজীব প্রাণীর মত মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে। সে পূর্ব্বেই ঐ বাসনাগুলিতে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা যত দিন না ক্ষয় হয়, তত দিন উহারা ঐরূপে উহাকে জ্বালাতন করিতে থাকে। পৃথিবীতে অবস্থানকালে মানুষ যদি খুব উৎকট কু-চিন্তা ও কু-বাসনা করিয়া থাকে, তবে মৃত্যুর পরে সেগুলি তাহার অতি ভয়ঙ্করী সঙ্গিনী হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এইটুকু সুখের বিষয় যে, ভুবর্লোকবাসীদের মধ্যে খুব অল্প লোকেরই এরূপ সঙ্গিনী দেখা যায়।

সচরাচর মনুষ্যগণ মৃত্যুর পরে একটা ফাঁকা, নিরর্থক জীবন অতিবাহিত করে ; এরূপ জীবন এতই বিরক্তিকর যে, বলিয়া বুঝান যায় না। ঈদৃশ জীবনে কোন প্রকার সঙ্গত সার্থকতা নাই। মৃত্যুর পর সাধারণ ব্যক্তিবর্গের ইহা অপেক্ষা গুরুতর অসুবিধা আর ঘটে না। যাহারা আত্মসুখে অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে ও তুচ্ছ গল্পগুজবে পার্থিব জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে, মৃত্যুর পরে তাহাদেরই ঐরূপ কষ্টকর জীবন-ভোগ ঘটে।

মৃত্যুর পর মানুষের যে পুরস্কার বা শাস্তি ঘটে, তাহা বহিরাগত নহে। পার্থিব জীবনে সে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, যেরূপ চিন্তার প্রশ্রয় দিয়াছিল, যেরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল, তদনুরূপ ফলই এখন তাহার ভাগ্যে ফলিবে। বস্তুতঃ মানুষ পার্থিব জীবনে যে শয্যা রচনা করে, মৃত্যুর পর তাহাকে সেই শয্যায় শয়ন করিতে হয়।

তথাচ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মানুষের যে নবীন জীবনের আরম্ভ হয়, তাহা যে শুধুই পার্থিব জীবনের ফলস্বরূপ, তাহা নহে। কাহার কাহারও পক্ষে উহা আর একটু বেশী গুরুতর হইয়া পড়ে। কিন্তু সেটুকু সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নিজের দোষেই হইয়া থাকে। ভুলোক অপেক্ষা ভুবর্লোক এক ক্রম উচ্চতর। কাজেই তত্রত্য সুখভোগ ও উন্নতির সম্ভাবনা নিম্নতর জগতের সম্ভাবনা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে খুব বেশী। কিন্তু ঐ সকল সম্ভাবনানিচয় উচ্চতর প্রকৃতিসম্পন্ন। উহাদিগের সুবিধা গ্রহণ করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ বুদ্ধি ও জ্ঞান আবশ্যক হয়। যে ব্যক্তির বুদ্ধির বিকাশ ঘটে নাই, পার্থিব জীবনে যে ব্যক্তির সমগ্র চিন্তা ও শক্তি মাত্র ঐহিক বিষয়পুঞ্জেই নিযুক্ত ছিল, ভুবর্লোকের উচ্চতর অবস্থার মধ্যে যাইয়া তাহার বিশেষ কিছু লাভ হয় না। পার্থিব জীবনেই আত্মোন্নতির সুযোগ ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে বা যে ব্যক্তি উহা দেখিতেই পায় না, তাহার অর্দ্ধকৃশতাপ্রাপ্ত চিত্তের পক্ষে অধিকতর মহীয়ান্ জীবনের সুপ্রশস্ত সম্ভাবনানিচয় অনুভব করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি পার্থিব জীবনে পারলৌকিকতত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত একটু যত্নবান্ হইয়া থাকে, স্থূল জড়ের অন্তরালে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার একটু শক্তিও যদি তাহার আয়ত্ত হইয়া থাকে, তবে ভুবর্লোকে গেলে তাহার সম্মুখে অতীব মর্ম্মস্পৃক্ অনুরাগাত্মক নূতন নূতন গবেষণার ও আলোচনার পন্থাসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকিবে ; এই প্রাথমিক ক্রমে, অর্থাৎ এই পার্থিব জীবনে যদি ঐ ব্যক্তি নিঃস্বার্থ কার্য্যকলাপে প্রীতি অনুভব করিতে ও পরোপকারার্থে কর্ম্ম করিতে শিক্ষা করিয়া থাকে, তবে ভুবর্লোকে সে প্রগাঢ় আনন্দের অধিকারী হয়। তাহার তত্রত্য উন্নতিও দ্রুতগতিতে হইতে থাকে। যিনি বুদ্ধিমান্ ও পরোপকারী, যিনি সূক্ষ্ম জগতের অবস্থানিচয় অনুধাবন করিয়া ঐ অবস্থানুযায়ী গঠিত হইবার আয়াস স্বীকার করেন, যিনি কায়মনোবাক্যে ঐ সকল অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহার সম্মুখে সুযোগপুঞ্জের সমৃদ্ধ বীথিকা উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। উহার সাহায্যে তিনি নবীন জ্ঞানার্জ্জন ও আবশ্যক কর্ম্মসাধন করিতে সমর্থ হয়েন।

তিনি বুঝিতে পারেন যে, এই স্থূলদেহ হইতে মুক্ত হইলেই জীবাত্মার উজ্জ্বলতা ও আভা বৃদ্ধি পায়। সৌরকরের নিকটে চন্দ্ররশ্মি যেরূপ হীনপ্রভ, ঐ ঔজ্জ্বল্যের সমীপে যাবতীয় পার্থিব উপভোগও তদ্রূপ পরিম্লান। তখন অনাবিল জ্ঞান ও নিষ্কম্প বিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি তদীয় পারিপার্শ্বিকনিচয়ের উপর অ-নশ্বর জীবনের প্রভাব দেদীপ্যমান দেখিতে পান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তখন তিনি শত শত ব্যক্তির নিকটে শান্তি ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দের কেন্দ্রস্বরূপ হইতে পারেন। সুদীর্ঘ পার্থিব জীবনে যে শুভানুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত, এক্ষণে ভুবর্লোকের এই অল্পকালস্থায়ী অবস্থিতির মধ্যেই তিনি তদপেক্ষা অধিকতর শুভকার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ।

পারলৌকিক জীবন একটা অভিনব ব্যাপার নহে

প্রথমেই একটা সুস্পষ্ট সত্য মনে রাখিতে হইবে যে, মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবন অদ্ভুত অভিনব ব্যাপার নহে। উহা বর্ত্তমান জীবনেরই প্রসারণ। মৃত

আত্মীয়বর্গ হইতে আমরা বিশ্লিষ্ট নহি। তাহারা সততই আমাদি
চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। আমাদিগের জ্ঞান সংরুদ্ধ হইয়াছে,
আমাদিগের মনে হইতেছে যে, আমরা তাহাদিগকে হারাইয়াছি
আমরা আত্মীয়গুলিকে হারাই নাই, হারাইয়াছি কেবল তাহাদিগ
দেখিবার শক্তি। আমাদিগের জ্ঞানের প্রসারণ করিয়া লইতে পারি
আমরা তাহাদিগকে দেখিতে, এমন কি, পূর্ব্বের মত তাহাদিগের সহি
কথাবার্ত্তা কহিতে সমর্থ হই। জ্ঞানের তাদৃশ উন্নতিসাধনও আমাদি
পক্ষে সম্পূর্ণরূপ সম্ভবপর। আমরা সকলেই মৃত আত্মীয়দিগের সহি
সর্ব্বদাই দেখা-শুনা করিতেছি ও কথাবার্ত্তা কহিতেছি; অ
এই ব্যাপার ঘটিতেছে বলিয়া আমাদিগের সম্পূর্ণরূপে মনে পড়িতে
না। জাগ্রৎ অবস্থার মধ্যেও মানুষ স্বীয় জ্ঞান অধিশ্রয়ণে সন্নিপাতি
করিয়া উহাকে লিঙ্গশরীরে নিবদ্ধ করিতে পারে। শিক্ষা করিতে
মানুষ এরূপ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ঈদৃশী শক্তি লাভ করিতে হই
বিশেষ উৎকর্ষের প্রয়োজন। সাধারণ শ্রেণীর মানবের পক্ষে ঐ
শক্তিলাভ বহু সময়সাপেক্ষ। কিন্তু স্থূলদেহটি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ি
প্রত্যেক ব্যক্তিই ন্যূনাধিকভাবে তাহার সূক্ষ্মশরীরের ব্যবহার করি
থাকে। ঐরূপভাবে আমরা প্রত্যহই আমাদিগের গতাসু আত্মীয়স্বজনে
সমীপবর্ত্তী হই। তাহাদিগের সহিত দেখা-সাক্ষাতের কথা কখন ক
আমাদিগের অংশতঃ মনে থাকে। সেরূপ ক্ষেত্রে আমরা বলিয়া থাকি
আমরা অমুক-অমুককে স্বপ্নে দেখিয়াছি। কিন্তু খুব সাধারণতঃ ঐ দে
সাক্ষাতের কথা মনে থাকে না। তাই মনে হয় যে, আমরা তাহাদিগ
আদৌ দেখিতে পাই না। তথাচ ইহা একটি সুস্পষ্ট সত্য যে, আমাদি
সহিত মৃত আত্মীয়দের স্নেহবন্ধন পূর্ব্ববৎ সুদৃঢ়ই বিদ্যমান থাকে।
মানুষ এই ভৌতিক দেহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবামাত্র সে স্বভাবতঃ প্রি
জনের নিকট যাইতে চেষ্টা করে। তাই বলিতেছি, বস্তুতঃ পরিবর্ত
কিছুই ঘটে না। পরিবর্ত্তনের মধ্যে মাত্র এইটুকু হয় যে, দিবসে তাহাদিগ

দেখিবার পরিবর্ত্তে আমরা তাহাদিগকে রাত্রে দেখিয়া থাকি। আর একটু বিশেষত্ব এই ঘটে যে, আমরা স্থূলশরীরে তাহাদিগের মেলা-মেশা করিবার পরিবর্ত্তে সূক্ষ্মশরীরে তাহাদের সহিত মিশিয়া থাকি।

মসার্ এল্ ম্যারিলার নামক এক জন গ্রন্থকার তাঁহার Le Braz's La Legende de la Mort en Basse Bretagne নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় ব্রিট্যানি নামক স্থানের কৃষককুলের পারলৌকিক অবস্থাসংক্রান্ত বিশ্বাস ও মনোভাবের একটা বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন:—"ব্রিটনদিগের ধারণা এই যে, জীবিত ও গতাসু সকল ব্যক্তিই তুল্যভাবে এই পৃথিবীতে বাস করিতেছে। উহারা পরস্পর দুশ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। তাহারা বলে, মৃত ব্যক্তিদিগের একটা বিপুল সঙ্ঘ আছে। সে সঙ্ঘের নাম "L' Anaon" ঝড় বা বাতাবর্ত্তের ন্যায় এই সঙ্ঘকে ভয় করা যাইতে পারে। পথিপার্শ্বস্থ কণ্টকাকীর্ণ গুল্মনিচয় যদি সূক্ষ্মশরীরী প্রেতগণ কর্ত্তৃক কথঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলই হইয়া পড়ে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই, কেন না, ঐ গুল্মগুলি বিহঙ্গমের ললিত-কাকলী-লহরীতে নিয়ত মুখরিত হইয়া থাকে। ব্রিটনরা বলে, গুল্মময় ক্ষেত্রবৃত্তি যেমন 'হনিসকল্' নামক সুরভি-পুষ্পে গ্রথিত, তদ্রূপ স্থূলজগতের সহিত সূক্ষ্মজগৎও বিজড়িত। ব্রিটনরা মৃত ব্যক্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে। উপরি-উক্ত সঙ্ঘ L' Anaon তাহাদের খুব গভীর বিশ্বাসের বিষয়। ঐ সঙ্ঘের নামে তাহাদের হৃদয়ে যুগপৎ ভয় ও সুকোমল সমবেদনার উদ্রেক হইয়া থাকে।

"মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকে। প্রত্যহ, এমন কি, প্রত্যেক ঘণ্টায়ই উহারা আসিয়া মিশিতেছে। তাহারা রাত্রিতে রাজপথে ও নির্জ্জন গলিপথে ভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহারা ক্ষেত্র ও ময়দানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তাহাদের সংখ্যা কম নহে। তাহারা মাঠের তৃণপত্রের মত ও সমুদ্রকূলের বালুকার ন্যায় অগণ্য, অসংখ্য। যে গৃহে তাহারা স্থূল নশ্বর দেহধারী হইয়া বাস করিত,

পরলোকের সংবাদ লইয়া তাহারা তথায় প্রত্যাগত হয়। নিশীথসময়ে তাহারা পরলোকের প্রায়শ্চিত্ত-যাতনার বা সুখভোগের সংবাদ লইয়া নীরব বাসভবনের মধ্যে ধীরপদসঞ্চারে বিচরণ করে। কখন কখন তাহাদিগকে মশারিযুক্ত পর্য্যঙ্কের বহির্দ্দেশে অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তিতে দেখা যায়। কখন কখন উননের নির্ব্বোণোন্মুখ অগ্নির পার্শ্বে তাহাদিগকে নীরবে অবস্থিতি করিতেও দেখা যায়। পার্থিব আত্মীয়গণ যখন কোন বিপদে বা জীবন-সঙ্কটে পড়ে, তখন উহারা রক্ষক হইয়া তাহাদিগের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে পাহারা দেয়। মৃত জননী আসিয়া নিদ্রিত অবস্থায় সন্তানকে আদর-সোহাগ করেন, তাহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তাহাদিগকে আদর করিয়া দোলাইয়া থাকেন। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি সন্তানের অশ্রু মুছাইয়া থাকেন। মৃত ব্যক্তি পৃথিবীতে হয় ত সুন্দর বৃতি-রক্ষিত গোলাবাড়ী রাখিয়া গিয়াছেন। হয় ত লোহিত-রাগ-রঞ্জিত উজ্জ্বল-গাত্র গো-মেষাদির পাল ফেলিয়া গিয়াছেন; হয় ত হেমোজ্জ্বল সৌরকরার্ণববৎ তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্র পৃথিবীতে রাখিয়া তিনি গতাসু হইয়াছেন। পরলোক-প্রাপ্তির পরও ঐ সকল বস্তুর স্মৃতি তাঁহার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। তখন তিনি ঐ ঐ দ্রব্যের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এরূপ ব্যাপার সর্ব্বদা না হইলেও কখন কখন ঘটিয়া থাকে। এরূপ ঘটনার স্থলে বৃদ্ধ কৃষকের জীবাত্মা তদীয় লাঙ্গলের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া উর্ব্বর সীতা-চিহ্নের মধ্যে দৃঢ়হস্তে উহা চালাইতে থাকে। ঐ পুরাতন অভ্যস্ত কার্য্যের বলবতী বাসনা তাহাকে সূক্ষ্মদেহীদিগের নীরব রাজ্য হইতে আকর্ষণ করিয়া আনে।

"মনে রাখিতে হইবে যে, সকল প্রেতাত্মাই দয়ার্দ্র নহে। অনেকে জীবিত মনুষ্যের উপর বরং নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকে। এরূপ প্রেতের নিকটে না যাওয়াই মঙ্গল। এই স্থূল জড় জগতের কোলাহল ও সঞ্চালন বশতঃই অধিকাংশ ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিদিগের মৃদুস্বর শুনিতে পায় না। বৃটন-দিগের ধারণা এই, যদি আমরা সাংসারিক কার্য্যেও সুখান্বেষণে নিবিষ্টচিত্ত না হই, তাহা হইলে পরলোকের প্রায় যাবতীয় কার্য্যই অবগত হইতে পারি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অদৃষ্ট ব্যাপার মিথ্যা নহে, সত্য

পরলোকের স্মৃতি ভূলোকে আনয়ন করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। প্রেতাত্মারা এইরূপ করে বলিয়া তাহাদিগের তত্রত্য চৈতন্যের কোন বিপর্য্যয় ঘটে না বা সেই সূক্ষ্মজগতে কার্য্য করিতেও কোনরূপ বাধা জন্মে না। সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের স্বাধীনতা ও সুবিধা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণই থাকে। আমরা জানিতে পারি বা না পারি, মৃত ব্যক্তিরা আমাদিগের অতি নিকটেই বাস করিয়া থাকে। আমরা দেহ বলিতে যে জিনিসটিকে বুঝি, মাত্র সেইটিই তাহাদের নাই, তাহাদের সহিত মাত্র এইটুকুই আমাদের প্রভেদ। আমাদিগের গাত্র হইতে উপরের জামাটি উন্মোচন করিলে আমাদের ব্যক্তিত্ব তাহাতে নষ্ট হয় না; তদ্রূপ স্থূলদেহ পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহাদিগেরও কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না। ভারমুক্ত হইলে আমরা বাস্তবিকই যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করি; তদ্রূপ দেহ-মুক্ত হওয়ায় তাঁহারাও আনন্দ বোধ করেন। মৃত্যু হওয়ায় মানুষের চিত্ত-বৃত্তি, স্নেহ, অনুরাগ, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় না। কেন না, ঐগুলি পরিত্যক্ত পার্থিব দেহের সহিত সম্পৃক্ত নহে। মৃত ব্যক্তি এই দেহরূপ পরিচ্ছদটি পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটি পরিধান করেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি পূর্ব্ববৎ চিন্তা ও অনুভব করিতে সমর্থ।

যে সকল ব্যাপার আমরা চর্ম্মচক্ষুতে দেখিতে পাই না, সেগুলিকে সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অতীব দুরূহ। আমরা যে জগতে বাস করিতেছি, তাহা একটা প্রকাণ্ড জগতের অতি ক্ষুদ্রাংশ। আমাদের দৃষ্টিশক্তি অতীব নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এটুকু অনুধাবন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তথাচ, বিজ্ঞান তারস্বরে এই সত্যের ঘোষণা করিতেছে। বিজ্ঞান যে সকল আণুবীক্ষণিক জীব-জগতের পরিচয়

দিতেছে, সেগুলি কিছুমাত্র আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেগুলিকে আমরা জ্ঞাত হইতে পারি না। ঐ জীবগুলি আণুবীক্ষণিক বলিয়া উহারা অনাবশ্যক নহে; কারণ, উহাদিগের অনেকগুলির অবস্থা ও স্বভাবসংক্রান্ত জ্ঞানের উপর আমাদিগের স্বাস্থ্যসংরক্ষণশক্তি, এমন কি, অনেক সময় আমাদিগের জীবন পর্য্যন্ত নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের ইন্দ্রিয়শক্তি সীমাবদ্ধ। আমরা যে বায়ুমণ্ডলে নিমজ্জিত, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। আমাদিগের কোন ইন্দ্রিয়ই বায়ুর বিদ্যমানতার পরিচয় দিতে পারে না। যখন বায়ু গতিশীল হয়, মাত্র তখন আমরা ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। তথাচ, উহা এত শক্তিমান্ যে, ঐ শক্তিতে আমাদিগের দৃঢ়তম অর্ণবযানও ধ্বংস হইতে পারে। ঐ শক্তি আমাদিগের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হর্ম্ম্য ভূপাতিত করিয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বে মহতী শক্তি বিরাজ করিতেছে, অথচ আমাদিগের নিস্তেজ ও ক্ষীণ ইন্দ্রিয় উহা অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাই বলি, যাহা আমরা দেখিতেছি, তাহা ছাড়া আর দেখিবার কিছুই নাই—এ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। যাহাতে ঐ ভ্রান্ত ধারণায় আমরা পতিত না হই, সে বিষয়ে আমাদিগকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বার্মিংহাম্ নগরে "বিশ্বে আমাদিগের স্থান" নামক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্যর্ অলিভার লজ্ এইরূপ বলিয়াছেন ;—

"আকাশ যদি সতত মেঘাচ্ছন্নই থাকিত, তাহা হইলে সূর্য্য যে কোথায় অবস্থিত, তাহা আমরা জানিতে পারিতাম না। তদ্রূপ, বিশ্বে এমন বিস্তর জিনিস বিদ্যমান আছে, যাহা আমরা তীক্ষ্ণতর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিতে পাইতাম। ইন্দ্রিয়গুলি আমাদিগের সেরূপ নয় বলিয়া ও আমাদিগের দৃষ্টিশক্তি আবরিত হওয়ায়, আমরা সেগুলি দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ নহি। বিশ্বে এতই দেখিবার ও জানিবার বিষয় আছে যে, উহার তুলনায় আমাদিগের পরিজ্ঞাত ও পরিদৃষ্ট ব্যাপার সমুদয় অতীব নগণ্য।"

আমরা যেন একটি দুর্গে আবদ্ধ আছি। আমাদিগের ইন্দ্রিয়গুলি যেন দুর্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতায়ন। দিগ্‌বিশেষে ঐগুলি যেন উন্মুক্ত আছে। অপর অপর অনেক দিকে আমাদের বাতায়ন নাই। সে সকল দিক্ আমাদিগের পক্ষে বদ্ধ। দিব্যদৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিপ্রভাবে আমাদিগের আর দুই একটি বাতায়ন খুলিতে পারে। উহাতে আমাদিগের চক্ষুগ্রাহ্য স্থানের বিস্তৃতি ঘটে। উহার প্রভাবে আমরা একটি নবীন ও বৃহত্তর জগৎ দেখিতে পাই। ঐ জগৎ এই প্রাচীন জগতেরই অংশ, অথচ সে তথ্যটুকু আমরা পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত ছিলাম না।

মানুষ প্রেতলোকে যাইয়া কি দেখে ?

মানুষ মরিয়া প্রথমেই ভুবর্লোকে যাইয়া উঠে। আমরা মৃত্যুর পরে এখানে যাইয়া কি দেখি ? মনে কর, আমাদের জীবাত্মা ইহ-শরীর ত্যাগ করিয়া ভুবর্লোকে যাইয়া উঠিল। উঠিলে, কোন্ নূতন পরিবর্ত্তন-নিচয়ের দিকে আমাদের মন প্রথমেই আকৃষ্ট হইবে ? যিনি মৃত্যুর পরে ভুবর্লোকে যাইয়া উঠেন, সম্ভবতঃ প্রথমে তাঁহার নিকটে কোন প্রভেদই পরিলক্ষিত হইবে না। তিনি জীবিত অবস্থায় এই পৃথিবীতে স্থূলনেত্রে যে সকল পদার্থ দেখিতে পাইতেন, সেখানেও সেই সেই পদার্থ সেই সেইরূপে দেখিতে পাইতেছি বলিয়া তাঁহার বোধ হইবে। এরূপ ব্যাপারটি কেন ঘটে, তাহা আমরা পরে বুঝাইয়া দিতেছি। বুঝাইয়া দিতেছি বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে পারিব না, কতকটা বুঝাইব ; কেন না, সম্পূর্ণরূপে বিশদভাবে বুঝাইতে হইলে ভুবর্লোক-সম্ভব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি সর্ব্বাঙ্গ-পরিস্ফুট প্রবন্ধের অবতারণা করা আবশ্যক হইয়া উঠে। পৃথিবীতে জড়ের কঠিন, তরল ও বায়বীয়—এই তিনটি অবস্থা দেখা যায়। তদ্রূপ, ভুবর্লোকেও তত্রত্য জড়ের নিবিড়ত্বের ক্রম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। তত্রত্য পদার্থগুলি ভূলোকের সম অবস্থাপন্ন দ্রব্যনিচয় দ্বারা আকৃষ্ট বা উহাদের সহিত সমঞ্জস হইয়া থাকে। এই কারণেই মৃত ব্যক্তি সেখানে

যাইয়া পূর্ব্বপরিচিত প্রাচীর ও গৃহ-আসবাবাদি দর্শন করিয়া থাকেন। যে স্থূল জড়াংশে পৃথিবীর প্রাচীরাদি গঠিত, তাহা সেখানে তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হইলেও ভুবর্লোকসুলভ জড়াংশের নিবিড় বিন্যাসই ঐ সকল আসবাব প্রভৃতির মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকে। ঐ মূর্ত্তি তাঁহার নিকটে অতীব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। সত্য বটে, একটু প্রণিধান করিলেই তিনি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন যে, ঐ সকল মূর্ত্ত পদার্থের পরমাণুপুঞ্জ চক্ষুগ্রাহ্যরূপে গতিশীল। ঐ গতিও খুব দ্রুত। কিন্তু পার্থিব পদার্থের পরমাণুর মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইতেছে না, তাহা নহে। এ পরিবর্ত্তন—এ গতি চক্ষুগ্রাহ্য নহে, এইটুকুই প্রভেদ। ভুবর্লোকপ্রবাসী অতি অল্পলোকই ঐরূপে প্রণিধান করিতে পায়। তাই মৃত্যুর পরে সাধারণ মানুষ প্রথমে কোন পরিবর্ত্তনই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

মৃত ব্যক্তি ভুবর্লোকে যাইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকেন; তখন তিনি স্বীয় পরিচিত গৃহাদি দেখিতে পান। যে সকল প্রাণপ্রিয় আত্মীয়-স্বজনকে পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকেও ঐ গৃহে দেখিতে পান। কেন না, পৃথিবীস্থ জীবিত আত্মীয়-স্বজনেরও সূক্ষ্মদেহ বিদ্যমান আছে। ঐ সূক্ষ্মদেহ এক্ষণে তাঁহার এই নবীন দৃষ্টিশক্তির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। ক্রমান্বয়ে তাঁহার নিকটে একটু প্রভেদ অনুভূত হয়। তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার সকল প্রকার যাতনা ও ক্লান্তি তিরোহিত হইয়াছে। এই যাতনা ও ক্লান্তির তিরোভাব অবস্থাটুকু যদি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, তবেই যথার্থরূপে তোমরা উচ্চতর জীবনের ধারণা করিতে কিয়ৎপরিমাণে সমর্থ হইবে। একটু চিন্তা করিয়া কথাটি তোমরা বুঝিতে চেষ্টা কর। এখানে, এই পৃথিবীতে তোমাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ-শান্তি নাই; কোন্ মুহূর্ত্তে যে তোমাদের ক্লান্তি বিশ্রান্তি ঘটিয়াছিল, তাহা কর্ম্মময় জীবনের অস্থির তাড়নায় তোমাদের মনেই পড়ে না; সেই বিশ্রান্তি যদি আবার ঘটে, সেই ক্লান্তিযাতনা যদি আবার স্খলিত হয়, বল দেখি, তবে সেই অবস্থাটি কতই সুখের হই

উঠে! পাশ্চাত্যদেশে আত্মার অবিনাশিতা ব্যাপারটি শৃঙ্খলার সহিত আলোচিত হয় নাই। সেই কারণে মৃত ব্যক্তি সাধারণতঃ বুঝিতেই পারেন না যে, তিনি মরিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর পরও দর্শন, শ্রবণ, চিন্তা, অনুভব সবই পূর্ব্ববৎ করিয়া থাকেন। তাই, "তিনি মরিয়াছেন"—এ কথাটি বুঝিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। মৃত ব্যক্তি বলিয়া থাকেন,—"আমি মরি নাই। আমি পূর্ব্ববৎ জীবিত আছি। এখন আমি পূর্ব্বাপেক্ষাও আরামে রহিয়াছি!" বস্তুতই তিনি আরামে থাকেন। পার্থিব জীবনে যদি প্রকৃত শিক্ষা পাইতেন, তবে ঐরূপ কথাই তাঁহার মুখে আমরা আশা করিতে পারিতাম।

তিনি যে মরিয়াছেন, তাহা এইরূপে অবগত হইতে পারেন। তিনি নিকটে তাঁহার বন্ধুবর্গকে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা চলে না। কখন কখন তিনি তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। তাঁহারা এমনভাবে থাকেন, যেন তাঁহার কথা শুনিতেই পাইতেছেন না। তিনি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে বুঝিতে পারেন যে, তাদৃশী চেষ্টা ফলবতী নহে। কখন কখন এতদূর ঘটিবার পরও মৃত ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যু-বিষয় অনুধাবন করিতে পারিয়া উঠেন না। তিনি মনে করেন যে, হয় ত তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। জাগরিত হইলেই এ সমুদায় অসুবিধা দূর হইবে। এরূপ মনে করিবার একটা কারণও আছে। ঐ সকল বন্ধু-বান্ধবের পার্থিব দেহ যখন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন তাহারা তাঁহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া গল্প-স্বল্প করে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি ধীরে ধীরে বেশ বুঝিতে পারেন যে, মোটের উপর তাঁহার মৃত্যুই হইয়াছে। তখন তাঁহার একটা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে। খুব সাধারণতঃই এইরূপটি ঘটে। এরূপ উদ্বেগের হেতু কি? পার্থিব জীবনে সুশিক্ষার অভাবই এই হেতু। চলিত মতাবলম্বী হওয়ায় তিনি মৃত্যুর পরে যে অবস্থাটি হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা

যাইয়া পূর্ব্বপরিচিত প্রাচীর ও গৃহ-আসবাবাদি দর্শন করিয়া থাকেন। যে স্থূল জড়াংশে পৃথিবীর প্রাচীরাদি গঠিত, তাহা সেখানে তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হইলেও ভুবর্লোকসুলভ জড়াংশের নিবিড় বিন্যাসই ঐ সকল আসবাব প্রভৃতির মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকে। ঐ মূর্ত্তি তাঁহার নিকট অতীব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। সত্য বটে, একটু প্রণিধান করিলেই তিনি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন যে, ঐ সকল মূর্ত্ত পদার্থের পরমাণুপুঞ্জ চক্ষুগ্রাহ্যরূপে গতিশীল। ঐ গতিও খুব দ্রুত। কিন্তু পার্থিব পদার্থের পরমাণুর মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইতেছে না, তাহা নহে। এ পরিবর্ত্তন—এ গতি চক্ষুগ্রাহ্য নহে, এইটুকুই প্রভেদ। ভুবর্লোকপ্রবাসী অতি অল্পলোকই ঐরূপে প্রণিধান করিতে পায়। তাই মৃত্যুর পরে সাধারণ মানুষ প্রথমে কোন পরিবর্ত্তনই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

মৃত ব্যক্তি ভুবর্লোকে যাইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকেন, তখন তিনি স্বীয় পরিচিত গৃহাদি দেখিতে পান। যে সকল প্রাণপ্রিয় আত্মীয়-স্বজনকে পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকেও ঐ গৃহে দেখিতে পান। কেন না, পৃথিবীস্থ জীবিত আত্মীয়-স্বজনেরও সূক্ষ্মদেহ বিদ্যমান আছে। ঐ সূক্ষ্মদেহ এক্ষণে তাঁহার এই নবীন দৃষ্টিশক্তির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। ক্রমান্বয়ে তাঁহার নিকটে একটু প্রভেদ অনুভূত হয়। তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার সকল প্রকার যাতনা ও ক্লান্তি তিরোহিত হইয়াছে। এই যাতনা ও ক্লান্তির তিরোভাব অবস্থাটুকু যদি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, তবেই যথার্থরূপে তোমরা উচ্চতর জীবনের ধারণা করিতে কিয়ৎপরিমাণে সমর্থ হইবে। একটু চিন্তা করিয়া কথাটি তোমরা বুঝিতে চেষ্টা কর। এখানে, এই পৃথিবীতে তোমাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ-শান্তি নাই; কোন্ মুহূর্ত্তে যে তোমাদের ক্লান্তির বিশ্রান্তি ঘটিয়াছিল, তাহা কর্ম্মময় জীবনের অস্থির তাড়নায় তোমাদের মনেই পড়ে না; সেই বিশ্রান্তি যদি আবার ঘটে, সেই ক্লান্তিযাতনা যদি আবার স্খলিত হয়, বল দেখি, তবে সেই অবস্থাটি কতই সুখের হইবে

উঠে! পাশ্চাত্যদেশে আত্মার অবিনাশিতা ব্যাপারটি শৃঙ্খলার সহিত আলোচিত হয় নাই। সেই কারণে মৃত ব্যক্তি সাধারণতঃ বুঝিতেই পারেন না যে, তিনি মরিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর পরও দর্শন, শ্রবণ, চিন্তা, অনুভব সবই পূর্ব্ববৎ করিয়া থাকেন। তাই, "তিনি মরিয়াছেন"—এ কথাটি বুঝিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। মৃত ব্যক্তি বলিয়া থাকেন,—"আমি মরি নাই। আমি পূর্ব্ববৎ জীবিত আছি। এখন আমি পূর্ব্বাপেক্ষাও আরামে রহিয়াছি!" বস্তুতই তিনি আরামে থাকেন। পার্থিব জীবনে যদি প্রকৃত শিক্ষা পাইতেন, তবে ঐরূপ কথাই তাঁহার মুখে আমরা আশা করিতে পারিতাম।

তিনি যে মরিয়াছেন, তাহা এইরূপে অবগত হইতে পারেন। তিনি নিকটে তাঁহার বন্ধুবর্গকে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা চলে না। কখন কখন তিনি তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। তাঁহারা এমনভাবে থাকেন, যেন তাঁহার কথা শুনিতেই পাইতেছেন না। তিনি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে বুঝিতে পারেন যে, তাদৃশী চেষ্টা ফলবতী নহে। কখন কখন এতদুর ঘটিবার পরও মৃত ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যু-বিষয় অনুধাবন করিতে পারিয়া উঠেন না। তিনি মনে করেন যে, হয় ত তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। জাগরিত হইলেই এ সমুদায় অসুবিধা দূর হইবে। এরূপ মনে করিবার একটা কারণও আছে। ঐ সকল বন্ধু-বান্ধবের পার্থিব দেহ যখন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন তাহারা তাঁহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া গল্প-স্বল্প করে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি ধীরে ধীরে বেশ বুঝিতে পারেন যে, মোটের উপর তাঁহার মৃত্যুই হইয়াছে। তখন তাঁহার একটা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে। খুব সাধারণতঃই এইরূপটি ঘটে। এরূপ উদ্বেগের হেতু কি? পার্থিব জীবনে সুশিক্ষার অভাবই এই হেতু। চলিত মতাবলম্বী হওয়ায় তিনি মৃত্যুর পরে যে অবস্থাটি হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা

হইতে স্বতন্ত্র অবস্থা তাঁহার সম্মুখে প্রকটিত হয়। তিনি কোথায় আছেন, কি ঘটিয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারেন না। এক জন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ মৃত্যুর পরে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—"আমার যদি মৃত্যুই হইয়া থাকে, তবে আমি কোথায় আছি? এতদবস্থার নাম যদি স্বর্গ হয়, তবে ইহা খুব বাঞ্ছনীয় নহে। ইহার নাম যদি নরক হয়, তবে যাহা ভাবিতাম, তদপেক্ষা ইহা অনেক ভাল।"

যাহারা যুক্তি ও সহজবুদ্ধি ব্যবহার করিবার পরিবর্ত্তে আজও পৃথিবীতে অবিদ্যমান, কল্পিত পিশাচাদির ভয়ঙ্করী-মূর্ত্তি-সংক্রান্ত মূঢ়তাব্যঞ্জক অলীক গল্প শিখাইতেছে, তাহাদের দোষেই প্রভূত পরিমাণে নিরর্থক উদ্বেগ ও সুতীব্র যাতনা উপরি-উক্তভাবে সংঘটিত হইতেছে। ভিত্তিহীন পাষণ্ডতাপূর্ণ নরকাগ্নি মতটিতে এত অনর্থ ঘটিয়াছে যে, ঐ মতের উৎসাহদাতৃগণও তাহা অবগত নহেন। কেন না, উহাতে ইহলৌকিক পারলৌকিক উভয় প্রকার অনিষ্টই সংসাধিত হইয়াছে। প্রেতলোকপ্রবাসী ঐরূপ বিপন্ন ব্যক্তির অপর অপর জীবাত্মার সহিত শীঘ্রই সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকে। তাহারা ভুবর্লোক-তথ্য অনেকটা সুপরিজ্ঞাত। তাহাদিগের নিকটে ঐ বিপন্ন ব্যক্তি জানিতে পারেন যে, ভুবর্লোকে ভয়ের কোন কারণ নাই; পৃথিবীর ন্যায় সেখানেও নৈতিক জীবন যাপন করা যাইতে পারে।

তিনি ক্রমশঃই বুঝিতে পারেন যে, ওখানে বিস্তর নূতন জিনিষ বিদ্যমান আছে। যে সকল দ্রব্যের সহিত ভূমণ্ডলে তিনি পরিচিত ছিলেন, তাহারও অসদ্ভাব নাই। কিন্তু সেগুলি পার্থিব পদার্থের প্রতিরূপমাত্র। এখানে চিন্তা ও বাসনা-নিচয় চক্ষুর্গ্রাহ্য মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। এই সকল মূর্ত্তির অধিকাংশই তত্রত্য সূক্ষ্মতর জড়াংশে গঠিত, ভুবর্লোকে তাঁহার অবস্থিতি যতই অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে, ততই ঐ সকল মূর্ত্তি তাঁহার সমক্ষে প্রকৃষ্টরূপে প্রকট হইয়া উঠে। কেন না, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভুবর্লোকে অবস্থানকালে তিনি নিয়মিতভাবে সততই অন্তর্মুখীন হইতে থাকেন। জীবাত্মা দেহী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে,

উহার সমগ্র পার্থিব জীবনটাই জড়ের মধ্যে আত্ম-বিনিয়োগ-কার্য্যে কাটাইয়া দেয়; পরে উহা হইতে আত্মনিষ্কাশন করিতে থাকে। শেষোক্ত কার্য্যের সময় বহু অভিজ্ঞতা উহার লাভ হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, পার্থিব জীবনেও মানুষের চিত্তবৃত্তি ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধদিকে ফিরিতে থাকে। এইরূপ ভাবে উহা ফিরাইবার চেষ্টা করা তাহার কর্ত্তব্য। যত দিন না এই নশ্বর দেহটি স্খলিত হইয়া পড়িবার সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তত দিন যাবৎ স্থূল-জগতের আসক্তি ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করা তাহার উচিত। স্থূল-দেহের বিনাশ ঘটিলেই সূক্ষ্ম-জগতে বাসের সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই সূক্ষ্মাবস্থায় কেবলই আত্মনিষ্কাশন ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। ইহার ফল এই হয় যে, যে সমুদয় নিম্নশ্রেণীর জড়াংশে পার্থিব বস্তুর প্রতিরূপগুলি গঠিত হইয়া প্রকট হইয়া থাকে, ঐগুলির প্রতি তাহার আসক্তি দিন দিনই হ্রাস পায়। যে সমুদয় উচ্চশ্রেণীর জড়াংশে চিন্তামূর্ত্তিনিকর নির্ম্মিত, তখন সে দিন দিন তাহাতেই সংশ্লিষ্ট হইয়া উঠে। ভুবর্লোকের চিন্তামূর্ত্তির উপাদান যত দূর তাহার আয়ত্ত হইতে পারে, তত দূর সংগ্রহ করিয়া তাহাতেই সে নিবিষ্ট-চিত্ত থাকে। এইরূপে তাহার জীবনটি দিন দিন চিন্তা-রাজ্যের সামগ্রীতে পরিণত হয়। তখন তাহার পরিত্যক্ত সংসারের প্রতিরূপ স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এরূপ বিলোপের কারণ তাহার অবস্থার-পরিবর্ত্তন নহে—অনুরক্তির কেন্দ্রচ্যুতিই সেই বিলোপের হেতু। এতদবস্থায় উন্নীত হইলেও তাহার বাসনাপুঞ্জ বিদ্যমান থাকে। তখনও তাহার চতুর্দ্দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ বাসনা-মূর্ত্তি বিরাজ করে। বাসনা-রাশির শুভাশুভ প্রকৃতি অনুসারে তাহার তৎকালীন জীবন সুখের বা অশান্তির প্রস্রবণ বা হেতু হইয়া উঠে।

এই ভুবর্লোকের ব্যাপার আলোচনা করিলেই আমরা বহু নীতি-উপদেশের হেতু বুঝিতে পারি। বিস্তর ব্যক্তিই জানেন যে, অপরের অনিষ্ট করা পাপ। উহা ঘোর অন্যায়। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত

হয়েন যে, ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, উচ্চাভিলাষ যখন বাক্যে বা কার্য্যে ব্যক্ত হয় ন
তখন উহা অন্যায় বলিয়া ঘোষিত হয় কেন ? পরলোকের দিকে সাম
একটু দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যে ব্যক্তি ঈর্ষ্যা প্রবৃ
বৃত্তিগুলিকে হৃদয়ে পোষণ করে, সে ঐগুলির দ্বারা বিশেষভাবে বিপর্য
হইয়া থাকে। মৃত্যুর পরে ঐগুলি তাহাকে তীব্র যাতনা প্রদান করে
আদর্শস্বরূপ, ভুবর্লোক-প্রবাসী কয়েকটা জীবাত্মার বিষয় আলোচ
করিয়া দেখিলেই আমরা উপরি-উক্ত কথাটি আরও সুন্দররূপে বুঝিতে স
হইব। উহাদিগের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদিগকে প্রণিধান করিয়া দেখি
হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

কয়েকটি প্রেতাত্মার বিবরণ

এক জন সাধারণ মানুষের ধারণা করুন। মনে করুন, লোকটির ভাল বা মন্দ কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য নাই। মৃত্যুর পরে এই বৈশিষ্ট্যহীনতাই উহার প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইবে। মৃত্যুর পরে উহার কোন বিশেষ প্রকার সুখ বা দুঃখ ঘটিবে না। খুব সম্ভবতঃ উহার আতিবাহিক জীবনটি নির্জ্জীব প্রকারের হইয়া উঠিবে। কেন না, পার্থিব জীবনে ঐ ব্যক্তি কোন প্রকার সঙ্গত বিষয়ের উৎকর্ষসাধন করে নাই। পার্থিব জীবনে ঐ ব্যক্তি যদি শুধু গল্প-স্বল্প করিয়া, শুধু ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া, শুধু নিজের কাজটুকু করিয়া বা নিজের পোষাক-পরিচ্ছদের ভাবনা ভাবিয়াই সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে, তবে মৃত্যুর পরে সম্ভবতঃ উহার নিকটে সময় বড়ই দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইবে। তখন সময় কাটান বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিবে; কেন না, তখন আর ঐ ঐ পার্থিব বিষয়ের উপভোগ সেখানে সম্ভবপর থাকিবে না।

এ সম্বন্ধে আমি এখানে একটি গল্প উদ্ধৃত করিব। উহা পড়িয়া পাঠকগণ উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যবিহীন মানবের নির্জ্জীব পারলৌকিক জীবনের বেশ একটা ধারণা করিতে পারিবেন। এক জন খৃষ্টান বহু বৎসর পূর্ব্বে একখানি পুস্তকে গল্পটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি তত বিখ্যাত নহে। যে সময়ে পুস্তকখানি প্রণীত, সে সময়ে "পরাবিদ্যা" বলিয়া কোন কথা প্রচলিত হয় নাই। তিনি তখন প্রেততত্ত্ব বলিয়া কোন শব্দও শুনেন নাই। তথাচ এই স্থূল-দেহেই তিনি দেহাতিরিক্ত জীবাত্মাদিগকে দর্শন করিতে ও তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে সমর্থ ছিলেন। পার্থিব জীবনেই তিনি তাদৃশী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই লিপিবদ্ধ বিবরণটি এই :—

"গত বৎসর কোন একটি বাড়ীর নিকট দিয়া যাতায়াত করিবার সময় প্রায় প্রত্যহই উহার গতাসু মালিকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। তিনি এক জন চিকিৎসক ছিলেন—প্রসার-প্রতিপত্তিও বেশ ছিল। লোকটি খুব সামাজিক ও সর্ব্বসাধারণ্যে সুপরিচিত। অনেকে তাঁহাকে আদর করিয়া নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণও করিত। * * * * * আমার সহিত দেখা হইলেই তিনি বলিতেন, তাঁহার বড়ই দুঃখ। তিনি সঙ্গহীন! সঙ্গী থাকিলেও তাহাদের সহিত থাকিতে তিনি অনিচ্ছুক। তিনি বলিতেন, তাঁহার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেই তিনি ভালবাসেন, পার্থিব জীবনের সঙ্গীদিগের কাছে থাকিতেই তাঁহার বেশী আনন্দ বোধ হয়। তাঁহার স্ত্রীর ধারণা যে, তিনি খুব দূরবর্ত্তী স্বর্গে বেশ সুখে আছেন অথচ তিনি স্ত্রীর কাছেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, স্ত্রী তাহা জানিতে পারিতেছেন না, তিনিও জানাইতে পারিতেছেন না, এই জন্য তাঁহার দুঃখের অবধি নাই। আমি তাঁহাকে পার্থিব বায়ুমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতর জীবনে আরূঢ় হইতে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে উপদেশ দিতাম; বলিতাম, পৃথিবীমণ্ডল অপেক্ষা সেখানে কার্য্য-প্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী। উত্তরে তিনি বলিতেন, সেখানে তাঁহার ন্যায় এক জন চিকিৎসকের কোন কার্য্যই নাই; কেন না, সেখানে নশ্বর দেহও নাই, দেহের ক্ষয়ও নাই।

"এইরূপ নির্জ্জীব প্রকারের একটা অসুখকর জীবন মৃত্যুর পরে তাঁহাকে যাপন করিতে হইবে, তাহা তিনি কখন চিন্তাও করেন নাই। এখন তিনি বড়ই নিরাশভাবে খৃষ্টধর্ম্মোক্ত বিচার-দিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সেই দিনের বিচারে তাঁহার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হয় কি না, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত তিনি উৎসুক হইয়াছেন। পার্থিব জীবনে তিনি নিয়মমত ভজনালয়ে যাইতেন। উপাসনা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল, তা ছাড়া উহা কর্ত্তব্য বলিয়াও তাঁহার মনে হইত। কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে তিনি কখনও মনঃসংযোগ পূর্ব্বক চিন্তা করেন নাই। সমাজ ও পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর দ্রব্যে তিনি অধিকতর আসক্ত ছিলেন। উপভোগ করিবারও বিপুল সুযোগ ছিল।

তথাচ, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ত্রাণকর্ত্তার উপরে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। এক্ষণে তিনি দেখিতেছেন, ব্যাপার বিপরীত! যাহাদিগকে তিনি পার্থিব জীবনে অধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিতেন, তাহারাই এখন দিব্য জ্যোতিতে প্রোজ্জ্বল। সে জ্যোতি তিনি এখন সহ্য করিয়া উঠিতে পারেন না। আবার, যাঁহারা ভজনালয়ে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্য এখন সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। * * *

"সকল দিনই বিচার-দিন, এই কথাটি আমি তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার নিজের কথাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি পৃথিবীতে শুধু ঐহিক জীবনই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাবের সঙ্কোচই বর্ত্তমানে বিচারফলস্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে। বলিয়াছিলাম যে, প্রতিভূ-ঘটিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমাদিগের ত্রাণ হইতে পারে না; পবিত্র জীবন-যাপনই পরিত্রাণের প্রকৃষ্ট পন্থা। আরও বলিয়াছিলাম যে, খৃষ্ট ও তাঁহার মহিমাশালী শিষ্যবর্গ সকলেই ধর্ম্মরাজ্যের বিস্তার-সাধন করিতেছেন। বলিয়াছিলাম, যদিও রোগ-চিকিৎসা করিবার তাঁহার কোনরূপ সুবিধা নাই, তথাচ তাঁহার দ্বারা বিস্তর অশরীরী আত্মার উপকার সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ বলায় তিনি বিরক্ত হইলেন। আত্মার ধর্ম্মোপদেষ্টা হইবার পক্ষে তাঁহার ঘোর অমত। আত্মার সাহায্যকারী হিসাবে আমরা সকলেই উপদেষ্টা, এ কথাটুকু আমি কিছুতেই তাঁহাকে উপলব্ধি করাইতে পারিয়াছিলাম না।"—(Light on the Hidden Way, Boston, Ticknor and Co, 1886, P. 71 দ্রষ্টব্য)।

এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি সূক্ষ্ম-জগতের একটা অতীব সাধারণ ব্যাপার। এরূপ ব্যাপার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ইহা চিত্তাকর্ষকও বটে। এরূপ ঘটনায় প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহারা পৃথিবীতে কোন প্রকার উচ্চতর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না থাকে, মৃত্যুর পর তাহাদিগের জীবন স্ফুর্ত্তিহীন ও অসুখকর হইয়া উঠে। তা ছাড়া, মিথ্যা ও অসম্পূর্ণ ধর্ম্মোপদেশ পালন করিয়া চলিলে মরণান্তে একটা কুফল ভোগ করিতে হয়। উপরি-উক্ত

চিকিৎসকের বিবরণের লেখক বলিয়াছেন যে, তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা
বার্ত্তা কহিয়া, অনেক প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া অবশেষে সেই চিকিৎ-
সকের প্রেতাত্মার মনের অবস্থা একটু ভাল করিয়াছিলেন। এইরূপে উ-
তির পথে আনিতে ঐ প্রেতাত্মাকে বিস্তর বেগ পাইতে হইয়াছিল। যা
হউক, উপদেশ-প্রভাবে ঐ প্রেতাত্মা উচ্চতর স্তরে আরূঢ় হইতে স-
হইয়াছিলেন। যাহারা পৃথিবীতে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, স্বার্থা-
হইয়া অসংযত ঐহিক জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা মৃত্যুর পরে য-
দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া বিগত পার্থিব জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে স-
হয়, তখন তাহাদের নিজের ত্রুটি তাহারা বুঝিতে পারে। তখন তাহা-
নিজেদের প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শন করে। সে সময় তাহাদের অনুতাপে-
পরিসীমা থাকে না।

এই প্রকারে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় মৃত ব্যক্তির মহোপকারের স-
বনা বিদ্যমান থাকে। পার্থিব জীবনে তিনি কোন্ কোন্ সুযোগ হারাই-
ছেন, কোন্ কোন্ গুণে তিনি বঞ্চিত ছিলেন, কোন্ কোন্ শুভ কার্-
অনুষ্ঠান তিনি করিতে পারিতেন, তত্তাবৎ তিনি পশ্চাদবলোকনশ-
প্রভাবে জানিতে পারেন। তখন তাঁহার মনে হয়, তিনি যেন ঘৃণিত, -
সমাজচ্যুত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সূক্ষ্ম-জগতে সহায়ক আছে-
তাঁহারা নিরন্তর পরোপকারকার্য্যে ব্যাপৃত। মৃত ব্যক্তির মানসিক অ-
ঐরূপ ঘটিলে, এক জন সহায়ক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া ব-
থাকেন, হতাশ হইও না, এখনও উপায় আছে; এখন হইতে প্রাণে -
বৃত্তির উন্মেষসাধন করিতে থাক, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পার্থিব জীবনে -
নিশ্চয়ই ঐ সকল সদ্‌গুণবিভূষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। কখন -
মৃত ব্যক্তি নিতান্ত নিরুৎসাহ ও নিরাশ হইয়া পড়েন। তাঁহার চতু-
অবসাদের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ জমাট বাঁধিয়া ঘিরিয়া দাঁড়ায়। উহা অপসা-
করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। পার্থিব জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তি আ-
বা উহার সম্বন্ধ অনবগত থাকায় ঐ ব্যক্তি সূক্ষ্ম-জগতের সুযোগ-সুবি-

ধারণা আদৌ করিতে পারেন না। সে সুযোগ-সুবিধাও অতীব চমৎকার। কাজে কাজেই তিনি ঘোর নৈরাশ্যে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। ইহার ফলে তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও সহায়কদিগের শুভচেষ্টা বহুদিন যাবৎ ব্যর্থ হইতে থাকে। চিকিৎসকের উপাখ্যানটি সাধারণ স্বার্থান্ধ জীবনের শেষ পরিণামের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। সূক্ষ্ম-জগতে ঐরূপ দশাগ্রস্ত সহস্র সহস্র জীবাত্মা বিদ্যমান আছে। আবার সুখাবস্থাসম্পন্ন বিস্তর ব্যক্তিও আছেন। তাঁহারা পার্থিব জীবনে ততটা স্বার্থপরায়ণ ছিলেন না।

অসাধারণ ঘটনাবলী

আমরা এক্ষণে কয়েকটি অসাধারণ ঘটনার আলোচনা করিব। তাহাতে পারলৌকিক জীবনের সুযোগ-সুবিধার সম্পূর্ণ ধারণা করিতে সমর্থ হইব। পার্থিব জীবনের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের প্রভাবে পারলৌকিক জীবন কিরূপ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাও বুঝিতে পারিব। নশ্বর-দেহ-পরিত্যাগের পর মদ্যপায়ীর কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী একটি অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি। মনে রাখিতে হইবে, মদ্যপায়ীর বিবরণটি নিকৃষ্ট জড় জগতের বলবতী বাসনাপুঞ্জের পরিণামের উদাহরণমাত্র। ঐ বাসনা মাত্র জড়জগতেই মিটিতে পারে। মৃত্যুর পর ঐ বিহ্বলকারিণী আকাঙ্ক্ষার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা উহা তীব্রতর হইয়া উঠে। কেন না, উহার স্পন্দন-বেগ মন্থর করিবার জন্য তখন আর স্থূল জড়কণা বিদ্যমান থাকে না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির অবস্থা সম্ভবতঃ মদ্যপায়ীর দশা অপেক্ষাও শোচনীয়। পুরাকালেও এতদ্ব্যাপার পৃথিবীবাসীরা সুন্দররূপে অবগত হইয়াছিলেন। ট্যান্ট্যালসের (Tantalus) উপাখ্যানে আমরা এই ব্যাপারের একটা প্রকট-মূর্ত্তি দেখিতে পাই। উৎকট পিপাসায় পীড়িত হইয়া ঐ ব্যক্তি জলপান করিতে যাইতেছে, অথচ জল মুখের কাছে আসিতে না আসিতেই অপসারিত হইতেছে।

ভোগ-বিলাস-পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ কখন কখন দারুণ অনুশোচনাযাতনা

ভোগ করিয়া থাকেন। মৃত্যুর পর নব জীবনে যদি তাঁহারা অনুতপ্ত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে পূর্ব্বরূপ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির নিমিত্ত উন্মত্ত চেষ্টা করে, তবে তাঁহাদের অবস্থা আরও ভয়াবহ হইয়া দাঁড়ায়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক এক অভিরুচির, এক এক বাসনার লোকগুলি যে এখানে একত্র হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম-জগতেও হইয়া থাকে। তাই, মৃত্যুর পর ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র, দুষ্ক্রিয় ব্যক্তিবর্গ একত্র হয়। নশ্বর দেহে যে যে স্থান তাহারা চরিত্র-ভ্রংশে কলুষিত করিয়াছিল, এক্ষণে ঐ ঐ স্থলে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। কাম-সিক্ত চিন্তা ও বাসনার বিষাক্ত উদ্গমে তাহাদের দূষিত বায়ুমণ্ডল আরও সাংঘাতিক হইয়া উঠে। পারলৌকিক জীবনেও অতি নিকৃষ্ট অবস্থাপন্ন হওয়ায়, তাহারা স্থূল-জগতের অনেকটা নিকটেই অবস্থান করে। কোন কোন ঘ্রাণে আমাদের ঘোর আসক্তি দেখা যায়। ঐ ঘ্রাণে তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহাদের কুবাসনার বেগ প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অথচ বাসনা চরিতার্থ করিবার কোন উপায় হয় না। এইরূপে সেই হতভাগ্য জীবগণ যাতনাক্লিষ্ট হওয়ায় ঘোরতর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তথাচ সেই লম্পট নরককুণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে না। না পারিবার কারণ, তাহারা পার্থিব জীবনে অনবহিতভাবে ঐ নরকের সর্ব্বনাশ-সাধিনী মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

এরূপ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ করিবার পক্ষে কখন কখন তাহাদের নবীন সুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। অন্যের মারফতে তাহারা বাসনার উপভোগ করে। এই 'মারফতে' উপভোগ-ব্যাপার অতীব যাতনাপ্রদ। ইহাতে তাহাদের মহাপাতক ঘটে। উত্তরকালে তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে বিস্ময়কর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। পার্থিব দেহে যে ব্যক্তি নিজ দোষে শরীর ও চিত্তের বল হারাইয়া বসে, তদীয় দেহে জীবাত্মার অধিকার হ্রাস পাইয়া থাকে। এতদবস্থায় ঐ ব্যক্তির চিত্তে যখন কুবাসনার উত্তাল লহরী খেলিতে থাকে, তখন তাহাতে গতাসু পাপ-নিরত জীবাত্মার আবেশ হয়। এইরূপ আবেশ হইলে, ঐ ব্যক্তি আরও ভয়ানক পাপে লিপ্ত হইয়া

থাকে। আবিষ্ট হইতে হইতে কোন কোন গতাসু প্রেতাত্মা ঐ ব্যক্তিকে আর ছাড়ে না। উহার স্থূল-দেহ আশ্রয় করিয়া মারফতীভাবে নিজের পূর্ব্ব ঘৃণিত বাসনা চরিতার্থ করিতে থাকে। এই প্রকার আবেশ নিতান্ত অস্বাভাবিক। ইহাতে উভয়েরই ক্ষতি। যে সূক্ষ্মদেহধারী কামুক প্রেতাত্মা আবিষ্ট হয়, তাহারও ক্ষতি হয়, আবার যে দুর্ব্বলচিত্ত স্থূলদেহধারী ব্যক্তির দেহে ঐরূপ আবেশ ঘটে, তাহারও মহা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহার কুফল অবগত হইতে পারে, সে কদাচ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হয় না। সকল সময়ে না হইলেও, কখন কখন উপরি-উক্ত হতভাগ্য অশরীরী ব্যক্তিগণকে কুসঙ্গ হইতে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়া উঠে। কুসঙ্গের হাত হইতে মুক্ত হইলেই দেখা যায়, তাহাদের মর্ম্মন্তুদ অনুশোচনা আসিয়া দাঁড়ায়। স্থূল-জগতের ন্যায় সূক্ষ্ম-জগতেও মনুষ্যেরা হতাশ হইয়াই কখন কখন কুসঙ্গে মিশিয়া থাকে। প্রচলিত ধর্ম্মের শিক্ষা অতীব নির্ম্মম, অসম্পূর্ণ ও পাষণ্ডতা-পূর্ণ। ঈদৃশী শিক্ষার প্রভাবে তাহারা বুঝিয়া লয় যে, তাহারা যে পাপ করিয়াছে, তাহার মোচন নাই, ক্ষমা নাই। তখন তাহারা নিরাশ হইয়া পড়ে; অপর গত্যন্তর নাই ভাবিয়া কুসঙ্গে মিশিয়া যায়। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, ধীরভাবে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে তাহাদিগকে নৈরাশ্য-পল্বল হইতে নিষ্ক্রান্ত করা যাইতে পারে। যে দলের মধ্যে তাহারা অনবহিত-ভাবে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন তাহারা ভীত-চকিত হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে থাকে।

ধনলিপ্সা ও ঈর্ষ্যা

সুরাপান বা লাম্পট্যের ন্যায় অন্যান্য বিস্তর পাপের পরিণাম ঐরূপ ভীষণই হইয়া থাকে। তবে পরিণামগুলিতে একটু একটু বৈশিষ্ট্য আছে বটে। কৃপণ ব্যক্তি যখন আর অর্থসংগ্রহ করিতে পারিতেছে না বা যখন তাহার সঞ্চিত অর্থে কোন শত্রুপক্ষের হস্তক্ষেপ আসিয়া পড়ে, তখন তাহার মনে

কতটা যাতনা জন্মে, তাহা আমরা কল্পনা করিতে অসমর্থ। মৃত্যুর প
ঈর্ষ্যাপরায়ণ ব্যক্তির ঈর্ষ্যানল জ্বলিতেই থাকে ; কেন না, তখন আ
স্থূল-জগতে হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি তাহার আদৌ থাকে না ;
ঈর্ষ্যার বেগ তখন আরও প্রবল হইয়া উঠে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ বি
বিশেষ পাপের বিষময় মোহনিবন্ধন প্রচণ্ডভাবে পার্থিব জীবনের প্রতি আ
হইয়া থাকে। পার্থিব জীবনে যে ব্যক্তি অন্যের ভাল দেখিয়া অন্
পীড়িত হয়, মরণান্তে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞানোন্মেষ হয় না। অন্যে
শ্রীবৃদ্ধিতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা তাহার আদৌ থাকে না, পার্থিব শ্রী
শ্রীমান্ হইবার সম্ভাবনাও তখন তাহার নাই। অথচ, উন্মাদের মত প
শ্রীকাতরতার বিষদংশন ভোগ করিতে থাকে,—অসূয়া সর্ব্বক্ষণই
স্বার্থের জৃম্ভণ। উহা চিরকালই অসঙ্গত। কিন্তু মৃত্যুর পর সচরা
উহার তরঙ্গ-স্ফীতি বড়ই ভীতিপ্রদ ও প্রচণ্ড হইয়া উঠে। যে হতভা
মানব এই অসূয়া-রাক্ষসীর করাল কবলে কবলিত, তখন আর তাহ
বিন্দুমাত্রও বিবেক-বুদ্ধি থাকে না। যাহারা অর্থসঞ্চয় করিয়া যায়,
রাচর ন্যূনাধিক পরিমাণে তাহাদিগকে উহার জন্য উদ্বেগ পোহাইতে হ
এই উদ্বেগ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন কে
প্রেতাত্মা ঐ সঞ্চিত অর্থরাশিকে সম্পত্তি মনে করিয়া উহার প্রতি
আকৃষ্ট থাকে। প্রেত-দেহে যদিও সে উহার ব্যবহার করিতে পারে
তথাচ তাহার আসক্তি কমে না ; পাছে কেহ ঐ অর্থ দেখিয়া ফেলে, পা
কেহ উহার অন্যায় খরচ করে, এই ভয়ে সে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকে। যেখা
ঐ অর্থ সংগোপনে সংগৃহীত থাকে,প্রেতাত্মা সেখানে চুপে চুপে গমন করে
অপহরণকারীদিগকে ভয়প্রদর্শন করিয়া বিদূরিত করাই তাহার উদ্দে
আবার কোন কোন প্রেতাত্মা মনে করে যে, তাহার সন্তান-সন্ততিরা
বন্ধু-বান্ধবেরা অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে, অতএব তাহার সঞ্চিত অর্থ তাহা
গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হইত। যতক্ষণ না ঐ
সন্তান-সন্ততিরা পায়, ততক্ষণ তাহার উদ্বেগের সীমা থাকে না।

প্রতিহিংসা

মৃত্যুর পরেও মানুষ বৈরসাধন করিয়া থাকে। এরূপ কয়েকটি ঘটনা বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে লেড বিটার সাহেব জানিতে পারিয়াছেন। একটি অত্যদ্ভুত ঘটনার বিবৃতি Theosophical Review. vol xxii. ৮১ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত মহোদয় এইরূপ বলিয়াছেন :—

"আমার জনৈক বন্ধুর একখানি ছোরা ছিল। কিংবদন্তী এই যে, যে ব্যক্তি ঐ ছোরাখানি হস্তে করিবে, ছোরাখানির এমনি গুণ যে, তাহারই মনে হইবে যে, কোন এক জন স্ত্রীলোককে উহা দ্বারা হত্যা করি। আমার বন্ধুটি একটু সন্দিগ্ধচিত্তের লোক, কিন্তু তথাচ একটু সন্দিগ্ধভাবেই উহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেন। আমার বন্ধু এক দিন ঐ ছোরাখানি হস্তে লইয়াছিলেন। যাই লওয়া, অমনি 'অসুস্থ' বোধ করিলেন। তখন তাড়াতাড়ি উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, কোন সময়ে উহাতে দুইটি স্ত্রীলোক নিহত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আমি ঐ ছোরাখানি হস্তে ধরিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। আমার দেহের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রকারের বেগ অনুভূত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, যেন কোন ব্যক্তি আমাকে সরাইয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে। আমি কিছুতেই নড়িব না সঙ্কল্প করিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, দেখা যাউক, ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ায়। তখন দেখিলাম, আমার সম্মুখে একটা অসভ্য চেহারার লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। আকৃতি দেখিয়া তাহাকে পাঠান বলিয়া মনে করিলাম। লোকটিকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, আমি তাহার চেষ্টায় নড়ি চড়ি নাই বলিয়া সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছে। সে আমাকে যে প্রবৃত্তি দিবার চেষ্টা পাইতেছিল, আমি তাহা সংবরণ করিতেছিলাম। এজন্য'ও তাহার ক্রোধ হইয়াছিল। আমি তাহাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরে জানিতে পারিলাম যে, ঐ

ব্যক্তির স্ত্রী অপর পুরুষের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া উহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। পরে তাহাদিগকে কোন স্থানে দেখিতে পাইয়া এই ছোরা দ্বারাই উভয়কে হত্যা করে। ছোরাখানি ব্যক্তির নিজস্ব। ঐখানি এখন আমি ধরিয়া বসিয়া আছি। তার ঐ ব্যক্তি স্ত্রীজাতির উপর প্রতিশোধ লইতে সঙ্কল্প করিল। এইরূপ রূঢ় হইয়া নিজের শালী ও অপর এক জন স্ত্রীলোককে নিহত করে। পরে নিজেই নিহত হয়। ইহার পরে ঐ ব্যক্তির প্রেতাত্মা ছোরাখানি সংলগ্ন হইয়া থাকে। এই ঘটনার পরে ছোরাখানি যাহারই হস্তে পাইয়াছে, ঐ প্রেতও তাহাতে আবিষ্ট হইয়া তাহাকে রমণীনিধনে সাহিত করিয়াছে। ঐ ভূতাবিষ্ট ছোরা দ্বারা অনেক রমণী নিহত য়াছে। তখন ঐ প্রেতের বর্ব্বরোচিত স্ফূর্ত্তি দেখে কে! প্রেতের প্রবৃত্তির পরিপন্থী হওয়ায় আমার উপর তাহার মহা ক্রোধ। সে করিয়াছিল যে, আমি ঐ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইব না। আমার কথা বুঝিতে পারিল না দেখিয়া, এক জন ভারতীয় বন্ধুর উপরে তাহাকে বুঝা বার ভার ন্যস্ত করিলাম। আমার সেই বন্ধুটি তাহাকে বুঝাইয়া সং আনিল। তখন ঐ প্রেত বলিল যে, ছোরাখানি ভাঙ্গিয়া ফেলাই উচি আমি তখন উহা মাটীতে প্রোথিত করিলাম। * * *

ঐ পাঠানভূত না বলিলেও আমি উহা ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত তাম। তথাচ তাহার সম্মতি লইয়া ঐরূপ করাই ভাল হইয়াছিল মনে হ

আর একটি প্রেতেরও ঐরূপ প্রতিহিংসা-বৃত্তি দেখা গিয়াছিল। ব্যক্তি উপরি-উক্ত পাঠান অপেক্ষা অনেক সভ্য। সভ্য হইলেও প্রতিহিং বৃত্তি কম নহে। লোকটি কামাসক্ত এক জন বৃদ্ধ। দ্যূতক্রীড়ার করিয়া ও অসংযতভাবে জীবন যাপন করিয়া লোকটি প্রভূত অর্থ অপ করে। অসংযমের মাত্রা খুব বর্দ্ধিত হইলে তাহার বন্ধুবান্ধব তাহার পরিত্যাগ করিল। সে তখন আত্মহত্যা করিয়া বসিল। আত্ম করিবার সময় বলিয়া গেল, সংসারের লোকেরা অকৃতজ্ঞতা ও ঔদা

প্রদর্শন করিয়াছে বলিয়াই আমি আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইলাম ; আমি ইহার প্রতিশোধ লইব ; যত দূর পারি, আমিও অপর অপর ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতে ছাড়িব না। এইরূপে প্রতিশোধে প্রবৃত্ত হইয়া সে প্রায় ৬০ বৎসরকাল নিজের মরণের স্থানটিতে বিচরণ করিয়াছিল। কোন দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তিকে পাইলেই তাহাতে আবিষ্ট হইয়া তাহাকে আত্মহত্যা করিতে প্রণোদিত করিত। তাহার উত্তেজনা বশতঃ কোন ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করিয়া বসিলে তাহাকে ঐ প্রেত ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলিত।

লুসিফার নামক সংবাদপত্রে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আর একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপারটি আরও বিস্ময়কর। বিবরণটিতে জানা গিয়াছে যে, এক জন এঞ্জিন-চালকের প্রেতাত্মা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের হত্যা-কামনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। গল্পটি খুব বড় বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, প্রায়শঃ এইরূপ প্রেতাত্মাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, তাহার কার্য্য অতীব গর্হিত। তখন তাহার প্রকৃত তীব্র অনুতাপ আসিয়া দেখা দেয়।

গ্রীস্‌দেশীয় পুরাণোক্ত সিসিফসের ভাগ্যের বিষয় স্মরণ করুন। অনন্ত-কাল ধরিয়া একটি গুরুভার বিপুল শিলাখণ্ড গড়াইয়া গড়াইয়া উর্দ্ধদিকে পর্ব্বতশিখরে তাহাকে তুলিতে হইবে ; আবার যাই শিখরের অতি নিকটে যাইবে, অমনি উহা ভূপতিত হইবে। এবম্প্রকার বিধিনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা। যাহারা ঐহিক বাসনাজালে জড়ীভূত, তাহাদের পারলৌকিক জীবন ঐ সিসিফসের ঠিক অনুরূপ। বাসনা-তাড়িত ব্যক্তি ঐহিক জীবনে শুধু স্বার্থ-প্রণোদিত জল্পনা-কল্পনা করিয়া থাকে। মরণান্তেও তাহার ঐ প্রবৃত্তির বিরতি ঘটে না। বেশ সাবধানতা পূর্ব্বক সে একটি মতলব স্থির করে, করিয়া বড়ই স্ফূর্ত্তি অনুভব করে। যাই মতলব স্থির হইয়া গেল, অমনি মনে পড়িল যে, উহা সিদ্ধ করিতে স্থূল-দেহের প্রয়োজন ; কিন্তু এখন স্থূল-দেহ নাই ! তখন সমস্ত আশা ঐ বিপুল শিলাখণ্ডের মত ভূপতিত হইয়া পড়ে। কিন্তু—প্রবৃত্তি এমনি প্রকৃতিগত যে, আশা বিনষ্ট হইলেও ঐ

ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আশারূপ শিলাখণ্ডকে আকাঙ্ক্ষা-শৈল-শিখরে তুলি
চেষ্টা করে। এইরূপ করিতে করিতে তাহার পাপের ক্ষয় হইয়া
পরিশেষে সে স্থির করে যে, ঐ শিলাখণ্ড আর টানিয়া তুলিবার প্রয়ো
নাই। তখন সে উহা পর্ব্বতের পাদমূলে ফেলিয়া রাখে।

সূক্ষ্ম-জগতে চিন্তার মূর্ত্তি

মানুষের যে সকল চিন্তা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট, যাহা স্বকীয় লাভ-বাসনায় স্ফুর
সেগুলি সূক্ষ্ম-জগতের স্থূলতর বিভাগে মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার চতুর্দি
অবস্থিত থাকে। যে ব্যক্তি সতত স্বার্থ-জড়িত চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে,
অত্যুৎকট চিন্তার মূর্ত্তি গঠিত করিয়া বসে। চিন্তার পৌনঃপুন্যে ঐ
ক্রমে ক্রমে শক্তিশালিনী হইতে থাকে। পার্থিব দেহে ঐ মূর্ত্তি
দেখিতে পায় না। দেখা না গেলেও উহার প্রভাব মানুষ
পারে। মূর্ত্তির অনুরূপ চিন্তা পুনঃ পুনঃ করিতে ইচ্ছা হয়। ঐ
পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা হওয়া ব্যাপারটাই ঐ মূর্ত্তির প্রভাব। কিন্তু মানুষ
গেলে, ঐ চিন্তা-নিচয় মূর্ত্ত হইয়া তাহার অনুসরণ করে। উহাদের
হইতে পলাইয়া নিস্তার পাইবার যো নাই। কেন না, উহার সহিত
গুলি প্রকৃতিগতভাবে সংশ্লিষ্ট। উহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ
হইলে মানুষকে মনে করিতে হইবে যে, ঐ চিন্তাগুলি বড়ই বিশ্রী,
ঘৃণিত। তার পরে ঐগুলি প্রশ্রয় না পায়, তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে

কখন কখন মানুষের চারিদিকে অপরিমিত চিন্তা মূর্ত্তি আসিয়া উ
হয়। সে চিন্তা তাহার নিজের নহে, মূর্ত্তি তাহার গঠিত নহে।
কোন ব্যক্তি হয় তো তাহার সম্বন্ধে আকুল প্রাণে চিন্তা করিয়াছে।
চিন্তা অনুকূলই হউক আর প্রতিকূলই হউক, স্নেহ-ভালবাসা-সি
হউক আর বিদ্বেষব্যঞ্জকই হউক, উহা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিশ্চয়ই
চতুর্দ্দিকে আসিয়া দাঁড়াইবে। শুধু তাহাই নহে। উহার পরিস্পন্দ
ঐ ব্যক্তি অনুভব করিতে থাকিবে। মৃত ব্যক্তির অনুকূলে আমরা
স্নেহ-ভালবাসা-সিক্ত চিন্তা করি, যদি আকুল প্রাণে তাহার জন্য শুভ

করি, তবে তাহার ফলে এইরূপে মৃত ব্যক্তির মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে। আমরা ইচ্ছা করিলে আমাদের মৃত আত্মীয়কে সুন্দর স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত রাখিতে পারি। তাহার ফলে সে চতুর্দ্দিকে মনোমুগ্ধকর আভা দেখিতে পাইবে। তখন কোন প্রকার অশুভকর প্রভাব তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারিবে না। সেই মনোহারিণী আভা, সেই অনুকূল আবরণ তাহার প্রাণের মধ্যে মহানুভূতি ও স্নেহের ভাব জাগাইয়া তুলিবে। শুধু তাহাই নহে, তাহার প্রাণের যাবতীয় অশান্তি বিদূরিত করিয়া দিবে। "দৃশ্য ও অদৃশ্য মানব" নামক গ্রন্থের (Man Vissible and Invissible) ৯ নম্বর ছবিতে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা চিন্তাকারীর সূক্ষ্ম-দেহে স্নেহসিক্ত চিন্তার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। মিসেস বেশান্ত ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের সংখ্যা 'লুসিফার' নামক সংবাদ-পত্রে "চিন্তামূর্ত্তি" নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ছবিগুলির মধ্যেও চিন্তার মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তির উদ্দেশে ঐ চিন্তা করা হইয়াছিল, মূর্ত্তিগুলি তাহার অভিমুখে খুব বেগে প্রধাবিত হইতেছে।

অন্যান্য প্রকার চিন্তামূর্ত্তিও দেখা যায়। সেগুলি তত সুখদায়িনী নহে। মানুষ স্থূলদেহে যাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করে, মৃত্যুর পর সে তাহাদের চিন্তা-মূর্ত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। এই সকল মূর্ত্তি দ্বারা এইরূপ ভাবে উদ্বেজিত হওয়ায় তাহার পূর্ব্বকৃত দুর্ব্যবহারের অনেকটা প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। এই সকল মূর্ত্তি হইতে স্পন্দন নিঃসৃত হইতে থাকে। তাহাকে ঐ স্পন্দন-বেগ সহ্য করিতে হয়। আবার যাহাকে সকলেই ভালবাসে, তাহার প্রতি প্রীতিপূর্ণ চিন্তা নিঃসৃত হওয়ায় ঐ চিন্তা-স্রোতে তাহার ঊর্দ্ধগতি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যাপারের একটা জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে কোটি কোটি ব্যক্তির প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা-ব্যঞ্জক চিন্তা-মূর্ত্তি নিঃসৃত হওয়ায় তিনি অতি সত্বর স্বর্লোকে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। তা ছাড়া তাঁহার স্বকীয় সদ্‌গুণও তাঁহার সত্বর স্বর্গপ্রাপ্তির সহায় হইয়াছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কোন ব্যক্তি অনেকের অবিশ্বাস বা বিদ্বেষভাজ হইয়া পড়ে। তাহাদের উপর কাহারও স্নেহ-ভালবাসা থাকে ; যাহারা তেজারতি, মহাজনী প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মমভাবে শত শত লোকে সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে, মৃত্যুর পর তাহাদের ভয়াবহ অবস্থা আসি উপস্থিত হয়। তাহাদের চতুর্দ্দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ চিন্তা-মূর্ত্তি নিরন্তর জ বাঁধিয়া দাঁড়ায় ও ভয়প্রদর্শন করিতে থাকে। তখন তাহারা অতীব ভী হইয়া পড়ে। অনুতাপেরও পরিসীমা থাকে না। চিন্তা-মূর্ত্তিগুলি স্ব জীব নহে। তাহাদের অবস্থিতিও নির্দ্দিষ্টকাল-সাপেক্ষ। চিন্তাকারী চিন্তার বেগ অনুসারেই মূর্ত্তির স্থায়িত্ব নিয়মিত হইয়া থাকে। তথ যাহাকে এই চিন্তা-মূর্ত্তি পরিবেষ্টিত করিয়া দাঁড়ায়, উহার হাত হই তাহার পলাইয়া নিস্তার পাইবার যো নাই। কেন না, তাহার প্র আকর্ষণই এই মূর্ত্তির উদ্ভবের বা অস্তিত্বের মূল কারণ। এই পীড়িত ব্যক্তি নিজের চারিদিকে একটি কবচ গঠন করিয়া লইতে পারে। কিরূপভা উহা গঠন করিতে হয়, অবশ্য তাহা জানা চাই। ঐ আবরণে মূর্ত্তি নিঃসৃত পীড়নকারীর পরিস্পন্দ প্রতিহত হইয়া যায়। জানা থাকিলে ব্যক্তি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চিন্তা-মূর্ত্তি-নিচয় চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে কিন্তু যতক্ষণ উহা বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ উহাই গুগ্‌লি-শামুকের দৃঢ়ভাবে মৃত ব্যক্তিতে সংলগ্ন দেখা যায়। মৃত ব্যক্তির কাছে ঘুরি ঘুরিয়া বেড়ায়, কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চায় না। সাধারণতঃ ভিন্ন ভি লোকের নিকট হইতে নিঃসৃত হওয়ায় চিন্তা-মূর্ত্তিগুলিও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করে। প্রত্যেক মূর্ত্তিই চিন্তাকারী ব্যক্তির মানসিক বৈশি প্রদর্শন করে। কিন্তু কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, চিন্তামূর্ত্তিগুলি ভি ভিন্ন ব্যক্তির চিন্তা-নিঃসৃত হইলেও উহারা সংমিলিত হইয়া একটা বিক অপদেবতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বসে। এই বিকট মূর্ত্তিটি যদি আবা প্রতিকূল প্রকৃতি-সম্পন্ন হয়, তবে তাহার ফল অতীব ভীষণ হইয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়

ব্যভিচারিণীর পরিণাম

যাঁহারা পারলৌকিক ব্যাপারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, তাঁহারা এক জন ব্যভিচারিণীর পরিণাম অবগত হইতে পারিয়াছেন। আমরা সে বিষয়টি এখনই বলিতেছি। তাহাতে অনেক স্ত্রীলোক সাবধান হইতে পারিবেন। ব্যাপারটি অতি অল্পদিন ঘটিয়াছিল। একটি যুবতী রঙ্গালয়ে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। শারীরিক সৌন্দর্য্য তাহার বেশ ভালরূপ ছিল। স্ত্রীলোকটি গর্ব্বিতা ও হৃদয়হীনা। নির্ব্বোধ ও লম্পট যুবকবৃন্দের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সে পৈশাচিক আনন্দে উৎফুল্ল থাকিত। সে গর্ব্ব করিয়া বলিত যে, তাহারই জন্য দুইটি দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও একটি আত্মহত্যা ঘটিয়াছে। উহা ছাড়া শত শত ব্যক্তির হৃদয় ভাঙ্গিয়াছে। যাহা হউক, হঠাৎ তাহার শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। সে যে সকল ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, যাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল, তাহাদিগের ক্রোধ ও বিদ্বেষ ভুবর্লোকে তাহার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিস্তর ব্যক্তির ঘনীভূত ক্রোধ ও ঘৃণা সংমিলিত হইয়া এ ক্ষেত্রে একটি বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। মূর্ত্তিটি দেখিতে একটি বিপুলকায় কদাকার গরিলা জন্তুর মত। এই অপ্রীতিকর সঙ্গীর সর্ব্বাঙ্গ যেন ক্রূরতায় পূর্ণ। ইহার সাহচর্য্যে স্ত্রীলোকটি যার-পর-নাই ভীত হইয়া পড়িল; ইহার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! কিছুতেই এই বিকট মূর্ত্তি তাহাকে ছাড়িল না। যে সকল পরাবিদ্যাবিদ্ মহাত্মা এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তাঁহারা অচিরাৎ এই অনিষ্টপ্রবণ মূর্ত্তিটির ধ্বংসসাধন করিলেন। কিন্তু তথাচ ঐ পাপনিরতা যুবতীর প্রেতাত্মার বিশেষ উপকার কিছুই হইল না; কেন না, দুর্ভাগ্যবশতঃ পার্থিব জীবনে সে নিতান্ত অপদার্থ ছিল। স্থূল-জগতে একটি জীবন নষ্ট করা যেরূপ গুরুতর ব্যাপার সূক্ষ্মজগতেও তদ্রূপ। কিন্তু

উপরি-উক্ত প্রকার চিন্তামূর্ত্তি যতই সজীব ও ভয়ানক হউক, উহা একটি ক্রমোন্নতি-সম্ভূত জীব নহে। উহা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-সঞ্জাত অস্থায়ী সৃষ্টিমাত্র। একটা মৃন্ময় পাত্র ধ্বংস করিলে যেমন কোনরূপ প্রত্যবায় হয় না, ঐ মূর্ত্তির বিলোপসাধন করিলেও তদ্রূপ কোন পাপ ঘটে না।

পাপের পরিণাম

এই পৃথিবীতে যে সকল পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সূক্ষ্মজগতে সেই সমুদয়ের ফল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ফলে। কিন্তু সে ফলগুলি অতী ভয়ঙ্কর। পাপানুষ্ঠানের ফল কিরূপভাবে ফলে, তাহার অনেকগুলি বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। একটি উদাহরণ দেখ। অনে সময় দেখা যায় যে, হত্যাকারী মরিয়া গেলে তাহার পূর্ব্বকৃত পাপে স্মৃতি পুনঃ পুনঃ তাহার মনে জাগিতে থাকে। নিরন্তরভাবে হিংসাগ্র ভীতিজনক চিন্তা করিতে করিতে একটি মূর্ত্তির উদ্ভব হয়। মূর্ত্তি পূর্ব্বকৃত ভয়ঙ্কর পাপের এই অনুষ্ঠানক্ষেত্রে নিঃশব্দে বিচরণ কর এরূপ ক্ষেত্রে পাপী যে সুতীক্ষ্ণ যাতনা অনুভব করে, তদ্বিষয়ে কো সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ব্যক্তিকে চিন্তার প্রেত-মূর্ত্তিগুলি নিরন্তর অনুস করে, তাহার যাতনা আরও উৎকট। এইরূপ একটা ব্যাপ জানা গিয়াছে। কি নিয়মে পুনর্জ্জন্ম নিয়মিত হইয়া থাকে, তদ্বি অনুসন্ধান করিতে যাইয়াই কয়েক জন মহাত্মা ঐ ব্যাপারটা জানি পারিয়াছেন। আরবজাতীয় দুইটি লোক একত্র বাস করিত। জনের মধ্যে বিশেষরূপ সৌহৃদ্য ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা উভ একই যুবতীর উপর আসক্ত হইয়া পড়ে। ব্যাপারটি পরিব্যক্ত হ উহাদের এক জন অপরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উ পাছে ঐ রমণী অপরের প্রতি প্রসন্ন হয়, এই ভয়ে সেই ক্রুদ্ধ ব তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাহার পথ হইতে অপসারিত করিবার চে করিতে লাগিল। সে নিজের হাতে হত্যা করিল না বটে, কিন্তু

প্রমাণ দিয়া তাহাকে শত্রুপক্ষের হস্তে ধরাইয়া দিল। তাহার ফলে উহার প্রাণদণ্ড হইল। এই ঘটনার অতি অল্পদিন পরেই সেই যুবতী অন্য এক ব্যক্তির উপর কৃপা-কটাক্ষ করিল; কেন না, ষড়যন্ত্রকারী যুবকের প্রতি তাহার একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল না। তখন সেই প্রেমিক বিফলমনোরথ হইয়া স্বীয় পাপ-কর্ম্ম স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া পড়িল। তার পরেই আত্মহত্যা করিয়া বসিল। এইরূপে যুবকদ্বয় তরুণযৌবনেই ভুবর্লোকে যাইয়া উপনীত হইল। অতি অল্পদিন পরেই এক জন অপরের অনুসরণ করিয়াছিল! ভুবর্লোকে তাহাদিগের অবস্থিতি অতি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া হইয়াছিল। তাহা হইলেও তাহাদিগের অবস্থা একরূপ দাঁড়াইল না। নিহত ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার একটা উদাহরণ আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। জীবিতকালে মনোভাব ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে নিকৃষ্ট জড়াংশ নিয়োজিত না করায় ঐ নিহত ব্যক্তি এক্ষণে ভুবর্লোকে যাইয়া তাহার পারিপার্শ্বিকনিচয় সম্বন্ধে ঘোর অনভিজ্ঞ। সূক্ষ্মদেহের জড়াংশবিন্যাসে এক্ষণে সে ভুবর্লোকের অতীব নিম্নস্তরে আবদ্ধ। অপর পক্ষে হত্যাকারী যুবককে তত্রত্য অতীব অপ্রীতিকর অবস্থার অবনতি ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাহার সূক্ষ্মদেহও অপেক্ষাকৃত স্থূলতর হইয়াছিল। কেন না, জীবিতকালে তাহার নিকৃষ্ট জড়াংশের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

পার্থিব জীবনের ঘটনা-সংশ্লেষের ফলে এই শেষোক্ত যুবককে পাপের ফলভোগ করিতে হইল। পাপের ফল যতটুকু বর্ণনা করা হইল, তাহাতে মনে হয়, উহা যেন কিছুই নহে। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী বিবিধ প্রকার বহুদর্শিতায় জানা গিয়াছে যে, ঐ ভোগ অতীব ভয়ঙ্কর ব্যাপার। মানুষ যেমন কাজ করিয়া যায়, মৃত্যুর পরে অবিকল তদ্রূপ ফল ফলিতে থাকে। ভয়ঙ্কর কাজের ফলভোগ ভয়ঙ্করই হইয়া থাকে। যিনি সূক্ষ্ম-জগতের তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি কোন ব্যক্তির পার্থিব জীবনের কাজ দেখিয়াই তাহার ভুবর্লোকের ভাবী জীবন-প্রবাহের বর্ণনা করিতে পারেন। বন্ধুর

শঠতা পরিজ্ঞাত না হইয়াই নিহত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বন্ধুর প্রতি তাহার স্নেহভালবাসা অক্ষুণ্ণই ছিল। এই নবীন জীবনে তাহার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কোন প্রকার অনুভূতি ছিল না, তথাচ ঐ অন্তর্নিহিত স্নেহ-ভালবাসা হত্যাকারী বন্ধুর নিকটে আসিবার তাহার প্রাণে একটা ইচ্ছা জাগাইয়া দিয়াছিল। হত্যাকারী ব্যক্তি জীবাত্মা অনির্ব্বচনীয় ভয়ে ভীত হইয়া উহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া পরিত্রাণ পাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। ভয়ানক ভয়ানক স্থানে, ভয়ানক নক লোকের মধ্যে, অতীব ঘৃণিত দৃশ্যের মধ্যে যাইয়া লুক্কায়িত হইয়া এইরূপে লুক্কায়িত হইয়া যখনই আপনাকে নিরাপদ মনে করে, নিহত বন্ধুর জীবাত্মা সেখানে তাহার পশ্চাতে যাইয়া বিদ্যুদ্বেগে উপস্থিত হয়। অনুসৃত বন্ধুর ভয়াবহ পারিপার্শ্বিকের বিষয় বা তাহার উৎকণ্ঠার বিষয় নিহত বন্ধু কিছুই অবগত ছিল না। মাত্র পূর্ব্বকার স্নেহভালবাসার টানে অনুসরণ করিতেছে, অথচ যাহাকে অনুসরণ করিতেছে তাহার দুর্দ্দশার বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, এইটুকুই ভয়ানক ব্যাপার হইয়া উঠিল। নিহত বন্ধু তাহার হত্যা-বিষয় কিছু অবগত ছিল না; তাহার প্রাণ সৌহৃদ্য, স্নেহ-ভালবাসায় পরিপূর্ণ। অনবগত থাকিয়াও স্বীয় হত্যাকাণ্ডের এরূপ ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ লাগিল, এইটুকুই একটা অদ্ভুত উৎকট তামাসা। এবম্প্রকার ও পলায়ন বহু বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকে। দোষী ব্যক্তির নিকটে সময়টা অতীব সুদীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়; তখন তাহার অনুতাপের থাকে না। পরে অল্প অল্প করিয়া বহিরাবরণ স্খলিত হইতে থাকে, উভয়ের মধ্যে একটা মীমাংসা হইয়া যায়।

প্রতিভাশালী ব্যক্তি

যে সকল ব্যক্তির কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য নাই, যাহারা সাধারণ অপেক্ষাও নিম্নস্তরের, আমরা তাহাদের বিষয় আলোচনা করি

যাহাদের অন্তরে বিশেষরূপ উৎকট স্বার্থের জল্পনা খেলিতে থাকে অথবা যাহারা দুষ্কৃতি-জড়িত, তাহারাই নিম্নস্তরের মানব।

যাহারা সাধারণ মানব অপেক্ষা অধম হইলেও কোন কোন বিষয়ে একটু সঙ্গতভাবে চলে, আমরা এক্ষণে তাহাদিগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এবংবিধ ব্যক্তিবর্গের নিকটে পারলৌকিক জীবনটি কিরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা সম্যক্‌রূপে অনুধাবন করিতে হইলে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অধিকাংশ ব্যক্তিকেই পার্থিব জীবনে অনিচ্ছার সহিত, মাত্র জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য, মাত্র পোষ্যবর্গের প্রতিপালনের নিমিত্ত অনেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া জীবন ও শক্তির বেশী অংশ ব্যয় করিয়া ফেলিতে হয়। আতিবাহিক দেহীর গ্রাসাচ্ছাদন বা বাসস্থানের প্রয়োজন নাই; সুতরাং সূক্ষ্ম-জগতে যখন তাহার জীবিকা অর্জ্জনের আবশ্যকতা থাকে না, যখন পোষণকারীর পরিশ্রমের যাবতীয় প্রয়োজন বিদূরিত হয়, তখন তাহার অবস্থাটি কিরূপ হইয়া উঠে, একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। পার্থিব জীবনের বাল্যকাল হইতে আর এই সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহধারণ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে স্বাধীনভাবে স্বীয় অভীপ্সিত কার্য্য করিবার এইটিই তাহার সুবর্ণ-সুযোগ। কার্য্য করিবার স্বাধীনতা সূক্ষ্ম-জগতেই খুব বেশী। স্থূল ভৌতিক জড়-দেহাতিরিক্ত হইয়া কার্য্য করা যতটা সম্ভব, সূক্ষ্ম-দেহে অবশ্য ততটুকুই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

মনে করুন, কোন ব্যক্তি পার্থিব দেহে খুব সঙ্গীতপ্রিয় ছিল। মরণান্তে সূক্ষ্ম-জগতে ঐ ব্যক্তি পৃথিবী-নিঃসৃত যাবতীয় উৎকৃষ্টতম সঙ্গীত শ্রবণের সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। পার্থিব দেহে সে সঙ্গীতের মিষ্টত্ব যতটুকু অনুভব করিতে পারিত, এক্ষণে এই নবীন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া তদপেক্ষা অনেক বেশী অনুভব করিতে পারিবে; কেন না, স্থূল শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত অপর অপর পূর্ণাঙ্গ স্বর-লহরী এই সূক্ষ্মদেহে তাহার আয়ত্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে শিল্পের অনুরাগী, যে ব্যক্তি

গঠন ও বর্ণের সৌন্দর্য্যে প্রীতি অনুভব করে, মরণান্তে উচ্চতর জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যরাশি তাহার সমক্ষে উন্মুক্ত হইয়া থাকে। তখন ইচ্ছানুসারে সে তাহা ভোগ করিতে পারে। যে ব্যক্তি নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যানুরাগী, সূক্ষ্ম-জগতে এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সম্ভাবনা তাহার খুব বেশী; কেন না, তখন সে ইচ্ছামাত্রই দ্রুতবেগে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া রাশি রাশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে। স্থূলদেহীর পক্ষে তাদৃশ উপভোগ বহু-বৎসরসাপেক্ষ। পার্থিব দেহে যদি কোন ব্যক্তি বিজ্ঞান বা ইতিহাসে অনুরক্ত থাকে, মরণান্তে সে দেখিতে পায় যে, পৃথিবীর যাবতীয় পুস্তকাগার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার তাহার আয়ত্ত। এতদবস্থায় সে দেখিতে পায় যে, রসায়নবিদ্যা বা প্রাণিবিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্বগুলি এখন তাহায় কাছে অতীব পরিস্ফুট। পার্থিব দেহে যাহা ভাল করিয়া অনুধাবন করা যাইত না, এখন তাহা অতীব সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতেছে; কেন না, এখন বাহ্য ও অন্তর উভয় দিকই তাহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত। এখন সে বিস্তর কার্য্য কারণ দেখিতে পায়। একটি আনন্দের বিষয় এই যে, এতদবস্থায় কাহাকেও একটা ক্লান্তি ভোগ করিতে হয় না। পার্থিব দেহে কোন একটা বিষয়ের আলোচনাকালে বা কোন একটা বিষয়ের পরীক্ষা-সময়ে আমরা কতকটা অগ্রসর হইয়াই যেন আর পারিয়া উঠি না; আমরা নিরন্তরই এইরূপ একটা ক্লান্তি অনুভব করিয়া থাকি। কেন না, আমাদের মস্তিষ্ক একটা নির্দ্দিষ্টপরিমাণ চাপ সহ্য করিতে পারে, তার বেশী পারে না। স্থূল-জগতের বাহিরে ক্লান্তি বলিয়া কোন কিছু নাই; কারণ, মন কখন ক্লান্ত হয় না, বাস্তবিক পক্ষে মস্তিষ্কই ক্লান্ত হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, বিস্তর বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম-জগতে যাইয়া বিপুল উৎসাহে অধ্যয়ন ও পরে গবেষণায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন। যখন তাঁহারা পার্থিব দেহে জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের একটা উৎসাহ ছিল না। পড়া-শুনা, আগ্রহ সূক্ষ্ম-জগতেই অধিক হয়; কারণ, তখন প্রশস্ততর সুযোগ সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে, গবেষণার অনুকূল

নূতন নূতন বৃত্তিও এই সময় আয়ত্ত হইয়া থাকে। মহামতি লেড্ বিটার বলিতেছেন যে, তাঁহার এক জন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন বন্ধুর সহিত এক জন প্রতিথনামা গতাসু গণিতজ্ঞের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই গণিতজ্ঞ অতি অল্পদিন হইল মারা গিয়াছিলেন। সূক্ষ্ম-জগতে যাইয়া ইনি কয়েকটা নূতন বিষয়ের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হওয়ায় ইঁহার আনন্দের সীমা নাই। গণিতবিজ্ঞানের উচ্চতর জটিল বিষয়ের সমাধান করিয়া সেইগুলি পৃথিবীতে অবিলম্বে প্রচার করিবার নিমিত্ত ইনি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিস্ময়কর নবীন আবিষ্কারগুলি সেই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তদীয় স্থূল মস্তিষ্কের সাহায্যে অনুধাবন বা প্রচার করিতে অসমর্থ হওয়ায় গণিতজ্ঞ জীবাত্মা উঁহার উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন। ঘন-ক্ষেত্রাতিরিক্ত স্থানের অনুভূতি করিতে পারিলেই ঐ আবিষ্কারনিচয় হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হইতে পারিত। এই ঘন-ক্ষেত্রাতিরিক্ত স্থানের বিষয় পরবর্ত্তী একটি অধ্যায়েই বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা যাইবে।

নিঃস্বার্থ শ্রমিক

এ পর্য্যন্ত শুধু স্বার্থজড়িত উপভোগের কথাই বলা হইয়াছে। কথাগুলি যদিও সঙ্গত, যদিও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক, তথাপি সকলের উহাতে তৃপ্তি জন্মিতে পারে না। এমন বিস্তর লোক আছেন, যাঁহারা এতদপেক্ষা বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত সন্তোষলাভ করিতে পারেন না। অপর ব্যক্তির সেবাতেই ইঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইয়া থাকেন। অপরকে সেবা করিতে পারিলেই ইঁহারা নিজের জীবন সার্থক মনে করেন। সূক্ষ্ম-জগতে এই সেবাধর্ম্মী ব্যক্তিদিগের কিরূপ দশা হইয়া থাকে? স্থূল-জগৎ অপেক্ষা সেখানে তাঁহারা অধিকতর আগ্রহের সহিত পরোপকার-ব্রতে ব্রতী হয়েন। এই ব্রতসাধনের সুযোগও সেখানে সুন্দরতর। সূক্ষ্ম-জগতে সহস্র সহস্র সাহায্যপ্রার্থী জীবাত্মা আছে। সেবা-ধর্ম্মীরা তাহাদিগকে বাস্তবিকই সাহায্য করিতে পারেন। সেরূপভাবে

পরোপকার করা পার্থিব দেহে সম্ভবপর হয় না। সূক্ষ্ম-জগতের ঐ সকল সেবাধর্ম্মীদিগের মধ্যে কেহ কেহ সর্ব্বসাধারণের উপকারসাধনে ব্যাপৃত থাকেন। আপন আপন জীবিত বা মৃত পরিবারবর্গ বা বন্ধু-বান্ধবের উপকারে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করেন। "জীবিত বা মৃত" শব্দ প্রয়োগে একটা অদ্ভুত সত্য-বিপর্য্যাস মনে আসিতে পারে। আমরা এই স্থূল, আবদ্ধকারী, ভৌতিক দেহে নিবদ্ধ রহিয়াছি, অতএব আমরা নিশ্চয়ই মৃত। যাহারা আমাদিগের মত আবদ্ধ নহে, আমাদিগের অপেক্ষা মুক্ত ও অধিকতর কর্ম্মপটু, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে জীবিত। যে মাতা মরণান্তে ঐ উচ্চতর জীবনে উপনীত হইয়াছেন, তিনি নিরন্তরই তাঁহার পার্থিব সন্তানের শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি রাখেন; তিনি সন্তানের ঠিক যেন রক্ষয়িত্রী দেবদূতী হইয়া দাঁড়ান। 'মৃত' স্বামী শোকার্ত্তা পত্নীর অতি নিকটেই সতত অবস্থান করেন। জীবিতকালে পার্থিব দেহে তিনি যেমন পত্নীর কাছে কাছে থাকিতেন, এখনও সেইরূপই থাকেন, এই সত্যটুকু যদি কোনরূপে স্ত্রীকে জানাইতে পারেন, যদি কোনরূপে বুঝাইতে পারেন যে, তিনি পত্নীকে এখনও সেইরূপ ভালই বাসেন, তবে বড়ই প্রীত ও কৃতার্থ বোধ করেন।

শেষোক্ত ঘটনার অনুরূপ একটি ঘটনা কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল। এ স্থলে পত্নী দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন। তাই তিনি গতাসু স্বামীর সাহচর্য্য অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি স্বতশ্চল লিখন-সাহায্যে স্বহস্তে পরলোকগত স্বামীর নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহও করিতেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি এইরূপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন পরাবিদ্যা-সমিতির সংস্রবে আসিয়া এতদ্‌বিদ্যা-বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিয়া অবগত হইলেন যে, পরলোকগত জীবাত্মাদিগকে ঐ প্রকারে আনয়ন করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ, তাহাতে তাঁহাদের অগ্রগতির পক্ষে বিলম্ব ঘটে, তখন সেই পত্নী কিয়ৎপরিমাণে উৎকণ্ঠিত হইলেন। তখন গতাসু স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ

সংগ্রহ করায় তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট হইয়াছে কি না? স্বামী উত্তর করিলেন,—অনিষ্ট হয় নাই। ইহাতেও স্ত্রী সম্যক্‌রূপে আশ্বস্ত না হওয়ায় ঐ গতাসু স্বামী তাঁহাকে লেড্‌বিটার সাহেবের সহিত পরলোকসম্বন্ধে আলোচনা করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

লেড্‌বিটার সাহেব বলিতেছেন—"আমি সেই গতাসু স্বামীর সহিত কিছু সময় কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি অতীব বুদ্ধিমান্ ও নিঃস্বার্থ। ভুবর্লোকের নিম্নতর জড়াংশের সংস্রবে থাকিয়া তাঁহাকে পত্নীর সাহচর্য্য ভোগ করিতে হইতেছে। ইহাতে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটিতেছে—অগ্রগতির বিলম্ব ঘটিতেছে, তাহা তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন। কিন্তু বলিলেন যে, তাঁহার সাহচর্য্যে তাঁহার পত্নীর একটু শান্তি হয়, পত্নী যত দিন এরূপ শান্তি চাহিবেন, নিজের সামান্য ক্ষতি হইলেও তত দিন তিনি এরূপ শান্তি প্রদান করিবেন। তাই এরূপভাবে পত্নীর নিকটে যত দিন পারিবেন, তত দিন থাকিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। আমি তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারিলাম না। তাঁহার কার্য্য একটু স্বতন্ত্র প্রকার, উহা সাধারণ বিধির বিপরীত। কিন্তু উহাতে স্বার্থের গন্ধ ছিল না। তাঁহার কার্য্যের ফল কিরূপ ফলিবে, তাহাও তিনি জানিতেন। তিনি যেমন স্বীয় পত্নীর, তেমনই অপর অপর ব্যক্তিরও প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। এই শুভকার্য্যের ফলে তাঁহার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক অকার্য্যকর হইয়া উঠিয়াছিল।"

নবম অধ্যায়

সূক্ষ্ম-জগতের পারিপার্শ্বিক

ভুবর্লোকের দৃশ্য, সাধারণ অবস্থা ও অধিবাসিবৃন্দের বিষয় মাহাত্মা লেড্‌বিটার তদীয় 'ভুবর্লোক' (The Astral Plane) নামক গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। সূক্ষ্ম-জগতের বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিবার পক্ষে মানবের ভাষা অসম্পূর্ণ। তথাচ যতদূর সম্ভব, তাহা করিয়াছেন। সে বর্ণনার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মরণান্তে মানুষের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর লোকে অপরিবর্ত্তনীয় প্রয়াণ ঘটিতে থাকে। লেড্‌বিটার-প্রদত্ত ভুবর্লোকের বর্ণনা পাঠ করিলে এই প্রয়াণের ও সূক্ষ্ম-জগতের একটা সুন্দর ধারণা জন্মে, ব্যক্তিবর্গের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে কোন কোন বিষয় অন্যরূপ হইলেও সূক্ষ্ম-জগতের দশা সাধারণতঃ একই প্রকার। আতিবাহিক জীবনের শেষাংশ মানুষ যে জগতে অতিবাহিত করে, সেখানে যাইয়া আপন আপন ইচ্ছানুসারে মূর্ত্তি বাছিয়া লইয়া তাহার পক্ষপাতী হয়; অপর মূর্ত্তিগুলিকে অনেকটা উপেক্ষা করিয়া থাকে। এই পৃথিবীতে যেমন একজাতীয় ও একধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা একত্র থাকিতে ভালবাসে, সেখানেও তদ্রূপ। পৃথিবীতে একধর্ম্মাবলম্বীরা যেমন পরস্পর পরস্পরের মতের সমর্থন করে, সেখানেও সেইরূপ করিয়া থাকে। মানুষ সেখানে যে আপন আপন চিন্তা-মূর্ত্তিই দেখিয়া থাকে, তাহা নহে। সেরূপ মূর্ত্তি ত থাকেই, তদ্ব্যতীত অপরের প্রসূত চিন্তার মূর্ত্তিও সেখানে বিস্তর। একই বিষয়ে যতরূপ চিন্তা নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাদের মূর্ত্তি সেখানে বিরাজ করিতেছে।

মনোহর সৃষ্টিপুঞ্জ

উপরি-উক্ত কথাটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝা যাউক। বাইবেল নামক ধর্ম্মগ্রন্থের প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন অংশের কাহিনীগুলি সম্বন্ধে শত শত

বৎসর যাবৎ সহস্র সহস্র ব্যক্তিনিচয় চিন্তা করিয়াছেন; সুতরাং ঐ সকল গল্প-সম্বন্ধীয় বিস্তর সুস্পষ্ট চিন্তা-মূর্ত্তি সূক্ষ্ম-জগতে প্রকট রহিয়াছে। এই সকল চিন্তাকারীদিগের অধিকাংশই পরলোক সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। তাই চিন্তা-মূর্ত্তিগুলিও স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ সম্পূর্ণরূপে অসমঞ্জস। প্রত্যেক জাতির কৃষক-সম্প্রদায় কোন গল্পের চিন্তা করিতে গেলে সেই গল্পের নায়ককে আপন আপন পরিচিত পোষাক ও পারিপার্শ্বিক-ভূষিত ও বেষ্টিত করিয়া থাকে। সকল দেশের কৃষকেরই এইরূপ ব্যাপার। তাই আমরা খৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের চিন্তা-মূর্ত্তির পরিধানে নিয়তই জর্ম্মণদেশীয় কৃষকের বা ইটালীদেশীয় "লাজেরণী" নামক দরিদ্রদিগের পোষাক দেখিতে পাই; জোসেফ ও তাঁহার অনুচরদিগের চিন্তা-মূর্ত্তিগুলি ইংলণ্ড ও আমেরিকার কৃষক-বালকদিগের পরিচ্ছদে ভূষিত। ঐ পরিচ্ছদ ফুটবল-সম্প্রদায়ের পশমী কামিজের ন্যায় "বিচিত্র বর্ণযুক্ত" ও জমকাল। যিনি সহজ-বিকার্য্য-প্রকৃতি-সম্পন্ন বা কথঞ্চিৎ দিব্যদৃষ্টিযুক্ত, তিনি স্থূলশরীরী হইয়াও কখন কখন উপরি-উক্ত চিন্তা-মূর্ত্তিনিচয় দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যাপার দর্শন করিয়া অ্যানি ক্যাথেরাইন্ ইমারিকের ন্যায় কেহ কেহ উহাকে বাস্তব ঘটনার অলৌকিক প্রত্যাদেশ বলিয়া মনে করেন।

শুধু বাইবেল-বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের প্রতিমূর্ত্তিই যে আমরা দেখিয়া থাকি, তাহা নহে। কবিবর সেক্ষপীয়র-প্রণীত নাটক-বর্ণিত বিস্তর ব্যক্তির মূর্ত্তিও ঐরূপে দেখা যায়। তদ্ব্যতীত আধুনিক ঔপন্যাসিকদিগের পুস্তক-বর্ণিত অনেক সুবিখ্যাত ব্যক্তির মূর্ত্তিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পাঠকবর্গ বহুদিবস যাবৎ ঐ সকল চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ চিন্তা করিয়াছেন, সূক্ষ্ম-জগতে চিন্তার মূর্ত্তিগুলিও তদনুরূপ হইয়াছে; ন্যূনাধিকভাবে সৌষ্ঠব-অসৌষ্ঠবযুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মাহাত্মা লেড্‌বিটার বলিতেছেন—আমি নিজে বেকীসার্প ও চেরিবল্ সহোদরগণের (Becky Sharp and of the Cheeryble brothers) অতীব সুন্দর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছি। রবিন্‌সন্ ক্রুসো, স্যাণ্টাক্লস, আলাদীন ও আলিবাবার অতীব সুস্পষ্ট জীবন্ত

চিত্র আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। উপন্যাসপ্রিয় বালক-বালিকাগণের বহুবৎসরব্যাপী সুতীক্ষ্ণ কল্পনার প্রভাবেই ঐ জীবন্ত চিত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। কোন কোন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন বালক ঐ প্রকার চিন্তা-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সেগুলিকে প্রকৃত ব্যক্তিই মনে করিয়াছিল। এই প্রকার ভ্রান্তি নিশ্চয়ই অনেক সময় ঘটিয়াছে। শুধু বালক-বালিকারাই যে এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছে, তাহাও নহে।

বহু ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভূতের মূর্ত্তি দেখিবার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি ভূতের মূর্ত্তি নহে। ঐ দর্শন-ব্যাপার যদি বিকৃত-মস্তিষ্ক-সম্ভূত না হয়, তবে ঐগুলি চিন্তামূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। গির্জ্জার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য যাহাতে অজ্ঞ কৃষকগণ বিপুল অর্থ-সাহায্য করে, এই অভিপ্রায়ে মধ্যযুগের ধর্ম্মধ্বজী সন্ন্যাসীরা উহাদিগকে ভীত করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মের মধ্যে অতিরঞ্জিত বিকট ভয়োৎপাদক ব্যাপারের কল্পনা করিতেন। তাঁহাদিগের কল্পনা নিশ্চয়ই বিকৃত-মস্তিষ্ক-সঞ্জাত। পাপ করিলে কিছুকাল কষ্টভোগ করিতে হয়—কিছুদিন স্বর্গে যাওয়া যায় না। এইটুকুই খৃষ্টধর্ম্মের সরল সত্য। কিন্তু ঐ সন্ন্যাসীরা এই সত্যকে বিকৃতার্থ করিয়া প্রচার করিলেন যে—পাপের ফল "অনন্ত নরক।" ঐ সময় অর্থাৎ মধ্যযুগ হইতে নরকাগ্নিজ্ঞাপক ধর্ম্মমতের হতভাগ্য ও প্রতারিত পৃষ্ঠপোষকগণ ক্রোধান্ধ ঈশ্বরের, মনুষ্যা-কারবিশিষ্ট সয়তানের, অগ্নিহ্রদের ও অকথ্য যাতনাক্লিষ্ট পাপীর ভয়াবহ চিন্তা-মূর্ত্তির উদ্ভব করিয়া আসিতেছে। ঐ সকল মূর্ত্তিতে সূক্ষ্মজগৎ পরিপূর্ণ। কখন কখন এই সকল মূর্ত্তি মানুষের দৃষ্টিপথেও পড়িয়াছে। ঐগুলি দেখিলে আজও দুর্দ্দান্ত ভীতিজনক পুরোহিতযুগের কথা মনে পড়ে। পার্থিব জীবনে যে হতভাগ্য এই ঘৃণিত মতের শিক্ষা পায়, মরণান্তে যখন তাহার সমক্ষে সত্য সত্যই ঐ সকল অদ্ভুত চিন্তা-মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার মনের ভাব কিরূপ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। সন্ন্যাসীদিগের ঐ নরকাগ্নির কল্পনা-সংবলিত মত যাবতীয়

ধর্ম্মমতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। উহাতে যে কত অনিষ্টসাধন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন ; কত শত সুন্দর প্রদেশে ঐ মত অভিসম্পাতের ন্যায় ছায়া-বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাহার ফলে, তত্রত্য মানবমণ্ডলী জীবিত হউক, মৃত হউক, সকলেই সমানভাবে শোক, দুঃখ ও অবসাদ ভোগ করিতেছে। ঐ মতটি ভয়োৎপাদক তো বটেই, তদ্ব্যতীত উহাতে মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস শিথিল হইয়া যায়, চরিত্র পাশবিকভাবে কলুষিত হইয়া উঠে।

কৃত্রিম দৃশ্য

যেরূপভাবে মূর্ত্তি-নিচয় সংগঠিত হয়, একটা দৃশ্যও অবিকল তদ্রূপ প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দান্তে-বর্ণিত প্রেতলোক ও সুইডেনবর্গ-বর্ণিত স্বর্গ ও নরকের উদ্ভবও এইরূপেই হইয়াছে। ঐ দুই মহাত্মার দিব্যদৃষ্টির সহিত মূর্ত্তি-প্রণয়নবিদ্যাও সংমিলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা প্রকৃত ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ মহাত্মগণের সত্যদর্শিতার বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মৃত ব্যক্তির জীবাত্মা বা কোন দেবযোনি উপরি-উক্ত চিন্তামূর্ত্তির কোন একটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন। সৎ বা অসৎ আত্মার চিন্তা-মূর্ত্তিতে এবম্প্রকার আবেশ নিয়তই হইয়া থাকে ; এরূপ ঘটনা অনেকবার জানাও গিয়াছে। মানুষ ভ্রমবশতঃ একটা সয়তানের কল্পনা করিল। কল্পনা করিল যে, সয়তানের একটা লেজ আছে, সেই লেজের আগাগুলি কাঁটার মত ছুঁচাল, তাহার চোখ দুটি রেকাবীর মত বড় ও গোল, তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। কল্পনাটি ভ্রমবশতঃ করা হইল বটে, কিন্তু সত্য সত্যই তাদৃশী চিন্তা-মূর্ত্তি সূক্ষ্ম-জগতে সংগঠিত হইয়া পড়িল। এইরূপ বিকট মূর্ত্তি সূক্ষ্ম-জগতে বিস্তর আছে। মরণান্তে কোন দুষ্ট ব্যক্তির জীবাত্মা অথবা কোন অনিষ্টকারী ব্যোমচর ঐরূপ একটি মূর্ত্তিতে কু-অভিপ্রায়ে আবিষ্ট হইয়া

থাকে। অপর পক্ষে নির্দ্দোষ সত্যপরায়ণ বালক-বালিকাগণের উদ্ভাবিত সাধু ও দেবদূতের চিন্তা-মূর্ত্তিতে সচরাচর ধার্ম্মিক লোকের জীবাত্মা, কখন কখন বা উচ্চশ্রেণীর দেবযোনিরা আবিষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম-জগৎ-প্রবাসী জীবাত্মা-বৃন্দের অশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন।

এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই যে, যে সকল অলীক কুসংস্কার সর্ব্বসাধারণ্যে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, অথচ বাস্তবিক পক্ষে যাহাদের কোনই ভিত্তি নাই, এরূপ ব্যাপারের অনুরূপ বর্ণনা প্রকৃত সত্যবাদী আধ্যাত্মিকজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন। এই কারণে এখনও ডানাযুক্ত দেবদূত দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু পাখাসঞ্চালন করিয়া যদি গমনাগমন করিতে হয়, তবে সেই ব্যাপারটি বড় সহজ-সাধ্য হয় না। তাহাতে বিপুল পরিশ্রম আবশ্যক। এই পরিশ্রমের কথা মনে হইলে সূক্ষ্ম-জগতে সুখ-স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিবার স্ফুর্ত্তির কথাটুকু আর মনে আইসে না। মরণান্তে মানুষকে চিন্তামূর্ত্তিসঙ্কুল এবম্প্রকার বিপুল জগতে যাইতে হয়। যিনি ঐ স্থানের অবস্থা সম্যক্ অবগত হইয়া ঐ স্থানে প্রবাসজনিত ষোল আনা সুবিধা ভোগ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে বুঝিয়া লইতে হইবে, কোন্‌টি চিন্তামূর্ত্তি, কোন্‌টি দেহাতিরিক্ত জীবাত্মা, আর কোন্‌টিই বা চিন্তা-মূর্ত্তিতে আবেশ। তাঁহাকে আরও বুঝিয়া লইতে হইবে, ঐ স্থানে কোন্ কোন্ ব্যাপারগুলি বিশিষ্ট, আর কোন্ কোন্‌গুলিই বা অস্থায়ী। যাঁহারা স্থূল-দেহে এই পৃথিবীতেই সূক্ষ্ম-জগতের বেশ ভালরূপ আলোচনা করেন, মরণান্তে ঐ স্থানে তাঁহাদের খুব বেশী সুবিধা হইয়া থাকে। এই পার্থিব দেহে যাঁহারা সূক্ষ্ম-জগতের অনেক সংবাদ রাখেন, মৃত্যুর পর সজীব সহায়কদিগের ন্যায় তাঁহারা অপর অপর অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ভ্রাতৃগণের সুখ-বিধান করিয়া প্রীতি অনুভব করেন। অজ্ঞ জীবাত্মাদিগের নিকটে যে সমুদয় ব্যাপার অদ্ভুত ও ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইত, তাঁহারা সে সমুদয়ের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

মূর্ত্তিমৎ স্বর্গ

যাহারা গোঁড়া, অজ্ঞ, ঐহিক উপভোগে ঘোর ব্যতিব্যস্ত, তাহাদের তীব্রতর চিন্তা-প্রভাবে একটা মূর্ত্ত স্বর্গের কতকটা স্থায়ী চিত্র সূক্ষ্মজগতে প্রকট হইয়া উঠে। এই স্বর্গচিত্রে উপাসনা করিবার গির্জ্জা আছে, বিদ্যালয় ও আরামগৃহ আছে, নগর-সহর আছে। নগর-সহর স্বর্গের বলিয়া খুব মনোহর। উহার অধিবাসিবৃন্দ দেবদূতের ন্যায় দিব্যকান্তিসম্পন্ন। এবম্বিধ ব্যক্তিবর্গ শত শত বৎসর যাবৎ স্বর্ণময় সরণী, মৌক্তিক তোরণ, অগ্নিময় স্ফটিক অর্ণব, রাজমুকুট ও বীণা, মধ্যযুগের সন্ন্যাসীদিগের পরিচ্ছদে ভূষিত ভবিষ্যদ্‌বক্তা, পুরোহিতদিগের শিরশ্ছদ ও উত্তরীয়ধারী সাধু ও খৃষ্টশিষ্যবর্গ, অ-মানবসম্ভব, পালকসংবলিত ডানাযুক্ত দেবদূত ও দেবযোনিবৃন্দের অদ্ভুত অসম্পূর্ণ অনুভূতির সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। এইরূপ এক জন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে প্রথমেই তাহাকে সূক্ষ্মজগতের যে স্তরে উপনীত হইতে হয়, সেটি প্রকৃতপক্ষে পাপের ক্ষালনভূমি। সে স্তরটি যেন অন্য একটি স্তরের পার্শ্ব-প্রকোষ্ঠ। তাহার পরে ধীরে ধীরে তাহাকে আর একটি স্তরে যাইতে হয়। এই স্তরে প্রধানতঃ সূক্ষ্ম জড়-দেহীরা বিরাজ করে। এই স্থান-সুলভ সূক্ষ্ম জড় উপাদানেই চিন্তামূর্ত্তিনিচয় অতি সহজেই সংগঠিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে মৃতব্যক্তির জীবাত্মা এই স্তরে আসিয়া এই স্থলটিকেই পূর্ব্বকল্পিত স্বর্গ বলিয়া মনে করে। এই স্তরটিকে স্বর্গ বলিয়া বুঝিতে তাহার কিছুমাত্র দ্বিধা জন্মে না। কখন কখন তাহার মনে এইটিকে স্বর্গ বলিয়া বুঝিতে যেন একটু অসঙ্গতির ভাব জাগিয়া উঠে। তখন সে মনে মনে ভাবিতে থাকে,—"স্বর্গ যে ঠিক এইরূপ, তাহা আমি কখনই ভাবি নাই।" মৃত ব্যক্তির বুদ্ধি যদি একটু অনন্যসাধারণ হয়, তবে কখন কখন তাহার প্রাণে নৈরাশ্যের ভাব আসিয়া দেখা দেয়।

মৃত ব্যক্তি সেখানেও স্থির থাকে না। তাহার প্রয়াণ অপরিবর্ত্তনীয়-ভাবে হইতেই থাকে। ক্রমে ক্রমে তত্রত্য চিন্তা-মূর্ত্তিগুলিরও বিলোপ হইতে

আরম্ভ হয়। তখন আর ইহাদিগের ততটা প্রভাব থাকে না। ক্রমে ক্রমে জীবাত্মার উপর একটা মহীয়ান্ ব্যাপারের উষালোক বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। তাহার প্রাণে একটা অতি চমৎকার অনুভূতির সঞ্চার হয়। তখন তাহার মনে হয়, ইতঃপূর্ব্বে যে সমুদয় ব্যাপার সে প্রীতিজনক বলিয়া মনে করিয়াছিল, সেগুলি বাস্তবিকপক্ষে একটা মহতী অবস্থার পূর্ব্ব-সূচনা মাত্র। এখন সে যে অবস্থায় উপনীত, সেখানকার ঐশ্বর্য্য, সেখানকার বিপুলতা, সেখানকার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। ভুবর্লোক ঈদৃশী মহিমার কল্পনাও করিতে পারে না। এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা পরে করা যাইবে। স্বর্লোক শ্রেষ্ঠ হইলেও স্থূল জড়-জগতেরও কিছু উপযোগিতা আছে। ভুবর্লোকের এক জন সহায়ক, অমার্জ্জিত জীবাত্মা-দিগের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিলে, তাহারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই দেবদূত বা শুভানুধ্যায়ী মহাপুরুষ বলিয়া মনে করে। স্বর্লোকের ব্যাপার অবগত হইবার পূর্ব্বে জীবাত্মগণ ঐরূপই মনে করে। যখন সাহায্যের বড় প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সঙ্কটসময়ে জীবাত্মাদিগকে প্রতারিত করা সহায়কের পক্ষে খুব সম্ভব। এ সময়ে আপনাকে তাহাদিগের নিকটে যা-তা একটা বলিয়া দেওয়াও চলে। অনেক সহায়ক মহাপুরুষ এইরূপ অবস্থায় অনেক সময় আপনাদিগের অনায়ত্ত গুণের অধিকার প্রকাশ করিয়া বাহাদুরী লইয়াছেন। যাহা হউক, কোন সহায়কেরই যখন কৃত কর্ম্মের জন্য যশের বাসনা থাকে না, তখন কে বাহাদুরী লইল, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। প্রধান ব্যাপার এইটুকু হওয়া চাই যে, সম্ভব হইলেই সাহায্য করিতে হইবে। সে সাহায্য কোথা হইতে কে করিতেছে, তাহা কাহারও পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন নাই।

বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিবর্গ

পরাবিদ্যা-সমিতি ভুবর্লোক (The Astral plane) সম্বন্ধে পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন। যাঁহারা উহা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন

যে, ভুবর্লোকের সর্ব্বোচ্চ বিভাগ অন্যান্য বিভাগগুলি হইতে স্বতন্ত্র। অন্যান্য বিভাগে জীবাত্মগণ যেমন কাল্পনিক অনুভূতি করিয়া থাকে, তদ্রূপ তত্রত্য আণবিক জড়াবস্থায় উহারা সেরূপ কিছু করে না। এখানে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ও বৈজ্ঞানিকগণ বাস করেন। ইঁহারা স্ব স্ব আলোচ্য বিষয়ের অনুশীলনে ঘোর ব্যস্ত। ইঁহারা অনুশীলনে যতদূর সম্ভব সূক্ষ্ম-জগতের শক্তি নিয়োগ করিয়া থাকেন। স্থূল-জগতেও প্রকারান্তরে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হয়েন। সাধারণ পার্থিব জীবনের সহিত সম্পূর্ণরূপে অসংশ্লিষ্ট থাকিয়াও ইঁহারা পার্থিব পুস্তকের সূক্ষ্মাংশ হইতে স্ব স্ব অভীপ্সিত বিষয়ের জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন। ইঁহারা অতি সহজেই কোন নবীন গ্রন্থ-কর্ত্তার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। কোন পুস্তকে ইঁহারা আকৃষ্ট হইলে, গ্রন্থকর্ত্তার মনের উপর নূতন নূতন চিন্তা-শক্তি স্ফুরিত করেন, আবার নিজেরাও উহা হইতে নূতন চিন্তা ও ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভুবর্লোকে থাকিয়া এইরূপে বিদ্যালোচনায় ব্যাপৃত হওয়ায়, স্বর্লোকে যাইবার পক্ষে ইঁহাদেব সময় সময় বড়ই বিপদ ঘটে। ভুবর্লোকের ব্যাপারে ইঁহারা এতই আকৃষ্ট থাকেন, ইহাতে এতই প্রীতি অনুভব করেন যে, এতল্লোক অপেক্ষা উচ্চতর লোকের আবশ্যকতা বোধ করেন না। উচ্চতর লোক যে আছে, তাহাও ইঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। না চাহিলেও, সময়ক্রমে উচ্চতর লোকের বিদ্যমানতা ইঁহারা বুঝিতে পারেন। তখন ইঁহাদের প্রতীতি জন্মে যে, ভূর্লোক অপেক্ষা ভুবর্লোক যেমন শ্রেষ্ঠতর, ভুবর্লোক অপেক্ষাও তদ্রূপ স্বর্লোক প্রভৃতি উৎকৃষ্টতর।

আমরা কি মরণান্তে আত্মীয়-স্বজনকে চিনিতে পারিব?

মৃত্যুর পরে মানুষের আতিবাহিক দেহের কিরূপ আকৃতি হয়, তাহাকে চেনা যায় কি না, এ সম্বন্ধে লোকে সর্ব্বদাই প্রশ্ন করিয়া থাকে। প্রত্যেক লোককেই সুন্দররূপে চেনা যায়। পার্থিব জীবনে যাহাদের সদ্‌গুণের ততটা বিকাশ ঘটে না, কেবল তাহাদের আকৃতিগুলি কিছু মলিন ও অস্পষ্ট হইয়া থাকে। যিনি দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন, তিনি স্থূলদেহধারী

মানবেরও দেহের চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্ম্ময় ডিম্বাকৃতি একটা আবরণ দেখিতে পান। ঐ আবরণটিকে আমরা পরিবেশ বলিয়া থাকি। এই পরিবেশ স্থূল-শরীরের চতুর্দ্দিকে প্রায় ১৮ ইঞ্চি দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বস্তুতঃ উহা বড়ই জটিল পদার্থ; কেন না, সূক্ষ্মজগতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জড়াংশে উহা গঠিত। ভুবর্লোকের বিষয়ই আমাদের এখন আলোচ্য। সাধারণ শ্রেণীর সূক্ষ্মদর্শীরা ভুবর্লোকসুলভ জড়াংশ-গঠিত পরিবেশই দেখিতে পান। আমরা যদি মনোযোগ সহকারে এই পরিবেশ জিনিসটি পরিদর্শন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, উহা যে কেবল স্থূল-শরীরের চতুর্দ্দিকেই রহিয়াছে, তাহা নহে; স্থূল-শরীরের উপরিভাগ অপেক্ষা মধ্যেই ঐ পরিবেশ অধিক পরিমাণে ঘনীভূত। স্থূল-দেহের বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত এই পরিবেশ নামক সূক্ষ্ম পদার্থটি মানুষের লিঙ্গশরীরাংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্থূল-দেহের স্থূল পরমাণুপুঞ্জের আকর্ষণবশতঃই দেহাভ্যন্তরে পরিবেশের ঘনত্ব ঘটে। যিনি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহার চক্ষুতে স্থূল-দেহ আদৌ পড়ে না। তিনি মানুষের লিঙ্গ-শরীরই দেখিয়া থাকেন: পরিবেশের মধ্যে ভুবর্লোকসুলভ ঘনতর জড়াংশে মানুষের লিঙ্গ-শরীর পরিস্ফুট হইয়া উঠে বলিয়া তাহার স্থূল-দেহের যে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা নহে। নিদ্রিতাবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য আর মৃত্যুব্যাপারে চিরদিনের নিমিত্ত জীবাত্মা স্থূল-দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়। তখনও লিঙ্গ-দেহের পরমাণুপুঞ্জ সেইরূপ ভাবেই বিন্যস্ত থাকে। এই পরমাণু-বিন্যস্ত লিঙ্গদেহ সূক্ষ্ম জড়াংশ-সম্ভূত হইলেও ইহাকে সুস্পষ্টভাবে চেনা যায়।

পার্থিব দেহে জীবিত থাকিবার সময়ে মানুষের লিঙ্গ-দেহের পরমাণুরাশি নিরন্তর দ্রুতগতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন শ্রেণীর লোকের অথবা যখন বিশেষ প্রকার আবেগপ্রভাব সূক্ষ্মদেহের উপর যাইয়া পড়ে তখন সকলেরই লিঙ্গ-শরীরে নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন-নিচয়, অতীব সুস্পষ্ট রেখা সকল পরিদৃষ্ট হয়। মহাত্মা লেড্‌বিটার তদীয় "স্থূল ও সূক্ষ্মদেহী মানব" নামক গ্রন্থে সূক্ষ্ম-শরীরের যে সকল চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সব

চিহ্ন বা রেখা অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে। যখন আবেগ-উদ্বেগ থাকে না, অর্থাৎ সাধারণ স্থলে সূক্ষ্ম-দেহের বর্ণগুলি অনবরত সংমিলিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন-ব্যাপারে কোন বর্ণ মিলাইয়া যাইতেছে, কোনটি বা ফুটিয়া উঠিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে, এই জ্যোতির্ম্ময়, উজ্জ্বলবর্ণ পরিবেশের উপরিভাগটা যেন ভয়ানক ফুটন্ত জলের অনুরূপ। জল ফুটিবার সময় যেমন উপরের অংশ নিম্নে যায়, নিম্নের অংশ উপরে আইসে, একটা ভয়ানক অস্থিরতা, ভয়ানক চাঞ্চল্য, পরিবেশের অবস্থাও তদ্রূপ। উহার চাঞ্চল্যও সার্ব্বক্ষণিক। মানুষের জীবিতকালে তাহার সূক্ষ্মদেহের অবস্থা এইরূপ হইতে থাকে। মানবদেহের উপরিভাগে যে সকল ভুবর্লোক-সুলভ পরমাণু-বিন্যাস থাকে, তাহারা নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তথাচ, মোটের উপর আকৃতির কোনরূপ বিপর্য্যয় ঘটিতেছে না। নিদ্রিতাবস্থায় মানুষের জীবাত্মা যখন স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখনও মূল আকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না; কিন্তু সাধারণতঃ একটু পরিবর্ত্তন ঘটে। তাহার অর্থ ও হেতু পরবর্ত্তী কোন একটি অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। কিন্তু সেইটুকু বুঝাইবার নিমিত্ত কতকটা অবান্তর বিষয়ের প্রয়োজন হইবে।

দশম অধ্যায়

বাসনা-উপাদান

জীবাত্মার জন্ম-পরিগ্রহ ব্যাপারটি ঠিক যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার অনুরূপ। আমরা শ্বাসত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের দেহের অনেক পদার্থ বহির্গত করিয়া দিই, আবার নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জ্জগতের বিস্তর দ্রব্য শরীরাভ্যন্তরে লইয়া থাকি। তদ্রূপ নিম্নস্তরে প্রকট হইবার সময় জীবাত্মার কিয়দংশ বহির্জ্জগতে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, পরে উর্দ্ধস্তরে প্রয়াণ-কালে তদংশ জীবাত্মা আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। যাহারা কুসীদ-জীবী, তাহারা টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ গ্রহণ করিয়া থাকে। জীবাত্মা যেন আপনার কিয়দংশ বিকীর্ণ করিয়া পরে বর্দ্ধিত অভিজ্ঞতারূপ সুদ গ্রহণ করিয়া বসে। প্রতি জন্ম-পরিগ্রহেই জীবাত্মার অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত হয়। প্রতি জন্মেই জীবাত্মার অন্তরে নূতন নূতন গুণের পরিপুষ্টি সংসাধিত হইয়া থাকে। জন্ম-পরিগ্রহের পূর্ব্বে জীবাত্মা কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত থাকে, এক্ষণে আমরা তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্রহে জীবাত্মার ক্রম-বিকাশ সংসাধিত হইতে থাকে। এই ক্রম-বিকাশের পথে আদৌ পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে জীবাত্মা স্বীয় বাসোপযোগী যে স্তরে অবস্থান করিত, পার্থিব দেহাবসানেও ঠিক সেই স্তরেই তাহার অবস্থিতি ঘটে। তবে পুনঃ পুনঃ পার্থিব দেহান্তে তাহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য বিপুলভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইটুকুই বৈশিষ্ট্য। কেন না প্রত্যেক জন্মে তাহার অন্তর্নিহিত গুণাবলী ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত নবীন গুণরাজিও তাহাতে অনুস্যূত হইতে থাকে। সূক্ষ্ম-জগতের যে মনোময় স্তর, জীবাত্মা পার্থিব দেহান্তে সেই স্তরের উচ্চতর স্থানে অবস্থান করে। উচ্চ হইতে নিম্নদিকে গণনা করিয়া আসিলে মনোময় স্তরের যে স্থান তৃতীয় ভূমি বিবেচিত হয়, সাধারণ শ্রেণীর মানবের সূক্ষ্ম-দেহ-সুলভ চৈতন্য সেই ভূমিতে কেন্দ্রীভূত থাকে। স্বর্গবাসের পর পার্থিব জন্ম পরিগ্রহ

পূর্ব্বে জীবাত্মাকে উপরি-উক্ত তৃতীয় ভূমিতে অধিক দিন থাকিতে হয় না; কেন না, ঐ স্থানের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কার্য্যতঃ উহার কোন অভিজ্ঞতাই জন্মে না; সুতরাং ঐ স্থানে অবস্থিতি বশতঃ উহার কোনরূপ শিক্ষালাভও ঘটে না। তত্রত্য পারিপার্শ্বিকনিচয় বিদিত হইয়া জ্ঞান ও শিক্ষালাভ করিতে হইলে জীবাত্মাকে বহুল পরিমাণে উন্নত হইতে হয়। সাধারণ শ্রেণীর মানবের জীবাত্মা তত উন্নত নহে বলিয়াই ঐ স্থানের উপকারে উপকৃত হয় না। পরে বহু জন্মান্তে উন্নতাবস্থায় জীবাত্মা ঐ স্থানে আসিয়া পৌঁছিলে, তাহার সমক্ষে ঐ স্থানের জ্ঞান সম্যক্‌ভাবে ফুটিয়া থাকে। তখন ঐ স্থানে বসবাস তাহার নিকট অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। সময়ক্রমে আরও বিস্তর জন্মের পর জীবাত্মা যখন আরও জ্ঞান-গরিমায় গরীয়ান্ হইয়া উঠে, তখন উহা মনোময় স্তরের দ্বিতীয় ভূমিতে আপনাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া বসে। এইরূপে জ্ঞান-সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা ঘটিলে জীবাত্মা মনোময় স্তরের সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে অধিরূঢ় থাকে। ঐ অবস্থায় উন্নীত হইলে জীবাত্মাকে উচ্চ শ্রেণীর সূক্ষ্মদেহী বলা চলে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণ শ্রেণীর মানবের জীবাত্মা মরণান্তে মনোময় স্তরের তৃতীয় ভূমিতে অবস্থান করে। সেখানেও তাহার তত্রত্য বস্তুনিচয়ের সম্যক্ উপলব্ধি ঘটে না। সৌররশ্মির সঞ্জীবন তাপ-প্লাবনে প্লাবিত হইলে অপ্রস্ফুটিত কুসুম-কোরকের মধ্যে যেমন একটা প্রাণ-শক্তির উন্মেষ ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ তৃতীয় ভূমিতে অবস্থিত জীবাত্মা সর্ব্বপ্রকার বহিরাগত স্পন্দনে উদাসীন থাকিলেও উপযুক্ত সদ্‌গুরুর উপস্থিতি ও আকর্ষণী শক্তি-প্রভাবে উহার কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তন ঘটে।

জীবাত্মার জন্ম-পরিগ্রহ-প্রণালী

অবেই দেখা যাইতেছে যে, অভিজ্ঞতা ও পরিপুষ্টিলাভার্থ স্থূল-জগতে জন্ম-গ্রহণ করা জীবাত্মার আবশ্যক হইয়া উঠে। প্রাচ্য-দেশের মত এই তৃষ্ণাই উহার জন্ম-গ্রহণের মূলীভূত হেতু। তৃষ্ণাপ্রভাবে উহাকে বাধ্য

হইয়া জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয়। ঐ তৃষ্ণাপ্রযুক্ত জীবাত্মার প্রথমতঃ মনে হয় যে, আমি অভিব্যক্ত হইব। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল বহিরাগত স্পন্দন ও ভাব-লহরী গ্রহণ করিতে পারিলে আপনাকে সজীব বলিয়া বিবেচনা হয়, সেই সকল স্পন্দন প্রভৃতি গ্রহণ করিবার একটা ইচ্ছা জীবাত্মার প্রাণে ঐ তৃষ্ণা জাগাইয়া দেয়। এইরূপে পরিস্ফুট, পরিব্যক্ত হইবার বলবতী আকাঙ্ক্ষাবলেই জীবাত্মার ক্রমোন্নতি ঘটিতে থাকে। ক্রমবিকাশের ইহাই পদ্ধতি। এই তৃষ্ণা বা বাসনাকেই পালিভাষায় "তান্‌হা" বলে। অন্তঃকরণে তৃষ্ণার সঞ্চার হইবামাত্র জীবাত্মা বহির্দ্দেশে অর্থাৎ মনোময় স্তরের নিম্নাংশে অবতরণ করিতে থাকে। কারণ, ঐটিই তাহার অবস্থিতি স্থানের নিকটবর্ত্তী। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝিবার পক্ষে দুইটি ভ্রম ঘটিতে পারে। সুতরাং আমাদিগকে একটু সতর্ক হইয়া কথাগুলি প্রণিধান করিতে হইবে। প্রথমতঃ, জীবাত্মা নিম্নস্তরে অবতরণ করে বলিলে ইহা যেন কেহ না বুঝেন যে, জীবাত্মা কতকটা স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। উহার অবতরণ অর্থ এই যে, উহা নিজ সংবিৎকে নিম্নস্তরে কেন্দ্রীভূত করে। ঐরূপ করায় নিম্নস্তরের স্থূলতর জড়াংশে উহার কতকটা অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, নিম্নস্তরে কেন্দ্রীভূত চৈতন্য বশতঃ উহার যে প্রকাশটুকু ঘটে, তাহা অতীব আংশিক। কেন না, নিম্নতর রৈখিক মানের (dimension) সহিত উচ্চতর মানের যে সম্বন্ধ, নিম্নস্তরের সহিত উচ্চস্তরের সম্বন্ধও তদ্রূপ। নিম্নতর রৈখিক মানে যেমন উচ্চতর মানের সর্ব্বায়তন প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ নিম্নস্তরে কেন্দ্রীভূত হইলে তত্রত্য জড়াংশ জীবাত্মার সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যক্ত করিতে পারে না। কথাটি আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক। আমরা সকলেই জানি যে, কতকগুলি সরল রেখা টানিয়া গেলেই একটি চতুষ্কোণ হইতে পারে না; কতকগুলি চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিলেই একটি ঘন-ক্ষেত্র গঠিত হয় না; তদ্রূপ, নিম্নতর স্তরে জীবাত্মার যুগপৎ কতকগুলি অভিব্যক্তি ঘটিলেই তাহাদিগের দ্বারা উহার সম্যক্ প্রকাশ ঘটে না। কেন না, জীবাত্মার মধ্যে এমন সকল

সম্প্রসারণ আছে, যাহার অনুভূতি নিম্নতর স্তরে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। আর যে যৌগপদিক অভিব্যক্তির কথা বলা হইল, তাহা মনোময় স্তরে সম্ভবপর, কিন্তু স্থূল-জগতে অসম্ভব। পরে এই তথ্য ব্যাখ্যাত হইবে। জীবাত্মার ঐ জন্ম-পরিগ্রহ-ব্যাপার পার্থিব ভাষায় যথাযথভাবে পরিব্যক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। যত দিন না আমরা সাধনা-বলে মনোময় প্রভৃতি সূক্ষ্ম স্তরের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, যত দিন না আমাদিগের দিব্যজ্ঞানের তাদৃশ উন্মেষ সংসাধিত হইয়া উঠে, তত দিন জীবাত্মার অবতরণ-ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা হইবে না। যদি ব্যাপারটা বুঝিতে চেষ্টা করি, তবে মাত্র এইটুকুই মনে হইবে যে, অগ্নির জিহ্বা যেমন প্রসৃত হইয়া দ্রব্যান্তরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জীবাত্মার কিয়দংশ স্থূল নিম্নতর স্তরে আসিয়া প্রকট হয়। ইহাপেক্ষা আমরা স্পষ্টতর ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু দিব্যজ্ঞানের উন্মেষ-সাধন করিয়া সূক্ষ্ম-জগতের উপলব্ধি করিতে পারিলে তত্রত্য ব্যাপার খুব সুন্দররূপে দৃষ্টিগোচর হয়।

যিনি মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে যদি কোন প্রেতবাদীদিগের বৈঠকে আসিয়া দেখা দিতে হয়, তবে তাঁহার এই স্থূল ভূলোকের স্থূল পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণ করিয়া দেহরচনা করত স্থূল নেত্রের বিষয়ীভূত হইবার প্রয়োজন। তদ্রূপ জীবাত্মা যে মুহূর্তে মনোময় স্তরের নিম্নাংশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই সেখানে প্রকট হইবার নিমিত্ত তত্রত্য পরমাণুপুঞ্জ সংগ্রহ করিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। মনোময় স্তরের পরমাণু স্থূলজগতের পরমাণু অপেক্ষা খুব সূক্ষ্ম হইলেও জীবাত্মার পক্ষে উহা স্থূল। আপনাকে ব্যক্ত করিতে হইলে যাদৃশ পরমাণু আবশ্যক, জীবাত্মা ঠিক সেইরূপ পরমাণুরাশিই সংগ্রহ করিয়া লয়। বৈঠকে প্রেতাত্মা স্থূল পরমাণু আকর্ষণ করিয়া যখন দেহরচনা করত মানবের দৃষ্টিপথের পথিক হয়, তখন তাহার সেই দেহের সাহায্যে স্থূল পার্থিব বস্তুও পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

অতএব দেখা গেল, সূক্ষ্মতম অবস্থা হইতে অবতরণব্যাপারে জীবাত্মার কিয়দংশমাত্র এক একটি স্তরে পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। উহার স্বরূপ পূর্ণ পরিমাণে কোন স্তরেই অভিব্যক্ত হয় না। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমরা কোন একটি লোককে যখন স্থূল-দেহের হিসাবে দেখি, তখন আমাদিগের সেই দেখাটা কতই অসম্পূর্ণ। সে ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃত মানুষটির কতই অল্পাংশ দেখিয়া থাকি! আর এইরূপ অল্পাংশ দেখিয়াই সচরাচর মনে করি যে, খুব দেখিয়াছি। যদি আমরা স্থূলদেহের হিসাব ছাড়িয়া আর একটু উন্নতভাবে তাহাকে মনোময় স্তরের দিক্ দিয়া দেখি, তাহা হইলেও তাহাকে সম্যক্‌ভাবে দেখা হয় না। মনোময় স্তরের জড়াংশে তাহার স্বরূপের যতটুকু ব্যক্ত হইবার কথা, মাত্র ততটুকুই আমরা ঐ দেহে তাহাকে বুঝিতে পারি। তাহার স্বরূপের মাত্র বুদ্ধির দিক্‌টাই মনোময় কোষে ব্যক্ত হইয়া থাকে। কাম-স্তরের দিক্ দিয়া দেখিলে আমরা আর একটি নূতন দিক্ দেখি মাত্র। বাসনা থাকার জন্য মানুষের একটা কাম-দেহ রচিত হয়। এই দেহে জীবাত্মার একটা নিম্নাংশ প্রকট হয় মাত্র। ভুবর্লোকে জীবাত্মা এই দেহে অবস্থান করিয়া থাকে। ভূ-লোকে আমাদের অবস্থা আরও হীন হইয়া পড়ে। কেন না, এখানে মানুষের স্বরূপ আরও আচ্ছন্ন। এখানে কোন একটি লোককে দেখিলে সে দেখা দেখাই হয় না। এখানকার দেখা বড়ই আংশিক, বড়ই অসম্পূর্ণ। আমরা এই ভূ-লোকে মানুষের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। এখানে তাহার অতীব নিকৃষ্ট অংশই দেখিয়া থাকি। তাই আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভূ-লোকে মানুষের অতীব সামান্য শক্তির প্রকাশ হয় মাত্র। তাহার মধ্যে আরও অনন্ত শক্তি নিহিত থাকে।

জীবাত্মা মনোময় স্তরে আসিয়া তত্রত্য জড়াংশ আকর্ষণ করিয়া একটা মনোময় শরীর বা কোষ গঠন করিয়া লয়। এই স্তরে অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বর্লোকে অবস্থান-কালে উহার যে মানসিক উন্নতি আয়ত্ত হইয়াছিল, তদনুসারেই এই নবীন মনোময় কোষ সংগঠিত হয়। স্বর্লোকে

যতটুকু মানসিক উন্নতি করিয়া উহাকে ঐ লোক ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে ঠিক সেই স্থান হইতেই আবার ঐ উন্নতি-প্রবাহ বহিতে থাকিবে। কিন্তু জন্ম-পরিগ্রহ-ব্যাপারে এই মনোময় স্তরে অবতরণ করিয়া জীবাত্মা কিরূপ মনোময় কোষ রচনা করিয়া লয়, তাহা তাহার অতীত পার্থিব জীবনের অবস্থা ও শিক্ষার উপর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে, মানুষ সারাটা জীবনই মনোময় কোষ রচনা করিতে থাকে। সারা জীবনের কার্য্যপ্রভাবে ঐ কোষের পরমাণুপুঞ্জের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়। কখন ঐ কোষের উৎকর্ষ, কখন বা অপকর্ষ ঘটিয়া থাকে।

মনোময় উপাদান বা তেজস্তত্ত্ব

মনোময় স্তরে আসিয়া জীবাত্মা প্রকট হইবার মানসে যে সকল জড়াংশ সংগ্রহ করিয়া লয়, সেগুলি নির্জীব পদার্থ নহে। থিওসফিষ্ট অর্থাৎ যোগদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষিগণ “নির্জীব পদার্থ” বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম-পদার্থের তৃতীয় বিভাগের প্রথম নিষেচনে যাবতীয় পদার্থই সঞ্জীবিত হইয়াছে। মহাত্মা লেড্-বিটার তদীয় “খৃষ্টীয় ধর্ম্ম” নামক গ্রন্থে এই তৃতীয় বিভাগের বর্ণনা করিয়াছেন। স্থূল-জগতের অভিমুখীন প্রত্যেক স্তরের আণবিক জড়াংশই ব্রহ্মের দ্বিতীয় নিষেচনে অনুপ্রাণিত হয়। এই নিষেচনকেই নিরবয়ব জীবৎপদার্থ বলে। মনোময় স্তরের যে জড়াংশ জীবাত্মার চতুর্দ্দিকে এক্ষণে সংগৃহীত, সেগুলি এই দ্বিতীয় নিষেচনেও প্রাণময়। এই নিরবয়ব জীবৎপদার্থকেই অন্যান্য স্তরে উপাদান-সার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব দেখা গেল যে, উপাদান-রাশি তিনটি প্রকৃষ্ট বিভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগ মনোময় স্তরের উচ্চতর অংশ-সম্পৃক্ত, দ্বিতীয় বিভাগ ঐ স্তরের নিম্নতর অংশ-সংবলিত, তৃতীয় বিভাগ ভুবর্লোক-সংশ্লিষ্ট। তৃতীয় বিভাগের কথা আমরা পরে বলিব। দ্বিতীয় বিভাগই এক্ষণে আমাদিগের আলোচ্য।

অতএব দেখা গেল, জীবাত্মা মনোময় স্তরে আসিয়া শুধু যে তত্রত্য জড়াংশই আকর্ষণ করিয়া লয়, তাহা নহে। কিন্তু উপরি-উক্ত দ্বিতীয় বিভাগীয় পদার্থও অর্থাৎ নিরবয়ব জীবৎপদার্থও সেই সঙ্গে আপনার অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ব্রহ্ম-সম্ভূত জীবৎ-পদার্থ একটা ক্রমোন্নতির পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকে। এই পদার্থে স্বভাবতঃ কতকগুলি প্রবৃত্তি নিহিত থাকে। উহাদের প্রেরণায় ঐ পদার্থ ক্রমোন্নতির অনুকূল অবস্থার অন্বেষণ করে। তদবস্থায় পরিস্পন্দই ঐ ক্রমোন্নতির পক্ষে আবশ্যক। বহিরাগত আবেগ-উদ্বেগে সাড়া দিতে দিতেই উহার ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে। ঐরূপেই উহার বৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়। আমাদেরও যখন খুব বেশী উন্নতি ঘটে, তখন আমরাও অনেক সূক্ষ্ম পরিস্পন্দে সাড়া দিতে সমর্থ হই। তাই বলিতেছি, ঐ জীবৎ-পদার্থ বিবিধপ্রকার স্পন্দনে সাড়া দিবার হেতু নিরন্তরই বহির্মুখ হইয়া থাকে। একটা বিষয়ে নিবদ্ধ থাকা উহার পক্ষে একেবারেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। উহা কিছুতেই বিষয়-বিশেষে অধিক কাল আবদ্ধ থাকিতে চাহে না।

আদিভূত জীবৎ-পদার্থের বহির্মুখীন হইবার বিষয় সম্ভবতঃ আমাদিগের সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। যখন আমরা ধ্যান-ধারণা করিতে বসি, যখন আমরা বিষয়বিশেষে নিবিষ্টচিত্ত হইবার চেষ্টা করি, তখনই দেখি যে, আমাদিগের চিত্ত কিছুতেই নিবদ্ধ হইতে চাহে না; অতর্কিতভাবে বাহিরে চলিয়া যায়। আমরা সকলেই বেশ বুঝিয়াছি যে, আমাদিগের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহার প্রভাবে আমরা নিরন্তর অস্থির চিন্তার আয়ত্ত হইয়া উঠিতেছি। উহারই দারুণ শক্তিতে আমরা কোন একটি বিষয়ে চিত্ত সংলগ্ন রাখিতে পারিতেছি না। আমরা চিত্ত স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছি, আর ঐ প্রভাব উহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। মনকে বশীভূত করিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছি; যাহাতে স্ফূর্তি করিয়া মন স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে না পারে, সে বিষয়ে আমাদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে। দৃষ্টি থাকিলে কি হইবে, কে যেন মনকে

আকুল-ব্যাকুল করিয়া বাহিরের দিকে যাইবার প্রেরণা দিতেছে। এইরূপে একটা প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে আমাদিগের নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে।

অপ্-তত্ত্বে প্রকট হইবার প্রণালী

মনোময় উপাদানকে আমরা তেজস্তত্ত্ব বলিতে পরি। এই তত্ত্বের সাহায্যে জীবাত্মাও যতটুকু পরিব্যক্ত হইবার কথা, তাহা হইয়া গেলে উহা নিম্নতর ও স্থূলতর অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয়। এই স্থূলতর জগতের জড়াংশকে অপ্-তত্ত্ব বলে। জীবাত্মা তেজস্তত্ত্বের সাহায্যে যেরূপ ভাবে প্রকট হইয়াছিল, এখানেও তদ্রূপভাবে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করে। এই অপ্-তত্ত্বে তাহার যতটুকু প্রকাশ হওয়া সম্ভবপর, ততটুকু ব্যক্ত হইবার মানসে নিজের চতুর্দ্দিকে তত্রত্য জড়াংশ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই জীবাত্মা পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্লোকে যাইবার সময় সঙ্গে সঙ্গে যে সূক্ষ্ম প্রেত-দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, সেই দেহের সহিত এখনকার এই অপ্-তত্ত্ব-সঞ্জাত দেহের অতীব সুন্দর সামঞ্জস্য দেখা যায়। তেজস্তত্ত্বেরই হউক বা অপ্-তত্ত্বেরই হউক, প্রত্যেক স্তরেই জীবাত্মার কিয়দংশমাত্র ব্যক্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল স্তরে জীবাত্মাকে পূর্ব্বেও অনেকবার অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ঐ ঐ স্তরে তাহার যেমন যেমন অভিজ্ঞতা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে কার্য্যতঃ তাদৃশ অভিজ্ঞতাই ফুটিয়া উঠে। জীবাত্মার পূর্ব্বজন্মে যে যে মানসিক আবেগ ও প্রবৃত্তি ছিল, এখন এই অপ্-তত্ত্ব-সঞ্জাত নবীন দেহের জড়াংশ-বিন্যাসে সেই সকল পৌর্ব্বদৈহিক প্রবৃত্তি প্রভৃতি স্ফুরিত হইবার কথা। এই জড়াংশ-বিন্যাস ঐ স্ফুরণের অনুকূল। পূর্ব্ব-প্রেত-দেহে জীবাত্মা যাদৃশী প্রকৃতি-সম্পন্ন ছিল, ইচ্ছা করিলে এখনও সে সেইরূপ হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ হওয়া না হওয়া তাহার ভূ-লোকের শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের উপর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। মানসিক উন্নতির সম্পর্কে এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

জীবাত্মার অন্তরে পূর্ব্বজন্মের বিস্তর বাসনা-বীজ সঞ্চিত থাকে। সে

সমুদয়গুলিকেই যে অঙ্কুরিত হইয়া ফলপ্রসব করিতে হইবে, তাহা নহে। একটু সতর্ক হইতে পারিলে সুবাসনা-বীজগুলির উন্নতি-সাধন ও কু-বাসনা-বীজগুলিকে শক্তিহীন করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর। যাহাতে কু-বাসনা-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে, সেরূপ যাবতীয় সুযোগ দূর করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ কু-বীজগুলির অঙ্কুরোদগমশক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অভিভাবকগণ এইরূপ সতর্ক হইলে সন্তানগণের অশেষ কল্যাণসাধন করিতে পারেন। সন্তান-সন্ততি ভূমিষ্ঠ হইয়া যতই বড় হইতে থাকে, সতর্ক অভিভাবকের গুণে তাহাদের সদ্বৃত্তিগুলির ততই উন্নতি, ব্যাপ্তি ও বৃদ্ধি হইয়া উঠে। উহাদের পূর্ব্বজন্মের যে সকল কু-প্রবৃত্তির বীজ সঙ্গে আসিয়াছিল, সেগুলিকে প্রশ্রয় না দেওয়ায় তাহারা কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয় না; পরন্তু সেগুলি বীজরূপে বালকদের অন্তরে এ জন্মে থাকিয়া যায়। এইরূপে ঐ সকল কু-প্রবৃত্তির বীজ শক্তিশূন্য হইয়া পড়ে। শেষে ঐগুলি অন্তর্হিত হয়, আর উহাদের স্থানে নূতন নূতন সদ্বৃত্তি আসিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। সতর্ক অভিভাবক-পরিচালিত এই বালকদিগের তাঁ জন্মে ঐ সকল শক্তিহীন কুপ্রবৃত্তির বীজ আর আদৌ পরিলক্ষিত হইবে না; আর কোন দিনই কু-প্রবৃত্তির জ্বালায় উহাদিগকে জ্বলিতে হইবে না; কেন না, তাহাদের অন্তরে বিপরীত গুণের অর্থাৎ সৎপ্রবৃত্তির পরিপুষ্টি হওয়ায় তথায় অসদ্বৃত্তির অবস্থান অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

জীবৎ-উপাদান

তেজস্তত্ত্ব যেমন ব্রহ্ম-শক্তির নিষেচনে প্রাণময় হইয়া থাকে, তত্র অপ্-তত্ত্বও ঐ জীবৎ-উপাদানে আচ্ছন্ন হয়। তাই জীবাত্মা অপ্-তত্ত্বে প্রকট হইবার সময় তত্রত্য জড়াংশের সহিত ঐ ব্রহ্ম-শক্তি অনেক পরিমা নিজের ভিতরে আকর্ষণ করিয়া লয়। ঐ শক্তি বা জীবৎ-পদার্থ সে সময় জন্য জীবাত্মার দেহাংশস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। স্মরণ রাখিতে হইবে, জীবৎ-পদার্থ ভগবৎ-সত্তারই অংশ। ভগবৎ-সত্তা সৃজন-ব্যাপারে

হইবার ইচ্ছায় জড় পরমাণুপুঞ্জের অভ্যন্তরে অনুস্যূত হইয়া থাকে। অপ্-তত্ত্বের এই ব্রহ্ম-উপাদানই বিবর্ত্তন-প্রথানুসারে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে খনিজ-রাজ্যকে প্রাণময় করিয়া তুলে। তখন সেই খনিজ-রাজ্যান্তর্গত ব্রহ্মশক্তির আবার ঊর্দ্ধদিকে নবীন বিবর্ত্তন-গতির সূত্রপাত হয়। অপ্-তত্ত্বের এই জীবৎ উপাদান খনিজ-রাজ্যের দিকে নিম্ন-গতি হওয়ায় উহার মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়ে, যাহার সহিত আমাদিগের প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য রক্ষা করা আমাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে। উন্নতি বলিতে আমরা স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে—ভৌতিক হইতে অধ্যাত্মের দিকে অগ্রসর বুঝি। কিন্তু উপরি-উক্ত জীবৎ-পদার্থের প্রকৃতি বিপরীত। উহা সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে অবতরণ করিতেছে। অতএব উহার পক্ষে উন্নতি বলিতে অধিকতর স্থূলত্ব-প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে; সুতরাং অতীব স্থূল স্পন্দনে সাড়া দেওয়াই উহার বাসনা। কিন্তু উন্নতিকামী মানবের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন বিভিন্ন প্রকার। মানব যথাসাধ্য স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে যাইতে চেষ্টা করে। উচ্চতর বাসনার সুকুমার পরিস্পন্দে সাড়া দেওয়াই তাহার আবশ্যক মনে হয়।

অপ্-তত্ত্ব অতীব সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত উপাদান। উপরি-উক্ত নিরবয়ব জীবৎ-ভগবদংশ জীবাত্মার ঐ অপ্-তত্ত্ব-গঠিত কামদেহে অবস্থান করে। এইরূপে কাম-দেহ গঠিত হইবার পরে জীবাত্মা স্থূল-শরীর পরিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে এই জীবাত্মার জন্য মাতৃ-জঠরে একটি স্থূলদেহ নির্ম্মিত হইতে থাকে। এখন কাম-দেহ সংবলিত হইয়া উহা ঐ জঠরস্থিত স্থূলদেহ অধিকার করিয়া লয়। এই স্থূলদেহটি ধীরে ধীরে গঠিত হইতে থাকে বলিয়া জীবাত্মা অপ্-তত্ত্ব ও তেজস্তত্ত্ব দিন দিন আয়ত্ত করিয়া ফেলে। এইরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া আত্ম-প্রকাশের উপযুক্ত ইন্দ্রিয়-গ্রামও সুন্দররূপে গঠন করিতে আরম্ভ করে। ইন্দ্রিয়াদি গঠনের উপাদান তাহাতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রদত্তই বা বলি কেন, উহার পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মানুসারেই ঐ উপাদানের ব্যবস্থা হয়; সুতরাং বলা যাইতে

পারে যে, এ উপাদানও তাহার স্বোপার্জ্জিত। তাহাকে উপাদান দেওয়া হয় বটে, কিন্তু উহা দ্বারা কিরূপভাবে কাজ করিতে হইবে, সেটা তাহার নিজের উপর নির্ভর করে। এই উপাদানের সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে কি উহাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, পরিশ্রম সহকারে ও নিরন্তর সতর্ক ব্যবহার দ্বারা উহার অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জের উন্মেষসাধন করিতে হইবে, কি অব্যবহার্য্য রাখিয়া উহাদিগকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিতে হইবে, তাহা তাহার নিজের বিবেচনাসাপেক্ষ। মাতৃ-জঠরে স্থূল-দেহধারী জীবাত্মা যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তাহার অন্তরে বাসনা-রাশি পুষ্টিলাভ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে তাহার অতিস্ফুট অব্যক্ত কাম-দেহটিকে একটি বর্ণ ও স্পন্দনযুক্ত সুস্পষ্ট লিঙ্গ-শরীরে পরি-বর্ত্তিত করিয়া তুলিবার ইচ্ছা জন্মে। জীবাত্মা তখন এতদিচ্ছার একটা বেগ অনুভব করিতে থাকে। জঠরে অবস্থান-কালে প্রবল ইচ্ছার বশে জীবাত্মা যেমন অপ্-তত্ত্ব গঠিত কাম-দেহটিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলে, তদ্রূপ ঐ ভাবে তাহার তেজস্তত্ত্ব-নির্ম্মিত মানস-দেহও সৌষ্ঠব-সম্পন্ন ও সুস্পষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা আপাততঃ অপ্-তত্ত্বেরই আলোচনা করিব।

একটি অস্থায়ী পদার্থ

মানুষ অপ্-তত্ত্বের স্তরে অবস্থান-কালে যে নিরবয়ব জীবৎ-পদার্থ আপনার অভ্যন্তরে আকর্ষণ করিয়া লয়, তাহা তদীয় কাম-দেহে পৃথক্ পদার্থরূপে অবস্থিত থাকে। ঐ পদার্থের একটা জগদ্ব্যাপী মহার্ণব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছে। মানুষের লিঙ্গ-দেহস্থ ঐ পদার্থ সেই বিশ্বব্যাপী জীবন-সমুদ্র হইতে পৃথগ্ভূত হইয়া পড়ে। উহার প্রকৃতির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। উহাকে জ্ঞানময় বলা চলে না; কেন না, উহা এখনও খনিজ পদার্থে পর্য্যন্ত স্ফুরিত হয় নাই। আর তাহাতেই বা কি? আমরা খনিজ পদার্থকেও "জ্ঞানময়" আখ্যা প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি। জ্ঞানময় না হইলেও ঐ পদার্থের একটি অসাধারণ শক্তি আছে। শক্তিটি এই

উহা পারিপার্শ্বিকের সহিত উপযোগী হইয়া চলিতে পারে ও তাহা হইতে আপনার প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ। এই শক্তি থাকা প্রযুক্ত উহাকে কতকটা জ্ঞানময় বলিয়া মনে হয়। আর যদি ভাবা যায়, এটা সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কার্য্য, তাহা হইলেও মনে হয় যে, এবম্প্রকার সীমাবদ্ধ জ্ঞান অতীব তীক্ষ্ণ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরিস্পন্দ দ্বারাই উহার ক্রমোন্নতি সংসাধিত হইয়া থাকে। ভুবর্লোকে যে সমুদয় পরিস্পন্দ হয়, তাহা কোন না কোন প্রকার অনুরাগ বা আবেগের ফল। ঐ জীবৎ-পদার্থ যখন ব্যোমপ্রদেশে ভাসমান হইয়া অবস্থান করে, তখন উহার উন্নতি নানাবিধ আবেগ-উদ্বেগের লহরী-লীলার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যে সকল জীবিত প্রাণী উন্নত ও শক্তি-সম্পন্ন, তাহাদিগের মানসিক স্পন্দন ভুবর্লোকে লহরী তুলিয়া ছুটিতে থাকে। জীবিত প্রাণী বলিতে এখানে শুধু মানুষকে বুঝিতে হইবে না; উহাতে মানব, মনুষ্যেতর জন্তু, স্বভাব-শাসক দেব-যোনি ও নিম্নশ্রেণীর দেবগণকেও বুঝিতে হইবে। শেষোক্ত দেবগণকে সংস্কৃত ভাষায় কাম-দেব বলা হইয়া থাকে। কেন না, দেবত্ব পাইলেও উহারা এখনও কামনা-শূন্য হইতে পারে নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যোম-প্রদেশে জীবৎ-পদার্থের একটা বিরাট বারিধি বিরাজ করিতেছে। উপরি-উক্ত মানব, দেব-যোনি প্রভৃতির আবেগ-উদ্বেগ বশতঃ যে স্পন্দন উদ্ভূত হয়, তাহাতে ঐ পদার্থ-সমুদ্রের দুই একটি কণামাত্র উপকৃত হইয়া থাকে। সে উপকারও নিরন্তর পাওয়া যায় না; ক্বচিৎ তাহা পাইবার সুযোগ ঘটে।

কিন্তু ঐ বিপুলার্ণব হইতে যে অংশ আকৃষ্ট হইয়া মানবের কাম-দেহে নিবদ্ধ থাকে, তাহা স্পন্দন-কেন্দ্রে অবস্থিতি প্রযুক্ত নিরন্তরই স্পন্দন-বেগ অনুভব করিতে পায়। তন্নিমিত্ত অল্পসময়ে অত্যধিক পরিমাণে স্পন্দনের উপকার প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানময় না হইলেও অদ্ভুত শক্তিপ্রযুক্ত উহাকে কতকটা জ্ঞানময় বলিয়া বোধ হয়। অদ্ভুত অর্দ্ধ-চৈতন্য থাকায় মনে হয়, উহা যেন ঐ উপকারটা অনুধাবন করিতে সমর্থ

হইতেছে। যেরূপেই হউক, ঐ জীবৎ-পদার্থ বুঝিতে পারে যে, উহা বেশ বাঞ্ছনীয় অবস্থায় অবস্থিত আছে। তাই উহার পরমাণুপুঞ্জ সংশ্লিষ্ট-ভাবে একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে অবস্থান করিতে কৃতসঙ্কল্প। এইরূপ অবস্থানে উহাদের সুবিধা অধিক। আর উহারা যে এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ়, তাহা নিজেরাও বেশ বুঝিতে পারে। স্থূল-দেহের পরমাণুপুঞ্জের মত কাম-দেহের পরমাণু-রাশি নিরন্তরই বিক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু তথাচ নবাগত পরমাণুপুঞ্জেও মানবের স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি বিজ্ঞাপিত হইয়া পড়িতেছে। কামদেহস্থ ঐ জীবৎপদার্থ নিঃসংশয়রূপে আপনাকে পৃথক্ সত্তা মনে করিয়া নিজের অভিলষিত কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে।

বিপরীত স্বার্থ

আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচনায় পরিস্ফুট হইবে। জীবাত্মা ও কাম-দেহস্থ জীবৎপদার্থ এতদুভয়ের স্বার্থ সাধারণতঃ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বাপেক্ষা অনাবিল স্পন্দনই প্রথমটির বাঞ্ছনীয়। উহা স্থূল-জগৎ পরিহার করিয়া নিরন্তর ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়টির কেবলই চেষ্টা যে, উহা অধিক-তর বেগবান্ ও স্থূলতর স্পন্দনের বিষয়ীভূত হয়। এই বাসনা-উপাদানের জীবৎপদার্থ নিম্নদিকে ক্রমশঃ নিবিড় হইতে নিবিড়তরভাবে জড়ভাবে যাইয়া মিশিতেছে। তাই জীবাত্মার সঙ্গে বাসনা-উপাদানের নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। সাধু পল (St. Paul) বলিয়াছেন—এ যুদ্ধটা ঠিক যেন দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত মনের যুদ্ধের মত। ব্যাপারটা যে ঠিক এই-রূপই হয়, তাহাও নহে। ইহাপেক্ষাও গুরুতর কাণ্ড ঘটে। লিঙ্গ-দেহের সেই জীবৎপদার্থ ক্রমে বুঝিতে পারে যে, তাহার মধ্যে একপ্রকার সূক্ষ্ম জড়াংশ বিদ্যমান আছে। সেটি মানস-দেহের জড়াংশ ব্যতীত আর কিছু নহে। সেই অস্থায়ী সত্তা ইহাও বুঝিতে পারে যে, যখন ঐ সূক্ষ্মতর জড়াং-শের সহিত তাহার নিজের যুগপৎ স্পন্দন হইতে থাকে, তখন সেই শক্তি

অনেকটা স্থায়ী ও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। তাই ঐ সত্তার প্রতীতি জন্মে যে, যদি উহা মানস-দেহের সূক্ষ্মতর জড়াংশের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে, অর্থাৎ কথাটি সহজ করিয়া বলিলে এইরূপ বলা যায় যে, যদি উহা আমাদিগের মনে এমন একটা বিশ্বাস আনিয়া দিতে পারে যে, ঐ সত্তার ইচ্ছা ও আমাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে একইরূপ, তাহা হইলে উহার প্রবৃত্তি আরও প্রকৃষ্ট হইয়া উঠে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমা-দিগের লিঙ্গদেহস্থ ঐ স্বতন্ত্র সত্তা আমাদের নিকটে বৃত্তির উত্তেজকস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। উহা আমাদিগের অন্তরে যাবতীয় স্থূল ইন্দ্রিয়বৃত্তির বাসনা সৃজন করিবার প্রয়াস পায়।

তথাচ আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে, যেন আমরা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুরাকালের সেই ভ্রমে পতিত না হই। ভ্রমটি এই—"ঐ সত্তা কুসত্তা, উহা একটি সয়তানবিশেষ, মতলব আঁটিয়া আমাদিগকে বলপূর্ব্বক পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।" ঐ জীবৎ-উপাদান কোন বিবর্ত্তন-বিধির প্রসূত ফল নহে। উহার জন্মান্তর প্রভৃতি নাই। আমাদিগের উপর এই অসার সত্তার কোন প্রকার কু-মতলবও নাই। উহা নিজের ব্যাপারেই নিবিষ্টচিত্ত থাকে। উহা যাহার কাম-দেহের অংশস্বরূপ, তাহারও কোন খোঁজ-খবর রাখে না। তাহার সম্বন্ধে কিছু পরিজ্ঞাত থাকা অথবা তাহার ক্রমোন্নতি-প্রণালী সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান লাভ করা উহার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। যদি উহা কোনরূপে অস্পষ্টভাবে তাহার ঊর্দ্ধগতির প্রয়াস বুঝিতে পারে, তবে সেই প্রয়াসকে প্রলোভনের কার্য্য বলিয়া মনে করে। মনে করে, ঐ প্রলোভন উহাকে ক্রমোন্নতির পথ হইতে নিম্নাভিমুখে টানিয়া আনিতেছে।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কাম-দেহস্থ ঐ জীবৎ-উপাদান মানবের কিছুই পরিজ্ঞাত থাকে না। উহা কেবল এইটুকু বুঝিতে পারে যে, ঐ স্থানে থাকা প্রযুক্ত উহার একটা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি ঘটে, আর সেই বৃত্তিটি যতই প্রখরা হয়, উহা ততই প্রীতি অনুভব করিতে থাকে। ঐ বৃত্তিটি তৎসংশ্লিষ্ট

৮

মানবের নিকটে সুখকর কি অপ্রীতিকর, তাহা উহা দেখিতে চাহে না। উহা মাত্র স্বকীয় পরিপুষ্টি লইয়াই ব্যস্ত থাকে। তাদৃশী পরিপুষ্টিতে যে উহার উন্নতি-পথে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, উহাতে উন্নতির পরিবর্ত্তে যে অবনতি হইতেছে, সে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। অতএব ঐ জীবৎ উপাদানকে কোনক্রমেই শত্রু বলিয়া ভয়ের চক্ষুতে দেখিবার আবশ্যক নাই। মানবের জীবাত্মা যেমন ভগবদংশ, উহাও তদ্রূপ সেই অংশবিশেষ। উহা-দের উন্নতির ক্রমে কেবল তারতম্য ঘটিয়াছে মাত্র।

অতএব আমাদের দৃষ্টিতে মনে হয় যে, ঐ জীবৎ-উপাদানের কার্য্য— "প্রলোভন।" আমরা বলিয়া থাকি যে, আমাদিগের বাসনা নিম্নদিকে প্রধাবিত হইয়া আমাদিগকে অশেষ যাতনা দিতেছে; কিন্তু যথার্থরূপে দেখিলে বুঝা যায় যে, ঐ বাসনাপুঞ্জ আদৌ আমাদিগের নহে। উহারা ঐ জীবৎ-সত্তারই সামগ্রী। আমাদিগের অভ্যন্তরে নিহিত ঐ সত্তার জন্য প্রকৃতপক্ষে আমরাই দায়ী। উহা আমাদিগেরই উপার্জ্জিত সম্পত্তি। উহা দ্বারা আমাদিগেরই প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বজন্মে যদি আমরা সংযত হইয়া বাসনা-পুঞ্জের পবিত্রতাসাধন করিতাম, তাহা হইলে এক্ষণে এই উচ্চতর ও পবিত্রতর জীবনযাপন করিবার চেষ্টার সময় আমাদিগের বাসনা-উপাদান ঘৃণিত ভোগাসক্তিব্যঞ্জক স্পন্দনের সহিত অশুভভাবে সংশ্লিষ্ট না হইয়া অধিকতর প্রীতিপ্রদ হইয়া দাঁড়াইত। ঐ অসৎ বাসনা-উপাদান আমরা নিজেরাই সৃজন করিয়াছি। তাই বলিয়াই যে আমাদিগকে উহার দাস হইয়া চলিতে হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। বরং আমাদিগকে উহা সংযত করিতে হইবে। আমাদিগকে অনুধাবন করিতে হইবে যে, উহা হইতে আমরা স্বতন্ত্র। উহার সম্বন্ধে আমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য কি?

বাসনা দমন করিবার উপায়

যখন কোন কু-বাসনার সহিত আমাদিগের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে, তখন সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে স্পষ্টতঃ অনুধাবন করিতে হইবে যে, আমরা ঐ ঘৃণি-

বাসনার অনুকূল নিম্নশ্রেণীর সামগ্রী নহি। কোন নিম্নতর পদার্থের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমরা কদাচ বলিব না যে, আমরা এইটি বা ঐটি চাই। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বলিতে হইবে—"আমি জীবাত্মা, যাহা আমার উন্নতির অনুকূল, উন্নততর সোপানে আরোহণ করিবার পক্ষে যাহা আমার ও অন্যের সহায়স্বরূপ, যাহাতে আমার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটাইবে, আমি তাহাই চাই। আমি কোন প্রকার নিম্নতর পদার্থের প্রয়াসী নহি।" যখন কোন বেগবান্ স্পন্দনে তাহার কাম-দেহ আলোড়িত হইবে, যখন ক্রোধের উন্মত্ত তরঙ্গে কিংবা ভোগাসক্তির বিপুল বেগে সে অস্থির হইয়া উঠিবে, তখন তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে—"আমি কদাচ ক্রোধের বশীভূত হইব না," কিংবা "আমি কদাচ কাহারও অপকার করিব না।" তাহাকে আরও ভাবিতে হইবে—"আমি প্রকৃতিস্থ থাকিব, এই সকল উৎপাতকে মনেও স্থান দিব না। এই যে বাসনা-উপাদান ক্রোধের সুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত আমাকে ক্রোধোন্মত্ত করিতে ব্যস্ত হইয়াছে, কিংবা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আমাকে তৎসংশ্লিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি বাসনা-উপাদানকে কখনই ঐরূপ প্রশ্রয় দিব না। আমি আত্মন্-পদার্থ। আমি আমার নিজের কর্ত্তব্যসাধন করিব। ঐ সকল ঘৃণিত, ভয়াবহ কার্য্য আমার দ্বারা হইতেই পারে না। আমি যখন আত্মন্, তখন ঐরূপ কার্য্য আমার লক্ষ্য ও চেষ্টার বিষয়ীভূত হইবে কেন? হইতেই পারে না। যে জীবৎ-পদার্থ বাসনা-উপাদান হইয়া আমায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহা অতীব নিকৃষ্ট—এত নিকৃষ্ট যে, খনিজ দেহ পর্য্যন্ত ধারণ করিবার সুযোগও পায় নাই। উহা স্বার্থ-সাধন নিমিত্ত আমাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। উহার ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইয়া আমি স্বীয় মানসম্ভ্রম নষ্ট করিব কেন?"

এক্ষণে প্রকৃত কথা এই যে, বাসনাপীড়িত ব্যক্তিকে অনুধাবন করিতে হইবে যে, সে উচ্চতর শক্তি, নিরন্তর কল্যাণ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, মঙ্গললাভার্থই সংগ্রাম করিতেছে; আর এই বাসনা-পুঞ্জ

নিম্নতর শক্তি, সে ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপ স্বতন্ত্র, এই নিম্নতর শক্তি উহার একটা নিম্নতর কোষের অসংযত ক্ষুদ্রাংশমাত্র। উহাকে সংযত করা, সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা ও উহাকে সুশৃঙ্খল করিয়া তোলা তাহার শিখিবার প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া সে যেন মনে না করে যে, ঐ বাসনা-উপাদান অসদ্‌বস্তু। উহাও দিব্য শক্তির নিষেচন। উহাও একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে শৃঙ্খলার সহিত ছুটিতেছে। তবে এ ক্ষেত্রে উহার গতি নিম্নাভিমুখে—জড়ের দিকে। আমাদিগের ন্যায় উহার গতি ঊর্দ্ধদিকে নহে। সে দিক্ হইতে দূরে।

অপন্যস্ত মমতা

যাঁহারা পরাবিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এতই কোমল-হৃদয়, নিঃস্বার্থ ভাবটিকে তাঁহারা এতই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন যে, তাঁহাদের মতে পূর্ব্বকথিত বাসনা-উপাদানের প্রতি আমাদের অনুকূল হওয়া ও ঐ উপাদানের আকাঙ্ক্ষা কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ হইতে দেওয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য। ঐ স্নেহশীল ব্যক্তিবর্গের এই সহানুভূতিসূচক নিঃস্বার্থ ভাবটি আদরণীয় হইলেও যুক্তিযুক্ত নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি আমাদিগের কামদেহে স্থূল-বৃত্তিকামী উপাদান নিহিত হইয়া পড়ে, তবে উহা বড়ই গর্হিত ব্যাপার বলিতে হইবে। যদি ঐ উপাদান আমাদের শরীরে সঞ্চিত না হইয়া একটি কুকুর বা তদপেক্ষাও কোন হীনতর প্রাণীর সূক্ষ্মদেহের অংশস্বরূপ হইত, তাহা হইলে উহার সমক্ষে স্থূল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ আরও প্রকৃষ্ট রূপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিত। অতএব এবম্প্রকার উপাদান বিদূরিত করিয়া তৎস্থানে যত সত্বর উচ্চতর উপাদানের সমাবেশ করা যায়, ততই আমাদের মঙ্গল।

ঐ প্রকার উপাদান সম্বন্ধে আমাদিগের একটা কর্ত্তব্য আছে। যে উচ্চতর উপাদান উপযুক্ত আশ্রয় ব্যতীত পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না,

তাহাকে তাদৃশ আশ্রয় সংগ্রহ করিয়া দেওয়াই আমাদের সেই কর্ত্তব্য। ঐ উপাদানের মধ্যে যেগুলি নিম্নশ্রেণীভুক্ত, অসভ্য মানুষ ও জীবজন্তুর দেহেই তাহাদের বিকাশসাধন ঘটিতে পারে। আমাদিগের স্বজাতির মধ্যে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, তাহারাই ঐ বিকাশসাধনের বিপুল ক্ষেত্র। তা ছাড়া সমগ্র প্রাণিরাজ্যেই ঐ নিম্ন শ্রেণীর উপাদান-ঘটিত পরিপুষ্টি সম্ভবপর। অতএব আমাদিগের উচ্চতর কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া অন্যের কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিপথগামী হইবার কোনই হেতু নাই। আমাদের অন্তর্নিহিত কু-বাসনাগুলি চরিতার্থ হইবার নিমিত্ত আমাদিগকে অনুক্ষণ প্রেরণা দিতে থাকে। আমরা যদি ঐ প্রেরণায় দৃক্‌পাত না করি, তাহা হইলে ঐ বাসনা-উপাদান ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া একটি স্বতন্ত্র জীবৎপদার্থ হইয়া উঠে। নিম্নশ্রেণীর কণাগুলি বহির্নিক্ষিপ্ত হওয়ায় উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর পরমাণুপুঞ্জ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লয়। যদি আমরা বাসনাগুলি সংযত করিতে ও অধ্যাত্ম-জীবন-যাপনে সমর্থ হই, তাহা হইলে যেরূপ বাসনা-উপাদান লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা অনেক উচ্চ ধরণের উপাদানে মণ্ডিত হইয়া আমরা জীবনের পরিসমাপ্তি করিতে পারি।

পুনর্গঠন

মৃত্যু হওয়ায় যখন মানুষের স্থূলশরীর পরিত্যক্ত হয়, তখন তাহার অন্যান্য কোষেরও পরমাণু-বিন্যাস পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার কাম-দেহের বিশ্লেষণ পূর্ব্ব হইতেই হইতে থাকে। ঐ দেহস্থ বাসনা-উপাদান ঐ বিশ্লেষণব্যাপার স্বভাবতঃই বুঝিতে পারে। তাই বুঝিবা-মাত্র ত্রস্ত হইয়া পড়ে। তখন উহার মনে হয়, "আমি সুবিরাট উপাদান-সমুদ্র হইতে পৃথগ্‌ভাবে এই লিঙ্গ-দেহে বাস করা প্রযুক্ত পরিপুষ্টি লাভ করিবার একটি অসাধারণ সুযোগ ভোগ করিয়া আসিতেছিলাম ; এখন বুঝি সেই সুযোগ বিনষ্ট হইতে চলিল। কেন না, আমার আবাস ভগ্ন

হইতে আরম্ভ হইয়াছে।” এই ভাবিয়া উহার ভয় হইতে থাকে। তাই, সে কালবিলম্ব না করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। এই আত্ম-রক্ষার উপায়টি সুবুদ্ধিচালিত। কেন না, তখন সে কামদেহের পরমাণুপুঞ্জ পুনরায় এরূপভাবে বিন্যস্ত করে যে, ঐ নবীন বিন্যাস বহুদিন যাবৎ বিশ্লেষণ-ব্যাপারে বাধা দিতে সমর্থ হয়। পরিশেষে যখন ঐ কাম দেহ চূর্ণ হইয়া যায়, তখন এই উপাদানের আর পূর্ব্ববৎ স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তাই বলিতেছি, ঐ বাসনা-উপাদান স্বকীয় জীবনের নিমিত্তই যেন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

কাম-দেহের এই নবীন গঠন প্রযুক্ত মানুষ বাসনা-উপাদানের আরও আয়ত্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ উপাদানের সেটুকু জানিতে পারে না। উহা কাম-দেহের অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত অংশের জড়পরমাণুগুলিকে কতক-গুলি এক-কেন্দ্রিক কোষে সজ্জিত করে। সজ্জিত করিবার সময় যে পরমাণুগুলি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, সেইগুলিকে বহির্ভাগে রাখে। সেইগুলিকেই ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে হয়। স্থূল-শরীরের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া যে সকল জড় পরমাণু পূর্ব্বে ভাস্বর পরিবেশজাল গঠন করিয়া-ছিল, উহা সেগুলিকে সচরাচর গ্রহণ করে না। উহার বেশ ভালরূপ জানা আছে যে, ঐগুলিকে উপেক্ষা করিলেও চলিতে পারে, কোনরূপ ক্ষতি হয় না। তার পরে আরও ঘনীভূত অপ্-তত্ত্বের বিপুল রাশির মধ্যে আবৃত হইয়া সে আপনাকে নিরাপদ করিয়া তুলে। এই রাশীকৃত অপ্‌তত্ত্ব পূর্ব্বে স্থূল-দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। এই পুনর্গঠন ব্যাপারের ফল বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা দ্বারা জীবাত্মার শান্তি ও অগ্রগতিতে বাধা জন্মে। কেন না, উহা এখন দ্রুতগতিতে বহিরাসক্তি ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হইতে চেষ্টা পায়। তাই বলিতেছি, উহার পক্ষে ভুবর্লোকে দীর্ঘ অবস্থান অবাঞ্ছনীয়। ইহাই যে একমাত্র অসুবিধা, তাহাও নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঐ নবগঠিত কাম-দেহের উপরিভাগটায় স্থূল পরমাণুর আবরণ থাকে, উহা দ্বারাই বাহিরের প্রতিস্পন্দ বা বোধ গৃহীত

হয়। মানুষের দেহাভ্যন্তরে নানাধরণের জড় পরমাণু বিদ্যমান থাকে। ঐ সকল বিভিন্ন পরমাণু স্ব স্ব প্রকৃতির অনুকূল স্পন্দনেই সাড়া দেয়। এখন দেখা যাইতেছে, নবগঠিত কাম-দেহের স্থূল পরমাণুপুঞ্জেই বহির্জগতের সাড়া জাগিয়া উঠে। ঐ স্থূল পরমাণু ভূ-লোকসুলভ পরমাণুর অনুরূপ। সুতরাং এই ভুবর্লোকবিহারী নবগঠিত প্রেতদেহ স্থূল-জগতের প্রকৃতিসংশ্লিষ্ট ; আর যত দিন উহার এই স্থূল ভৌতিক ভাব বিদ্যমান থাকে, তত দিন ভুবর্লোকের উচ্চতর ও অধিকতর সুন্দর দৃশ্য উহার জ্ঞান-গোচর হয় না। এই দৃশ্য থাকা না থাকা উহার পক্ষে দুই-ই সমান। কোন একটি স্তরে আবদ্ধ থাকার ইহাই অর্থ। আবদ্ধ থাকা বলিতে বুঝিতে হইবে না যে, তাহার বোধ-শক্তি মাত্র এক শ্রেণীর জড়াংশের ভিতরেই স্ফুরিত হইতেছে। আর তদ্ধেতু তদীয় প্রবাস-ভূমির একটা অতীব আংশিক দৃশ্য তাহার চক্ষুতে পড়িতেছে। ঐ স্তরের অভ্যন্তরে যে সমুদয় অত্যুৎকৃষ্ট, অত্যুজ্জ্বল ও অতীব মনোরম বস্তু বিদ্যমান আছে, সেগুলি তাহার দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত। তত্রত্য উচ্চতর প্রভাবনিচয় কামদেহের নবগঠিত ঐ স্থূল জড়াবরণ ভেদ করিতে পারে না। এই কারণে দেহধারী জীবাত্মাকে পৃথিবীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পৃক্ত থাকিতে হয়। আর এই হেতুই উহার যে সকল আত্মীয়স্বজন সূক্ষ্ম-জগতের উচ্চতর স্তরে ইতঃপূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছেন, সে তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না।

পুনর্গঠনের কু-ফল

বাস্তবিকপক্ষে লিঙ্গ-দেহের ঐরূপ নবগঠন-প্রযুক্ত প্রেতাত্মা মৃত আত্মীয়কে যথার্থরূপে দেখিতে পায় না। তবে যদি ঐ আত্মীয় উহার সঙ্গে একই সময়ে পার্থিব দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে দেখিবার বাধা জন্মে না। মনে কর, এক ব্যক্তির আত্মীয় ১২ বা ১৫ বৎসর হইল মরিয়া গিয়াছেন, আর এখন ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইল। মরণের পর ঐ ব্যক্তি সেই মৃত আত্মীয়কে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। দেখা পাইবে কি? সম্ভবতঃ সেই

আত্মীয় এখন উচ্চতর স্তরে যাইয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান-চৈত
এখন সেখানেই নিবদ্ধ। সেই আত্মীয়ের সূক্ষ্ম-দেহের যে অংশটার পরমা
এই ব্যক্তির বাস-স্তরের পরমাণুর সদৃশ, মাত্র সেই অংশটাই ইহার দৃষ্টিপ
পড়িবে। ইহার মনে হইবে, যেন ঐ আত্মীয় ইহাকে ভাল করিয়া চিনি
পারিতেছেন না। ঐ আত্মীয়কে যেন স্বপ্নময়, বিভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইবে
এই ব্যক্তি দেখিবে যে, ঐ আত্মীয় নিরন্তরই নিম্নতর স্তরগুলি হইতে চি
আকর্ষণ করিয়া লইয়া উচ্চতর পদার্থে উহা নিবিষ্ট করিতেছেন; কার
উহাতেই তাঁহার স্বার্থ প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীভূত।

জীবাত্মা নিম্নতর স্তর হইতে ক্রমান্বয়ে অপসৃত হইয়া উচ্চতর স্ত
যাইয়া উপনীত হয়। তখন তথায় তাহার চৈতন্য কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে
তখন সেখানেই সে কর্ম্মঠ স্বতন্ত্র জীবৎপদার্থরূপে বিরাজ করে। নির্দি
নিয়মানুসারে তাহাকে নিম্নতর স্তরেও দেখা যায়; কিন্তু তখন তাহাকে
সংজ্ঞাশূন্য কোষমাত্র বলিয়া মনে হয়। উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইয়া গেলে
তাহার সূক্ষ্ম-দেহে নিম্নস্তরসুলভ জড়াংশ তখনও কিয়ৎপরিমাণে থা
প্রযুক্ত তাহাকে নিম্নতর স্তরে আনিয়া ফেলা যায়; কিন্তু সে অল্পসময়ে
জন্য। নিম্নস্তরের জড়াংশ যথেষ্টরূপে তীব্র উত্তেজনায় উত্তেজিত হইলে
তাহাকে নিম্নে আসিয়া দেখা দিতে হয়। পৃথিবীস্থ আত্মীয়-স্বজনের সম
শোকোচ্ছ্বাসের ফলে অনেক সময় মৃত ব্যক্তির অবস্থা ঐরূপ ঘটে
"মিডিয়ম্" অর্থাৎ কোন বাহনের দ্বারা কোন মৃত ব্যক্তির সহিত কথাবা
বলিবার চেষ্টা করিলেও ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। উচ্চস্তরা
জীবাত্মাকে স্নেহের টানে নিম্নস্তরে আনিয়া ফেলা যায় বটে, কিন্তু নিম্নস্ত
তাহার চৈতন্য খুব অল্পসময়ের জন্য থাকে মাত্র। সেখানে অধিক
তাহাকে রাখা যায় না, তাই বলিতেছিলাম, সেই বহুদিনের
আত্মীয় এখন রাশি রাশি চিন্তামূর্ত্তির সম্মুখীন, তাহাদিগকে লইয়াই
এখন বিব্রত। আর উহার যে স্বজনটি এখন মরিল, এ ব্যক্তি ভুবনে
ভূ-লোকের পদার্থ-নিচয়ের প্রতিরূপই দেখিতে পায়। উহা লইয়াই

ব্যক্তি ঘোর ব্যস্ত। এখন দুজনই সূক্ষ্মজগদ্বাসী বটে, কিন্তু উহাদের অবস্থা স্বতন্ত্র প্রকার। উহাদের এক জন অপরকে অস্পষ্ট, অবাস্তব বলিয়া মনে করে; এক জন অপরকে ছায়া-জগদ্বাসী বলিয়া ভাবিতে থাকে। সেই আত্মীয়টির নিকটে চতুষ্পার্শ্বস্থ চিন্তা-মূর্ত্তিনিচয়ে সজীব ও সুস্পষ্ট বাস্তব-সত্তা বলিয়া মনে হয়। এই নূতন মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহে উচ্চতর স্তরের জড়াংশও বিদ্যমান থাকে বলিয়া ঐ সূক্ষ্মদেহ সেই আত্মীয়ের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার চৈতন্য অন্যত্র সংরুদ্ধ থাকা-প্রযুক্ত ঐ সূক্ষ্ম-দেহটি তাঁহার নিকটে সংজ্ঞাশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যদি গভীর ও প্রকৃত ভালবাসা থাকে, তবে সম্ভবতঃ ইঁহাদের উভয়েই বাসনা-উপাদান সংযত করিয়া কিছু সময়ের জন্য পরস্পরকে পরিষ্কাররূপে দেখিতে পারে। কিন্তু এককেন্দ্রিক কোষের বিন্যাস-প্রভাবে শীঘ্রই ব্যাপার অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তখন এক জন অপরকে ছায়াময় বলিয়া মনে করে।

বাসনা-উপাদানের প্রত্যাখ্যানে সুবিধা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মৃত্যুর পর বাসনা-উপাদান নূতন করিয়া অপ্-তত্ত্বের বিন্যাস-সাধন দ্বারা কামদেহ রচনা করিয়া লয়। রচনা করিবার সময় সমুদয় জড়াংশকে সমকেন্দ্রিক করিয়া সজ্জিত করে। যে ব্যক্তি এই নবীন দেহ-রচনায় অস্বীকৃত হয়েন, তিনি পূর্ব্বকথিত অসুবিধা ও বিপ্রলম্ভের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন। ঐ ব্যক্তির মৃত আত্মীয় সূক্ষ্ম-জগতের যে স্তরেই স্থির থাকুন না কেন, ইনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও মুক্তকণ্ঠে কথোপকথন করিতে সমর্থ হয়েন। অনেক সময়ে এতদপেক্ষাও বেশী সুবিধা হইয়া উঠে; কেন না, নিজে বাসনা-উপাদানের দাসত্ব হইতে পরিমুক্ত থাকায় ইনি ঐ আত্মীয়কেও মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন। এতদুপায়ে ইঁহারা উভয়েই সূক্ষ্ম-জগতে আপন আপন জীবনকে খুব বেশী সুখী ও অধিকতর প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে সমর্থ হন।

বাসনা-উপাদানের হাত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা প্রথমে না করিলে এক্ষণে উহাদের জীবনের এইরূপ সুখ ও সফলতা সম্ভবপর হইত না।

সাধারণ শ্রেণীর মানব এই সকল তথ্য কিছুমাত্র অবগত না থাকায় বাসনা-উপাদানের এই নবীন পরমাণু-বিন্যাসে আপত্তি করে না। তাহারা মনে করে, এই নবীন দেহ তদানীন্তন অভিনব ও অদ্ভুত অবস্থার অঙ্গস্বরূপ। মরণের পর সাধারণ মানুষ এই নবীন দেহের দেহী হইয়া মনে করে যে, সে মৃত্যুর পরপারস্থ জগতের সমগ্র ভাগটাই দেখিতেছে ; কিন্তু বস্তুতঃ সূক্ষ্ম জগতের অন্তর্গত মাত্র একটি ক্ষুদ্র স্তরের অতীব আংশিক দৃশ্য তাহার চক্ষুর্গোচর হইয়া থাকে। যাঁহারা এই নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত ব্যাপার অবগত আছেন। জীবিতকালে তাঁহারা যেমন বাসনার আয়ত্ত হইতে চাহেন না, মরণের পরও তদ্রূপ বাসনা-উপাদানের শাসন স্বীকার করিয়া লইবার কোনই কারণ দেখেন না। এরূপ নিগূঢ়তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ঐ উপাদান-কৃত দৃঢ়ীভূত কাম-দেহ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন। এবম্প্রকার দেহ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে মাত্র এক ক্ষুদ্র স্তরে আবদ্ধ থাকিতে হয়। তিনি ভুবর্লোকের উচ্চতর স্তরের সহিত মিশিবার সুযোগ অব্যাহত রাখিতে সতত সচেষ্ট। মরণের পূর্ব্বে মানুষ স্বপ্নাবস্থায় ভুবর্লোকে বিচরণ করিয়া থাকে। উহার অবস্থাও কার্য্যতঃ সেইরূপ হইয়া দাঁড়ায়। নিম্ন শ্রেণীর বাসনা-পুঞ্জের ক্রীতদাস হইয়া পড়িলে তাঁহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িত। এখন তিনি বাসনার অনধীন হওয়ায় খুব স্বাধীনভাবে বিচরণ ও আপনাকে পরোপকারে অধিকতর ব্রতী করিতে সমর্থ হয়েন।

মরণের পর বাসনা-উপাদানের নবীন দেহ-রচনায় বাধা প্রদানের ও প্রেত-দেহটিকে পূর্ব্ব অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা অবিকল পার্থিব জীবনের বল-বতী বাসনা দমন করিবার চেষ্টার অনুরূপ। ঈদৃশী চেষ্টার সময় ঐ জড় ধরণের অর্দ্ধ-চেতন বাসনা-উপাদান ভীত হইয়া পড়ে। তখন উহা নিজের ভয়টা ঐ চেষ্টাশীল ব্যক্তির অন্তরে প্রবিষ্ট করিবার প্রয়াস পায়।

একটা অব্যক্ত বিপদের প্রবল অনুভব অজ্ঞাতসারে তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসে। সর্ব্বদা যেন এই অনুভূতি তাহার প্রাণে জাগিতে থাকে। তাহার মনে হইতে থাকে যে, বাসনানুরূপ নবীন দেহ গঠিত হইলেই আর কোন বিপদ ঘটিবে না। যদি ঐ ব্যক্তি এই অমূলক ভয়ের অনুভূতিটিকে ধীরতার সহিত বাধা দিতে পারে, যদি স্থিরভাবে নিজের মনে এই বিশ্বাস জাগাইতে পারে যে, ভয়ের কোনই কারণ নাই, তাহা হইলে কপালক্রমে ঐ উপাদান-ঘটিত বাধার বেগ প্রশমিত হইয়া যাইবে। পার্থিব জীবনেও ঐ ব্যক্তিকে অনেক সময় ঐরূপভাবে বাসনা-বেগ দমন করিতে হইয়াছিল। এইরূপ করিতে পারিলে ঐ ব্যক্তি ভুবর্লোকে সজীব শক্তি হইয়া উঠিবে। তখন সে অপরের উপকারসাধন করিতে সমর্থ হইবে। নিদ্রা-কালে স্বপ্নাবস্থায় আমরা ভুবর্লোকে যাইয়া কত লোকের ঐরূপ উপকার করিয়া থাকি। অতএব মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থানিচয় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে যে প্রভূত সুবিধা আছে, তাহা আমরা আর একটিবার বুঝিতে পারিলাম।

একাদশ অধ্যায়

নূতন মাপের কথা

শ্রীযুক্ত লেডবিটার সাহেবের 'Other side of Death' গ্রন্থ অবল পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করিয়াছি। আজ একটি ন বিষয়ের আলোচনা করিব। সকলেই লম্বা, চৌড়া ও পুরু—এই তি মাপ বা Dimensionএর কথা জানি। পরলোকতত্ত্বের অনুস দেখা যায় যে, এই তিন মাপ ছাড়া একটা চতুর্থ মাপ বা Fo Dimension আছে। আমরা অদ্য সেই বিষয়ের আলোচনা করিব।

আমরা স্থূল-জগতে জীবিত আছি। মরণের পর আমাদের দেহটা আ স্বজনে পুড়াইয়া ফেলিবে বা সমাধিস্থ করিবে। তখন আমাদের আ সূক্ষ্মজগতে যাইয়া উঠিবে। সেই সূক্ষ্ম-জগৎ স্থানটা কিরূপ, তাহা বুঝিয় বড় সহজ নহে। স্থূল-জগতে বসিয়া সূক্ষ্ম-জগৎটাকে বুঝিয়া লওয়া খুবই কথা। অথচ আমরা এখন সেই চেষ্টাই করিতেছি। মরণের আমরা ভুবর্লোকে যাইব, তার পর স্বর্লোকে যাইব, আর পর জন তার পর মহর্লোকে, তার পর তপোলোকে, তার পর সত্যলোকে উঠিব। সচরাচর আমরা স্বর্লোক পর্য্যন্তই যাই, তার পর আসিয়া এই পৃথিবীতে জন্মাই।

এই পৃথিবী আর স্বর্লোক—ইহার মধ্যেই আমাদিগকে অনেক এমন কি, কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; মুনি, ঋষি প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তপঃ, সত্য প্রভৃতি যাইতে পারেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সূক্ষ্ম-জগৎ একটা স্থান নহে। সূক্ষ্ম-জগতের নীচের ধাপ হইল ভুবর্লোক। স্থানটিতেই আমরা মরিতে মরিতে যাইয়া উঠি। এ স্থানটি পৃথিবী অনেক সূক্ষ্ম, আবার ইহার অপেক্ষাও সূক্ষ্ম—স্বর্লোক। আবার

অপেক্ষাও সূক্ষ্ম জনলোক। এইরূপ ক্রমেই সূক্ষ্ম হইতে হইতে গিয়াছে। পৃথিবীতে আমাদের যতটুকু বুঝিবার, দেখিবার ও জানিবার শক্তি আছে, ভুবর্লোকে গেলে তার চেয়ে আমাদের শক্তি আরও বাড়িয়া যায়। এখানে যাহা দেখিতে পাই না, সেখানে গেলে তাহা দেখি ; এখানে যাহা শুনিতে পাই না, সেখানে গেলে তাহা শুনি। আবার স্বর্লোকে গেলে আমাদের জানিবার শুনিবার শক্তি আরও অনেক বাড়িয়া যায়। ভুবর্লোকেও যাহা দেখিতে পাই নাই, স্বর্লোকে গেলে তাহা দেখি ; ভুবর্লোকেও যাহা শুনিতে পাই নাই, জানিতে পারি নাই, স্বর্লোকে তাহা শুনি ও জানি। এইরূপে সূক্ষ্ম-জগতের উপরদিকে আমরা যতই অগ্রসর হই, আমাদের দেখিবার, শুনিবার, জানিবার শক্তি ততই বাড়িতে থাকে। আমরা যতই স্থূল-জগতের দিকে আসি, আমাদের জ্ঞানও ততই কমিতে কমিতে আইসে। এইটুকুই মজার কথা। পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা যাহা দেখি, মনে করি, বুঝি সবই দেখিয়া ফেলিলাম, দেখিবার বুঝি আর কিছুই নাই। কিন্তু ভুবর্লোকে যখন আরও বেশী দেখিতে পাই, তখন মনে করি—তাই ত, পৃথিবীতে দেখিবার শক্তি কতই কম ছিল! আবার স্বর্লোকে যাইয়া মনে করি—তাই ত, ভুবর্লোকে কতই কম দেখিয়াছি! ইহা হইতে আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি যে, জ্ঞানের সীমা নাই ; জানিবার, শুনিবার, বুঝিবার, দেখিবার বিষয়ের অন্ত নাই। কেবল আমাদের জ্ঞান অল্প বলিয়া অল্প দেখি শুনি। জ্ঞান যত বাড়ে, ততই বেশী দেখি শুনি। এই স্থূল-জগতে আমাদের দেখিবার শক্তি খুব কম। আমরা লম্বা বলিলে বুঝি, চৌড়া বলিলে বুঝি, পুরু বলিলেও বুঝি। এই তিন রকম মাপ বেশ বুঝিতে পারি। ভগবান্ আমাদের চোখও ঐ রকমভাবে গড়িয়া দিয়াছেন। তাই আমরা সব জিনিসেরই ঐ তিন রকম মাপ দেখিতে পাই ; কিন্তু ঐ তিন রকম ছাড়া আরও কোটি কোটি রকমের মাপ হয় ত আছে, অন্ধের মত আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না। মরিয়া গেলে যখন ভুবর্লোকে যাইয়া উঠিব, তখন হয় ত আরও দুই একটি নূতন মাপের কথা জানিতে

পারিব ; আবার যখন স্বর্লোকে যাইয়া উঠিব, তখন হয় ত আবার অ
নূতন নূতন মাপের কথা জানিতে পারিব। তখন কি স্ফূর্ত্তিই হই
তাই বলিতেছি, এই পৃথিবীতে আমরা মাত্র তিনটি মাপের কথা জা
যে কাজেরই চেষ্টা করা যাক্, একটা ফল নিশ্চয়ই ফলে। তাই অনেকে
চেষ্টা করিয়া, না মরিতে মরিতেই আর একটা মাপের কথা জানি
পারিয়াছেন। সেইটির বিষয় আমরা ক্রমে আলোচনা করিব। সেইটি জানি
এক জনকে ঘরে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিলেও সে বাহিরে আসিয়া প
পারে। বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! অনেক সিদ্ধ পুরুষকে ঐরূপ করিতে
গিয়াছে। ঐ অদ্ভুত মাপটার নাম আমরা চতুর্থ মাপ রাখিলাম। তাই ব
তেছি, ইচ্ছা করিলে জ্ঞানটাকে বাড়াইয়া তুলা যায়। এ পৃথিবীতে আম
সকল শক্তিই কম ; বুঝিবার শক্তিও খুব কম। আমরা কথায় কথায়
করিয়া বসি। এক জন একটা কথা হয় ত ঠিকই বলিল, অ
সেটিকে ভুল বুঝিয়া বসিলাম। সিদ্ধ পুরুষেরা হয় ত ভুবর্লোকের ক
আমাদের কাছে ঠিক্ ঠিক্ই বলিলেন, আমাদের বুঝিবার শক্তি কম ব
আমরা বুঝিলাম বা বুঝিলামই না। সূক্ষ্ম-জগৎ ত পরের কথা, এই জগ
কথাই আমরা অনেক সময় বুঝিতে পারি না। মনে কর, একটি স্থা
আলোক-চিত্র তোলা হইল ; আমরা দেখিয়া এক গাল হাসি হা
বলিলাম—বাঃ, বেশ উঠিয়াছে! কিন্তু যে সূক্ষ্মদর্শী, সে হয় তো
মধ্যে কত ভুল—কত অসঙ্গতি দেখিয়া বসিবে। তবে আমার দে
দেখা হইল কৈ ? তাই বলিতেছি, আমাদের পদে পদেই ভুল। অ
দের দেখা দেখা নহে ; আমাদের শুনা শুনা নহে ; আমাদের জানা জা
নহে। দেখিবার, শুনিবার, জানিবার শেষ নাই, অন্ত নাই, অবধি নাই

সূক্ষ্ম-জগৎটাকে বুঝিয়া লইবার একটা ভাল উপা

আমাদের মধ্যে অনেকের জ্ঞান-চক্ষুটা বেশ খুলিয়া যায়। ভুবর্লোকের
স্বর্লোকের কথা এখানে বসিয়াই জানিতে পারেন, মরা মানুষের

দেখিতে পান, আরও কত কি দেখিতে ও জানিতে পারেন। কিন্তু যাহাদের ঐ রকম জ্ঞান-চক্ষুটা খোলে নাই, তাহারা যদি ইচ্ছা করে, আমরা সূক্ষ্ম-জগৎটাকে দেখিব, তবে তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থা কি? তাহাদের জন্য একটি সুন্দর উপায় আছে। আগে একটা চতুর্থ মাপের কথা বলিয়াছি। প্রথমে সেইটির আলোচনা করিতে হইবে। লম্বা, চৌড়া, পুরু ছাড়া আরও একটা মাপ ভাবিয়া ভাবিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ চেষ্টা করিলে কালক্রমে বুদ্ধিটা আস্তে আস্তে খুলিয়া যাইবে। তখন ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম-জগতের অনেক ব্যাপার চক্ষুতে পড়িবে। এইটিই হইতেছে সেই উপায়। ভাবিয়া ভাবিয়া ঐ মাপটি বাহির করিতে হইবে। বড় সহজ কথা নহে। এখন যেমন ভাবি, এ রকম ভাবনা ভাবিলে হইবে না। ভাবনার রকমারি করিতে হইবে—ভাবনার ভঙ্গী বদলাইতে হইবে। তাহা হইলে আস্তে আস্তে মস্তিষ্কটাও আর এক রকম হইয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, গড়িয়া উঠিবে। আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ভগবান্ অনন্ত শক্তি পূরিয়া দিয়াছেন। সেই শক্তিগুলা যেন ঘুমাইয়া অসাড় হইয়া রহিয়াছে। ঐ নূতন মাপটা ভাবিয়া ভাবিয়া বাহির করিতে গেলে আমাদের অনবরত তীব্র চেষ্টার ফলে সেই ঘুমানো অসাড় শক্তিগুলা জাগিয়া উঠিবে। নূতন শক্তি যেমন জাগিবে, অমনই ভুবর্লোকের সূক্ষ্ম বিষয় অনেকটা আমাদের চক্ষুতে পড়িবে। মূল কথা, শক্তিগুলাকে জাগান চাই। কিন্তু এই রকম চেষ্টা করিয়া মাপটাকে বাহির করা বা চেষ্টা করিয়া ঘুমানো শক্তিগুলাকে জাগিয়ে তোলা সাধারণ মানুষের পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। কেহ বা সহজেই জাগাইতে পারে, আবার কাহার কাহার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। কেহ বলে, ঘুমানো শক্তিগুলাকে জাগিয়ে তোলা খুবই সহজ; কেহ বলে, বড়ই কঠিন, অসম্ভব বলিলেও হয়।

লম্বা, চৌড়া, পুরু ছাড়া আর একটা মাপ ভাবিয়া ভাবিয়া বাহির করিবার কথা বলিতেছিলাম। কি রকম ভাবনা ভাবিয়া সেইটি বাহির

করিতে হইবে ? অনেক রকমে সে ভাবনাটা ভাবা যায়। হিণ্টন্ সাহেব এইরূপ ভাবনার প্রণালীগুলা খুব ভাল করিয়া একখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন। পুস্তকখানির নাম—"আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলী।" বইখানি পড়িয়া লেড বিটার্ সাহেবের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি পড়িয়া এইরূপ বলিয়াছেন—"হিণ্টনের পুস্তকখানি আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে; যাহারা পড়িবে, তাহাদের সকলেরই ভাল লাগিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। বহিখানিতে হিণ্টন্ উপরি-উক্ত চতুর্থ মাপের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া এরূপ একটা মাপ বাহির করা একান্ত অসম্ভব নহে।" এই মাপটি বুঝিতে পারিলে তাহার সাহায্যে সূক্ষ্ম জগতের অনেক বিষয় বুঝিবার উপায় হইয়া আইসে। হিণ্টন্ অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতি করিতে গিয়াই ঐরূপ ধারণার চেষ্টা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ হিণ্টন্ সূক্ষ্ম-জগতের বড় একটা ধার ধারিতেন না। ধারিতেন কি না, তাহাও আমরা ঠিক জানি না। যাহা হউক, তাঁহার এই নূতন মাপের আবিষ্কারে পারলৌকিক ব্যাপার বুঝিবার পথ সহজ হইয়া উঠিয়াছে। হিণ্টন্ বলেন—"মানুষ বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে ভাবিলে এই চতুর্থ মাপ অবগত হইতে পারে; মানুষের চিন্তা ইহার অপেক্ষা স্থূল-জগতে থাকিয়া আর উঠিতে পারে না। এইটিই মনুষ্য-চিন্তার চরম উন্নতি।" তিনি আরও বলেন—চতুর্থ মাপ ব্যাপারটা কল্পনা নহে; বাস্তবিকই এটা সত্য ব্যাপার। জীবিত মানুষের মধ্যে অনেকে ইহা অবগতও হইয়াছেন। চতুর্থ মাপ কেন ? অনন্ত কোটি মাপ এই পৃথিবীতেই আছে। আমরা শুধু তিনটি মাপ সহজে বুঝিতে পারি, তাই ভাবি, বুঝি এই তিনটিই আছে, আর নাই। ভুবর্লোক অন্য স্থানে নাই ; এই পৃথিবীর মধ্যেই এই স্থূল-জগতের ভিতরেই মিশানো আছে। শুধু ভুবর্লোকই বা কেন, স্বর্লোক, জনলোক প্রভৃতি সমস্ত সূক্ষ্ম-জগতের মধ্যে মিশানো রহিয়াছে। তাই বলিতেছি, চতুর্থ মাপটা বুঝিয়া লইতে পারিলে স্থূল-জগতে থাকিয়া আমরা সূক্ষ্ম-জগতের কতকটা ভাব বুঝিতে পারি। চেষ্টা করি

সকলেই যে ভাবিয়া চিন্তিয়া এই নূতন মাপটি বাহির করিতে পারিবেন, আমরা তাহা বলিতেছি না। ঐ জিনিসটা বুঝিয়া উঠা সকলের কাছে সহজ নহে, কিন্তু এ কথাটা খুব ঠিক যে, যাঁহারা এইটি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই একটা নূতন শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতএব এ কথা বলা যাইতে পারে, যাঁহারা এই নূতন মাপটি ভাবিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন, কোন কিছু বুঝিয়া উঠার পক্ষে অন্য লোক অপেক্ষা তাঁহাদেরই বেশী সহায়তা হইবে। তাঁহাদের বুদ্ধি-শক্তি অন্যের অপেক্ষা একটু ভাল হইবেই।

আমরা স্থূল-জগতের মানুষ—আমাদের জ্ঞান খুবই কম। আমরা অতি ক্ষুদ্র। কোন কিছুর ধারণা করিতে গেলেই আমাদের চিন্তা বেশী দূর যায় না। আমাদের চিন্তাশক্তি যে খুবই অল্প, তাহা আমরা পদে পদে বুঝিতে পারি। মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের বুদ্ধি ক্ষুদ্র নহে, অল্পও নহে। কেবল জড়জগতে স্থূলদেহে আবদ্ধ হইলেই মানুষের ঐ সকল গুণ কমিয়া আইসে। এই তথ্যটুকু ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ব্ব অঞ্চলের ভাল ভাল লেখকেরা খুব সুন্দররূপেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, মানুষের জ্ঞান ও চৈতন্য অনন্ত ; দেশ ও কাল এই দুইটিই জ্ঞানকে ছোট করিয়া রাখে মাত্র ; বস্তুতঃ দেশ ও কাল কিছুই নহে ; জ্ঞান-চৈতন্য দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে ; উহা অনন্ত—অসীম। জ্ঞান-চৈতন্য অনন্ত—এ কথাটা বুঝিয়া উঠা বড় সহজ নহে। যাহারা শুধু এই স্থূল-জগৎটাই দেখে ও বুঝে, কখন সূক্ষ্ম-জগতের আস্বাদ পায় নাই, তাহারা "জ্ঞান অনন্ত" এ কথা কিছুই বুঝে না। যাঁহারা সাধনা দ্বারা বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিয়া সূক্ষ্ম-জগতের আভাস পাইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই ঐ কথাটা বুঝিতে পারেন। সূক্ষ্ম-জগতের একটু ধারণা হইলেই বুঝা যায় যে, দেশ ও কাল এই দুইটি কিছুই নহে। স্থান জিনিসটিকে বুঝিতে গেলেই আমরা উহার তিনটি মাপ দেখিতে পাই। দেখি, উহা লম্বা, চৌড়া ও পুরু। ঐ তিনটি দিক্‌ই আমাদের জ্ঞানে ফুটিয়া উঠে।

এই তিনটি মাপ ছাড়া আরও একটা বেশী মাপ উহার সঙ্গে যুক্ত করি[য়া] চিন্তা করিতে পারি না। কথাটা আর একটু সহজ করিয়া বুঝা যাক্। মনে কর, যদি কোন একটা দিক্ লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে কেহ যাইতে বলে, তাহা হইলে আমরা হয় লম্বা-লম্বি যাইব, নয় আড়াআড়ি যাইব, নয় উচ্চ-নীচ ধরিয়া চলিব। ইহা ছাড়া আর কোন দিক্ ধরি[য়া] আমরা যাইতে পারি না। একটা উদাহরণ দিই, তাহা হইলে কথা[টা] আরও সহজে বুঝা যাইবে। মনে কর, ঘরের মধ্যে মেঝের উপরে একটা জিনিস রহিয়াছে। ঐ জিনিসটি যদি আমরা অন্য স্থানে নড়া[ইয়া] রাখি, তাহা হইতে জিনিসটির সরান কাজে তিন রকম গতি হইবে। প্রত্যেক গতিটায় একটা সরল রেখা হইবে। আর প্রতি দুইটি সর[ল] রেখায় একটি করিয়া সমকোণ হইবে। মেঝের যেখানেই জিনিসটি থাকু[ক] না কেন, সেটির সঙ্গে মেঝের লম্বা-চৌড়ার একটা হিসাব থাকিবে। অ[র্থাৎ] সেই লম্বা-চৌড়ার রেখা দুটিও সমকোণে অবস্থান করিবে। আবার সে[ই] জিনিসটি তুলিয়া উঁচু করিতে গেলেই হাত থেকে মেঝে পর্য্যন্ত আর একটা যেন সরল রেখার সৃষ্টি হইবে। এ রেখাটিও আগেকার দুটি রেখা[র] প্রত্যেকটির সঙ্গে সমকোণে দাঁড়াইবে। তাই বলিতেছি, চলাফেরাই ক[র] আর জিনিসপত্রই নড়াও-চড়াও, সবই তিনটি দিকের মধ্যেই করিতে হইবে।

অঙ্কের হিসাবে আমরা এইটুকু বুঝিলাম যে, লম্বা, চৌড়া, পুরু— তিনটি দিক্ ধরিয়া তিনটি রেখা টানিলে তাহারা পরস্পর সমকো[ণে] দাঁড়ায়। এইটুকুই আমরা দেখি, আর এইটুকু বুঝি। পৃথিবী[তে] সাধারণতঃ আর কিছু বুঝা যায় না। আমরা ঐ তিন দিক্ ছাড়া অ[ন্য] এক দিক্ দিয়া এমন একটা রেখা টানিতে পারি না, যাহা ঐ তি[ন] রেখার সঙ্গে পরস্পর সমকোণ হইয়া থাকিবে। তিন দিক্ ছাড়া আর অ[ন্য] দিকের ধারণা আমাদের হয় না। আমরা ধারণা করিতে পারি[না] বলিয়াই কি তাহা নাই বুঝিতে হইবে? অবশ্যই আছে। আমরা ধা[রণা] করিতে পারি না, তাহাতে এইটুকু প্রমাণ হয় যে, সেই নূতন দিকে

বা মাপটার কল্পনা করিয়া উঠা আমাদের বুদ্ধির পক্ষে একরূপ অসম্ভব। তবে যদি নানারূপ তুলনা, নানারূপ কল্পনা, নানারূপ অনুমান লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করি, তবে ঐ নূতন দিক্ বা মাপের একটু আভাস আমরা পাইতে পারিব। আমাদের যতটা জ্ঞান আছে, হয় ত খুব ছোট ছোট পোকার ততটা জ্ঞান নাই। হয় ত কেন, মনে করিয়া লওয়া যাক্, তাদের জ্ঞান আমাদের মত নহে। লম্বা, চৌড়া, পুরু—এ তিনটা দিকের জ্ঞান আমাদের আছে; কিন্তু ঐ ছোট পোকার পুরু বলিয়া একটা জ্ঞান হয় ত নাই। উহারা হয় ত লম্বা ও চৌড়া এই দুইটি দিক্ই বুঝে। এখন ঐ পোকার তুলনা করিয়া যদি আমরা চতুর্থ মাপ কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করি, তবে সেই তুলনা দ্বারা আমাদের একটু ধারণা হইয়া আসিবে। আর ঐ রকম পোকামাকড় দিয়া বুঝিবার চেষ্টাই সব চেয়ে ভাল। উঁচু, নীচু, পুরু—একই মাপের নাম। এই মাপটি বুঝে না, এমন কোন ক্ষুদ্র কীট আছে কি না, আমরা জানি না। থাকাই সম্ভব। তর্কের খাতিরে বা আমাদের চতুর্থ মাপের ধারণাটা করিয়া লইবার নিমিত্ত ধরিয়া লওয়া যাউক যে, একটা ছোট পোকা শুধু লম্বা ও চৌড়াই বুঝে, উঁচু বলিয়া একটা ধারণা তার আদৌ নাই।

নূতন মাপের কথা

উঁচু বুঝে না, শুধু লম্বা-চৌড়া দিক্ বুঝে, এমন প্রাণীর আলোচনা

আমরা ধরিয়া লইলাম, এমন পোকা সত্যই পৃথিবীতে আছে। এখন একটা কল্পনা করিয়া লওয়া যাক্ যে, ঐ পোকাটা একখানি কাগজের উপর আছে। কাগজখানি মনে কর বেশ সমান—একটুও উঁচুনীচু নহে। ঐ কাগজখানিই উহার কাছে যেন খুব বড় একটা পৃথিবী! কাগজখানা যে সমতল, তাহাও ঐ পোকাটি বুঝিতে পারে না; কারণ, যাহা সমতল

নহে, তাহা উঁচুনীচু হইবে। কিন্তু উঁচুনীচু বলিতে যে দিক্‌টার কথা আসে, সে জ্ঞান উহার নাই, তাহা গোড়াতেই ধরিয়া লইয়াছি। পোকাটা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে ঐ কাগজখানির উপরেই থাকিবে। কাগজ খুঁড়িয়া নীচের দিকে যাওয়া বা কিছু বাহিয়া উপরের দিকে উঠা—এ স করিবে না; কেন না, সে দিক্‌টা সে জানে না। উঁচুনীচু দিকের জ্ঞান তার একটুও নাই। মনে কর, এই পোকাটার বিচারশক্তি আছে। পোকাটা লম্বা বলিলে বুঝে, চৌড়া বলিলেও বুঝে, কিন্তু উঁচুনীচু বলিলে বুঝে না। এখন এই বুদ্ধিমান্ পোকাটিকে যদি উঁচুনীচু দিক্‌টা ভাবি বাহির করিতে বলা হয়, তবে কি সে তাহা ভাবিয়া বাহির করিতে পারে? আমরা মানুষ, আমরা লম্বা, চৌড়া, পুরু—এই তিন মাপের জিনি দেখিতে পাইতেছি। পোকাটা লম্বা, চৌড়া এই দুই মাপ দেখিতেছে। এখন ঐ পোকাটার সম্মুখে যদি আমরা একটা তিন মাপের পদার্থ রাখি সেটা উহার চক্ষুতে কিরূপ বোধ হইবে, তাহাই আলোচনা করিয়া দে যাউক। তাহা হইলে পুরু কিংবা উঁচুনীচু দিকের কল্পনা করা উহা পক্ষে সহজ কি কঠিন, তাহা আমরা বুঝিয়া লইতে পারিব। আবা তাহা হইতে এটুকুও ধারণা করিতে পারিব যে, আমাদের সম্মুখে য কোন একটা চারি মাপের পদার্থ আনিয়া ফেলে, তবে সেইটা আমাদে চক্ষুতেই বা কিরূপ বোধ হওয়া সম্ভব। তিন মাপের পদার্থ পোকা কাছে যেমনটি বোধ হইবে, চারি মাপের পদার্থ আমাদের চক্ষুতে সে রূপই বোধ হইবে।

মনে কর, পোকাটি খুব ক্ষুদ্র; কাগজখানি উহার কাছে যেন ক্রোশের পথ—খুবই বড়। ধরিয়া লইতে হইবে, পোকাটা যেন এক পরমাণুর মত ছোট। এখন ঐ কাগজখানির উপরে যদি একটি রে টানি তবে পোকাটা ঐ রেখা ডিঙ্গাইয়া আসিতে পারিবে না। রেখাটি পেন্‌সিলের গুড়া প্রভৃতি থাকায় তাহার একটা পুরুত্ব আছে, সেটা ডিঙ্গান পোকার পক্ষে অসম্ভব। কেন না, পুরুত্ববোধ উহার আ

নাই। কাগজের উপর মনে কর, একটা আড়াআড়িভাবে রেখা টানিয়া দিলাম। এখন কাগজের দুইটি ভাগ হইল। পোকাটা এক ভাগ হইতে রেখাটাকে ডিঙ্গাইয়া আর ভাগে আসিতে পারিবে না। রেখাটা উহার কাছে একটা প্রাচীরের মত হইয়া থাকিবে। উঁচুনীচু জ্ঞান থাকিলে রেখাটাকে ডিঙ্গাইয়া আসিতে পারিত। সে জ্ঞান নাই বলিয়া ডিঙ্গাইবার কল্পনাও উহার মাথায় আসিবে না। ঐ রেখাটির কাছেই উহার জগৎ শেষ মনে করিবে। অথচ রেখার এ পিঠেও ঠিক ঐরূপ আর একটা জগৎ রহিয়াছে, তাহা সে ধারণাই করিতে পারিবে না। একই কাগজ, মাঝে কেবল একটি রেখা। তার দুইটি ভাগ এত কাছাকাছি, এত লাগালাগি, তবুও পোকাটা শুধু ঐ রেখাটার জন্য তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। যে ভাগটায় পোকাটি নাই, সেই ভাগে কোন কিছু ঘটিলে সে খুব কাছে থাকিয়াও তাহা জানিতে পারে না।

আমরা তিন মাপ দেখিতে পাই। আমরা উপর হইতে পোকাটির দশা দেখি। কাগজের যে ভাগে পোকাটা নাই, সেই ভাগ হইতে একটা জিনিস লইয়া আমরা উহার জগতে ফেলিয়া দিতে পারি। ফেলিয়া দিবার সময় রেখাটাতে আমাদের কিছুই আটকায় না। ফেলিয়া দিলে, জিনিসটি কোথা হইতে আসিল, তাহার ধারণাই সে করিতে পারিবে না। সে ভাবিবে —এটা একটা ভৌতিক কাণ্ড! উহার চারিদিকে চারিকোণা করিয়া একটা বেড় আঁকিলাম। পোকাটা এখন কি করিবে? ঐ বেড়ের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইবে, ঐটুকুই উহার জগৎ। বেড়ের বাহিরে আসিবার যো নাই; কারণ, উঁচুনীচু দিক্ উহার জানা নাই। তাই বেড়ের বাহিরে যে আরও স্থান আছে, সে ধারণাও উহার হয় না। বেড়টার বাহির হইতে কোন একটা দিক্ ভাঙ্গিয়া একটা জীব যে ভিতরে ঢুকিতে পারে, সে কথাই উহার অনুমান করিয়া উঠা অসম্ভব। সে কথা অনুমান করা উহার বুদ্ধির অতীত। কিন্তু আমরা দেখি, উহার কাছে বাহির হইতে একটা জিনিস লইয়া উপস্থিত করা খুবই সহজ। যদি আমরা ঐরূপ

কোন একটা জিনিস উহার কাছে উপস্থিত করি, তবে অনেক দিন ধরিয়া ও ভাবিবে যে, এটা বাস্তব জিনিস নহে। আবার ঐ জিনিসটি যদি আমরা বেড়ের বাহিরে আনি, তাহা হইলেও পোকাটা অবাক্ হইয়া যাইবে। ভাবিবে—তাই ত, কোথায় গেল ! ঐ বেড়ের মধ্যে খুব ছোট করিয়া পোকাটার গা ঘেঁসিয়া যদি আমরা আর একটা বেড় আঁকি, তবে ও মনে করিবে, আমি একটা বাক্সের মধ্যে রহিয়াছি। উহার যদি বাক্স গড়িবার ক্ষমতা থাকিত, তবে বড় অদ্ভুত বাক্সই গড়িত! সে মনে করিত, আমার বাক্সটা খুব আটকান আছে, অথচ আমরা উপর হইতে বাক্সটির সমস্ত জিনিসই দেখিতে পাই। উপর-নীচে বলিলে যে দিক্‌টার কথা হয়, পোকার সেটা দেখিবার শক্তি নাই ; কিন্তু আমাদের সে শক্তি আছে। আমরা সেই দিক্‌টা দিয়া উহার বাক্সের সবই দেখিয়া ফেলি। শুধু ঐ দিক্‌টার সাহায্যে আমরা উহার কাছে কত কাণ্ডই করিতে পারি—একটা জিনিস উহার কাছে হাজির করিতে পারি, আবার উহার কাছ থেকে অন্তর্হিত করিতেও পারি। উহার হিসাবে উহার বাক্স বন্ধ থাকিলেও আমরা ঐ বাক্সের মধ্যস্থিত সব দেখিতে পারি। কিন্তু ঐ দিক্‌টা না জানার দরুণ উহার কাছে এ সমস্তই ঘোর রহস্য বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের দশাও ঠিক ঐরূপ। আমরা তিন মাপের জীব। অন্য কোন পরিমাপের প্রাণী যদি আমাদের অজানা সেই চতুর্থ মাপের দিক্‌টার সাহায্যে কোন জিনিস আমাদের কাছে আনিয়া ফেলে বা আমাদের কাছ হইতে লইয়া যায়, তবে আমরা অবাক্ হইয়া যাই। আমাদের বাক্স তোরণবন্ধ থাকিলেও চারি মাপ জানা প্রাণীরা তাহার মধ্যস্থ সব দেখিতে পায়। তিন মাপের বাহিরে যে বিপুল বিশ্ব পড়িয়া আছে, তাহা আমরা টের পাইতেছি না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের অবস্থা ঠিক ঐ পোকারই মত।

পোকাটির বুদ্ধিও আমরা এলোমেলো করিয়া দিতে পারি।

কর, কাগজখানির তুই মোড়ে তুইটি বিন্দু দিয়া চিহ্ন করিলাম। পোকাটার কাছে একটা বিন্দু থেকে আর একটা বিন্দু পর্য্যন্ত বিস্তর ক্রোশ পথ। আমরা কাগজখানিকে বাঁকাইয়া তুইটি বিন্দু বেশ কাছাকাছি করিয়া ফেলিতে পারি; কাছাকাছিই বা কেন, একেবারে সংলগ্নও করিয়া ফেলিতে পারি। এইরূপ ব্যাপার করিলে সে মনে করিবে—তাই ত! তুইটি স্থান এত দূরে দূরে ছিল, হঠাৎ এমন কাছাকাছি কি করিয়া হইল! কি আশ্চর্য্য! কি অদ্ভুত ব্যাপার! কাগজখানিকে বাঁকাইয়া বিন্দু তুইটিকে একত্র করিতে হইলে উঁচু-নীচুর দিক্‌টার আবশ্যক হয়। আমরা মানুষ, আমাদের সেইটা জানা আছে, তাই ওরূপ করা আমাদের পক্ষে খুবই সহজ। কিন্তু পোকার সে দিক্‌টার ব্যাপার জানা নাই, তাই তার বিন্দু তুইটির একত্র হওয়া বুদ্ধির অতীত। সে ভাবিবে—কেমন করিয়া এত দূরত্ব চলিয়া গেল, কেমন করিয়াই বা একই সময়ে একই স্থানে তুইটি স্থান আসিয়া একত্র হইল! তাই, সে এ ব্যাপারটাকে একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড বলিয়া মনে করিবে। উহার অপেক্ষা আমরা একটা মাপ বেশী জানি বলিয়া উহার কাছে কত অদ্ভুত ব্যাপারেরই সৃষ্টি করিতে পারি।

ভূত-প্রেতেরাও আমাদের লইয়া ঐ কাণ্ড করে। ভুবর্লোকে যাওযায় তাহাদের একটা আধটা মাপের জ্ঞান বেশী হয়। তাই তারা অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারে। পারে কেন, করিয়াই থাকে। তারা হঠাৎ দেখা দেয়, হঠাৎ মিলাইয়া যায়, বাক্স রুদ্ধ অথচ তার মধ্যে কি আছে বলিয়া দেয়, বাক্সের মধ্যে কিছু আটকান আছে, ভূতেরা তাহা বাহিরে আনিয়া ফেলিল অথচ বাক্স আটকানই থাকিল; বাক্সের মধ্যে লেখা কাগজ একখানা আছে, তাহারা বাহির হইতে তরতর করিয়া সেই লেখাগুলি পড়িয়া গেল। এরূপ নিরন্তরই ঘটিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ—আমরা তিনটি মাপ জানি, তারা আমাদের অপেক্ষা বেশী মাপ জানে। তারা যে দিকের সাহায্যে ঐ সব কাণ্ড করে, আমরা সে দিক্‌টার খবরই রাখি না।

উঁচু-নীচুর দিক্‌টা না জানাই পোকাটার কাছে আমাদের কাজগু... অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় ; অথচ আমরা দেখি, ইহা খুবই স্বাভাবি... সেইরূপ ভূত-প্রেতের কাজগুলি আমাদের চক্ষুতে ঘোর অস্বাভাবি... বলিয়া মনে হয় ; অথচ তাহারা দেখে যে, এ সব খুবই স্বাভাবি... অস্বাভাবিক কিছুই নহে।

নূতন মাপের কথা

অগ্রহায়ণের 'ব্রহ্মবিদ্যা'য় আমরা আমাদের পরিচিত লম্বা, চৌড়া ও পু... যাহাদিগকে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ বলে—ঐ তিন মাপ ছাড়া একটা বে... মাপ বা Fourth Dimension আছে, তাহার বিষয়ে আলো... করিয়াছিলাম। কিন্তু সকল কথা বলা হয় নাই। আজ আমরা গ... শাস্ত্রের দিক্‌ দিয়া দেখিব, চতুর্থ মাপ সমর্থিত হয় কি না।

আচ্ছা, দুই ইঞ্চি লম্বা একটা সরল রেখা টান। এক এক ই... লম্বাকে মাপের এক একটা মাত্রা বা মান ধরা যাউক। তাহা হই... আমাদের রেখাটির মাপ হইবে দুই। জ্যামিতি, পাটীগণিত প্র... অনেক রকম অঙ্কশাস্ত্রের অঙ্ক আছে। জ্যামিতির নিয়ম অনুসারে এক... বিন্দুকে বর্দ্ধিত করিয়া লইয়া গেলেই একটা রেখার উৎপত্তি হয়। এক... রেখার উপর আর একটা রেখা ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইলে সেই দাঁড়া... রেখাটাকে লম্ব বলে। আচ্ছা, এখন যদি আমাদের আঁকা ঐ দুই ই... সরল রেখাটাকে এমন করিয়া সরাইতে থাকি যে, উহা নিজেই নি... লম্ব হইবে অথচ সব লম্বগুলিই লম্বায় দুই ইঞ্চির বেশী হইবে ... তাহা হইলে সেইরূপ আঁকার ফলে বা সরানোর ফলে চারিদিক্‌ স... একটা চারিকোণা মূর্ত্তি তৈয়ারী হইবে। ভাল কথায় ইহাকে ক্ষে... বলে। (X২) এই সংখ্যার চতুষ্ক, এইটুকু বুঝাইতে হইলে আ... পাটীগণিতের নিয়মানুসারে (২^{২}) এইরূপ লিখিয়া থাকি। আর ... চতুষ্কটিকে যদি এমন করিয়া সরান যায় যে, উহা নিজেই নিজের

সমকোণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তবে তাহাতে যে মূর্ত্তিটি হইবে, তাহাকে ঘন-ক্ষেত্র বলা হয়। সেই মূর্ত্তিটির সব বাহুই—সব দিক্ই দুই ইঞ্চি লম্বা। পাটীগণিতের নিয়মে ঐ ঘন-ক্ষেত্রকে ($২^৩$) এইরূপ অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। এখন একটু বিবেচনা আবশ্যক। দেখিতে হইবে যে, বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া ঘন-ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যতগুলি মূর্ত্তি তৈয়ারী হইল, সমস্তগুলিই বেশ শৃঙ্খলাযুক্ত গতির ফল। বিন্দু গতিযুক্ত হইয়া একটা রেখা হইয়া দাঁড়াইল, রেখা গতিযুক্ত হইয়া একটা চতুষ্ক হইয়া উঠিল, চতুষ্ক আবার গতির ফলে ঘন-ক্ষেত্র হইয়া পড়িল। সরলরেখা, চতুষ্ক, ঘন-ক্ষেত্র—তিনটিই নিয়মিত গতির ফল। এই তিনটিই জ্যামিতির মূর্ত্তি। পাটীগণিতে উহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হইলে (২, $২^২$, $২^৩$) এইরূপ ভাবে করিতে হয়।

জ্যামিতির সাহায্যে আমরা ঘন-ক্ষেত্রের উপর আর উঠিতে পারি না। ইহাতে ধারাবাহিক গুণ তিন বারের বেশী হয় না। কিন্তু পাটীগণিতে ৪, ৫ বা যে কোন সংখ্যায় উঠিতে পারি। এখানে আর একটু সূক্ষ্ম চিন্তার প্রয়োজন। দেখা যাইতেছে, পাটীগণিতের (২, $২^২$, $২^৩$) এই সংখ্যাগুলি যখন জ্যামিতির সাহায্যে আঁকা যায়, তখন পাটীগণিতের ($২^৪$) এই সংখ্যাটিকে জ্যামিতির সাহায্যে আঁকিলে সেই মূর্ত্তিটা কিরূপ হইতে পারে ? সেই ভাবের একটা জিনিস আমরা গড়িয়া তুলিতে অপারগ। ওরূপ ভাবের মূর্ত্তি কোথাও আমাদের চোখে পড়িবে না। তাই ঐরূপ একটা মূর্ত্তি খুব চেষ্টা করিয়া কল্পনা করিতে হইবে। কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিলেই প্রকারান্তরে আমাদের সেই চতুর্থ মাপের ধারণাটাও হইয়া পড়িবে। মনে মনে অঙ্কগুলির খুব আলোচনা করিতে হইবে। (২) এই রাশিটিকে ($২^২$) এই রাশি করিবার সময়, ($২^২$) এই রাশিকে ($২^৩$) এই রাশি করিবার সময় কেমন করিয়া মূর্ত্তিগুলিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আঁকা হইল ভাবিতে হইবে। আবার ভাবিতে হইবে, ($২^৩$) এই রাশিকে কেমন করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ($২^৪$) এই মূর্ত্তি করা চলে। অনবরত ভাবিতে ভাবিতে একটা উপায় আসিয়া যাইবে।

চারিদিক্ সমান, এক এক দিক্ দুই ইঞ্চি লম্বা, এইরূপ একটা মূর্তি প্রকাশ করিতে হইলে ($২^২$) এই অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করা যায়। দুই ইঞ্চি লম্বা একটা সরল রেখা হইল এক জিনিস, আর চারি-কোণা মূর্তি কি না চতুষ্কটি হইল আর এক জিনিস। সরল রেখার মাপের মাত্রা হইল একরূপ, চতুষ্কটির হইল অন্যরূপ। দুইটির মাপের মাত্রা বা মান এক রকম নহে। রেখাটির মাপের মাত্রা হইল—এক ইঞ্চি, আর চারি কোণা মূর্তি কি না চতুষ্কটির হইল—এক বর্গ-ইঞ্চি। আর একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে যে, রেখার মাত্রাটির মত রাশি রাশি মাত্রা একত্র করিলেও চতুষ্কের মাত্রা গড়ান যায় না। রেখা জিনিসটাই অদ্ভুত ; উহার শুধু লম্বা ভাবটা আছে, চৌড়া দিক্‌টা মোটেই নাই। অঙ্ক-শাস্ত্রে এরূপ অদ্ভুত জিনিসটাকেই রেখা বলা হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যাহার আদৌ চৌড়াভাব নাই, তাহা রাশি রাশি একত্র করিলেও একটা চতুষ্ক হইতে পারে না—কখনই পারে না। আবার ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, রেখা জিনিসটা দেখাও যায় না ; কারণ, যাহার আদৌ চৌড়াভাব নাই, তাহা কেমন করিয়া দেখিবার বিষয় হইতে পারে ? রেখাকে যদি রেখার মত করিয়া আঁকা হয়, তবে সে রেখাও ঠিক রেখা হইল না মনে করিতে হইবে।

রেখা নিজের উপরে নিজে দাঁড়াইলে চতুষ্ক হয়। সেইরূপ চতুষ্ক আবার নিজের উপরে নিজে দাঁড়াইলে ঘন-ক্ষেত্র তৈয়ারী হয়। চতুষ্কের পরিচয় এই যে, উহার আদৌ স্থূলত্ব—পুরুত্ব নাই, শুধুই লম্বা আর চৌড়া ভাব দুইটি আছে। তাই, রাশি রাশি চতুষ্ক একত্র করিলেও একটা ঘন-ক্ষেত্র তৈয়ারী হয় না। রেখার মাপের মাত্রা, চতুষ্কের মাপের মাত্রা যেমন পৃথক্ পৃথক্, তেমনই ঘন-ক্ষেত্রের মাপ বা মানও একেবারে স্বতন্ত্র। রেখার মাত্রা—ইঞ্চি ; চতুষ্কের মাত্রা—বর্গ-ইঞ্চি ; আর ঘন-ক্ষেত্রের মাত্রা—ঘন-ইঞ্চি। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রেখা, চতুষ্ক, ঘন-ক্ষেত্র—এই তিনটি তিন রকম দিক্ বা তিন রকম

বা তিন রকম পরিসর। মাপের হিসাবটাও তিন দিকের তিন রকমের। আরও দেখিতে হইবে যে, উচ্চতর দিক্‌টা নিম্নতর দিকের মাপের মাত্রায় স্থির করা যায় না।

অঙ্কের হিসাবের মধ্যে আর একটি সূক্ষ্ম কথা বুঝিবার আছে। কথাটা এই :—আমরা একটা চিত্রকে সরাইয়া বা চালিত করিয়া আর একটা মূর্ত্তি তৈয়ারী করিতে গেলে, যেটিকে চালিত করা যায়, তাহার প্রত্যেক বিন্দু হইতেই অদৃশ্যভাবে একটা করিয়া রেখা তৈয়ারী হইতে যায়; আবার সেই রেখাগুলিও এলোমেলো নহে, তাহাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা থাকে। মনে কর, একটা চতুষ্ক গড়িতে বসিলাম। আমাদিগকে কি করিতে হইবে? একটা সরল রেখাকে চালিত করিয়া নিজের উপরে নিজকে সমকোণযুক্ত করিয়া দাঁড় করাইতে হইবে। এরূপ করিলে চতুষ্কের সীমাসূচক চারিদিকে চারিটি রেখা ত আঁকিতেই হইবে; তা ছাড়া, আমাদিগকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, চালিত রেখার প্রত্যেক বিন্দুটিও চালিত হইয়াছে আর চালিত হইবার সময় একটা করিয়া রেখার সৃষ্টি করিয়াছে। আবার যখন আমরা একটা চতুষ্ককে চালিত করিয়া একটা ঘন-ক্ষেত্র তৈয়ারী করি, তখন ঐ চতুষ্কের রেখা চারিটি যে শুধু আর একটা চতুষ্ক সৃষ্টি করে, তাহা নহে। ঐ চালিত চতুষ্কের উপরিভাগস্থ প্রত্যেক বিন্দুটি উপরিভাগের উপর সমকোণযুক্ত হইয়া বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে চালিত হইতে থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ঘন-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চালিত চতুষ্কের প্রত্যেক বিন্দুটি কাজে লাগে। আর মনে রাখিতে হইবে যে, চতুষ্ক বলিলে চারিধারের শুধু রেখা চারিটি বুঝিতে হইবে না। উহাতে রেখা-ঘেরা স্থানটি বুঝিতে হইবে। আর একটি কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেখিবার দিক্‌গুলা যত বাড়িয়া যাইবে, ততই কম দিক্‌ওয়ালাদের সমস্তটাই দেখিয়া ফেলিব। পোকাটার কথা ভাবিয়া দেখ। পোকাটা দুই দিক্‌ওয়ালা, আর আমরা তিন দিক্‌ওয়ালা। আমরা উহার

আটকানো বাক্সও দেখিয়া ফেলি। আবার ভূতযোনিরা আমাদে অপেক্ষা বেশীদিক্‌ওয়ালা বলিয়া আমাদের রুদ্ধ, গুপ্ত, আটকানো স্থানগু বাক্সগুলি সবই দেখিয়া ফেলে। যতই বেশী দিক্‌ওয়ালা হওয়া য ততই দৃষ্টিটা উপর হইতে নীচে পড়ে, তখন কমদিক্‌ওয়ালাদের স দেখিতে পাওয়া যায়।

বলা হইয়াছে যে, বিন্দুকে চালিত করিলে রেখা হয়, রেখাকে চালি করিলে চতুষ্ক হয়; আবার চতুষ্ককে চালিত করিলে ঘন-ক্ষেত্র হয়। আর ঘন-ক্ষেত্রকে চালিত করিলে কি রকম মূর্ত্তিটা হয়? মনে করা য একটা দিক্ আছে অথচ সেই দিক্‌টার কথা আমরা কল্পনাও করি পারি না, সেই দিক্‌টার সঙ্গে সমকোণযুক্ত করিয়া একটা ঘন-ক্ষেত্র চালিত করিলাম। তখন সেই মূর্ত্তিটা কেমন হইবে? উত্তর—আ যে তিনটি দিক্ বা মাপের কথা জানি, তাহা দ্বারা সে মূর্ত্তির ধারণা হই পারে না। সে জিনিসটি নূতন মাপের জিনিস। তাহার আমরা "চ মাপ" নাম দিয়াছি। নূতন মাপ বলিয়া তাহার পরিমাণের মা স্বতন্ত্র। সুতরাং রাশি রাশি ঘন-ক্ষেত্র একত্র করিলেও তার একটা ম তৈয়ারী হইবে না। আগেও বলা হইয়াছে, নীচের মাপের দ্ব উপরের মাপের মাত্রা বুঝা যাইবে না।

ঐ অদ্ভুত চারি পরিসরযুক্ত মূর্ত্তিটির কাল্পনিক নাম—"টেসার‍্যাক্ট"

একটা অজানা, কল্পনার অতীত রেখার সঙ্গে সমকোণযুক্ত করিয়া এ ঘন-ক্ষেত্রকে চালিত করিলে যে মূর্ত্তিটি হইবে, হিন্টন্ সাহেব অ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার একটা মন গড়া নাম দিয়াছেন—"টেসার‍্যা এ কথাটির অর্থ "আটটি ঘন-ক্ষেত্রের মিলন।" তিনি ঐ মূ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—"আমরা দেখিতে পাই, একটা রেখা দু বিন্দুতে সীমাবদ্ধ; একটি চতুষ্ক চারিটি রেখায় আবদ্ধ;

একটি ঘন-ক্ষেত্র ছয়টি পৃষ্ঠ, ১২টি রেখা ও ৮টি বিন্দুতে পরিমিত। সেইরূপ টেসারাক্ট মূর্ত্তিটিতে ১৬টি বিন্দু, ৩২টি রেখা, ২৪টি পৃষ্ঠ ও ৮টি ঘন-ক্ষেত্র থাকিবে।"

আচ্ছা, আমরা যদি সত্য সত্যই ঐ রকম একটা মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তবে সেটিকে দেখিয়া আমরা কি মনে করিব? ঐটি আমাদের চক্ষুতে চারি মাপের পদার্থ বলিয়া মনে হইবে না! আমাদের মনে হইবে, ওটা একটা ঘন-ক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের চোখে ওটা তিন মাপের জিনিস বলিয়াই মনে হইবে। এই কথাটুকু বুঝিতে হইলে আমাদের আবার সেই কাগজের উপরকার দুইটি মাপ-জানা পোকাটির কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা যদি লম্বা, চৌড়া, পুরু—এই তিন মাপের একটা জিনিস পোকাটার সম্মুখে রাখিয়া দিই, তাহা হইলে সে ভাবিবে যে, এইটি দুই মাপের জিনিস। পুরুত্ব—কি না উঁচু দিক্‌টার জ্ঞান না থাকায় সে দিক্‌টা সে দেখিতে পাইবে না। আমাদেরও ঐরূপ অবস্থা। হয় ত আমাদের সম্মুখে কত শত চারি মাপের জিনিস রহিয়াছে অথচ সেই চতুর্থ মাপটা দেখিবার শক্তি আমাদের নাই বলিয়া আমরা সেগুলিকে তিন মাপের বলিয়াই বুঝিয়া লইতেছি।

আমাদের চারি মাপের জিনিস দেখিবার শক্তি নাই সত্য, কিন্তু একটু আভাসে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। আচ্ছা, যে ক্ষুদ্র প্রাণী লম্বা চৌড়া—এই দুই দিক্ ছাড়া আর বুঝে না, তাকে যদি লম্বা, চৌড়া, পুরু—এরূপ তিন মাপের জিনিস বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে কি করা উচিত? সেইটুকু বুঝিতে পারিলেই আবার আমরা বুঝিয়া লইতে পারিব যে, চারি মাপের জিনিস বুঝিতে হইলে আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কি? একটা তা'-দেওয়া ডিম লইয়া যদি খুব পাতলা পাতলা করিয়া কাটা যায়, তবে দেখা যায় যে, প্রত্যেক খণ্ডে ভ্রূণটির একটু একটু অংশ আছে। অবশ্য, অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা সেটা দেখিতে হয়, শুধু চোখে দেখা যায় না। ভ্রূণের সেই অংশগুলি এত পাতলা যে, তার পুরুত্ব নাই বলিলেও হয়, শুধুই লম্বা চৌড়া ভাব

আছে। সেইগুলিকে পর পর সাজাইলে পুরুত্ব বলিয়া দিক্‌টা ফুটিয়া উঠ তখন তাকে তিন মাপের জীব বলা চলে। এখন একটি কথা বুঝি আবশ্যক। লম্বা-চৌড়াই বুঝে, পুরু বলিলে বুঝে না, এমন কোন ক্ষুদ্র প্র যদি লম্বা, চৌড়া, পুরু প্রাণীর ধারণা করিতে যায়, তবে তাকে কি করি হইবে? তাকে নিজের মত অনেকগুলি দুই মাপের জীবকে মনে একত্র করিয়া ভাবিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে পুরুত্ব দি বুঝিয়া উঠিতে পারিবে। আবার ঐ রকমভাবে যদি আমরা তিন মা কতকগুলি জিনিস একত্র করিয়া ক্রমাগত ভাবিতে থাকি, তবে ক্রমে ক্র চতুর্থ মাপটির জ্ঞান মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা।

আমাদের মনে হয়, আমরা যে সকল পদার্থ বা জীব দেখিয়া থা তাহাদের সকলগুলিরই চারিটি মাপ। চতুর্থ মাপটা দেখিবার শ আমাদের নাই, তাই ঐগুলিকে লম্বা, চৌড়া, পুরু এই তিন মাপযুক্ত ব বুঝি। তাহা হইলে সকল জীবেরই এমন একটা অংশ আছে, যেটি আ দেখিতে পাইতেছি না। সেইটিই চতুর্থ মাপ। এই পৃথিবীতে যাহ আমরা সাধারণ শ্রেণীর মানুষ ভাবিতেছি, হয় ত তার চতুর্থ মাপটা উচ্চ, খুব উন্নত, খুব অসাধারণ।

হিণ্টন সাহেব চতুর্থ মাপের কথা খুব ভাল করিয়া আলোচনা করি ছেন। তিনি বলেন, যদি আমরা চেষ্টা করিয়া এই মাপটা বা দি বুঝিয়া লইতে পারি, তবে আমাদের বিস্তর গুণ বাড়িয়া যাইবে। কত রকম শক্তি আসিয়া পড়িবে। কিন্তু ঐ মাপটা বুঝিয়া উঠাই ক বিশেষ মন না দিলে বুঝা যায় না। হিণ্টন্ একটি সুন্দর উপমা বুঝাইয়াছেন। সেটি এই :—

একটি সুন্দর উপমা

আচ্ছা, আবার আমাদের সেই দুই দিক্‌দর্শী পোকাটার কথা ভাব আগে যখন তাহার কথা ভাবিয়াছি, সে যেন একখানা কাগজের

আছে। এবার তাহাকে কাগজের উপর না ভাবিয়া ভাবা যাক্, সে যেন একটা পাতলা মোমের পাতের উপর আছে। বেশ, এখন কল্পনা করা যাক্, যেন একটা সূতা ঐ মোমের পাতের ভিতর দিয়া উঁচু-নীচুভাবে খাটান আছে। এখন আমরা সূতাটির দুই মোড় দুই হাতে ধরিয়া যদি টান-টান করিয়া উঁচু-নীচুভাবে সূতাটিকে উঠানো-নামানো করি, তবে ঐ পোকাটি সূতার ঐ গতি আদৌ বুঝিতে পারিবে না। মোমপাতের উপরকার ছিদ্র, আর সেই ছিদ্রটুকুতে সূতার যে অংশটুকু আছে, মাত্র তাহাই তাহার চোখে পড়িবে। আবার যদি সূতাটি মোটা-সরু হয় বা নানা রঙ্গেরই হয়, তবে ছিদ্রমধ্যস্থ অংশটুকুর আকার ও রঙ পোকাটির চোখে ঘন ঘন. বদ্‌লাইতে থাকিবে। উঁচু-নীচু দিকের জ্ঞান না থাকায় সে সমগ্র সূতাটির কথনই ধারণা করিতে পারিবে না। আবার আর একটি কথা ভাবা যাক্। তোমরা অনেকেই কলার ফুল বা মোচা দেখিয়াছ। মোচার আগার দিক্‌টা দুই তিন আঙ্গুল লম্বা করিয়া কাটিয়া লইলে সেই জিনিসটি দেখিতে কিরূপ হয় বল দেখি? তার একদিকে মোটা, আর একদিকে খুব সরু ছুঁচাল। মোটা দিকটা হইতে ক্রমে ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে। ভাল কথায় এ রকম জিনিসকে ক্রমসূক্ষ্ম বলে। আচ্ছা, এখন যদি এই ক্রমসূক্ষ্ম একটা জিনিসকে মোমপাতের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে চাপ দিয়া পাতটিকে ফুঁড়িয়া অন্য পিঠ দিয়া ঐটিকে বাহির করা যায়, তবে সেই ব্যাপারটা পোকার চক্ষুতে কিরূপ বোধ হইবে? যখন সরু আগাটা পাতের উপর রাখা হইবে, তখন পোকাটা দেখিবে, পাতের উপর একটা ছোট গোল দাগ পড়িল। ক্রমে আমরা যতই জিনিসটিকে চাপ দিতে থাকিব, পোকাটা দেখিবে, সেই দাগটা ক্রমেই বড় হইতেছে। তাহার পর জিনিসটা বাহির হইয়া গেলে ফাঁকটা বুজিয়া যাইবে। মোমটা মনে কর এত নরম যে, ফাঁক হইতে হইতেই বুজিয়া যায়! এ ক্ষেত্রে জিনিসটা বাহির হইয়া যাইবামাত্র ফাঁকটি বুজিয়া যাইবে, গোল দাগটাও মিলাইয়া যাইবে। পোকাটি তখন অবাক্

হইয়া ভাবিবে—তাই ত! কি অদ্ভুত ব্যাপার! দাগটা আসিলই বা কো হইতে, আর গেলই বা কোথা? গোল দাগটা ক্রমে বাড়িতেছে দেখি সে অবাক্ হইবে! কিন্তু সেই বৃদ্ধিটা যে একই জিনিসের সহিত গাঁথ তাহা সে ভাবিতে পারিবে না।

আবার সূতাটিকে ঠিক উঁচু-নীচুভাবে না ধরিয়া যদি একটু কা করিয়া, টান-টানভাবে উঠানো-নামানো করি, তাহার ফল কি হইবে! তাহাতে মোমপাতটা সূতার সঙ্গে চিরিতে চিরিতে যাইবে। আচ্ছা, মোমের এমন একটা গুণ থাকে যে, চেরাটা সঙ্গে সঙ্গে বুজাইয়া তবে তার ফল পোকার চোখে কেমন দাঁড়াইবে? সে তাহা মনে করিবে যে, একটা ছিদ্র পাতের উপর চলিয়া বেড়াইতেছে। সূতা সোজা করিয়া ধরা যায়, আবার কাত করিয়াও ধরা যায়। ধরিবার এক স্থানেই রাখিয়া উঠানো-নামানো যায়, আবার পাতটির সকল দিকে লওয়া যায়। তাই তার মনে হইবে, ছিদ্রটি পাশাপাশি চলিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সূতার গতিটি হইতেছে উঁচু-নীচু। উঁচু-নীচু গতি সে পাশাপাশি বলিয়া বুঝিবে। পোকাটির কি ভ্রম!

আচ্ছা, আবার মনে কর, যেন একটি সূতার পরিবর্তে আম অনেকগুলি সূতা ধরিয়া আছি, সূতাগুলির সংখ্যা যেন সহস্র সহস্র; এ কাঠের সঙ্গে যেন এমনভাবে জুড়িয়া দেওয়া আছে যে, কোনটি হইয়া, কোনটি উপুড় হইয়া, কোনটি চিৎ হইয়া, কোনটি কাত পাতের ভিতর দিয়া ফুঁড়িয়া গিয়াছে বা অপরটার সঙ্গে সমান গিয়াছে; কোনটা অপরটার উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে। মনে যাক্, সূতাগুলির মোড় একই কাঠের সঙ্গে আঁটা অথচ এলোমেলো মোম-পাত ফুঁড়িয়া গিয়াছে। এখন এই কাঠখানা ধরিয়া টান-টান সূতাগুলিকে উঠানো-নামানো করিলে উহার চক্ষুতে কিরূপ বোধ হ সে দেখিবে, বড় চমৎকার ব্যাপার! বিস্তর বিন্দু চলাফেরা করিয়া বে তেছে; কতকগুলি পরস্পর তফাৎ হইতেছে, কতকগুলি

যাইতেছে, আবার অল্পসময় পরেই পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে ; কতকগুলি ধীরে যাইতেছে, কতকগুলি দ্রুত চলিতেছে। সে মনে করিবে, একটা ঘোর বিশৃঙ্খল ব্যাপার! আর আমরা তিন-দিকৃদর্শী মানুষ, আমরা দেখি, বিশৃঙ্খলা কিছুই নাই, সবই সুশৃঙ্খল। আমরা দেখি, বিন্দুগুলির ঐ সকল পাশাপাশি গতি প্রকৃত গতি নহে, সূতা খাটানো কাঠখানির উঁচু-নীচু গতিই প্রকৃত গতি। এখানেও আমাদের পোকা বেচারীর মস্ত বড় ভ্রম!

আমাদের অবস্থাও অনেকটা ঐ পোকারই মত। আমাদেরও চারি-দিকে কত রকম গতি! ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, কত কত রকমের জটিলতা, কুটিলতা, কত কত রকমের গণ্ডগোল! কিন্তু সকলগুলি একটা ক্রম-বিকাশের কাঠের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া আছে। ভিন্ন ভিন্নমুখী হইলেও প্রকৃতপক্ষে সবগুলি উন্নতির উঁচুদিকে চলিতেছে। দেখিবার শক্তিটা বাড়িয়া গেলে আমরা দেখিতাম, কিছুই গণ্ডগোল নহে, বিশৃঙ্খল নহে, ভগ-বানের রাজ্যে সবই সুশৃঙ্খল। হিণ্টন্ বলেন, এই উপমাটি ভাল করিয়া বুঝিলে বিজ্ঞানের অনেক জটিল কথা সহজে বুঝা যায়।

চতুর্থ মাপ বুঝিবার পক্ষে আরও কয়েকটা সঙ্কেত

চতুর্থ মাপটা হিণ্টন সাহেব আরও উপমা লইয়া বুঝাইয়াছেন। তিনি বাষ্পের কথা তুলিয়াছেন। কথাটি বেশ একটু মজার। আমরা দেখি, তরল পদার্থকে সমতলে ঢালিয়া ফেলিলে উহা লম্বা-চৌড়া দিকে ছড়াইয়া যায়। আর যতই ছড়ায়, ততই পুরুত্বের দিকৃটা ক্ষীণ হইয়া আইসে। দুইটি মাপে ছড়াইলে, তৃতীয় মাপটা কমিয়া যায়। উহা হইতে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, বাষ্প লম্বা, চৌড়া, উচ্চ—এই তিনটি দিকে যতই ছড়াইতে থাকে, ততই চতুর্থ দিকৃটা বা মাপটা কমিয়া আইসে। তাহা হইলে বাষ্পের ঘনত্ব দেখিয়া উহার চতুর্থ মাপের অবধারণ করা অসম্ভব নহে।

পৃথিবীতে আমরা একই রকমের অনেক জিনিস দেখিতে পাই। যেমন

ডান-হাতখানা বাঁ হাতেরই মত অথচ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একখানির স্থানে আর একখানিকে বসান যায় না। আবার মনে কর, একখণ্ড কাগজের উপর বিপরীতমুখ করিয়া দুইটি সমকোণ ত্রিভুজ আঁকিলাম। তারপর ঐ দুইটিকে কাটিয়া টেবিলের উপর রাখিলাম। এখন ঐ দুইটিকে এক বলিয়া বোধ হইবে, এমনটি করিতে হইলে উহার একটিকে তুলিয়া উল্‌টা- ইয়া অপরটির উপরে বসাইতে হইবে। তাহা হইলে মনে হইবে, ত্রি যেন একটা ত্রিভুজই রহিয়াছে। একটিকে না তুলিয়া অন্য কোন প্র দ্বারা ঐরূপ একীভূত করা অসম্ভব। একটি দুই মাপের পদার্থকে তি মাপের মধ্যে উল্টান যায়; শুধু উল্টান নহে, মুকুরের মধ্যে প্রতিবিম্বি পর্য্যন্ত করা যায়। সেই রকম, তিন মাপের জিনিসগুলিকে চারি মাপের মধ্যে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত করা যায়। হিণ্টন্ বলেন, এইরূপ তর্ক-সূ ধরিলে বিদ্যুতের অনেক অদ্ভুত ব্যাপার খুব সহজে ভাল করিয়া বুঝা যায়। তিনি আরও বলেন যে, আমরা চতুর্থ মাপ হইতে নৈতিক জীবনের উন্নতি করিতে পারি।

চতুর্থ মাপ বুঝিতে হইলে অহঙ্কার দূর করিতে হইবে। যাঁহারা প বিদ্যার আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, স্বার্থভাব ত্যাগ কর হইবে। শুধু পরের ভাবনা ভাবিতে হইবে, পরকে আপন করিতে হই পরের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে হইবে, নিজের চিন্তা একেবা ভুলিয়া যাইতে হইবে। মানবজাতির মঙ্গলকামনা করিয়া কার্য্য করি হইবে। তবেই চতুর্থ মাপ বুঝিবার অবস্থা হইয়া আসিবে। কতক ঘন-ক্ষেত্র অর্থাৎ লম্বা, চৌড়া, পুরু এই তিনটি সমান মাপের জিনিস সাজাইয়া সাজাইয়া দেখিতে হইবে।

সাজাইলে একটা খুব বড় রকমের ঘন-ক্ষেত্র তৈয়ারী হইবে। তার পর একটা ছোট ঘন-ক্ষেত্রের সঙ্গে অপরটির বা সকল ছোটগুলির পর কিরূপ সম্পর্ক, তাহা বুঝিবার শিক্ষা করিতে হইবে। এই সম্পর্ক বুঝি সময় আমরা স্বভাবতঃ দেখিয়া থাকি যে, কোন্‌টি কাহার উপরে বা

কোন্‌টি কাহার সম্মুখে বা পিছনে, কিংবা কোন্‌টি কাহার ডাহিনে বা বামে আছে ; কিন্তু এরূপ দেখাটা ঠিক দেখা নহে। এ সম্বন্ধটাও ঠিক সম্বন্ধ নহে। এ সম্পর্কটি আমাদের দৃষ্টিধারার সঙ্গে জড়িত, এটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক ; এ ছাড়াও উহাদের ভিতরে নিজেদের সম্বন্ধ আছে। সেইটি কোন বাহিরের পদার্থের সঙ্গে জড়িত নহে। সেই ভিতরের অথচ খাঁটী সম্বন্ধটা চেষ্টা করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন। বুঝিবার সময় আমাদের নিজের নিজের ব্যক্তিত্বটা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া যাইতে হইবে: ঘনগুলির ঐ সূক্ষ্ম সম্বন্ধটা বুঝিয়া লওয়া বেশী লোকের কাছেই খুব কঠিন ব্যাপার। একেবারে নিঃস্বার্থ হইতে পারিলেই ঐ সূক্ষ্ম সম্বন্ধটি চোখে পড়িবে, ক্রমে চতুর্থ মাপও বুঝা যাইবে। আত্মার প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে ঐরূপ চেষ্টা—ঐরূপ সাধনা করা আবশ্যক।

চতুর্থ মাপ জানিবার পক্ষে আমরা খুব অল্প আলোচনাই করিলাম। যদি কাহারও এ বিষয় সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে তিনি যেন হিণ্টনের বহিগুলি পড়েন। হিণ্টন লেডবিটারকে বলিয়াছিলেন যে, বিষয়টি আরও সহজ করিয়া তিনি সাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। অনেকেই সেই নূতন ব্যাখ্যাটার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। ধ্যান-ধারণা-নিদিধ্যাসন দ্বারাও জ্ঞানবৃদ্ধি হয় ; আবার চতুর্থ মাপের চিন্তা দ্বারাও বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। প্রথম উপায়টি অনেকের কাছে সহজ। দ্বিতীয় পথটি কঠিন ; কেন না, অঙ্কের পথ বলিয়া সকলেরই মাথায় ঢুকে না। পথটি কঠিন হইলেও এটিকে তাচ্ছীল্য করা উচিত নহে। ইহার আলোচনাতেও বিশেষ সুফল হয়। এ পথে সকলেরই যে দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়া উঠে, সকলেই যে চতুর্থ মাপটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, আমরা তাহা বলি না ; তবে যে একটা নূতন রকম দৃষ্টিশক্তির বিকাশ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা ধ্যান-ধারণার বিষয় পরে আলোচনা করিব।

দ্বাদশ অধ্যায়

সহায়কদিগের কার্য্য

লোকে কখন কখন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, পরাবিদ্যা মরণের নিমিত্ত কিরূপভাবে প্রস্তুত হইতে উপদেশ দেয়? এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও যাহা বলিয়াছি, এখনও তাহাই বলিতে চাই। পার্থিব জীবনটিকে নিষ্কলঙ্ক করিয়া তোলাই প্রধান কর্ত্তব্য। এইটিই মরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার পক্ষে একমাত্র ফলদ অনুষ্ঠান। কবে মরণ হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া যত ব্যাকুল না হওয়া যায়, ততই ভাল। তত্ত্ব-বিদ্যাবিষয়ক পুস্তকাবলীতে বিস্তর উপদেশ আছে। ঐগুলির সহিত যতই আমাদের পরিচয় হয়, ততই মঙ্গল। তাহা হইলে মরণান্তে সূক্ষ্ম-জগতে আমাদের অবস্থা যেমন যেমন ঘটিবে, আমরা তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি। শুধু তাহাই নহে। সেথানে যদি আমাদিগের সম্বন্ধে বা আমাদের সাহায্যপ্রার্থী কাহারও ভাগ্যে কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব দুর্ঘটনা ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলেও আমরা তাহা বিদূরিত করিবার নিমিত্ত দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া প্রস্তুত থাকিতে পারি। মৃত্যু যে সম্পূর্ণভাবে একটি নৈসর্গিক ব্যাপার, সেটুকু বুঝিয়া রাখা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। মৃত্যুকে আদৌ ভয় করা উচিত নহে। পরন্তু, উহাকে আনন্দের ব্যাপার বলিয়া বুঝিয়া রাখাই আমাদিগের কর্ত্তব্য; কেন না, মরণের পরই পার্থিব জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হয়; তখনই জীব উচ্চতর জীবনে প্রবেশ করে; তথায় নানা প্রকারে বিপুল পরিমাণে পরোপকার-ব্রত পালন করা যায়। এ পৃথিবীতে সেরূপটি পারা যায় না। যাহারা এ পৃথিবীতে মরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হয় না, তাহাদিগকে ভুবর্লোকে যাইয়া অনেক বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। তত্রত্য জ্ঞান আমাদের যতই পরিস্ফুট হইবে, আমরা সে লোকের পক্ষে ততই উপযুক্ত চালক, বান্ধব ও স্বাচ্ছন্দ্য-বিধাতা হইয়া দাঁড়াইতে পারিব। ভুবর্লোকে কত প্রকার

সাহায্য করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনায় ফল আছে। কেন না, জীবাত্মা তথায় কিরূপ অবস্থায় কিরূপ সাহায্যের প্রার্থী হয়, তাহা জানিতে পারিলে আমরাও সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে প্রস্তুত থাকিতে পারি। আমরা পার্থিব দেহেও সেবা-ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে সমর্থ; কারণ, নিদ্রিতাবস্থায় এ দেহেও আমরা সাহায্য-প্রার্থী মৃতব্যক্তিগণের সাক্ষাৎ পাইয়া থাকি। শুধু সাক্ষাৎ নহে, উহাদের উপকারসাধনও করি। স্বপ্নাবস্থায় ভুবর্লোকে যাইয়া তত্রত্য জীবাত্মাদিগের উপকার করিবার অভ্যাসটা আমরা এই পার্থিব দেহেই করিয়া রাখিতে পারি। আর, এরূপ অভ্যাস করাও মন্দ নহে। মরণান্তে ভুবর্লোকে ঐরূপ পরোপকারই আমাদের জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইবে।

পরলোক আমাদিগের খুবই সুপরিচিত স্থান

পার্থিব জীবনে স্বপ্নাবস্থায় ভুবর্লোকে যাইয়া মৃত ব্যক্তিগণের উপকার করা যদি আমাদিগের অভ্যাস থাকে, তবে মরণান্তে যখন আমরা তথায় যাইয়া উপনীত হইব, তখন সেই স্থান আমাদের নিকটে কিছুমাত্র অপরিচিত বা ভীতিজনক বলিয়া মনে হইবে না। তখন মনে হইবে, ইতঃপূর্ব্বে এই স্থানে কতবার আসিয়াছি। তত্রত্য জিনিস-পত্র, বন্ধু-বান্ধব সমস্তই আমাদের সুপরিচিত বলিয়া বোধ হইবে। মনে হইবে, মৃত্যুটা কিছুই নহে, পার্থিব জীবন হইতে সূক্ষ্ম-জগতে যেন একটা পাদক্ষেপমাত্র। মরণান্তে আমরা ভুবর্লোকে গেলে পূর্ব্বপরিচিত আত্মীয়-স্বজনেরা আমাদিগকে দেখিয়া কতই আনন্দিত হয়। আমরা পার্থিব জীবনে স্বপ্নাবস্থায় ইহাদের নিকটে কতবার আসিতাম। আসিলে কি হইবে, আবার অল্পসময়ের মধ্যেই জাগরিত হওয়ায় ইহাদিগকে দীর্ঘ-কালের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইতাম। তখন ইহাদের কাছে আমাদের খুব অল্পসময় থাকা ঘটিত; কিন্তু এখন আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী সময় থাকিতে পারিব ভাবিয়া ইহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। আমরা এই

ভুবর্লোকে যাইয়া কিছুমাত্র অসুবিধা মনে করি না। তথায় কোন প্রকার সঙ্কোচ, কোনরূপ অচেনা-ভাব মনে আইসে না। পূর্ব্বেও তথায় স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ কাজ করিতাম, এখনও সেইরূপ কার্য্যেই স্বভাবতঃ ব্যাপৃত হইয়া পড়ি। পূর্ব্বেও যাহাদিগের উপকার করিতাম, এখনও তাহাদিগের উপকারেই প্রবৃত্ত হই। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সময় এখানে থাকিতে সমর্থ হওয়ায় আমরা অত্রত্য কাজ-কর্ম্মের গণ্ডী প্রসারিত করিয়া লইতে পারি; সুতরাং এখন আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারোপকারসাধনে সমর্থ হই।

প্রেতাত্মাদিগকে সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক

পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে ধর্ম্মোপদেষ্টারা যুক্তিযুক্ত ও সত্য সংবাদ না দেওয়ায়, আর ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিষয়ে লজ্জাকর তাচ্ছীল্য বিদ্যমান থাকায় ভুবর্লোক-গত হতভাগ্য ব্যক্তিরা তত্রত্য বিস্তর বিষয় অনবগত থাকে। বিস্তর ব্যাপার তাহাদের নিকটে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়; অনেক সময় তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। অনেকে তখনও বিস্তর পার্থিব দ্রব্য দেখিতে পায়, বিস্তর পার্থিব জীবনের অনুভূতি তখনও স্ফুরিত হইতে থাকে। উহারা তখনও ঐ সকল জিনিসের মায়া ছাড়িতে চাহে না। তখনও ঘোর আগ্রহে পৃথিবীর স্নেহবন্ধনে জড়িত থাকিতে চাহে। এইরূপ ব্যাপার হইবার কারণ এই যে, মরণের পরও এ পর্য্যন্ত উহারা পার্থিব বিষয় ব্যতীত অন্য কোন কিছুর চিন্তা করে নাই বা অন্য কোন কিছু উহাদের চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হয় নাই। উহাদের এ পর্য্যন্ত মনে হইয়াছে যে, পার্থিব বিষয় ভিন্ন যদি অন্য কিছু বিদ্যমান থাকে, তবে তাহা শূন্যগর্ভ ও অবাস্তব। কু-শিক্ষা-প্রাপ্ত বালক-বালিকারা যেমন অন্ধকার দেখিয়া ভয় পায়, সেইরূপ উহারাও এই ভূলোকাতিরিক্ত অবস্থা স্মরণ করিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠে। সত্য সত্যই যে উহাদের মৃত্যু হইয়াছে, উহারা তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, আর তাদৃশী ধারণা করিতেও চাহে না। না চাহিলে কি হইবে? উহাদের মৃত্যুর কথা ক্রমেই পরিস্ফুট

হইতে থাকে। কিন্তু তখনও উহারা তাহা বিশ্বাস করিতে ঘোর অনিচ্ছুক; মরণ হইয়াছে বুঝিবামাত্র উহারা ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা দিবার প্রয়োজন হয়। পরিশেষে বেশ মিষ্ট ভাষায় এই খাঁটি সত্যটুকু উহাদিগকে জানান হয় যে, পূর্ব্বাচরিত চিন্তাধারা ও জীবনোদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিতে না পারিলে এই নবীন অবস্থায় প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হইবার যো নেই। এই চিন্তা ও উদ্দেশ্যপুঞ্জের পরিবর্ত্তন বড় সহজ নহে। চেষ্টা করিলেও পরিবর্ত্তন-কার্য্যটা কষ্টকর। উহা অতীব ধীরে হইতে থাকে। তাই উহারা এরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, প্রবৃত্ত হইতে ভয় পায়। তাই উহারা পূর্ব্ব-বর্ণিত চিকিৎসকের ন্যায় বিমর্ষ ও নিরুদ্যম জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকে। সন্দিগ্ধ ও ধনলিপ্সু ব্যক্তিরা অতীব শোচনীয়রূপে পার্থিব বন্ধনে বদ্ধ থাকে। ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইলে, সাহায্য করার নিতান্ত প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহারা এমনই সাধারণ জ্ঞানবর্জ্জিত, এতই বিচার-শক্তিশূন্য যে, ইহাদের অনুকূলে প্রায়ই বেশী কিছু করিয়া উঠা যায় না। আবার কোন কোন লোক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে পৃথিবীর সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকে। সেই কারণটি পার্থিব কার্য্যাবলীর প্রতি অসাধারণ আসক্তি নহে। হয় তো উহারা কোন ঋণ পরিশোধ করিয়া আসিতে পারে নাই, কিংবা কোন একটি কর্ত্তব্যপালন হয় নাই, এই প্রকার একটা না একটা দায়িত্ব-বোধই উহাদের পার্থিব বন্ধনের মূলীভূত কারণ। এই পৃথিবীতে কত শত লোক মরণের পূর্ব্বে ঘোর অন্যায় "উইল" (চরমপত্র) করিয়া যায়। পরে ভুবর্লোক-সুলভ সূক্ষ্মদৃষ্টি-বলে যখন উহারা আপনাদের অন্যায় বুঝিতে পারে, তখন অনুতপ্ত হইয়া প্রতীকারের চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হয়! আবার অনেকে কোন না কোন গুপ্ত কথার নিমিত্ত পৃথিবীমুক্ত হইতে পারে না। এরূপ গুপ্ত ব্যাপার সাধারণতঃ অখ্যাতিকর। উহারা যদি কাহাকেও মরণের পূর্ব্বে উহা না বলিয়া যাইতে পারে, তবে প্রেত-লোকে উহাদের বিবেক ভারাক্রান্ত হইয়া

উঠে ; পার্থিব জীবনে হয় তো ঐ কথাটির জন্য কোন দিন অতটা কথাটি মনে আইসে নাই, কিন্তু এখন উহার জন্য মৃত ব্যক্তি ঘোর উদ্বেগ বোধ করিতে থাকে। কখন কখন প্রয়োজনীয় দলীলপত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কোন ব্যক্তি হয় তো উহার সন্ধান জানিত। সে এখন পরলোকে। কখন কখন টাকাকড়ি খুব গুপ্তস্থানে থাকে, উহা হয় তো কাহারও আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। উহা যে কোথায় লুক্কায়িত আছে, তাহা মনে কর, উহার উত্তরাধিকারী জানে না। যে জানে, সে হয় তো মারা গিয়াছে। এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তি ঐ টাকার কথা সেই উত্তরাধিকারীকে বলিবার নিমিত্ত মহা ব্যস্ত হইয়া উঠে। যখন ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়া দাঁড়ায়, তখন অনেক স্থলে ঐ মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা ভূলোকে কোন-না-কোনরূপে আসিয়া আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করিতে বসে। সাহায্য করিতে পারিলে একটু প্রীতি অনুভব করিয়া থাকে, আর তখনই পার্থিব বন্ধন হইতে তাহার মুক্তি ঘটে। কিন্তু সকলের ভাগ্যে এরূপ সাহায্য করিতে আর ঘটিয়া উঠে না। খুব বেশীর ভাগ প্রেতাত্মাকেই পরিশেষে বুঝিতে হয় যে, মরণান্তে পার্থিব জীবনের অন্যায় কার্য্যের প্রতীকার করিবার চেষ্টা নিষ্ফল। বুঝিতে হয় যে, ঐ সকল দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া অনুতাপ করা বৃথা, কেন না, প্রতীকারের এখন কোনই সুযোগ নাই। মৃত ব্যক্তির এখন পার্থিব চিন্তা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। এই নবীন জীবনের সুবিধাগুলি যাহাতে সম্যক্ প্রকারে পাওয়া যায়, এখন উহার পক্ষে সেই দিকে লক্ষ্য করাই শ্রেয়ঃ।

যাহারা কাহারও উপর ক্রোধ পোষণ করিয়া পৃথিবী ত্যাগ করে, তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। এইরূপ ব্যক্তিদিগের অনেকে মরণান্তে আপনাদের অন্যায় বুঝিতে পারে। তখন উহাদের মনে হয়, আমরা পার্থিব জীবনে অন্যায়রূপে ক্রোধ পোষণ করিয়াছিলাম কিংবা রোষান্ধ হইয়া কত অন্যায় কাজ করিয়াছি। এই ভাবিয়া উহাদের হৃদয় দুঃখে পূর্ণ হইয়া উঠে। উহারা তখন যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণের অভিলাষী হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থলে অন্যরূপ ব্যাপারও ঘটিয়া দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ কখন

কখন বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার ভাব মরণের পরও প্রেতাত্মার প্রাণে পুঞ্জীভূত থাকিয়া যায়। তখন ঐ প্রেতাত্মা পৃথিবীর কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে চায়। কাহারও উপকার করা তখন উহার উদ্দেশ্য নহে। শত্রুপক্ষের অনিষ্টসাধনই সে সময় উহার অভিপ্রায় হইয়া উঠে। এরূপ বিদ্বেষভাবাপন্ন প্রেতাত্মার কয়েকটা কাহিনী আমরা পূর্ব্বেও বিবৃত করিয়াছি।

বিদ্বেষ ব্যতীত আরও কয়েকটি তীব্রভাব কখন কখন মৃত্যু-তোরণ অতিক্রম করিয়া চলিতে থাকে। একটি দরিদ্রা রমণীর কাহিনী আমাদের জানা আছে। জাহাজে আগুন লাগায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। জাহাজে আগুন লাগিলে রমণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইতে পারে নাই। পুড়িয়া মরিব ভাবিয়া তাহার খুব ভয় হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দাহ-জনিত কোন প্রকার দৈহিক যাতনাই তাহার ঘটে নাই; কেন না, রমণী অগ্নিশিখার আয়ত্ত হইবার পূর্ব্বেই রুদ্ধ-শ্বাস হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল। মরিয়া গেলে, কয়েক ঘণ্টা পরে তাহাকে দেখা গেল যে, তখনও যেন সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সে যে মরিয়াছে, যেন তখনও সে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। উহার মুখের ভাবটি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন তখনও ভাবিতেছে যে, 'আমি প্রজ্বলিত কক্ষের মধ্যে আটক পড়িয়াছি।' মরিয়া গেলেও তাহার মুখে সেই ভাব। এরূপ উৎকট ভয়, বস্তুতঃ বায়ু-রোগেরই পরিচায়ক। সচরাচর এরূপ ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রায়ই ভয় ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। আর এরূপ আক্রান্ত হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। তাই উহাদিগকে সান্ত্বনা করা, ভরসা দেওয়া, প্রকৃত কথা বুঝাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যই সহায়কদিগের কার্য্যের মূল-মন্ত্র হইয়া উঠে।

নিঃস্বার্থ প্রেতাত্মা

ভুবর্লোকের নিম্নতর স্তর-বিহারী বিস্তর নিঃস্বার্থ জীবাত্মা বিদ্যমান আছে। ইহারা স্বেচ্ছায় পৃথিবীর সহিত নিকট-সম্পর্কে সম্পৃক্ত থাকিতে

চায়। ইহারা যে পৃথিবীর উপর খুব আসক্ত, তাহা নহে; কোন প্রকার স্বার্থের প্রেরণাও ইহাদের প্রাণে জাগে না। তবে পৃথিবীর কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? তাহার কারণ এই যে, ইহারা উপচিকীর্ষু। অন্যের হিত করিবে, তাহাই ইহাদের বাসনা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এইরূপ একটি উপচিকীর্ষু স্বামীর বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। তদপেক্ষাও একটি বিস্ময়কর কাহিনী আমাদের জানা আছে। কাহিনীটি এই—এক জন সুবিখ্যাত ব্যক্তি মরণের পর অধ্যাত্ম-মার্গীদিগের অধিনায়কত্ব হাতে লইয়াছিলেন। শুনা যায়, ইঁহার পার্থিব জীবন পাপ ও অন্যায়-অত্যাচারের গাঢ় কলঙ্কে কলঙ্কিত ছিল। মৃত্যুর পর না কি ইনি পার্থিব জীবনের সেই সকল দুষ্কৃতির গভীরতা অনুধাবন করিতে সমর্থ হয়েন। তখন আত্ম-নির্বেদ উপস্থিত হওয়ায় স্বীয় কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পৃথিবীবাসীদিগের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। হয় তো ইঁহার মনে হইয়াছিল, কিম্বা কোন উন্নততর সহায়কের সঙ্কেতে ইনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পার্থিব জীবনে বিস্তর অসৎকার্য্য করিবার ফলে এই ভুবর্লোকে ইঁহার স্থিতি দীর্ঘকালব্যাপী হইবেই, সুতরাং বৃথা অনুতাপে কাল নষ্ট না করিয়া যথাসম্ভব পৃথিবীবাসী-দিগের উপকার করাই ভাল, তাহাতে দুঃখের মধ্যেও একটু শান্তি পাওয়া যাইবে। তাই ইনি অক্লান্ত ধৈর্য্য ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পৃথিবীবাসী মানবগণের সমীপে পারলৌকিক জীবনের যাথার্থ্য প্রতিপাদন নিমিত্ত নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার চেষ্টায় দুঃখ-ভারাক্রান্ত শত শত ব্যক্তি যে উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সহায়ক হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য

সহায়কদিগের কার্য্য যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বিশদভাবে বলা হইয়াছে। পার্থিব জীবনে স্বপ্নাবস্থায়ই হউক কিম্বা মৃত্যুর পরে ভুবর্লোকে যাইয়াই হউক, অসহায় জীবাত্মাদিগের উপকার করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর

নাই। ঐ কার্য্যে দয়া ও উদারতা যুগপৎ প্রকাশ পায়। আমাদের সকলেরই যথাসম্ভব পূর্ণ-পরিমাণে উহাতে আত্ম-নিয়োগ করা উচিত। ইচ্ছা করিলে সকলেই এই মহান্ ব্রতে ব্রতী হইতে পারে, এই সেবা-ধর্ম্মের পথ সকলের সমক্ষেই উন্মুক্ত রহিয়াছে। মননশীল ব্যক্তিমাত্রই এই পরোপকার-সাধনে সমর্থ। এ বিষয়টি মহাত্মা লেডবিটার একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। আমাদিগের প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য সহায়ক-গণকে সাহায্য করা উচিত। তাঁহারা যে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহার কতক আমাদিগেরও করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শুধু তাহাই নহে, নিঃস্বার্থভাবে উপকার-সাধন করিতে গিয়া তাঁহারা যে সকল বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়েন, সেগুলি অপসারিত করিবার চেষ্টা করাও আমাদের কর্ত্তব্য। প্রেতাত্মাদিগের সঙ্গে খুব বেশী পরিমাণে স্বার্থ-ভাব জড়িত থাকে, পৃথিবীর উপর আসক্তি খুবই প্রকাশ পায়। সহায়কগণ ঐ ভাব ও আসক্তি বিদূরিত করিয়া থাকেন। এইটিই তাঁহাদের পক্ষে খুব কঠিন কার্য্য। পার্থিব মায়া ও স্বার্থভাব প্রেতাত্মাদিগের পক্ষে বড়ই স্বাভাবিক। তথাচ উহা পার্থিব জীবনেরই অজ্ঞান-প্রসূত ফল। এই ফল যাহাতে না ফলিতে পারে, তাহা করিতে হইলে আমাদিগের যথাসাধ্য তত্ত্ব-বিদ্যার উপদেশগুলি প্রচার করা আবশ্যক। উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

মৃত ব্যক্তিদিগের সহায়কগণ উপকারব্রতের পথে আর একটি বাধাও দেখিতে পান। সেটি এই যে, অনেকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অদ্ভুত ও অসঙ্গত ধারণা পোষণ করে; আবার কেহ কেহ বা পার্থিব আত্মীয়ের স্বার্থজড়িত অসংযত শোকের আবেগে বিচলিত হইয়া উঠে। উহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেও সহায়কদিগকে অকারণ বেগ পাইতে হয়; কিন্তু উহারা পার্থিব মায়ায় বিচলিতই হউক কিম্বা ধর্ম্মবিষয়ক কুসংস্কার-চালিতই হউক, উভয় স্থলেই প্রতীকার-বিধি একইরূপ। প্রকৃত জ্ঞানলাভই সেই বিধি। উহাতে জীবিতগণ শোকের হাত হইতে ও মৃতগণ নৈরাশ্য হইতে তুল্যরূপে রক্ষা পাইয়া থাকে। যাঁহারা তত্ত্ব-বিদ্যাবিৎ, তাঁহারা ঐ প্রকৃত জ্ঞানবিস্তার

করা একটি পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। প্রকৃষ্ট দক্ষতার সহিত ঐ কর্ত্তব্যটি পালন করা আবশ্যক। অশুশ্রূষু ব্যক্তিবর্গের নিকটে সর্ব্বদা উহার আলোচনা করা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে; করিলেও তাহা ফলপ্রদ হইবে না। এবংবিধ আলোচনায় শ্রোতৃবর্গ বিরক্ত হইয়া উঠিবে। এ ক্ষেত্রে উহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে না। মনে কর, সঙ্কল্প পরিচালিত হইয়া যদি কোন আগন্তুক অকস্মাৎ আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়েন ও আমাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমাদের মেজাজ কিরূপ হইয়া উঠে? ঐ অসাময়িক প্রবেশে আমরা হয় তো বিরক্ত হইয়া উঠি। কিন্তু তত্ত্ববিদ্গণ যাহাতে অপরকে ঐ জ্ঞানের মহীয়ান্ আলোকে আলোকিত করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদের নিকট হইতে এই শান্ত, স্নিগ্ধোজ্জ্বল, দিব্য জ্ঞানালোকের বিমল রশ্মি বিকীর্ণ হইতে পারে, তদনুরূপ গুণে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিভূষিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

আবশ্যক হইলে যাহাতে পারলৌকিক তাবৎবিষয় অতীব বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, প্রত্যেক তত্ত্ববিদ্যাবিৎকে সেইরূপ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এতদ্বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞানলাভ রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহার উপর এ সম্বন্ধে যে কোন সুসঙ্গত প্রশ্নই হউক না কেন, তাঁহাকে তাহার উত্তর দিতে সমর্থ হইবার মত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এমন হইতে পারে যে, কাহারও আত্মীয় মারা গিয়াছেন; ঐ বিয়োগবিধুর ব্যক্তি হয় তো সান্ত্বনা ও উপদেশের আশায় আসিয়া উপস্থিত। তখন তাত্ত্বিকের কর্ত্তব্য কি? যাহাতে ঐ শোকাকুল ব্যক্তির যাবতীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন, তাঁহাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার উত্তর দিতে সমর্থ হওয়া চাই। আর এইরূপে সেই সমাগত শান্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে মৃত্যু ও পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানদান করিতে হইবে। সাধারণ শ্রেণীর মানবকে যথার্থ জ্ঞানের পথে পরিচালিত করিবার পক্ষে এইরূপ ক্ষেত্রই সুবর্ণসুযোগ বলিতে হইবে।

এই প্রকারে ঐ সকল শোকাকুল ব্যক্তির দুঃখের হ্রাস ও জ্ঞানের বিকাশ করিয়া দিতে পারিলে উঁহারা আর তখন সূক্ষ্ম-লোক-চারী সহায়কদিগের কার্য্যের বাধা উৎপাদন করিতে পারেন না ; সুতরাং উঁহারাও তখন ঐ সকল শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তিবর্গের মৃত আত্মীয়ের উপকার করিতে সমর্থ হয়েন। শোকাকুল ব্যক্তিবর্গকে যথার্থভাবে বুঝাইয়া উপযুক্ত তাত্ত্বিক এতটা উপকারসাধন করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার উপদেশে উঁহারাও মৃত্যু-ব্যাপারটি প্রকৃতভাবে দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ হয়। এক দিন না এক দিন উহাদের নিকটেও মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে। সে ভয়ানক সময়ের জন্য উহারা প্রস্তুত হইতে পারে। ইহলোক পরলোক সর্ব্বত্রই তত্ত্ব-বিদ্যা উপকার-সাধন করিয়া থাকে। তত্ত্ববিদ্যায় আমরা অকাট্য বেদব্যাসের ন্যায় সত্য দেখিতে পাই। সে সত্য সকলেরই উপকার-সাধক। সত্যটি এই—"মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই।" এই সত্যে জীবন ও অমরত্ব-রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। যাহারা এই সত্য লাভ করিতে প্রয়াসী, তাহাদিগকে উহা দান করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা আনন্দের সঙ্গে উহা দান করিতে চাই। এইরূপ দানে আমরা প্রীতি অনুভব করি, আর এই সত্য প্রচার করিতে আমরাই একমাত্র অধিকারী।

পারলৌকিক জীবনে আরও অনেক সুবিধা আছে

পূর্ব্ববর্ত্তী পার্থিব জীবনের সহিত পারলৌকিক জীবন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইলেও উহার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। উহা পার্থিব জীবনেরই ফল, তদ্ভিন্ন উহা আর কিছুই নহে, এরূপ ভাবা একটা মহাভ্রম। যাহারা মরণের পর পরমাণুর নবীন বিন্যাসসঞ্জাত সূক্ষ্ম-দেহ ও পারিপার্শ্বিক বিনা ওজরে গ্রহণ করিয়া বসে, তাহাদের নিকট পারলৌকিক জীবন অনেকটা পার্থিব জীবনেরই ফলস্বরূপ বটে। কিন্তু যে ব্যক্তি পরলোক ও তত্রত্য সুযোগ সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণও জ্ঞানলাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে পারলৌকিক জীবন স্বতন্ত্র প্রকার। সূক্ষ্ম-জগতে প্রভূত পরিমাণে উপকার অপকার দুই-ই

করা যাইতে পারে। সেখানে বিস্তর শিখিবার বিষয় রহিয়াছে, শিখি
পন্থাও অনেক। যাহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা সেখানে অনন্ত
পাইয়া থাকে। কাজের সেখানে শেষ নাই। সাধারণ শ্রেণীর
স্বভাবতঃ ঐরূপ কার্য্যে লিপ্ত হয় না। এরূপ লোক পার্থিব জীবনে
পরায়ণ হয়, পরলোকে গেলে ইহাদের চিন্তা স্বার্থকলুষিতই থাকে।
কখন ইহাদের দৃষ্টিপ্রণালী ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়; তখন প্রকৃত
দেখিতে পায়। তখন বুঝিতে পারে যে, এ পর্য্যন্ত স্বার্থচিন্তায় তাহ
সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছে। যেমন এইরূপ বুঝে, অমনই আত্মোৎকর্ষে স
রূপে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে। কখন কখন মৃত্যু হওয়ায় মা
প্রকৃতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, আর সেই পরিবর্ত্তনে শুভফলই ফ
থাকে। এমন দেখা গিয়াছে যে, এক জন অসৎ লোক মরণের পর
শীঘ্র শীঘ্র ভাল হইয়া উঠিল; সাধারণ শ্রেণীর মানব উচ্চতর ও প্রশস্ত
সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া বসিল; যে ব্যক্তি সৎ, তিনি হয় তো মর
পর আরও ভাল হইয়া উঠিলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা হয় তো আরও পরোপ
হইয়া দাঁড়াইলেন।

একটি তৃপ্তিকর ঘটনা

একটি গল্প বলিব। গল্পটিতে উপরি-উক্ত কথার প্রমাণ পাওয়া য
গল্পটি এই—দুইটি যুবতী অকস্মাৎ মৃত্যু-মুখে পড়িল। এক জনের
১৬, অপরের ১৮। দুই জনই পার্থিব জীবনে বেশ ভাল ছিল। স
আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহাদের পার্থিব জীবন সেইরূপই
বেশ কোমল-প্রকৃতি, স্নেহময়ী, সদভিলাষিণী। কিন্তু একটু সুখ্যাতি
উহারা ভালবাসিত, আর একটু বেশভূষারও পক্ষপাতিনী ছিল।
প্রায়ই এরূপটি হইয়াও থাকে। জীবনে কতই সুখী হইবে ভাবি
ভাবী জীবনের দিকে কতই আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উৎফুল্ল-প্রকৃ
চাহিতেছে, এমন সময় মৃত্যুর করাল ছায়া আসিয়া তাহাদের উপর প

এই আকস্মিক মরণে তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, ভুবর্লোকের নবীন অবস্থার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে প্রথম প্রথম তাহাদের একটু অসুবিধা হইতে লাগিল। কিন্তু এক দল অদৃশ্য সহায়কের সাহচর্য্যে তাহারা শীঘ্রই সেবাব্রতের উৎসাহে উৎসাহিনী হইয়া উঠিল। তখন পরোপকারে সম্পূর্ণভাবে প্রাণমন উৎসর্গ করিল। পূর্ণযৌবনে ঢল-ঢল লাবণ্যের মধ্যে এই আকস্মিক মরণটি হওয়ায় উহাদিগকে স্বভাবতঃ ভুবর্লোকে একটু দীর্ঘকাল থাকিতে হইল। কিন্তু ঐ সময়টা তাহারা পরোপকারে উৎসর্গ করিয়াছিল।

রমণী দুইটির পার্থিব আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে তাহাদের পারলৌকিক অবস্থা জানিতে না পারায় এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিল, "আহা, উহারা বড় অল্পবয়সে মারা গেল, বাঁচিয়া থাকিলে উহারা কতই সুখী হইত। আহা! উহাদের বড়ই শোচনীয় মরণ হইয়াছে।" অথচ, প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা অপেক্ষা সুবিধাজনক মরণ আর হইতে পারে না। কেন না, ভূলোকে স্থূলদেহে উহারা বিংশতি বৎসরে যে পরোপকার করিতে পারিত, তদপেক্ষা অনেক অধিক কার্য্য এই উচ্চতর নবীন জীবনে মাত্র এক বৎসরমধ্যেই করিতে এখন সমর্থ। তদ্ভিন্ন পার্থিব জীবনে পার্থিব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কার্য্য-ফল যেরূপ হইবার কথা, তদপেক্ষা অনেক অধিক মহীয়ান্ ফল উহাদের কার্য্যে এখন ফলিতেছে। উহাদের কার্য্য-ক্ষেত্রও এখন খুব বেশী বিস্তৃত। পার্থিব জীবনে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রও পাওয়া যায় না। পার্থিব জীবনে বাধ্য হইয়া উহাদিগকে নানা কার্য্যে সময় দিতে হইত। উহারা কতকটা সময় সৎকার্য্যে ও পর-সেবায় উৎসর্গ করিতে পারিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাচ বাধ্য হইয়া অনেকটা সময় উহাদিগকে তুচ্ছকার্য্যে নষ্ট করিতে হইত। কারণ, ভূলোকে তুচ্ছ কার্য্যই খুব বেশী। এখন উহাদের একটি মুহূর্ত্তও নষ্ট হয় না। উহারা এখন মহোল্লাসে, ফূর্ত্তির সহিত উন্নতির পথে ছুটিয়া বেড়ায়। এই নবীন জীবনে উহাদের ক্লান্তি নাই, কষ্ট নাই। কেন না, মুহূর্ত্তের জন্যও উহারা এখন আপনাদের

ভাবনা ভাবে না ; এখন কেবল পরের ভাবনাই ভাবে। শত শত ব্যক্তিকে কেমন করিয়া সাহায্য করিবে, কেমন করিয়া তাহাদের প্রাণে শান্তির সঞ্চার করিবে, উহাদের মনে এখন কেবল সেই চিন্তাই জাগিতে থাকে।

অতএব দেখা গেল যে, ভুবর্লোকে প্রেতাত্মা অনেকটা আত্মোন্নতি-সাধন করিয়া লইতে পারে। চিন্তা করিলে ইহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতাম ; কেন না, উন্নতিই ভাগ্যবতী ব্যবস্থার চিরন্তন বিধি; এতদ্বিধি অন্যত্রও যেরূপ, এখানেও সেইরূপ। আমাদের জ্ঞানের পরিপুষ্টির অনুপাতেই এখানে আমাদের উন্নতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বাসনার দাস, বাসনা-ক্ষয় হইলে তাহার উন্নতি হইবে। ভুবর্লোকে বাসনা-পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিধি, ইহাপেক্ষা সুন্দর ব্যবস্থা তথায় আর সম্ভবপর নহে। কিন্তু যিনি দয়াশীল ও পরোপকারী, তিনি সেখানে নানাবিধ কার্য্য করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন। তাই তাঁহার অভিজ্ঞতার গণ্ডীও বহুদিক্ হইতে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাঁহাকে যখন আবার এই ভূ-লোকে আসিয়া জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তখন তিনি এই নিঃস্বার্থভাবের অনুশীলন-ফলে অনেক অতিরিক্ত শক্তি ও গুণের অধিকারী হইয়া আইসেন।

আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ

পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে অনেকে সর্ব্বদাই অনেক প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই—"আমরা কি মৃত আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে ও চিনিত পারিব ?" নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব, নিশ্চয়ই চিনিতে পারিব। কেন না, মরণের পর তাহাদের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, আমাদেরও কোনপ্রকার রূপান্তর ঘটিবে না। তবে কেন তাহাদিগকে চিনিতে পারিব না ? সূক্ষ্ম-জগতে গেলেই স্নেহ-ভালবাসা অন্তর্হিত হয় না। স্নেহ সেখানেও আছে। যাহাদের সহিত আমরা মায়া-ডোরে আবদ্ধ, মরণের পর তাহাদের সহিত একত্র হইয়া পড়ি। ঐ ভালবাসাই চুম্বক-শ

হইয়া আমাদিগকে সমবেত করিয়া ফেলে। পার্থিব জীবনে মিলিত হইতে একটু বিলম্ব ঘটে, কিন্তু তথায় একত্র হইতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব লাগে না। কোন প্রাণ-প্রিয় আত্মীয় যদি আমাদের মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্বে মরিয়া থাকে, তবে বাস্তবিকপক্ষে সে হয় তো আমাদের মরণ-সময়ে ভুবর্লোক ত্যাগ করিয়া স্বর্লোকে যাইয়া উপনীত হইয়াছে। আমরা ভুবর্লোকে যাইয়া দেখি, সে তৎপূর্ব্বেই হয় তো স্বর্লোকে চলিয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে যত দিন আমরা স্বর্লোকে না যাই, তত দিন তাহার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ ঘটে না, প্রতীক্ষা করিতে হয়। পরে স্বর্লোকে যাইয়া তাহাকে দেখিতে পাই। এই পার্থিব দেহের কারাগৃহে আমরা তাহাকে যতটুকু দেখিয়াছিলাম, স্বর্লোকে তাহাকে তদপেক্ষা অনেক সুন্দর দেখিয়া থাকি। আমাদিগের যে সকল স্নেহভাজন ভালবাসার পাত্র মারা গিয়াছে, আমরা নিশ্চিতই তাহাদিগকে দেখিতে পাইব, এ কথাটি খাঁটি সত্য। আমরা তাহাদিগকে হারাই নাই।

মৃত্যু ব্যাপারটি একটি অধিকতর প্রশস্ত ও পূর্ণ জীবনে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ। যদি আমরা ঐটুকু বুঝিয়া রাখিতে পারি, তবে আত্মীয়-স্বজনের মরণ আমাদিগের নিকটে স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইবে। তাহা হইলে তাহার বিরহ-যাতনা এত বেশী ও এরূপভাবে অনুভূত হইবে না। কেন না, প্রথমতঃ আমরা জানি যে, জীবাত্মাগুলির মধ্যে বিরহ-বিচ্ছেদ অসম্ভব। আমরা আত্মীয়ের জীবাত্মাকেই ভালবাসি, তাহার দেহটি মাত্র ভালবাসিবার জিনিস নহে। দেহটি তাহার বহিরাবরণমাত্র, আমরা মানুষটাকেই ভালবাসি, পোষাকটিকে নহে। উচ্চতর স্তরে মৃত আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা ত হইয়াই থাকে, তাহার নিম্নস্তরেও যে আমাদের কাছে থাকে, আমরা তাহাও বুঝিতে পারি। মৃত আত্মীয়ের নিকট হইতে আমরা কখনই বিচ্ছিন্ন নহি। আমরা পৃথিবীতে বাঁচিয়া রহিয়াছি, আমাদের আত্মীয় মরিয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা নহে, সে সর্ব্বদার জন্যই আমাদের নিকটে আছে। সে যে খুব

দূরে নক্ষত্রনিকরেরও ও-পিঠে স্বর্গ-নামক একটা অজানা অনিশ্চিত স্থানে অ
রহিয়াছে, তাহা নহে। সে এই পৃথিবীতেই আমাদের নিকটে আছে উ
আমরা যে ভাবনা ভাবিতেছি, তাহা সে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছে ভ
আমাদের মনে যে সকল চঞ্চল আবেগরাশি উদ্ভূত হইতেছে, অনেক সময় ক্র
সে তাহা জানিতে পারিতেছে। আমরা প্রতি রাত্রিতেই নিদ্রাকালে আ
তাহার সহিত মিলিত হইতেছি। যদি তাহার মৃত্যুর অল্পদি
পরেই আমাদের মরণ হয়, তবে অনতিবিলম্বেই আমরা তাহাকে
ভুবর্লোকে দেখিতে পাই। তাহার মৃত্যুর পরেও যদি আমরা অনে
দিন বাঁচিয়া থাকি, তবে মরণান্তে স্বর্লোকে তাহাকে দেখিতে
পাইব। যদি স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন থাকে, তবে ভুবর্লোকেই হউক, আ
স্বর্লোকেই হউক, এক স্থানে না এক স্থানে সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই ঘটিবে। কে
না, ভালবাসাই জাগতিক শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি
জীবনে মরণে উহার প্রভাব অপ্রতিহত।

তত্ত্ব-বিদ্যার পূর্ণ আলোচনায় আমাদিগের বাস্তবিক লাভ আছে
উহাতে আমরা প্রকৃত সত্য অবগত হইতে পারি। তাহার ফলে আমাদে
মরণ-ভয় দূরে যায়, আর জীবনযাপন ব্যাপারও প্রীতিকর হইয়া উঠে
কেন না, তখন আমরা উহার উদ্দেশ্য ও পরিণাম বুঝিতে পারি। যাঁহা
অকলঙ্ক নিঃস্বার্থ জীবন অতিবাহিত করেন, মৃত্যু তাঁহাদিগকে আনন্দ
প্রদান করিয়া থাকে। লাটিন ভাষায় একটি প্রবচন আছে যে—"মৃ
জীবনের দ্বার।" কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বাস্তবিকই তাঁ
সত্যই উহা পূর্ণতর ও উচ্চতর জীবনের তোরণস্বরূপ। পরলোকেই হউ
আর ইহলোকেই হউক, একই ন্যায়সঙ্গত ঐশ নিয়ম সর্ব্বত্র বি
করিতেছে। আমরা ঐ ঐশ বিধির উপর সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণ নির্ভর করি
পারি। ঐ বিধির প্রভাব আমাদের উপরেও যেমন, আমাদের স্নেহ-ভাল
বাসার পাত্রদিগের প্রতিও তদ্রূপ। জীবন অনন্ত; উহার বিনাশ না
এই তথ্যটুকু একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই যাবতীয় ভুল ধা

অপগত হইবে। তখন আমরা প্রত্যেক বিষয়টিকে যেরূপ ভাবে দেখা উচিত, সেইরূপ ভাবে দেখিতে আরম্ভ করিব। তখন আর মৃত্যুকে ভয়ঙ্করমূর্ত্তি যমরাজ বলিয়া মনে করিব না, আমরা তখন তাহাকে ক্রমোন্নতির দিব্যকান্তি স্বর্গদূত বলিয়া বরণ করিয়া লইব। কেন না, আমরা জানি যে,—

"জীর্ণ বাস পরিহরি, নব বাস অঙ্গে ধরি,
কতই আনন্দ পাই মনে।
সেইরূপে স্থূলদেহ, রক্ত-মাংস-মজ্জা-গেহ,
ত্যজি যাই নূতন সদনে॥"

ভগবদ্গীতা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রেত-মূর্ত্তিতে দেখা দেওয়া

পরাবিদ্যা-সমিতির ও প্রেতানুসন্ধান-সমিতির অনুসন্ধান-ফলে আজকাল ভূত-প্রেতের অনেক ব্যাপার জানা যাইতেছে। কিছু দিন আগে লোকে ভূতে বিশ্বাস করিত না। যাহারা ভূতে বিশ্বাস করিত, লোকে তাহাদিগকে ঘোর অজ্ঞান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবিত। ভূত-বিশ্বাসীরা প্রায়ই উপহাসের আস্পদ ছিল। কিন্তু এখন আর উপহাস করিলে চলে না; এখন ভূত সম্বন্ধে খোঁজ-খবরের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ভাল ভাল জগৎ-প্রথিত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা খাঁটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভূতের তত্ত্ব-তল্লাস সংগ্রহ করিতেছেন। এ যাবৎ বিস্তর লোক ভূত দেখিয়াছে, কিন্তু যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা প্রায়ই দেখার সময় ভয়ে কেমন একরূপ জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল; তাই তাহাদের কথা অনেক সময় ঠিক ঠিক বিশ্বাস করা চলে না। সবগুলি বিশ্বাস না করিলেও অনেকগুলিই যে খাঁটি সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভূতের গল্পগুলি একটু এলোমেলো হইলেও একটু চেষ্টা করিয়া বুঝিলে উহাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা—একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

পরাবিদ্যা-সমিতি বলেন যে, আমরা এই স্থূল-শরীরেই সূক্ষ্ম-জগতের বিষয় অবগত হইতে পারি; তাহা হইলে ভূতের খোঁজখবর ঠিক পাইবার আশা আমাদের প্রাণে নিশ্চয়ই আসিতে পারে। আমরা কয়েকটি ভূতের গল্প করিব। মৃত্যুর পর মানুষের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, সে সব কথা ঐ গল্পে অনেকটা বুঝা যাইবে। পরাবিদ্যা সূক্ষ্ম-জগতের অনেক সংবাদ দেয়। পরাবিদ্যাবিৎ লেড্‌বিটার সাহেব বলেন যে, ভূতের কাহিনীগুলি একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে সূক্ষ্ম-জগতের অনেক কথাই অনুমান করিয়া লওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, পরাবিদ্যা-প্রদত্ত বিবরণ একটুও মিথ্যা নহে।

পরাবিদ্যা ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মমতে পরলোক সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি ভুল। প্রেত-দর্শনের বিস্তর সত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সেই বিবরণের কয়েকটা আমরা এখানে বলিব। যে গল্পগুলি বলিব, তাহা অতীব সুস্পষ্ট ও সত্য। কয়েকটি স্থলে যতটা বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা উচিত ছিল, তাহা ঘটে নাই। এখন সেই বিশেষ তথ্যগুলি জানিবারও উপায় নাই।

ভূতযোনি সম্বন্ধে বিস্তর গল্প আছে। গল্পগুলি খুব বেশী রকম অতি-রঞ্জিত, হঠাৎ যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যাঁহারা পরাবিদ্যার গূঢ় রহস্যের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা উহার মধ্য হইতেই প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিয়া লয়েন; কোন্‌টুকু সত্য, কোন্‌টুকু মিথ্যা, তা বেশ বুঝিতে পারেন। অনেক সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় বেশ নামজাদা লোকেরাও অনেক ভূতের গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি এত বাড়িয়ে লেখা, যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। বড়ই দুঃখের বিষয়, যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত ব্যাপারটা জানিবার জন্য একটুও কষ্ট-স্বীকার করেন নাই। যদি সত্য ব্যাপারটা তাঁহারা লিখিতেন, তবে তাঁহাদের লিখিত গল্পগুলি আরও চিত্তাকর্ষক হইত, লোক আরও আগ্রহ করিয়া পড়িত।

যতগুলি ভূতের গল্প লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলির মধ্যে প্রায়ই অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য। আবার অনুসন্ধান করিলেও অনেকগুলির এখন প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব। তথাচ গল্পগুলি মূলতঃ সত্য বলিয়াই মনে হয়। কেন না, একই ধরণের বিস্তর গল্প শুনা যায়। আর অনেকগুলি যে সত্য, তার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এতই সত্যমূলক, এতই প্রমাণ-বাহুল্যে দৃঢ়ীকৃত যে, একটা আধটা গল্প মিথ্যা হইলেও তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমরা যে গল্পগুলি বলিব, সেগুলি সংক্ষেপেই বলিব, বিশেষ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; কেন না, তাহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটান আমাদের ইচ্ছা নহে।

ভূতের গল্পের আমাদের অভাব নাই। বরং এত বেশী গল্প আমাদের জানা আছে যে, কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি বলিব, তাহার নির্ব্বাচন করাই আমাদের পক্ষে কঠিন। গল্পগুলি এতই অদ্ভুত যে, তাহার পরীক্ষা করিয়া উঠাই মহা দুরূহ ব্যাপার। সূক্ষ্ম-জগতের ব্যাপার জানিবার জন্য অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপক সিজ্‌উইক্ যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, সূক্ষ্ম-জগতের বাস্তব ব্যাপার এ পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে, ইহা বড়ই লজ্জার কথা! সূক্ষ্ম-জগতের ঘটনাপুঞ্জ খুব সত্য। সেগুলি এতই দুর্ব্বোধ্য যে, সম্যক্‌ভাবে বুঝিয়া উঠা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ঠিক একই রকমের অনেকগুলি ভৌতিক ব্যাপার একাল-সেকাল ঘটিয়া আসিতেছে মনে হয়। সেগুলির মধ্যে একটু একটু পার্থক্য আছে।

যাহাদের চক্ষুতে ঐ রকম ভৌতিক ব্যাপার পড়ে, তাহারা সাধারণতঃ ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া উঠে। তাই তাহারা ভূতের ব্যক্তিগত ভাবটাই দেখিয়াছে, তাহারা বৈজ্ঞানিক হিসাবে উহার পরীক্ষা করিবার সুবিধা পায় নাই। বৈজ্ঞানিক হিসাবে দেখিলে হয় তো অনেক তথ্য জানা যাইত। ভয়-বিহ্বল হওয়ায় সে সব তত্ত্ব অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। যাহারা কখন ভূত-যোনির আলোচনা করে নাই, ভূতের কি জানিতে হইবে না হইবে, তাহা তাহারা আদৌ জানে না। আবার যাহারা ভূত দেখিবার জন্য খুব বেশী ইচ্ছুক, ভূত তাহাদিগকে বড় একটা দেখা দেয় না। এইরূপে প্রকৃত ব্যাপার না জানায় পারলৌকিক ব্যাপার অনেকের কাছে ভয়ানক এলোমেলো বলিয়া বোধ হয়। তাই কোন্‌টা প্রকৃত ভূত, আর কোন্‌টাই বা স্থূলদেহধারীর সূক্ষ্মমূর্ত্তি, তাহা জানিতে অনেকে চেষ্টাও করে না। সূক্ষ্ম-জগতে ভূত-যোনির মত চিন্তা-মূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক রকম মূর্ত্তি বিচরণ করিয়া থাকে। কোন্‌টি কিরূপ মূর্ত্তি, তাহা জানা আবশ্যক।

আমরা পরে সে সব বিষয়ের কিছু কিছু পরিচয় দিব। মানুষ স্থূলশরীরী, অথচ তাহার সূক্ষ্ম-দেহ স্থূল-শরীর ছাড়িয়া বিচরণ করিতে পারে, আমরা সেই অদ্ভুত ব্যাপারটাই প্রথমে আলোচনা করিব। আমাদের এ দেহ হইতে

অল্পসময়ের জন্য কোন কোন সময় একটি সূক্ষ্মদেহ বাহির হইয়া অন্যত্র বিচরণ করে ; এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমরা অতি সহজে এ কথা বুঝিতে পারিব যে, মরণকালে চিরদিনের জন্য এই স্থূল-দেহ বিনষ্ট হইলেও একটা সূক্ষ্ম-দেহ-ধারী জীবাত্মা বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব নহে ; পরন্তু, থাকাই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই বলিতেছিলাম, আমরা প্রথমেই আমাদের প্রেত-মূর্ত্তির বহির্গমন-বিষয় আলোচনা করিব। ম্যাডাম্ ডিএস্পার্‌য়্যান্স-নাম্নী রমণী এক জন খুব ভাল মিডিয়ম্ ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার উপর খুব শীঘ্র শীঘ্র ভূতযোনির আবেশ হইত। এই স্ত্রীলোকটি নিজের জীবন-চরিত নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানির নাম "ছায়া-রাজ্য।" এই পুস্তকের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় একটি অদ্ভুত ব্যাপার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জীবিতকালেই ইহার প্রেত-মূর্ত্তি এক দিন স্থূল-শরীর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বিচরণ করিতেছিল, সেই বিস্ময়কর ব্যাপার তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :—

সূক্ষ্ম-জগতের প্রথম আভাস

"গ্রীষ্মকাল। রবিবারের প্রাতঃকালে এক দিন আকাশ বেশ নির্ম্মল। দিব্য ফুটফুটে রৌদ্র। আমি একখানি বই লইয়া সোফায় বসিয়া পড়িতে বসিয়াছিলাম। বইখানি আমার হাতে ছিল বটে, কিন্তু মনটা আমার বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছিল। কাজেই কেমন একরূপ তন্দ্রার ভাবে আমি আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। ক্রমে পুস্তকের অক্ষরগুলি যেন চোখের সম্মুখে অস্পষ্ট হইতে লাগিল। যেন কেমন একটা মূর্চ্ছার ভাব আসিয়া পড়িল। চারিদিক্ যেন আমার আঁধারে ঘিরিয়া ফেলিল— আমার মনে হইতে লাগিল, আমি আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। অন্যকে এ সময় ডাকিতে আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও বেশ মনে হইতে লাগিল যে, তখন সে স্থানে কোন লোক ছিল না। অল্পসময়ের মধ্যেই আমার সেই মূর্চ্ছার ভাবটা অপসারিত হইল। কাহাকেও ডাকিয়া

হাঁকিয়া জ্বালাতন করিতে হইল না ভাবিয়া মনে মনে একটু আনন্দও হইল। আবার বাহির দিকে চাহিলাম। কিন্তু অদ্ভূত ব্যাপার! বহিখানি খুব দূরে আর অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি আগেই সোফা হইতে উঠিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার স্থানে আর এক ব্যক্তি বহি হাতে করিয়া বসিয়াছিল। ভাবিলাম, লোকটা কে? তখন সেই অবস্থায় আমি বড়ই আরাম বোধ করিতেছিলাম। শরীর অতি চমৎকার হাল্কা আর বেশ সবল। মূর্চ্ছার ভাব গিয়াছে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কেমন এক-রূপ বিস্ময়কর স্বাস্থ্য ও শক্তির অনুভূতি আমাকে যেন ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। এমন সুন্দর সুখানুভূতি তাহার পূর্ব্বে আমার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই।

"আমার দেহটার মধ্যে যেন জীবন জিনিসটি জাগিয়া উঠিতেছিল। আমার শিরার মধ্যে যেন জীবন স্ফুরিত হইয়া, উচ্ছলিত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেহটার সর্ব্বাংশেই একটা নবীন শক্তি, একটা চমৎকার মুক্তভাবের অনুভূতি যেন তাড়িত-গতিতে ছড়াইয়া পড়িল। বাঁচিয়া থাকার প্রকৃত আস্বাদটা আমি যেন সেই দিনই প্রথম উপভোগ করিলাম।

"আমার সেই ঘরটিকে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যে, ঘরটি খুব ক্ষুদ্র, ভয়ানক রুদ্ধ, বিশ্রী অন্ধকার। আর ভাবিতে লাগিলাম, সোফার উপরিস্থ ঐ অস্পষ্ট মূর্ত্তিটিই বা কে? মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের, কিন্তু কে? মূর্ত্তিটি নীরবে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমি উহাকে একটু একটু চিনি। তখন আমার প্রাণে একটা মুক্তভাবের হাওয়া লাগিয়াছিল। সেই ভাবই আমার বড় ভাল লাগিতেছিল। তাই আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু যাই কোথায়? জানালার কাছে গেলাম। অদ্ভুত! আমার চারি-দিকের সব জিনিসপত্রই অস্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, দেওয়ালগুলি আমার নিকট সরিয়া আসিতেছে, আবার তখনই অন্তর্হিত হইয়া গেল। কিন্তু কোথায় যে গেল, জানি না।"

আমাদের স্থূল-শরীর ত্যাগ করিয়া যখন জীবাত্মা বাহিরে চলিয়া যায়, তখন তাহার ভারি স্ফূর্ত্তি। তখন সে চমৎকার স্বাস্থ্য ও শক্তি অনুভব করে। তাহার মনে হয়, যেন এক ভয়ানক বোঝা তাহার ঘাড়ের উপর হইতে সরিয়া গিয়াছে। জীবাত্মা তখন নিজেকে খুব হাল্‌কা মনে করে, খুব চমৎকার একটা আরাম অনুভব করে। লেড-বিটার প্রভৃতি অনেক যোগীই এই অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন। মরণের সময় রুগ্ন দেহ ত্যাগ করিলে জীবাত্মার এই আরাম-বোধ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। এমন কি, সুস্থ দেহ ত্যাগ করিলেও এরূপ আরাম বোধ হয়। স্থূল-দেহটা আত্মার পক্ষে একটা ভয়ানক ভার-স্বরূপ। যোগীরা ইচ্ছা করিলেই স্থূল-শরীর খানিকটা সময়ের জন্য ত্যাগ করিয়া ঐরূপ চমৎকার মুক্তভাব উপভোগ করিতে পারেন। তাঁহাদিগের পক্ষে এটি খুব সহজ ও দৈনন্দিন ব্যাপার। কয়েদীকে অন্ধকার হইতে ফুটফুটে আলোতে আনিলে তাহার যেমন আনন্দ হয়, দুর্ব্বল সসীম অবস্থা হইতে সবল বিরাট অবস্থায় আসিলে যেমন আনন্দ হয়, স্থূল-জগতের উন্নততর জীবনে আরূঢ় হইলে প্রাণে সেইরূপ আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।

জীবিত ব্যক্তির প্রেতদেহে পরিভ্রমণ

মিঃ আর, ডি, আউয়েন্ "অপর জগতের দ্বারদেশে" নামক পুস্তকের ২৫৬ পৃষ্ঠায় সূক্ষ্মদেহে পরিভ্রমণের একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ও যাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, এই দুই ব্যক্তিরই বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পরে মিলাইয়া দেখা গিয়াছে। যিনি প্রেত-দেহে বিচরণ করিতেন, তিনি এক জন স্ত্রীলোক। রাত্রিকালে স্বামীর কাছে শুইয়া থাকিতে থাকিতে উঁহার সূক্ষ্মমূর্ত্তি স্থূল-শরীর হইতে সূক্ষ্ম জড়াংশ আকর্ষণ করিয়া লইয়া একটি দেহ রচনা করিত। তাহার পরে তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দূরবর্ত্তী কোন স্থানে যাইয়া অন্য একটি আত্মীয়ার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। যাইবার সময় ইঁহার মনে হইত

যে, ইনি মারা গিয়াছেন; কিন্তু রাত্রিশেষে যখন আবার স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিতেন, তখন বুঝিতে পারিতেন যে, মরি নাই, সত্য সত্যই বাঁচিয়া আছি। এই সূক্ষ্মদেহ অনায়াসে স্থূল দেওয়াল প্রভৃতির ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে পারিত, কোন প্রকার অসুবিধা ঘটিত না। ইহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সূক্ষ্মদেহে চলিয়া যাওয়া আবার ফিরিয়া আসা, এ সব ব্যাপার রমণীর মনে থাকিত না; কারণ, এই সব ব্যাপার-কালে অনেকটা জ্ঞানের লোপ ঘটিত।

স্ত্রীলোকটির প্রেতমূর্ত্তি এইরূপে নিশাভ্রমণ করিত। বিশেষ উদ্দেশ্যেই প্রেতমূর্ত্তিরা এইরূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। একটু অনুসন্ধান করিলেই সে উদ্দেশ্য স্থির করা যায়। এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই কোন একটা উদ্দেশ্য ছিল।

পোস্ত-গাছ

লেড্‌বিটারের এক জন অল্পবয়স্ক বন্ধু তাঁহাতে এইরূপ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন:—"প্রায় সপ্তাহকাল হইল, মাতা পিতা উভয়েই অন্যত্র গিয়াছিলেন। এক দিন জি-নাম্নী আমার ছোট ভগিনীর অসুখ হইয়া পড়ে। অসুখের সময় দেখা গেল, রাত্রিকালে জি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আর দেখা গেল, বিছানার চাদর দিব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে কে যেন পাতিয়া মুড়িয়া দিয়া গিয়াছে। জি যখন শুইয়াছিল, তখন চাদর এরূপ সুন্দর পাতা ছিল না, অথচ রাত্রির শেষে দেখা গেল, চাদর-খানি অতি সুন্দরভাবে পাতা। পর পর তিন রাত্রি ধরিয়া এইরূপ ব্যাপার হইতে লাগিল। তৃতীয় রাত্রির শেষে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, জি দেখিল, মা তাহার বিছানায় বসিয়া আছে। একটু পরেই সেই মাতৃ-মূর্ত্তি উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঐ রাত্রিতে বিশ্রী ঝড় হইয়াছিল। সেই ঝড়ে পোস্ত-গাছগুলি ভূমিসাৎ হয়। গাছগুলি পিতা বাড়ীর সম্মুখস্থ বাগানে রোপণ করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে মা বাড়ী আসিলে তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, তিনি সেই বিদেশে পর পর তিন রাত্রি

ধরিয়া 'জি'কে স্বপ্নে দেখিয়াছেন। তিনি দেখিতেন, যেন তিনি 'জি'র বিছানা পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। তিনি বলিলেন, তৃতীয় রাত্রিতে তিনি যেন ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন আর গাছগুলিকে ধরাশায়ী দেখিয়া দুঃখিত হইয়া বলিতেছেন যে, 'আহা, এমন করিয়াও গাছগুলি পড়িয়া গিয়াছে।' এ কথাগুলি যেন তাঁহার এখনও মনে জাগিতেছে। মা বলিলেন, বাড়ীর দরজা খোলা ছিল, এখনও তাঁহার সে কথা মনে আছে।

এই ব্যাপারটিতে আমাদের মনে হয়, স্নেহবশতঃই মায়ের সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। মা বিদেশে থাকিয়া স্বভাবতঃই সন্তানের অসুখ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই সন্তানকে যত্ন-শুশ্রূষা করিবার জন্য সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল আর বিছানা জুতবরাত করিয়া দিতেছিল। তৃতীয় রাত্রিতে ঐ মূর্ত্তি সূক্ষ্ম জড়াংশ সংগ্রহ করিয়া অল্প একটু স্থূলভাব ধারণ করিয়াছিল। তাই 'জি' নাম্নী কন্যা তাঁহাকে স্থূল-চক্ষুতে দেখিতে পায়। সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি গাছগুলি দেখিয়া একটু দুঃখ করিয়াছিল, দরওয়াজা খোলার কথা মনে করিয়া রাখিয়াছিল। এ সব ব্যাপারে প্রেত-মূর্ত্তি যথার্থ আসিবার কথাই প্রমাণিত হয়।

কাহারও কাহারও দিব্যদৃষ্টির শক্তি সহজেই স্ফুরিত হয়। আবার কাহারও কাহারও ঐ শক্তি গভীরভাবে অন্তর্নিহিত থাকে। উপরি-উক্ত স্ত্রীলোক দুইটির শক্তি খুব অল্পেই প্রকাশ পাইবার মত ছিল। যাহাদের শক্তি অন্তর্নিহিত, বিশেষ বিপদের সম্ভাবনাস্থলে তাহাদের সেই শক্তি জাগিয়া উঠে, কিংবা খুব একটা অভাবের সময়েও উহা জাগিয়া থাকে।

অচৈতন্য অবস্থায় সাহায্যের অন্বেষণ

স্থূল-শরীর মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে অথচ সূক্ষ্ম-দেহটা স্থানান্তরে যাইয়া অপরের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, এরূপ ঘটনা বিস্তর শুনিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার "ল" নামক এক ব্যক্তি "দৃশ্য ও ছায়া" নামক পুস্তকের ৮৮ পৃষ্ঠায়

এইরূপ ভাবের একটি গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গল্পটি এইরূপ:— বিলাতের অক্সফোর্ড প্রদেশে দুই জন পুরোহিত ছিলেন, এক জনের নাম ডব্লিউ, অপরের নাম—পি। দুই জনে এক কলেজে পড়াশুনা করিয়াছিলেন। ডব্লিউ অক্সফোর্ড সহরেই থাকিতেন, কিন্তু "পি" ১৮ মাইল দূরে অবস্থান করিতেন। এক দিন রাত্রিকালে ডব্লিউ একটা দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। ঘুম ভাঙ্গিলেও স্বপ্নটি মন হইতে মুছিয়া গেল না, খুব স্পষ্টভাবে মনে জাগিতেই লাগিল। শুধু তাহাই নহে, এক রাত্রির মধ্যেই স্বপ্নটি দুইবার দেখা গেল। ডব্লিউ স্বপ্ন দেখিলেন যে, "পি" যেন খুব ভীত হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলিতেছে, 'ভাই আমাকে জীবিত অবস্থায় লোকে কবর দিচ্ছে।' রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতর্ভোজনের পর ডব্লিউ একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, কে যেন দরওয়াজায় একটি মৃদু আঘাত করিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ভিতরে এস।" যাই বলা, অমনই দরজা খুলিয়া গেল, কে এক জন যেন ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ডব্লিউ মনে করিলেন, হয় তো এক জন চাকর এসেছে। তিনি মুখ তুলিয়া বড় একটা দেখিলেন না। পরে তাঁহার কানের কাছে কে যেন ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিয়া উঠিল—"ডব্লিউ, আমাকে ভাই সজীব অবস্থায় কবর দিতে যাইতেছে।" এই কথাগুলি শুনিবামাত্র ডব্লিউ চমকিত হইয়া উঠিলেন, কেন না, কথাগুলি তাঁহার বন্ধু "পি"র কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল। ডব্লিউ ঘরের মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘরে চাকর বা অন্য কেহই নাই। তখন তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কাছ দিয়া কতকগুলি লোক একটা মড়ার বাক্স লইয়া যাইতেছে। বাক্সটা এরূপভাবে আঁটা, যেন উহার মধ্যে মড়া আছে। ডব্লিউ লোকগুলিকে বলিলেন—"বাক্সটা খোল।" তাহারা কিছুতেই খুলিতে চাহে না। তখন ডব্লিউর মনে ঘোর সন্দেহ হইল। তিনি জবরদস্তী করিয়া বাক্স খোলাইলেন। দেখিলেন, তাহার মধ্যে "পি"র দেহ অসাড় অবস্থায় আবদ্ধ। তখন তিনি দেহটিকে

বাহির করিয়া যত্ন ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই দেহে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া উঠিল। স্বেদ-তাপের প্রভাবে কয়েক দিনের মধ্যেই 'পি' সুস্থ হইয়া উঠিলেন। ইহার পর তিনি আরও নয় বৎসর বাঁচিয়াছিলেন।

মানুষ ঘুমাইয়া থাকিলে তাহার জীবাত্মা স্থূল-শরীরের জড়ভাব কতকটা অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম-জগতে মিশিবার উপযোগী হয়। তাই ডব্লিউর নিদ্রিত অবস্থায় "পি"র প্রেতাত্মা আসিয়া নিজের বিপদের কথা প্রথমে জানাইয়াছিল; কিন্তু যখন তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না, ডব্লিউ স্বপ্নের ব্যাপার বলিয়া "পি"র জন্য যখন বিশেষ কিছু করিলেন না, অথচ "পি"র বিপদ ক্রমেই ভয়ানক হইতে চলিল, তখন আর "পি"র প্রেতাত্মা স্থির থাকিতে পারিল না, তখন সেই প্রেতাত্মা বিপদে বাধ্য হইয়া কতকটা স্থূলভাব ধারণ করিয়া ডব্লিউর কাছে যাইয়া মানুষের গলায় কথা বলিল আর নিজের বিপদের সংবাদটা দিয়া আসিল। কাজে কাজেই তখন ডব্লিউ বন্ধুর দশা স্মরণ করিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। এরূপ ভাবের বিস্তর গল্প আমাদের জানা আছে। কিন্তু মধ্যে হইতে আমরা একটা অতি অদ্ভুত রকমের গল্প বলিব। মিঃ রবার্ট ডেল্ আউয়েল "সূক্ষ্ম-জগতের দ্বার-দেশে" নামক গ্রন্থের ২৪২ পৃষ্ঠায় সেই গল্পটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, গল্পটি আমরা যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি। কারণ, ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। গল্পটি এই :—

"উত্তর-পশ্চিম মুখে জাহাজ চালাও"

একখানি বাণিজ্য-পোত লিভারপুল, সেণ্টজন্, নিউব্রন্সউইক্ প্রভৃতি স্থানগুলির মধ্যে যাতায়াত করিত। মিঃ রবার্ট ব্রুস এই জাহাজের প্রধান মালিম। একবার জাহাজখানি প্রায় ৫।৬ সপ্তাহকাল কূলত্যাগ করিয়া ভাসিয়াছে; পণ্যদ্রব্য বুকে করিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড নামক স্থলভাগের পূর্ব্ব-উপকূল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, এমন সময় রবার্ট ও কাপ্তেন একদিন দুপুর-বেলায় জাহাজের পাটাতনের উপর

দাঁড়াইয়া সূর্য্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহারা জাহাজ-পরিচালন-সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য পাটাতন হইতে নামিলেন। ভাবিলেন, কামরায় যাইয়া লেখাপড়া করি।

কামরাটি খুব ছোট, জাহাজের পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত। কামরাটির কাছেই অবতরণ করিবার সিঁড়ি, সিঁড়ির কাছে অল্প একটু চতুষ্ক আকারে অবতরণস্থান ; তাহারই কাছে ঐ মালিমের একটা ছোট ঘর। এই ঘরটি কামরার ঠিক সম্মুখে। কামরা ও মালিমের ঘর ঠিক যেন ঋজু ঋজু ভাবে অবস্থিত। মালিমের ঘরের দরজার কাছে একটি ডেস্ক ছিল। সে স্থানটিতে বসিলে কামরার ভিতর পর্য্যন্ত নজর চলে।

পাটাতন হইতে নামিয়া আসিয়া মিঃ রবার্ট তাঁহার ঘরে বসিয়া খুব মনোযোগের সঙ্গে জাহাজের গতিবিধির হিসাব-নিকাশ করিতেছিলেন। হিসাবে ভুল হইতেছিল বলিয়া সমস্ত মনোযোগটুকু সেই দিকেই ছিল। অধ্যক্ষ নামিয়া আসিয়া কোথায় গেলেন না গেলেন, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। গণনা ঠিক হইবার পর রবার্ট ওদিকে না চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন যে, "কোন্ দিকে জাহাজ যাইতেছে, এতক্ষণে তাহা ঠিক করিতে পারিয়াছি। কেমন, আমার গণনা ঠিক হয় নাই কি ? মহাশয়! আপনার গণনা কিরূপ হইল ?"

মিঃ রবার্ট অধ্যক্ষকে উদ্দেশ করিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া আবার ঐ কথাগুলি বলিলেন। এবার বলিবার সময় মুখটা উঁচু করিয়া অধ্যক্ষের কামরার দিকে একটু চাহিলেন। দেখিলেন, অধ্যক্ষ যেন নিবিষ্টচিত্ত হইয়া শ্লেটে কি লিখিতেছেন। রবার্ট এবারও কোন উত্তর পাইলেন না। কাজে কাজেই তখন তিনি অধ্যক্ষের কামরায় গিয়া দাঁড়াইলেন ; দেখিলেন, যে লোকটা বসিয়া লিখিতেছিল, সে অধ্যক্ষ নহে, এক জন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি। সে ব্যক্তিও মাথা তুলিয়া রবার্টকে একবার দেখিল। অধ্যক্ষের কামরার মধ্যে এক জন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া রবার্ট খুবই বিস্মিত হইলেন।

সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে রবার্ট আর কোন দিন কোন স্থানে দেখেন নাই। একেবারে ঘোর অপরিচিত। তাহা ছাড়া কেমন এক রকম নীরব অথচ অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি রবার্টের দিকে চাহিতে লাগিল। রবার্টের মনে কেমন একরূপ ভয় জন্মিল। তিনি দ্রুতবেগে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পাটাতনের উপরে যাইয়া হাজির। অধ্যক্ষ তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "রবার্ট! ব্যাপারখানা কি? তুমি এমন ভাবে আসিলে কেন?"

"ব্যাপারখানা, মহাশয়? আপনার ডেস্কে বসিয়া লিখ্‌ছে ও ব্যক্তি কে?"

"কই, আমি তো কাহারও কথা জানি না!"

"মহাশয়, সত্যই কে এক জন লিখ্‌ছে। লোকটা অপরিচিত।"

"অপরিচিত! কেন হে, তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ? হয় তো কর্ম্মাধ্যক্ষকে কিম্বা তোমার সহকারীকে দেখিয়া থাকিবে। নচেৎ, বিনা অনুমতিতে আমার কামরায় আর কে সাহস করিয়া প্রবেশ করিতে পারে?"

"কিন্তু মহাশয়, লোকটি আপনার চেয়ারে বসিয়া শ্লেটের উপরে লিখিতেছে, আমার দিকে মুখ তুলিয়া স্পষ্ট করিয়া চাহিল। আমি তাহাকে খুব ভাল করিয়াই দেখিয়াছি।"

"তাহাকে! কাহাকে?"

"ঈশ্বর জানেন, মহাশয়; আমি চিনি না। দেখিলাম, একটা লোক; আর লোকটাকে কখনও দেখি নাই।"

"মিঃ ব্রুস, তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। অপরিচিত ব্যক্তির কথা কি কহিতেছ! আমরা প্রায় দেড় মাস সমুদ্রের উপর আছি, অপরিচিত ব্যক্তি কি করিয়া এখানে আসিতে পারে?"

"তাহা' ত জানি, মহাশয়; কিন্তু আমি যে স্ব-চক্ষে দেখিলাম!"

"নীচে যাও, ভাল করিয়া দেখ লোকটা কে?"

নীচে আসিতে ব্রুসের পা সরিল না। তিনি বলিলেন—"মহাশয়,

আমি কোন দিনই ভূত মানি না ; কিন্তু আজ আমার একা নীচে যাইতে সাহস হইতেছে না।"

"থাম, থাম! মাঝি-মাল্লাদের কাছে আর পাগ্‌লামী করিও না। এখনই নীচে যাইয়া দেখ।"

ক্রস্ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেলেন—বলিলেন, "আমি বরাবরই আপনার আদেশ পালন করিয়া আসিতেছি ; কিন্তু আজকার ব্যাপারটা অন্য রকম, আজ আপনিও চলুন, তু'জনে একসঙ্গেই যাই।"

অধ্যক্ষ নামিলেন। মালিমও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আসিয়া দেখিলেন, কামরায় কেহ নাই। তাঁহারা ঘরগুলি খুব ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন। কিন্তু কোথাও কেহ নাই!

অধ্যক্ষ বলিলেন—"কই, কেহই তো নাই! মিঃ ক্রস, তাই বলিতে ছিলাম যে, তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছ।"

'মহাশয়! এখন তো তাই বলিবেন! আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি যে, বাস্তবিকই একটা লোককে শ্লেটে লিখিতে দেখিয়াছি। যদি আমি মিথ্যা কথা বলি, তবে যেন আর আমি পুত্র-কলত্র না দেখি—এই দিব্য করিলাম।"

"অ্যাঁ, শ্লেটে লিখছিল! তা, হ'লে শ্লেটে নিশ্চয়ই লেখাটা আছে!' —এই বলিয়া অধ্যক্ষ শ্লেটখানি তুলিলেন।

তিনি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে, কি লেখা রহিয়াছে! মিঃ ক্রস! এ খেলাটা কি তোমার?"

মালিম শ্লেটখানি লইলেন। দেখিলেন, স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"উত্তর-পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাও।"

অধ্যক্ষ একটু রুক্ষ স্বরে বলিলেন,—"আমার সঙ্গে একটা রহস্য লাগিয়েছ?"

ক্রস্ বলিলেন—"আমি যথার্থ বলিতেছি, এ সব কাণ্ড আমি কিছুই জানি না। যতটুকু জানি, আপনার কাছে তাহাই বলিয়াছি।"

অধ্যক্ষ তখন শ্লেটখানি সম্মুখে করিয়া ডেস্কে বসিয়া গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর শ্লেটখানি উল্টাইয়া ব্রুসের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "উত্তর-পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাও' এই কথা কয়টা তুমি লেখ ত।"

ব্রুস লিখিলেন। অধ্যক্ষ দুই পিঠে লেখা খুব মনোযোগের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেন। তাহার পর বলিলেন, "মিঃ ব্রুস, তোমার সহকারীকে ডাকিয়া আন!"

সহকারী আসিলেন। তিনিও অধ্যক্ষের কথামত শ্লেটে লিখিলেন। কর্ম্মাধ্যক্ষও লিখিলেন! এইরূপে মাঝি-মাল্লাদের মধ্যে যাহারা লিখিতে জানিত, একে একে সকলেই লিখিল; কিন্তু কাহারও লেখাই সেই লেখাটার সঙ্গে মিলিল না।

মাঝি-মাল্লারা নিজের নিজের কাজে চলিয়া গেল। তখন অধ্যক্ষ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—"তবে কি কোন বদমায়েস ভাড়া না দিয়া এই জাহাজে লুকাইয়া যাইতেছে?" এই ভাবিয়া, তিনি বলিলেন—"জাহাজ তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ, দেখি, কে লুকাচুরি খেল্‌ছে।"

জাহাজখানির আগাগোড়া খোঁজা হইল—কোণগুলি, কোলুঙ্গীগুলি, কোন স্থানেই খুঁজিতে বাদ পড়িল না। খুব ভাল করিয়া দেখা হইল। সকলেই শুনিয়াছিল, একটা অপরিচিত লোক জাহাজে ঢুকেচে—খুঁজিয়া বাহির করিতে সকলেই উৎসুক। কিন্তু মাঝি-মাল্লা ব্যতীত আর কাহাকেও পাওয়া গেল না।

অনুসন্ধানে কোনই ফল হইল না। তখন অধ্যক্ষ বলিলেন—"মিঃ ব্রুস! এ ব্যাপারটা তোমার কিরূপ বোধ হয়?"

"মহাশয়! বলিতে পারি না। আমি লোকটাকে লিখ্‌তে দেখেছি। আপনিও লেখাটা দেখলেন! ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক।"

"ওহে, রহস্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। বাতাস বেশ অনুকূল আছে,

আমি ভাব্‌ছি, ঐ লেখা অনুসারে আমি জাহাজখানিকে উত্তর-পশ্চিম দিকে চালাইব। দেখি, ব্যাপার কিরূপ দাঁড়ায়!”

“আমি অধ্যক্ষ হইলে ইহার আগেই জাহাজ সেই দিকে লইয়া যাইতাম। অনর্থক কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট করা হইল।”

“বেশ, তাই করা যাক। পাটাতনের উপর যাও। জাহাজের গতি উত্তর-পশ্চিম দিকে ফিরাইয়া দাও।” মিঃ ব্রুস যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। অধ্যক্ষ আবার বলিলেন—“একটা বিশ্বাসী লোককে উপরে রেখ, সে যেন খুব দূরে চারিদিকে নজর করিতে করিতে যায়।”

অধ্যক্ষের আদেশ অনুসারে জাহাজ চলিতে লাগিল। চারিদিকে দেখিবার লোকও নিযুক্ত হইল। পরে বেলা তিনটার সময় সেই পাহারার ব্যক্তি সংবাদ দিল যে, সম্মুখে অদূরে একটি তুষার-শৈল দেখা যাইতেছে; আবার অল্পসময় পরেই সংবাদ দিল—ঐ তুষার-শৈলের কাছে একখানি জাহাজের মত কি একটা দেখা যাইতেছে।

আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া অধ্যক্ষ দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলেন যে, বাস্তবিকই একখানি জাহাজ ভগ্ন অবস্থায় ভাসিতেছে। জাহাজখানি যেন বরফে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার উপরে অনেকগুলি মানুষ রহিয়াছে। দেখিয়াই—অধ্যক্ষ সেই মানুষগুলিকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নৌকা পাঠাইলেন।

পরে জানা গেল, জাহাজখানি আরোহী লইয়া কুইবেক সাগর হইতে লিভারপুলে যাইতেছিল। পথে তুষার-শৈলের মধ্যে পড়িয়া এই দশা ঘটিয়াছে। কয়েক সপ্তাহকাল এই ভয়ানক অবস্থায় রহিয়াছে; সমস্ত খাদ্য, সমস্ত পানীয় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আরোহী ও মাঝি-মাল্লারা সকলেই জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল। এখন অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য পাইয়া তাহাদিগের কৃতজ্ঞতার অবধি রহিল না।

নৌকা করিয়া লোকগুলিকে আনা হইতে লাগিল। তৃতীয়বারে যে লোকগুলি আসিতেছিল, তাহাদের মধ্যে এক জনকে দেখিয়া মাঝি

অর্থাৎ ক্রুস ভয়ে চমকাইয়া উঠিলেন। এই ব্যক্তিকে তিনি অধ্যক্ষের কামরার মধ্যে বসিয়া শ্লেটে লিখিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, এ ঠিক সেই লোক।

ক্রুস প্রথমে মনে করিলেন, এ কেমন করিয়া জাহাজে আসিবে? হয় তো আমার ভ্রম হইতেছে। কিন্তু যতই ভাল করিয়া লোকটিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। বেশ বুঝিলেন যে, ঠিক এই লোকই কামরায় গিয়াছিল। শুধু মুখখানিতেই যে মিল, তাহা নহে। শরীর, পোষাক, সবই ঠিক সেই ব্যক্তির।

সেই অনশন-ক্লিষ্ট, মৃতপ্রায় ব্যক্তিদিগকে জাহাজে আনিবার পর তাহাদিগের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। জাহাজও নির্দ্দিষ্ট দিকে চলিতে লাগিল। তখন মালিম অধ্যক্ষকে ডাকিয়া গোপনে বলিলেন —"আজ যে লোকটিকে কামরায় দেখিয়াছিলাম, বোধ হইতেছে, সেটি ভূত নহে। লোকটি এখনও জীবিত আছে।"

"কি বলিতেছ? কে জীবিত?"

"যে সকল আরোহীদিগকে আমরা উদ্ধার করিলাম, তাহাদের মধ্যে এক জনকে আমি আপনার কামরায় বসিয়া শ্লেটে লিখিতে দেখিয়াছি! এ বিষয়ে আমি আদালতে হলফ পড়িয়া বলিতে পারি।"

অধ্যক্ষ বলিলেন—"মিঃ ক্রুস! আমি যথার্থই বলিতেছি, ব্যাপারটা আমার কাছেও খুব আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। চল, আমরা যাইয়া লোকটিকে দেখি।"

তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন যে, লোকটি নিজেদের অধ্যক্ষের সঙ্গে গল্প করিতেছে। তাহারা উদ্ধার পাইয়াছে বলিয়া ইঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কাছে আসিল। বলিল—"আপনাদের দয়া ব্যতীত আমরা অনাহারে ঠাণ্ডা বাতাসে নিশ্চয়ই কষ্ট পাইয়া মরিয়া যাইতাম।" অধ্যক্ষ বলিলেন—"বেশী আর কি করিয়াছি? আমরা ঐ অবস্থায় পড়িলে আপনারাও আমাদিগকে নিশ্চয় উদ্ধার করিতেন।

আপনারা নীচে আমার কামরায় আসুন।” কামরায় প্রবেশ করিয়া অধ্যক্ষ সেই অদ্ভুত আরোহীটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আপনি এই শ্লেটখানির উপর অনুগ্রহ করিয়া কয়েকটা কথা লিখুন। আমি একটা খেয়াল করিয়া আপনাকে এ কথা বলিতেছি না, এরূপ বলিবার একটা বিশেষ হেতু আছে।” এই কথা বলিয়া অধ্যক্ষ তাহার হাতে শ্লেটখানি দিলেন। শ্লেটের যে দিকে জাহাজ চালানর কথা লেখা ছিল, সেই দিক্‌টার বিপরীত দিক্ উপরে রাখিয়া শ্লেটখানি দেওয়া হইল। আরোহী বলিল,—“যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব, কিন্তু কি লিখিব?”

“কয়েকটি কথা মাত্র আমি দেখিতে চাই। আচ্ছা, লিখুন—উত্তর-পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাও।”

এরূপ লিখিতে অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্য কি, ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিলেও আরোহী একটু হাসিয়া তাহাই লিখিল। অধ্যক্ষ শ্লেটখানি লইয়া এই লেখাটার সহিত সেই আগেকার লেখার তুলনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর একটু সরিয়া আসিয়া, আরোহী দেখিতে না পায়, এমন ভাবে আগেকার লেখাটা উপরদিকে উল্টাইয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—“এ লেখাটা আপনার তো?”

আরোহী লেখাটা দেখিয়া বলিল—“এ কথা বলাই বাহুল্য, কারণ, আপনি তো আমাকে লিখিতেই দেখিলেন।”

তখন অধ্যক্ষ অপর দিকের লেখাটা আবার উল্টাইয়া বলিলেন,—“এ লেখাটা?”

আরোহী একবার এটা, একবার ওটা, এইরূপ করিয়া দুইটি লেখাই দেখিল। দেখিয়া ভ্যাবাচাকায় পড়িল। কি বলিবে, স্থির করিতে পারে না। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল,—“আমি ত এক দিকে লিখিলাম, অথচ দুই দিকেই আমার লেখা! ইহার অর্থ কি? আর এক দিকে আমার মত করিয়া কে লিখিল?”

অধ্যক্ষ বলিলেন—“সে কথাটা আমিও জানি না। আমার মনে

বলিতেছে, আপনি আজ দুপুরে এই কামরায় বসিয়া ঐরূপ কথা কয়টি এই শ্লেটের উপর লিখিয়া গিয়াছেন।”

আরোহী ও তাহাদের অধ্যক্ষ এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিল। পরে অধ্যক্ষ আরোহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই শ্লেটে লিখিয়াছ, এমন স্বপ্ন কি দেখিয়াছিলে ?”

“না মহাশয়, কই, তা ত মনে পড়ে না।”

কামরার অধ্যক্ষ তখন ভাঙ্গা জাহাজের অধ্যক্ষকে বলিলেন,—“আপনি স্বপ্নের কথা বলিতেছেন! আচ্ছা, এই আরোহী আজ দুপুর-বেলায় কি অবস্থায় ছিলেন ?”

সেই বিপন্মুক্ত অধ্যক্ষ বলিলেন—“ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত! আপনার নিকট বলিব বলিয়াই আমি স্থির করিয়াছিলাম। আরোহীকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এই ভদ্রলোক অবসন্ন হইয়া দুপুরের কিছু আগে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। কিঞ্চিদধিক এক ঘণ্টার পর ইনি জাগিয়া উঠেন। উঠিয়াই আমাকে বলেন—‘মহাশয়! আজই আমরা উদ্ধার পাইব।’ জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কিসে বুঝিলেন যে, উদ্ধার পাইব ? ইনি বলিলেন যে, ইনি স্বপ্নে একখানি জাহাজে গিয়াছিলেন আর সেই জাহাজখানি আমাদিগের উদ্ধারের জন্য আসিতেছে। শুধু বলা নহে, ইনি জাহাজখানির বর্ণনা পর্য্যন্ত করিলেন। আরও বিস্ময়ের বিষয়, যখন আপনার এই জাহাজখানি আমাদের চক্ষুগোচর হইল, তখন দেখিলাম, ইঁহার বর্ণনার সঙ্গে আপনার জাহাজের চমৎকার সাদৃশ্য।”

কামরার অধ্যক্ষ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন,—“লেখাটা শ্লেটের উপর যেরূপেই আসুক, এই লেখাটার জন্যই আপনাদের জীবন রক্ষা পাইয়াছে; সে সময় আমি অনেকটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়া জাহাজ চালাইতেছিলাম। তাহার পর লেখাটা দেখিয়া উত্তর-পশ্চিমে চালাইলাম, আর দূরে নিরীক্ষণ করিবার জন্য এক জন পাহারার বন্দোবস্ত করিলাম।” অধ্যক্ষ তাহার

পর সেই আরোহীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"শ্লেটে লিখিবার কথা আপনি কি স্বপ্নে দেখেন নাই ?"

"না মহাশয় ! সেরূপ কোন কথাই আমার মনে পড়ে না। কেবল মনে পড়ে যে, একখানি জাহাজ উদ্ধারের জন্য আসিতেছে। তাই স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। উদ্ধারের জন্য আসিতেছে, এ ধারণা কেমন করিয়া হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আর একটি বিষয়ে আমি বিস্মিত হইতেছি, এখানকার সমস্ত দ্রব্যই যেন আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। অথচ আমি কখনই আপনার জাহাজে ইতঃপূর্ব্বে আসি নাই। আমার কাছে এ সব ব্যাপার রহস্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনার মালিম কি দেখিয়াছিলেন ?"

এই কথা শুনিয়া মিঃ ব্রুস যেরূপ যাহা দেখিয়াছিলেন, সেগুলি যথাযথ বলিলেন। শেষে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, ভগবান্ বিশেষ কৃপাপরবশ হইয়াই আসন্ন মৃত্যু হইতে বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে বাঁচাইবার জন্য ঐ সকল ব্যাপার করিয়াছেন।

এই গল্পটি 'জুলিয়া হ্যালক্' নামক ক্ষুদ্র অর্ণব-পোতের অধ্যক্ষ জে, এস, ক্লার্ক লেড্‌বিটার সাহেবকে বলেন। তিনি ইহা মালিম ব্রুসের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ব্রুস কিরূপ প্রকৃতির লোক, জানিতে চাওয়ায় ক্লার্ক বলেন যে—"সেরূপ সত্যবাদী, সাঁচ্চা লোক আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। আমাদের উভয়ের মধ্যে সহোদরের মত ভালবাসা। আমরা দুজনে ১৭ মাসকাল একসঙ্গে কাটিয়েছি। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি। গল্পটি বলিবার সময় তাহার কথায় সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব ব্যক্ত হইত ; কারণ, এগুলি সূক্ষ্ম-জগতের পবিত্র ব্যাপার। তাহার বিশ্বাস—এরূপ ব্যাপার দেখিতে দেখিতে ক্রমে ভগবানের কাছে উপনীত হওয়া যায়। আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, ব্রুস কখনই মিথ্যা কথা বলে নাই।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গল্পটি অতীব সুন্দর, আদর্শ-স্থানীয়,

উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। এরূপ কাহিনী যে মাত্র এই একটাই পাওয়া গিয়াছে, তাহা নহে। "থিওসফিক্যাল রিভিউ" নামক পত্রিকার ২২শ খণ্ডে ২৭৪ পৃষ্ঠায় এনি বেশান্ত এইরূপ একটি গল্পের অবতারণা করিয়াছেন—"আমি অনেকবার সমুদ্র-ভ্রমণ করিয়াছি, একবার একটি জাহাজের অধ্যক্ষ আমার সঙ্গে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী বলিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিলেন, এক দিন একটা লোক আমার কাছে আসিয়া হাজির। জলাভেদ্য কাপড়ের পোষাক পরা, সকল শরীর বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল গড়াইতেছে। লোকটা আসিয়া কোন একটা বিশেষ দিকে জাহাজ চালাইয়া কতকগুলি জলমগ্ন জাহাজের লোককে বাঁচাইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি তাহার কথামত জাহাজ চালাইলাম, বাস্তবিকই একখানা জাহাজ ভগ্ন হইয়া ভাসিতেছে, অনেকগুলি মাঝি-মাল্লা বিপন্ন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে লোকটি আমার কাছে আসিয়া অনুরোধ করিয়াছিল, বিপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে তাহাকেও দেখিয়া বেশ চিনিলাম।" এনি বেশান্ত আর একটি গল্পও বলিয়াছেন। সে গল্পটি পূর্ব্ব-বর্ণিত ক্রুসের গল্পেরই অনুরূপ। পশ্চিম-ভারতীয় বাণিজ্যে ব্যাপৃত 'মোহক' নামক ক্ষুদ্র জাহাজের অধ্যক্ষ মিঃ বেনারের সম্বন্ধেই এনি বেশান্তের এই গল্পটি সম্পর্কিত।

দ্বি-মাস্তুল-বিশিষ্ট মোহক নামক একখানি জাহাজ

গল্পটি এইরূপ। এক দিন রাত্রে ঐ জাহাজখানির অধ্যক্ষের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখলেন, তাঁর সম্মুখে এক জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির গায়ে সবুজবর্ণ পোষাক। লোকটি তাঁহাকে বলিল, আপনি জাহাজখানি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চালান। অধ্যক্ষের মনে হইল, বুঝি বা তাঁহার মালিম তাঁহার নিকট এই সংবাদ পাঠিয়েছে। তাই তিনি তাড়াতাড়ি পাটাতনের উপর গেলেন। যাইয়া শুনিলেন, মালিম তাঁহাকে এ সংবাদ দেয় নাই। অধ্যক্ষ তখন কামরায় ফিরিয়া আসিলেন।

আবার সেই লোকটা আসিয়া জাহাজখানিকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চালানোর জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তিনি আবার মালিমের কথা মনে করিয়া পাটাতনের উপর গেলেন। তখনও শুনিলেন, মালিম এই সব কথা বলে নাই, লোকটাকেও পাঠায় নাই। সেই সবুজ পোষাক-পরা অদ্ভুত লোকটা তখন তৃতীয়বার আবার আসিল, আসিয়া বলিল, জাহাজ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে না চালাইলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, আর সময় নাই, শীঘ্র জাহাজ চালাইয়া দিউন। তখন অধ্যক্ষ জাহাজের গতি সেই দিকে ফিরাইলেন। খানিক পরে দেখা গেল, জলমগ্ন জাহাজের একখানি ক্ষুদ্র তরী ৪টি লোককে বুকে করিয়া অকূল সাগরে ভাসিতেছে। লোকগুলির মধ্যে এক জনের গায়ে সবুজ রঙের পোষাক। আর এই লোকটাই রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, যেন সে তিনবার এই দ্বি-মাস্তলবিশিষ্ট 'মোহক' জাহাজের কামরায় প্রবেশ করিয়াছে, আর অধ্যক্ষকে জাহাজের গতি ফিরাইয়া আপনাদিগকে বাঁচাইবার অনুরোধ করিয়াছে। গল্পটির উৎপত্তি বিষয়ে আমরা আর কিছু জানি না।

ঘটনাগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সূক্ষ্মমূর্ত্তিগুলি স্থূল-শরীর পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত বাধ্য হইয়াছিল। শুধু তাই নহে। পরিত্যাগ করিয়া অপরকে দেখা দেওয়া অনেকটা সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ব্ব-বর্ণিত "পি" নামক পুরোহিতের অজ্ঞানাবস্থাটা খুব খাঁটি রকমের হইয়াছিল। আর জাহাজের লোকগুলির অবসন্নভাবটা কতকটা ঠাণ্ডা লাগিয়া, কতকটা অনশনে ঘটিয়াছিল! অনেক সাধু-সন্ন্যাসী উপবাস করিয়া যেরূপ শক্তি লাভ করেন, বাধ্য হইয়া উপবাস করিলেও বহু স্থলে সেরূপ শক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে। মহা বিপদে পড়িলে মানুষের প্রেত-মূর্ত্তি ঐরূপভাবে বাহির হইতে পারে বটে, কিন্তু সেটা খুব বাঞ্ছনীয় নহে। আবার আব্‌হাওয়া অনুকূল না হইলেও প্রেত-মূর্ত্তির নির্গমন ঘটে না। বিপন্ন আরোহীদের বেলায় নির্গমনের অবস্থা অনুকূল ছিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বেই প্রেতাত্মা আসিয়া দেখা দেয়

মরণের আগে প্রেতাত্মা আসিয়া দেখা দিল, এইরূপ বিস্তর গল্প আমাদের জানা আছে। একটা মানুষ যখন মর-মর হয়, তখন তাহার শরীরটা খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অত দুর্ব্বল আর কখনই হয় না। সেই অবস্থায় যদি ঐ ব্যক্তির কোনরূপ উৎকট তীব্র ইচ্ছা হয়, তবে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত মরণের ঠিক আগে বা ঠিক পরেই প্রেতাত্মা তাহা পূর্ণ করিয়া লয়। মরণের পরে প্রেতাত্মা ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত কাহাকেও দেখা দিলে আমরা তাহাকে যথার্থ ভূত বলিয়া থাকি। এই যথার্থ ভূত সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করিব। মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বেও প্রেতাত্মা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী আত্মীয়-স্বজনকে দেখা দেয়। আমরা এখন তাহারই বিষয় বলিব। লেড্‌বিটার সাহেব তদীয় "দিব্য-দৃষ্টি" নামক পুস্তকে রোচেষ্টার প্রদেশের মেরীগফের একটা সুবিখ্যাত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেইটি পড়িয়া মিঃ অ্যানড্রু ল্যাং নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে—"এমন সুন্দর প্রামাণিক ভূতের গল্প খুব বেশী শুনিতে পাওয়া যায় না।" লেড্‌বিটার আর একটি বিখ্যাত গল্পও বলিয়াছেন। উহা তিনি ডাক্তার এফ, জি, লী, লিখিত "সূক্ষ্ম-জগতের আভাস" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মিসর হইতে তুরস্ক

একটি স্ত্রীলোকের স্বামী ভারতবর্ষে একটি উচ্চপদে থাকিয়া চাকুরী করিতেন। তিনিও স্বামীর কাছে থাকিতেন। তাঁদের ছেলেপুলে তুরস্কে কোন বন্ধুর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেছিল। স্ত্রীলোকটি

ও তাঁর স্বামী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাড়ী আসিতেছিলেন। তাঁহারা চারি বৎসরকাল বাড়ী ও সন্তানগুলির কাছছাড়া। আসিতে আসিতে যখন মিশরে পঁহুছিলেন, তখন রমণীর সাংঘাতিক ব্যারাম দেখা দিল। জীবনের আর আশা রহিল না। তখন তিনি সন্তানগুলিকে দেখিবার নিমিত্ত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁকে শুশ্রূষা করিতেছিল, তাহাদিগকে বার বার ছেলেপুলেগুলিকে দেখিবার ইচ্ছা জানাইতে লাগিলেন। জ্বরের বেগে যখন অজ্ঞান হইয়া পড়েন, কেবল তখন চুপ করিয়া থাকেন। আবার যেই বিকারের বেগ একটু উপশমিত হয়, অমনই তাহাদের নিমিত্ত ছট্‌ফট্ করেন। এইরূপ হইতে লাগিল। সন্তানগুলিকে দেখিবার নিমিত্ত তিনি সাতদিন ধরিয়া অস্থিরতা প্রকাশ করিলেন। বলিতে লাগিলেন—"আমার আর কোন ইচ্ছা, কোন বাসনা, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, তোমরা একটবার মাত্র আমার ছেলে-মেয়েগুলিকে আনিয়া দেখাও। একটবার দেখিলে আমি মরিয়াও সুখ পাইব; তা' হইলে আমি শান্তির সঙ্গে মরিতে পারিব।"

যে দিন মরিবেন, সেই দিন প্রাতে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব সুন্দরভাবে গাঢ় নিদ্রা গেলেন। শুশ্রূষাকারিণীদের ভয় হইল। তাহারা সে ঘুম ভাঙ্গিতে পারিল না। এমন ঘুম যে, একটু 'টু' শব্দ নাই—হাত-পা পর্য্যন্তও একটু নড়িল না। দুপুরের অল্প একটু পরেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন। জাগিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"আমি তাহাদিগকে দেখিয়া আসিলাম। দেখিয়াছি! দেখিয়াছি! আমার ছেলেপুলেগুলিকে দেখিয়াছি। ভগবান্ আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া তিনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুমাইলেন। সন্ধ্যাকালে মারা গেলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছেলেপুলেগুলি তুরস্কে কোন বন্ধুর বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। তাহারা দোতলায় থাকিত। তাহাদের পৃথক দুইটি ঘর ছিল। সেই ঘরে তাহারা খেলা-ধূলা করিত, বসিত-উঠিত।

সে দিন তাহারা সকলেই এক স্থানে ছিল। এক জনও এদিক্ ওদিক্ যায় নাই। বই নিয়ে খেলানা নিয়ে খেলা করিতেছিল। কাছে ঝি ছিল; ঝি কখনও তাহাদের মাকে দেখে নাই। তাহারা খেলা-ধুলা করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের মা হঠাৎ সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত! খুব আগে এই রকম করিয়া হঠাৎ আসা তাঁহার অভ্যাস ছিল। এবারও মা হঠাৎ আসিলেন। যে ঘরটি বড়, সেইটির মধ্যেই আসিলেন। আসিয়া চুপটি করিয়া একটু দাঁড়াইলেন, সব ছেলেপুলের দিকে বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর একটু মুচ্‌কি হাসিয়া কাছের ছোট ঘরটিতে গেলেন। তাহার পরই অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনটি বড় বড় ছেলে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার চুপ করিয়া থাকা, কেমন কেমন চেহারা, কেমন কেমন ভাব দেখিয়া তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। ছোট ছেলেটি ভাল করিয়া চিনিতে পারিল না। সে আর ঝি কেবল দেখিল যে, সাদা পোষাকপরা একটা মেয়েমানুষ ছোট ঘরের মধ্যে যাইয়াই হাওয়ায় মিলাইয়া গেল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই ঘটনাটি ঘটে। তারিখটি বেশ যত্ন করিয়া লিখিয়া রাখা হইল। তাহার পর জানা গেল, রমণীর মৃত্যু আর ছেলেপুলের কাছে আসিয়া এইরূপে দেখা দেওয়া প্রায় একই সময়ে ঘটিয়াছিল। এই ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। পরে পারিবারিক ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে সাদা পাতায় লিখিয়া রাখা হইল। গ্রন্থকার সেখান হইতে গল্পটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ঐ গ্রন্থকার আর একখানি পুস্তকে আর একটি বিবরণ দিয়াছেন। পুস্তকখানির নাম—"গোধুলি-সম্ভোগ।" বিবরণটি এই পুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। এটাও এক জন স্ত্রীলোকের কাহিনী। ইনি জর্জ্জ ফক্স্-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়বিশেষের লোক। ইনি "ককার মাউথ" নামক স্থানে মারা যান। ইঁহার তিনটি সন্তান 'সেট্‌ল্' নামক স্থানে ছিল। মরণের একটু আগেই দিনে দুপুরে ইনি ছেলেপুলেগুলিকে দেখা

দিয়াছিলেন। ছেলে তিনটিও ইঁহাকে খুব ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। এ গল্পটি আগেকার গল্পেরই অনুরূপ। এ ব্যাপারটিরও যথাযথ প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে।

লেড্‌বিটার সাহেব তাঁহার বন্ধুর কাছে অনেক দিন পূর্ব্বে একটা অদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়াছিলেন। ঘটনাটি যে পরিবারের মধ্যে ঘটে, লেড্‌বিটার তাহার পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। বন্ধুটি কলেজে অধ্যয়নকালে ঐ ব্যাপারটি ঘটে; তাহার পরে লেড্‌বিটারকে বলেন। ব্যাপারটি এইরূপ :—

প্রেতাত্মা মরণের একটু আগে একই রাত্রে দূরবর্ত্তী পুত্রকে তিনবার দেখা দিয়াছিল

ঐ দিন বন্ধুটি সকাল সকাল শুইলেন। অন্যদিন যত রাত্রি জাগেন, সে দিন তাহা জাগিলেন না। বসা-উঠার ঘরটির বাহির দিকের দরজা শুইবার সময় তালা দিয়া আটকাইয়া শুইলেন। শুইবার ঘর ও বসা-উঠার ঘর—এ দুইটির মধ্যে একটা দরজা। কেবল এই দরজাটা খোলা থাকিল। বসিবার ঘরটিতে আগুন জ্বালিয়া রাখা হইয়াছিল; আগুনও বেশ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল; সেই আলোকে ঘরটিও বেশ আলোকিত ছিল। দিন-দুপুরের মত ঘরের প্রত্যেক দ্রব্যই খুব সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিল, তখন বন্ধুটি সুখদায়িনী নিদ্রা উপভোগের নিমিত্ত শয্যা আলিঙ্গন করিলেন। ঠিক সেই সময় দেখিলেন যে, দুই ঘরের মধ্যে যে দরজাটি খোলা অবস্থায় ছিল, সেইখানে সেই সুস্পষ্ট প্রদীপ্ত আলোকে তাঁহার পিতার মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই তিনি কয়েক সেকেণ্ড-কাল বিস্ময়স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। শুধু স্তব্ধ নহে, আগুনের আলোক পিতার সেই বিষাদ-মাখা মুখখানির উপর পড়িয়া কেমন খেলা করিতেছে, তাহাও দেখিলেন। এক মিনিটকাল সেই পিতৃ-মূর্ত্তিটি ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, যেন কে

মূর্ত্তি হাতছানি দিয়া তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকিতেছে। তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, স্তব্ধভাব দূরে গেল, তিনি লাফাইয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর বেগে দরজার দিকে ছুটিলেন; কিন্তু সেখানে না যাইতেই মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হইল।

বন্ধুটি বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া শুইবার ঘর ও বসিবার ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। বেশ বুঝিলেন, বাহির হইতে কোন লোকের আসিবার সম্ভাবনা নাই। বাহিরের দরজা তালা-বন্ধই আছে। আর ঘরেও দ্বিতীয় মনুষ্য নাই। তাহা-ছাড়া পিতার মূর্ত্তিটি তিনি বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহাকে যেমনটি দেখিয়া আসিয়াছেন, এ মূর্ত্তি ঠিক সেইরূপই; কেবল তাঁহার মুখে একটা বাসনার আবেগ প্রকাশ পাইতেছিল। বন্ধুটি ভাবিলেন—আমার কোন ইয়ারবন্ধু ভয় দেখাইবার নিমিত্ত যে এইরূপ সাজিয়া আসিবে, তাহা ত হইতে পারে না। শেষে মনকে একরূপ করিয়া বুঝাইলেন—এ আর কিছু নহে, দৃষ্টিবিভ্রম। মনকে বুঝাইলেন বটে, কিন্তু মন সে কথা বুঝিতে চাহিল না; কেন না, পিতার স্বাভাবিক মূর্ত্তি খুবই স্মরণ হইতেছিল, সেই মুখের উপর আলোকের খেলা স্পষ্ট করিয়া মনে জাগিতেছিল। এ অবস্থায় দৃষ্টিভ্রম বলিলে মন সে কথা মানিবে কেন? যাহা হউক, মনকে একরূপ জোড়াতাড়া দিয়া বুঝাইয়া তিনি আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন।

অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া মন আলোড়িত হইয়াছে। ঘুম কি সহজে আইসে? অনেকক্ষণ ঘুম আসিল না। দেওয়ালের উপর চাহিলেন, দেখিলেন, ছায়াগুলি তর তর করিয়া নড়িতেছে, সেই ছায়ার খেলা প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে আবার একটু তন্দ্রার ভাব আসিল। শরীর একটু অবসন্ন হইয়াও পড়িল। ঠিক এমনই সময় তিনি একেবারে জাগিয়া উঠিলেন। জাগিয়া চমকিত হইয়া দেখিলেন যে, ঠিক সেই দরজায় আবার সেই পিতৃমূর্ত্তি। মূর্ত্তির মুখে ঠিক সেইরূপ বাসনা-বেগ, যেন একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা মুখের উপর প্রকাশ পাইতেছে।

এবার মূর্ত্তিটি আরও আগ্রহের সহিত তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতে লাগিল। বন্ধুটি আগে হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এবার প্রেতমূর্ত্তি আসিলে যাইতে দিবেন না; নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিবেন। তাই এবার মূর্ত্তিটিকে দেখিবামাত্র তিনি এক লাফে বিছানা হইতে মূর্ত্তির কাছে যাইয়া উঠিলেন। শুধু যাওয়া নয়, খুব শক্ত করিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন; কিন্তু ভূতকে কখন কি ধরা যায়? সে যে ছায়ার মত! তাই ধরা বৃথা হইল। ভূতটিকে দুই হাত দূরে আবার দেখা গেল। আবার বন্ধুটি হাত বাড়াইয়া ধরিলেন। সেবারও হাতের মধ্যে কেহ নাই! মুঠা খালি। ভূত মিলাইয়া গেল। সেবারও ঘরগুলি বন্ধুটি খুব ভাল করিয়া দেখিলেন, বুঝিলেন, ঘর হইতে কেহ বাহিরে যায় নাই বা বাহির হইতেও কেহ ঘরে আইসে নাই। বাহিরের তালা সেইরূপই বন্ধ আছে।

যুবকেরা প্রায়ই ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে না। বন্ধুটিও যুবক—কালেজের ছাত্র। ইনিও ভূত মানিতেন না। আজ স্পষ্টভাবে বার বার ভূত দেখিলেন, তবুও তাহাকে ভূত বলিয়া ভাবিলেন না। মনকে এই বলিয়া একটা প্রবোধ দিলেন যে, হয় ত শরীরটা অতর্কিতভাবে অসুস্থ হইয়াছে, তাই এইরূপ একটা মনের ভ্রান্তি দেখা দিতেছে। মনকে এইরূপ বুঝাইয়া তিনি শীতল জলে মাথাটি ধুইলেন। তাহার পরে ঘুমাইবার জন্য আর একবার শুইলেন। মনে মনে ভাবিলেন—"যাহা সব দেখিলাম, উহা কিছুই নয়; মাথা গরম হইয়াছিল বলিয়াই ঐরূপ দেখিয়াছি; ও সব আর মনে করিব না।" শুইবামাত্র চারিদিক্ হইতে অনেকগুলি ঘড়ীতে রাত্রি ১২ বাজিয়া উঠিল। তখন নিদ্রার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

চেষ্টা করিতে করিতে নিদ্রা আসিল। খানিকটা ঘুমাইবার পরই আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আবার চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। যাহাদের স্নায়ু দুর্ব্বল, তাহারা অনেক সময় অকারণ ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে। যুবকও তাহাদের মত হঠাৎ ভয় পাইয়া নিদ্রোত্থিত হইলেন। তখন বাতি-বার ঘরের আলো মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। আলোটা তখন আর

আগেকার মত সমুজ্জ্বল ছিল না। এখন কেমন একরূপ মিটমিটে লাল আভা দেওয়ালের উপর ও ছাদের নীচে পড়িয়াছিল। যুবক দেখিলেন যে, সেই অস্পষ্ট আলোকের মধ্যে ঠিক দরজাটার কাছে আর একবার পিতার সেই প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিলেন, এবার মূর্ত্তিটি একটু অন্য-রূপ। আগে মূর্ত্তিটির মুখে একটা বাসনার বেগ—একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টরূপে দেখা গিয়াছিল, কিন্তু এবার সে ভাব নাই, এবার যেন একটা নিরাশ দুঃখের ভাব ব্যক্ত হইতেছে। আগে দুইবার হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল, এবার মূর্ত্তিটি ভয়-বিহ্বল যুবকের হাতের সঙ্কেতে আসিতে নিষেধ করিল। পূর্ব্বে মূর্ত্তিটি খুব তাড়াতাড়ি মিলাইয়া গিয়াছিল, এবার খুব ধীরে ধীরে দেওয়ালের উপরিস্থ লোহিত আভার মধ্যে অস্পষ্ট হইতে হইতে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পিতার ঐ প্রেতমূর্ত্তি ঐরূপে অন্তর্হিত হইবার পরক্ষণেই যুবকের জড়-ভাব কাটিল—তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া পকেট-ঘড়ীটিতে দেখিলেন, রাত্রি দুইটা বাজিতে ১০ মিনিট আছে। মনে করিলেন, এটা নিতান্ত অসময়; এখন বাড়ী যাইবার গাড়ী মিলিবে না বা এত রাত্রিতে কাহাকেও ঘুম থেকে ডাকিয়া তোলাও ঠিক নহে। যুবক ভাবিলেন, অতি প্রত্যূষে নিশ্চয়ই বাড়ী যাইব। তাঁহার পিতা একটি দূরবর্ত্তী স্থানে পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। বাড়ী হইতে আসিবার সময় কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি তাঁহাকে বেশ সুস্থ দেখিয়া আসিয়াছিলেন। আসিবার পরও তাঁহার কোন অসুস্থ-সংবাদ পান নাই; কিন্তু রাত্রিতে তিন তিন বার তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া যুবকের মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। স্বচক্ষে পিতাকে সুস্থ না দেখিলে তিনি সুস্থ হইতে পারিবেন না। তাই বাড়ী যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার আর ঘুম আসিল না; ঘুমাইবার চেষ্টাও করিলেন না। অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই তিনি কলেজের অধ্যক্ষকে রাত্রির ব্যাপার সমস্ত বলিয়া ছুটী লইয়া বাড়ী রওনা হইলেন। বাড়ী যাইতে একটুও কালবিলম্ব করিলেন না।

যুবক খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইতে লাগিলেন। ব্যস্তসমস্ত হইয়া যাওয়ায় গত রাত্রির উৎকণ্ঠা কতকটা কমিয়াছিল। সন্ধ্যাকালে যখন অল্প অল্প আঁধার হইয়া আসিতেছে, ঠিক সেই সময় তিনি বাড়ীর কাছে যাইয়া উঠিলেন। আজ বাড়ী যাইতেছেন, কত আনন্দের বিষয়, কিন্তু তাঁহার আনন্দ হইতেছে না, কেমন একরূপ ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার সে আনন্দ নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। বাড়ীটা তাঁহার চোখে পড়িবামাত্র যেন প্রাণটা দমিয়া গেল। তিনি দেখিলেন—ঘরের খড়খড়িগুলা সমস্তই বন্ধ। সন্ধ্যাকালে খড়খড়ি অনেকে বন্ধ করেন বটে, আর সন্ধ্যাও হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তিনি জানিতেন যে, গো-ধূলির আলো-আঁধারের মিশামিশি ভাবটা তাঁহার পিতা খুব ভালবাসিতেন। তাই তিনি এ সময় খড়খড়ি বন্ধ করিতেন না। বেশ একটু অন্ধকার হইয়া আসিলে তাঁহার আলো জ্বালা অভ্যাস ছিল। আজ এ সময় খড়খড়ি বন্ধ দেখিয়া যুবকের প্রাণটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। বাড়ীর দরজায় গিয়া তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন, কাহাকেও ডাকিতে পারিলেন না। কিছু পরে একটু সামলাইয়া লইয়া দরজায় আঘাত করিলেন। চাকর দরজা খুলিয়া দিল। এই চাকরটি বহুদিন হইতে এই বাড়ীতে চাকুরী করিয়া আসিতেছে। যুবকও ইহাকে জন্মাবধিই দেখিতেছেন। এই পুরাতন চাকরের মুখখানি দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন যে, বাড়ীতে একটা দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে।

চাকর বলিল—"আঃ, আপনি বড়ই দেরী করিয়া আসিয়াছেন! গত রাত্রিতে আসিলেও দেখাটা হইত!" যুবক ভীতিজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা কি মারা গিয়াছেন?" চাকর বলিল—"হ্যাঁ, তিনি গিয়াছেন! ব্যারাম হওয়া অবধি কেবল আপনাকে দেখিবার জন্য ছটফট করিয়াছিলেন। রাত্রি দশটার সময় ফিট্ হইল, আধ ঘণ্টা পরে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইবামাত্র বলিলেন, 'আমার ছেলেকে আনিতে পাঠাও, আমি একটিবার তাহাকে দেখিব।' আমরা বলিলাম, ভোর হইবামাত্র লোক

পাঠাইব।' মনে হইল, আমাদের সে কথা তাঁহার কানে পৌঁছিল না। কারণ, তখনই আবার তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাহার পরে আবার পৌনে বারটার সময় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার জ্ঞান হইল। তখনও বলিলেন—'আঃ! ছেলের সঙ্গে দেখা হইল না! এখনও আসিল না?' আবার অজ্ঞান হইলেন। ঠিক দুইটা বাজিতে দশ মিনিট থাকিতে আবার চোখ মেলিলেন; আমাদিগকে চাহিয়া দেখিলেন, সকলকেই যেন বেশ চিনিতে পারিলেন; কিন্তু কথা বলিতে পারিলেন না। কারণ, বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতিকষ্টে কেবল মৃদুস্বরে বলিলেন—'ছেলের সঙ্গে দুই একটা কথা বলিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। আমি এখনই চলিলাম, তাহাকে দেখা পর্য্যন্ত আর আমার সময় নাই।' এই কথা বলিয়াই তিনি চিরদিনের জন্য চোখ বুজিলেন। যেন সুখের নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িলেন।"

যুবক সূক্ষ্ম-জগতের আভাস এই প্রথম পাইলেন। অনেকেই এরূপ আস্বাদ পাইয়া থাকেন। তবে এ ঘটনাটি খুবই চমৎকার। তাঁহার মনে এই ব্যাপার চিরদিনের মত অঙ্কিত রহিল। শুধু অঙ্কিত নহে, উত্তরকালে তাঁহার জীবনের গতিও ইহাতে একটু অন্যরূপ হইয়া গিয়াছিল।

আমাদের মধ্যে এমন বিস্তর ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের জীবনে এইরূপ ব্যাপার ঘটায় তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্র পর্য্যন্ত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের অতি সন্নিকটেই সূক্ষ্ম-জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, এ কথা না জানায় প্রথমে তাঁহারা কতকটা নাস্তিকভাবাপন্ন ছিলেন, কিছুই মানিতেন না; কিন্তু এইরূপ ব্যাপার দেখিয়াই তাঁহাদের সে ভাব গিয়াছে। এখন সবই মানেন। এটা অবিশ্বাসের যুগ। কেহ কিছু মানিতে চাহে না। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যায় যে, এরূপ সূক্ষ্ম-জগতের কাণ্ড বিস্তর ঘটিতেছে।

অর্দ্ধ-শতাব্দী আগে লোকে আরও নাস্তিক ছিল। তখন কিছুই মানিত না। বরং এখন কতক কতক মানিতেছে। তখনকার অপেক্ষা

এখন আমরা সূক্ষ্ম-জগতের অনেক তথ্য জানিতেও পারিয়াছি। সেই ঘোর অবিশ্বাসের সময় লর্ড লিটন্ "একটি আশ্চর্য্য গল্প" নামক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

"আমার প্রদত্ত বিবরণ অল্প লোকে পড়িবে কি বেশী লোকে পড়িবে, তাহা জানি না। তবে আমি একটা কথা বলিতে পারি যে, অনেক লোক জীবনে কোন-সময়-না-কোন সময় অদ্ভুত ভৌতিক কাণ্ড দেখিয়াছেন। সে সব কাণ্ডগুলি এমন ধরণের যে, সেখানে যুক্তি-তর্ক বড় খাটে না। অন্ধের মত সেগুলিকে ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। হয় তো স্বপ্নে ঐরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। প্রথমে কেহ স্বপ্ন দেখিল, পরে ঠিক তাহাই ফলিয়া গেল। স্বপ্ন কেমন করিয়া ফলিল, সে কথার উত্তর কে করিবে? হয় তো কেহ কোন দুর্ঘটনার কথা দূরে থাকিয়া মনের মধ্যে জানিতে পারিলেন। কেমন করিয়া মনের মধ্যে সেই পূর্ব্বাভাস আসিল, কে তাহার কারণ নির্ণয় করিবে? অদ্ভুত স্বপ্ন দেখা আর সেই স্বপ্ন ফলা, দুর্ঘটনার পূর্ব্বাভাস প্রভৃতি হইতে প্রেতের দেখা দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্তগুলিতেই সূক্ষ্ম-জগতের প্রমাণ হয়। যাঁহারা জীবনের মধ্য-বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই এরূপ অনেক ঘটনা হয় দেখিয়াছেন কিংবা কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন। যাহারা সূক্ষ্ম-জগৎ প্রভৃতির কথা শুনিলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া থাকে, ঐ সকল ঘটনার সু-ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া তাহাদের বুদ্ধিতে কুলায় না। দুনিয়ার সকল ঘটনা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আর এরূপ বিস্ময়জনক ঘটনার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। যাহারা স্বচক্ষে ঐ সকল ভৌতিক ব্যাপার দেখিয়াছে, তাহারা আর অস্বীকার করিতে পারে না। যাহারা শুধু অন্যের মুখে শুনিয়াছে, কেবল তাহারাই নির্ব্বোধ নাম কিনিবার ভয়ে বিশ্বাস করিতে চাহে না। যিনি আমাদের লেখা নির্জ্জনে বসিয়া স্থির হইয়া পড়িবেন, তিনি দেখিবেন যে আমি প্রলাপ বকিতেছি না। পরন্তু যাহা বলিলাম, তাহা সমস্তই সত্য।"

অধুনা তত্ত্ববিদ্যা-সমিতি ও প্রেতানুসন্ধান-সভা ভৌতিক ব্যাপারগুলি

বেশ সুযুক্তির সঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছেন। লর্ড লিটনের সময় ঐরূপ যুক্তি-তর্কের সঙ্গে ঐ সকল ঘটনার আলোচনা হইত না। এখন আমরা এ সম্বন্ধে বেশী বেশী সংবাদ রাখি। মহাত্মা লিটনের উপরি-উক্ত কথাগুলি খুব খাঁটী সত্য।

প্রেতদেহে পরিভ্রমণ করিবার অনেকগুলি কাহিনী বলা হইল। তাহা হইতে আমরা এইটুকু বুঝিলাম যে, তীব্র ইচ্ছা হওয়ায় প্রেতাত্মা স্থূল-শরীর ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছিল। নতুবা আসিবার ঐ ক্ষমতা কখনই হইত না। সাধারণ মানুষের ঐরূপ উৎকণ্ঠাও হয় না, আসিতে পারে না। ব্যারামে পড়িয়া মরণের আগে অনেকটা সময় মানুষ অজ্ঞান হইয়া থাকিতে পারে। ঐরূপ স্থলে প্রেতাত্মা ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত স্থূল-শরীর হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। এইরূপ ব্যাপারের ভূরি ভূরি গল্প আছে।

প্রেতাত্মা আফিসে যাইয়া ফটোগ্রাফ চাহিয়া বসিল।

মরণের আগে তুচ্ছ বিষয়ের নিমিত্তও উৎকট ইচ্ছা হইলে অনেক সময় প্রেতাত্মা বাহির হইয়া পড়ে, তাহার খুব ভাল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। "প্রকৃত ভূতের গল্প" নামক পুস্তকের ১০১ পৃষ্ঠায় এরূপ একটা গল্প লিপিবদ্ধ আছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একটি প্রেতাত্মা প্রাতে ৮টার সময় নিউক্যাস্‌ল্ সহরের সুপ্রশস্ত জনপূর্ণ বড় রাস্তার ধারে একটি দোকানে যাইয়া হাজির। সেখানি ফটোগ্রাফের দোকান। প্রেতাত্মা সহজ মানুষের মত দিব্য স্বাভাবিক ভাবে ঐ দোকানে যাইয়া নিজের ফটোগ্রাফগুলি চাহিল। প্রায় এক মাস আগে ঐখানে তাহার ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল। দোকানদার বলিল, "ছবিগুলি এখনও ঠিক করা হয় নাই; আপনি কা'ল আসিবেন।" প্রেত বলিল, "আমি আসিতে পারিব না, কারণ, আমাকে সমস্ত রাত্রি বেড়াইতে হয়।" লোকটা যে প্রেতাত্মা, তাহা প্রথমে কেহই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু এক

সপ্তাহ পরে তাহার পিতা ঐ দোকানে আসিলেন। তাঁহার মুখে শুনা গেল, যখন তাঁহার পুত্রের প্রেতাত্মা দোকানে আসিয়াছিল, তখন পুত্র বাড়ীতে অচেতন অবস্থায় শয্যাশায়ী। তাহার পরে তাহার আর জ্ঞানসঞ্চারও হয় নাই। সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রেতাত্মা দোকানে আসিয়াছিল প্রাতে ৮টার সময়, আর ঠিক ঐদিনই বেলা ২॥০ টার সময় তাহার মৃত্যু হয়। যিনি ফটো তুলিতেন, তাঁহার নাম—মিঃ ডিকেন্‌সন্। তিনি ঐ প্রেতের রক্তমাংসের প্রকৃত শরীরটা ইহার পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। অন্য লোকে তাহার ফটো তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ফটো দেখিয়া বেশ চিনিয়া ফেলিলেন যে, এ ফটো যিনি প্রাতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারই। মিঃ ষ্টেড্ এই গল্পটি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"আমরা ইহাও মনে করিতে পারি যে, ঐ মূর্ত্তিটি চিন্তা-মূর্ত্তি। এরূপ মূর্ত্তিও চলা-ফেরা করিতে পারে, কথাও বলিতে পারে। চিন্তা-মূর্ত্তি যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাইতে পারে, ইচ্ছামত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেও পারে।"

মিঃ ষ্টেড্ উহাকে চিন্তা-মূর্ত্তি বলিয়া বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহাকে সূক্ষ্মদেহ বলি। চিন্তা-মূর্ত্তি বলিয়া কতকগুলি মূর্ত্তিও আছে। সেগুলি সজীব মানুষেরই প্রেত-মূর্ত্তিবিশেষ। মানুষ অজ্ঞানাবস্থায় থাকিলে সময় সময় ঐ চিন্তা-মূর্ত্তির নির্গমন ঘটে। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আমরা উহার আলোচনা করিব।

পঞ্চদশ অধ্যায়

চিন্তার মূর্ত্তি

যাঁহারা পরাবিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে, মানুষের চিন্তারাশি অনেক সময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; আর সেই মূর্ত্তিগুলি সূক্ষ্ম-জগতের তেজস্তত্ত্বে প্রকট হইয়া উঠে। অপ্‌-তত্ত্বে অর্থাৎ ভুবর্লোকেও অনেক সময় ঐ সকল মূর্ত্তি দেখা যায়। যদি কোন লোক খুব তীব্রভাবে সমস্ত মনটুকু দিয়া ভাবিতে পারে যে, আমি অমুক স্থানে যাইব, তবে তাহার সেই উৎকট চিন্তার ফলে একটা মূর্ত্তি হইয়া সেই ঈপ্সিত স্থানে যাইয়া হাজির হয়। মূর্ত্তিটা ঠিক লোকটারই মত। তাহা হইলেও উহা লোকটির সূক্ষ্মদেহ বা প্রেতাত্মা নহে। উহা একটা স্বতন্ত্র বস্তু। প্রেতাত্মার নির্গমন-কালে প্রকৃত মানুষটাই বহির হইয়া যায়, কেবল স্থূল-শরীরটা অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকে; আর চিন্তা-মূর্ত্তির বহির্গমনকালে প্রেতাত্মা কি না আসল মানুষটা কোথাও যায় না, স্থূলদেহের মধ্যেই থাকে। মাত্র তাহার চিন্তা ঘনীভূত অবস্থায় দৃশ্যমান হইয়া অন্যত্র যায়। স্থূলদেহের সহিত প্রেতাত্মার একটা বন্ধন থাকে, বাহিরে গেলেও আবার ফিরিয়া আইসে। চিন্তা-মূর্ত্তির সেরূপ কোন বন্ধন থাকে না। যোগৈ-শ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই চিন্তা-মূর্ত্তির উদ্ভব করিয়া অনেকরূপ কার্য্য করেন; কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে চিন্তা-মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা সহজ নহে। অনেক সময় এই মূর্ত্তি অপরের দৃষ্টিগোচরও হইয়া থাকে। লোকে তখন ইহাকে আসল মানুষ বলিয়া মনে করে। লোকে দেখিতে পায়, এমন একটা সুন্দর সুস্পষ্ট মূর্ত্তি গঠন করিতে হইলে চিন্তা বা বাসনা খুব তীব্র হওয়া আবশ্যক। এরূপ প্রকট মূর্ত্তির উদ্ভব করিতে হইলে তিনটি কার্য্যের কোন একটি করা চাই। (১) যাহার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, তাহার মনের মধ্যে নিজের চেহারাটা জাগাইয়া, ফুটাইয়া তুলিতে

হইবে। এ কৌশল সাধনা করিয়া শিখিতে হয়; কিংবা (২) যাহার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, তাহার সূক্ষ্ম-শক্তিগুলিকে এরূপভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে, যেন সে চিন্তাকারীর সূক্ষ্ম-দেহটা দেখিতে পায়—এটাও সাধনার ব্যাপার; অথবা (৩) নিজের নিজের চিন্তাকে ঘনীভূত করিয়া স্থূল আকারে পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলে অপরের গোচরীভূত হওয়া যায়। এই তিনটির একটা না একটা করা চাই। একটা গল্প বলিব, তাহাতে শেষের শক্তিটি প্রকাশ পাইয়াছিল। গল্পটি এই—

উদ্বেগের ফল

আলেক্‌জন্দর ড্রমণ্ড নামে এক জন চিত্রকর ছিলেন। তাঁহার কারবার খুব বড়, অনেক লোকজন খাটিত। ওয়াল্‌টার স্টার নামে তাঁহার এক জন শ্যালক কেরাণীর কাজ করিতেন। দোকানটি ডণ্ডী সহরের নর্থগেট রাস্তার উপরে। স্টার প্রত্যহ প্রাতে ৬টার সময় দোকানে যাইয়া, লোকজন কে কি কাজে লাগিল, মাল-মসলা কত কি আছে, এই সব তত্ত্ব-তল্লাস করিতেন। ড্রমণ্ডের কন্যাও তাঁহার সাহায্য করিতেন। এক দিন প্রাতে ৬টার সময় স্টার দোকানে আসিতে পারিলেন না, কিন্তু ঠিক ৬—২০ মিনিটের সময় খুব ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিলেন। যে ডেস্কের কাছে ড্রমণ্ড ও তাঁহার কন্যা স্টারের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, স্টার সেখানে না আসিয়া সটান সম্মুখের দোকানে ঢুকিলেন; সেখান হইতে একটা দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। এই ব্যাপারটা ড্রমণ্ড ও তাঁহার কন্যা দুই জনেই দেখিলেন। আরও বিস্তর লোক দেখিল। ইহার ঠিক ২০ মিনিট পরে "স্টার" ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দোকানে আসিলেন। আসিয়া বলিলেন—"আজ আমার দোকানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, কারণ, আমার ৬—২০ মিনিটের সময় ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, বড় বেশী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। বিলম্ব হইল ভাবিয়া আমি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছি।" স্টার

আধক্রোশ দূরে থাকিতেন। তিনি বরাবরই ঠিক ৬টায় আসিতেন। বড় খাঁটী লোক, কখন এক সেকেণ্ডেরও এদিক্ ওদিক্ হয় না। কথাগুলি শুনিয়া ড্রমণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রথমবারে আসিয়া তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?" ড্রমণ্ডের প্রশ্ন শুনিয়া স্টুটার যেন আকাশ হইতে পড়িলেন ! কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। স্টুটারের কথা ঠিক কি না অর্থাৎ স্টুটার ঠিক ৬—২০ মিনিটে জাগিয়াছিল কি না, তাহা জানিবার জন্য ড্রমণ্ড সেই দিন বৈকালে স্টুটারের স্ত্রীর কাছে গেলেন। স্ত্রীও ঠিক ঐরূপই বলিল। স্টুটারের স্ত্রীও বলিল যে, স্টুটার ৬—২০ মিনিটে জাগিয়াছেন, আর জাগিয়াই বিলম্ব হইল ভাবিয়া খুব ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়িলেন। কারণ, এরূপ ভাবে আর কখনও ঘুমাইয়া পড়েন নি।

নিঃ ষ্টেড "প্রকৃত ভূতের গল্প" নামক পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠায় এই গল্পটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যিনি তাঁহাকে গল্পটি বলিয়াছিলেন, তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ২৫ বৎসর পুলিশ কমিশনার ছিলেন। তাহা ছাড়া ভণ্ডী সহরে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদেও পাঁচ বৎসর কার্য্য করিয়াছেন। এরূপ লোকের কথা কখনই অবিশ্বাস করা যায় না। এরূপ গল্প শুধু এইটিই জানা গিয়াছে, এমন নহে, এরূপ ব্যাপার বিস্তর ঘটিয়াছে, বহু লোকে এরূপ কাণ্ড দেখিয়াছে। "প্রকৃতির নৈশ দিক্" নামক পুস্তকে ক্রো-নাম্নী রমণী অনেকগুলি এই রকমের গল্প বলিয়াছেন। উহাদের মধ্য হইতে আমরা পাঠকবর্গকে কয়েকটি উপহার দিতেছি।

ট্রিপ্‌লিন নামক এক ব্যক্তির প্রেতাত্মা

ষ্টিলিং নামক জনৈক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ট্রিপ্‌লিন সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি উইমার সহরে থাকিতেন। এক দিন একখানি প্রয়োজনীয় দলীল আনিতে আফিসে যান। আফিসে ঢুকিয়াই দেখেন যে, ঠিক তাঁহারই মত অপর এক ব্যক্তি সেই দলীলখানি সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছে। ঐরূপ দেখিয়া তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন বাড়ী

আসিয়া চাকরাণীকে বলিলেন—"টেবিলের উপর কাগজখানি আছে, তুমি যাইয়া লইয়া আইস।" চাকরাণী তাঁহার আদেশমত উহা আনিবার নিমিত্ত আফিসে যাইয়া দেখে যে, তাহার মনিব বসিয়া আছেন। তখন সে মনে করিল, তাহার মনিব বুঝি বা অন্যপথ দিয়া তাহার আগেই আসিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, মনিবের মন আগেই আফিসে আসিয়া মূর্ত্তি ধরিয়া বসিয়াছিল।"

সরিফের কার্য্যাধ্যক্ষ

ফ্রাঙ্ক ফোর্ট সহরের জনৈক সরিফ তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষকে কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিলেন। রওনা হইবার পরই তিনি ফিরিয়া আসিয়া ঢুকিয়া একখানা পুস্তক হাতে করিলেন। সরিফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যেতে না যেতেই আবার ফিরিয়া আসিলে কেন?" যেমন এই প্রশ্ন, অমনই কার্য্যাধ্যক্ষের মূর্ত্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল, আর বহিখানিও ধপাস করিয়া মাটীতে পড়িল। পুস্তকখানির নাম লিনস্ (Liunaeus)। সন্ধ্যাকালে কার্য্যাধ্যক্ষ ফিরিয়া আসিলেন। সরিফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত গিয়াছিলে, যাইয়া কিরূপ ভাবে কাজকর্ম্ম করিলে?" তিনি উত্তরে বলিলেন, যাইতে যাইতে জনৈক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাঁহার সঙ্গে উদ্ভিদ্-তত্ত্ব লইয়া আমার মহাতর্ক উপস্থিত হয়; তখন আমার মনে হইতে লাগিল, 'হায়! যদি লিনস্ বইখানা এ সময় আমার সঙ্গে থাকিত, তবে তাহা দেখাইয়া বন্ধুকে নিরুত্তর করিতে পারিতাম।' (১৭৬ পৃষ্ঠা)

সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি প্রায়ই দেখা দিত

এডওয়ার্ড ষ্টার্ণ এক জন জর্ম্মাণ গ্রন্থকার। তাঁহার জনৈক বন্ধুর সূক্ষ্ম মূর্ত্তি প্রায়ই স্থূল-শরীর ছাড়িয়া দেখা দিত। ঐ ব্যক্তির পিতারও ঐ দশা ঘটিত। পিতা হয় তো মাঠে কাজ করিতেছেন, অথচ তাঁহার সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি

বাড়ী আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; পুত্রবধূ প্রভৃতির সঙ্গে গল্পস্বল্পও করিতেছে। এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার!

"এবার্সডর্ফ" নামক স্থানে সন্ন্যাসিনীদিগের মঠ আছে। পাক করিবার নিমিত্ত তথায় অবশ্যই এক জন পাচিকা থাকে। পাচিকা রান্নাঘরে বসিয়া রান্না করিতেছে, রাঁধিবার সময় তাহার শাকের প্রয়োজন হইল; দেখা গেল, পাচিকারই প্রেতাত্মা বাগানে যাইয়া শাক তুলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। (১৭৮ পৃষ্ঠা)

রোমের একটি অদ্ভুত গল্প

কিছু দিন আগে "ডব্লিন্ ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন্" নামক পত্রিকায় একটি অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঘটনাটি রোমের। বিবরণ এইরূপ :—জনৈক ভদ্রলোক ভ্রমণ করিবার পর বাড়ী আসিলেন। চাকর তাঁহাকে দেখিয়া অবাক্! সে বলিল, "মহাশয়, আপনি তো কিছু আগেই আসিয়াছেন, আপনার সঙ্গে উপর-তলায় যাইয়া আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ খুলিয়া আপনাকে শয়ন-ঘরে শুইতে দিয়া আমি নীচে আসিয়াছি। আবার এখন কোথা হইতে আসিতেছেন? একই মানুষ দুই-দুইবার আসিল! এ যে ভয়ানক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছি!" তিনি বলিলেন—"কই, আমি তো আসি নাই; চল, উপরে কে গেল দেখি গিয়া।" এই কথা বলিয়া তিনি চাকরের সঙ্গে উপরের শয়ন-ঘরে গেলেন। চাকর যে পোষাক খুলিয়া রাখিয়াছে বলিল, সে পোষাক-পরিচ্ছদ কিছুই নাই। শুইলে বিছানা যেমন জড়সড় হইয়া থাকে, দেখা গেল, বিছানাটি সেইরূপ হইয়া রহিয়াছে; ঠিক যেন কিছু আগে কেহ শুইয়াছিল। আর দেখা গেল, ঘরের মধ্যে ছাদের গায় কি রকম দাগ রহিয়াছে, বিদ্যুৎ চলিয়া গেলে যেরূপ ঝল্‌সা-পোড়া দাগ হয়, ঐ দাগটাও ঠিক সেইরূপ। তিনি বড়ই চমৎকৃত হইলেন। ভাবিয়া আর স্থির করিতে পারেন না যে, কেন এমনটি হইল। শেষে মনে পড়িল যে, বাহিরে থাকার

কালে মহাক্লান্ত হইয়া তিনি একটিবার চিন্তামগ্ন হইয়া পড়েন। খানিকটা সময়ের জন্য তাঁহার মনেই ছিল না যে, তিনি বাহিরে আছেন। মনে হইতেছিল, যেন বাড়ীতেই আছেন। (১৮৯ পৃষ্ঠা)

এই গল্পটি বড়ই আশ্চর্য্যজনক। অনেকের মনে হয়, পোষাক খুলিয়া দেওয়ার কথা আর ছাদের গায়ে সেই দাগটির উল্লেখ, এ দুটিই অতি-রঞ্জিত। এই অধ্যায়ের যতগুলি গল্প বলা হইল, সবগুলিই চিন্তামূর্ত্তির কাহিনী। মূর্ত্তিগুলি প্রেতাত্মার নহে, সবগুলিই চিন্তামূর্ত্তি, কেন না, প্রত্যেক স্থলেই দেখা যাইতেছে যে, আসল মানুষটা জাগিয়া ছিল অথচ দূরবর্ত্তী স্থানে তাহার অবিকল মূর্ত্তি বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছে।

পুরোহিতের একটা সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি

লেডবিটার সাহেব নিজেও একবার নিজের সূক্ষ্মমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। সেটিকেও চিন্তা-মূর্ত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা চলে। তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :—"অনেক দিন আগে আমি একটি পল্লীতে পুরোহিত ছিলাম। তখন বিশেষ কোন কারণে আমার শরীরটা বড়ই রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রবিবারের কাজকর্ম্ম করিয়া উঠা আমার পক্ষে যেন একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। উঠিলে কি হয়, অতিকষ্টে কাজগুলি করিলাম, কিন্তু ভয়ানক ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। সন্ধ্যার সময়ও অনেক কাজ করিবার ছিল। ভাবিতেছিলাম, সেই কাজের ধাক্কাটা পেলে অনেকটা বিশ্রাম করিতে পাইব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি গির্জ্জা মন্দিরের দিকে চলিলাম। ঘরের মধ্যে যাইয়াই যাহা দেখিলাম, তাহা অতীব বিস্ময়জনক—দেখিয়া আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল! দেখিলাম, ঠিক আমারই মত একটি লোক চেয়ারে বসিয়া আছে। ঐ চেয়ারখানি ছাড়া আর চেয়ার ছিল না। তাহার উপরে আবার এই রকম কে একজন বসিয়া রহিয়াছে। আমার যেমন পোষাক পরা, উহার গায়েও ঠিক সেইরূপ পোষাক! লোকটা বিষণ্ণভাবে অথচ একদৃষ্টে আমার দিকে

চাহিয়া রহিল। যে সময় এই ঘটনাটি ঘটে, তখন আমি পরবিস্তার আলোচনা করিতাম না, তাই এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণও নির্দ্দেশ করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু তখন শুনা ছিল যে, যদি কোন লোক নিজের সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তবে সে খুব শীঘ্রই মারা পড়ে। কিন্তু আমি সে সময়টা এত ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিলাম যে, লোকটি কে, হয় তো আমি মরিব, এ সব চিন্তা করিবার সামর্থ্য ছিল না। আমি সটান সেই লোকটার কাছে গেলাম, আর চেয়ারের উপর, বলিতে কি, লোকটার ঘাড়ের উপর বসিয়া পড়িলাম। সে জন্য কোন ত্রুটি-স্বীকারও করিলাম না। তাহার পর সেই লোকটার কি হইল, কোথায় গেল, তাহা জানি না; কেন না, ১০ দশ মিনিট পরে যখন আমি একটু সুস্থ হইয়া উঠিলাম, তখন সেই মূর্ত্তিটি আর সেখানে ছিল না। ইহার পর আর কোন কিছু ঘটে নাই। তাহার পর সেইরূপ ব্যাপারও আর কখন দেখি নাই। আমার মনে হয় যে, পুরোহিতের দৈনন্দিন কার্য্যের দিকে আমার ঐকান্তিক যত্ন থাকিলেও আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিরন্তরই একটা বিশ্রামের ইচ্ছা জাগিতেছিল। আর ঐ প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাবশেই মনে মনে এমন একটা মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল, যেন ঘরের মধ্যে চেয়ারে আমি উপবিষ্ট আছি, আর কার্য্যশেষে বিশ্রাম করিতেছি। শরীরটা দুর্ব্বল হওয়ায় অন্তরিন্দ্রিয়গুলি সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। আর সেই জন্যই আমার চিন্তা-মূর্ত্তিটি দেখিবার মত দিব্যচক্ষু ফুটিয়াছিল।”

ষোড়শ অধ্যায়

ভূতযোনি আসিয়া মৃত্যু-সংবাদ দিয়া যায়

মানুষের প্রেত-মূর্ত্তি অনেক সময় স্থানান্তরে যাইয়া অনেকের স... দেখাশুনা করে, কথাবার্ত্তা বলে, এ সব কথা আমরা পূর্ব্বে বিশেষ ক... বলিয়াছি। খাঁটী ভূতগুলিও ঠিক ঐরূপ; ঠিক ঐ সূক্ষ্ম-দেহের ম... ভূতেরা প্রায়ই মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে না। কেবল যখন দে... করিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে, তখনই তাহারা মানুষকে দে... দেয়। অনেক সময় তাহাদের দেখা দিবার উদ্দেশ্যও আমরা সম্যক্ বুঝি... পারি না। ভূতের আবার দেখা করিবার প্রয়োজন! এ কথা শু... অনেকে বিস্মিত হইতে পারে; কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ... সব লোক বাঁচিয়া আছে, তাহাদেরও কার্য্যকলাপ, মনের ভাব, উ... প্রভৃতি আমরা অনেক সময় বুঝিতে পারি না। তবে ভূতের উদ্দেশ্য... সব সময় কেমন করিয়া বুঝিব? দেখা যায়, জীবিত মনুষ্যেরাও তুচ্ছ বি... অনেক সময় অনেক উৎসাহের অপব্যয় করিয়া থাকে। হয় তো ... ক্ষণস্থায়ী বাসনা বা খেয়াল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত, হয় তো ... তুচ্ছ অর্থ উপার্জ্জনে বা কাহারও সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইবার ... ঘোর উৎসুক, কিংবা হয় তো কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে বা কাহ... উপর প্রতিশোধ লইতে প্রাণপণ করিতেছে। সাধারণ মানুষ এইরূপ ... বিষয়ে সর্ব্বদাই মহাব্যস্ত থাকে। তাহাদের সময় ও উৎসাহ যদি এই... নষ্ট না হয়, যদি তাহারা ঐ সময় ও উৎসাহের সদ্ব্যবহার করে, ... হইলে তাহাদের মহোপকার হয়, সন্দেহ নাই। সময় ও উৎসাহের স... ব্যবহার করিতে পারিলে তাহারা আত্মোন্নতি করিয়া লইতে পারে। ... বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, বুদ্ধিশুদ্ধি হইবার পরও যে কেন তুচ্ছ বিষয়ে সর্ব...

করে, সেটা বুঝিয়া উঠা বাস্তবিক কঠিন। প্রবীণ লোকেও যে তুচ্ছ বিষয়ে ব্যস্ত থাকে, আমরা প্রত্যহই তাহা দেখিতে পাই।

মানুষ মরিয়া গেলে বিশেষ একটা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে না, স্থূল শরীরটা খসিয়া যায় মাত্র। জীবিত অবস্থায় যেরূপ বুদ্ধি-শুদ্ধি ও যেরূপ প্রকৃতি থাকে, মরিয়া গেলেও তাহার জীবাত্মার সে সব ঠিক সেইরূপই থাকে। স্বভাবের একটুও এদিক্ ওদিক্ হয় না। যেমন স্বভাব, ঠিক তেমনই থাকে। বাঁচিয়া থাকার সময় যখন তুচ্ছ বিষয়ে মানুষ ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন মরিয়া গেলে তাহার জীবাত্মা বা ভূত-যোনি তুচ্ছ বিষয়ের জন্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করিবে, সেটা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভূত অনেক সময় মানুষের সঙ্গে দেখা-শুনা করিয়াছে; কিন্তু খুব বেশী স্থলেই কোন ভালবাসা মানুষের কাছে আসিয়া নিজের মরণের সংবাদটা দিয়া গিয়াছে। মৃত্যু-সংবাদ দিতে আসে, এইটিই বেশী দেখা যায়। সেনাপতি হুইট্‌ক্রফট্‌ মরিয়া গেলে ভূত হইয়া আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিলেন। সে গল্পটি বড় চমৎকার! মৃত্যু সম্বন্ধে সরকারী কাগজে তারিখের ভুল হইয়াছিল। সেনাপতির ভূতযোনি আসিয়া সে ভুল সংশোধন করিয়া দেয়। মিঃ আর, ডি, আউয়েনের "পদসঞ্চার" নামক গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠায় গল্পটি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জনৈক কর্ম্মচারীর প্রত্যাগমন

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সেনাপতি হুইট্‌ক্রফট্‌ ৬নং অশ্বারোহী সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন।

তাঁহার স্ত্রী ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ সহরে ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর রাত্রির শেষভাগে স্ত্রী স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি যেন স্বামীকে দেখিতেছেন; স্বামী অসুস্থ ও উদ্বিগ্ন। স্বপ্ন দেখিয়াই জাগিলেন। শুধু জাগা নয়, ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন বাহিরে ফুটফুটে

জ্যোৎস্না। জাগিয়া তিনি ভাল করিয়া চাহিলেন। চাহিয়াই দেখিলেন যে, তাঁহার বিছানার পার্শ্বে স্বামীর মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মূর্ত্তির পরে সেনাপতির পোষাক, হাত-দুখানা জড় হইয়া বুকের উপরে আছে; চুল আলুথালু; মুখখানি বড়ই ম্লান। স্ত্রী দেখিলেন, মূর্ত্তিটির বড় বড় চোখ দুটি তাঁহার উপরে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। চোখ দুটিতেও একটা উদ্বেগ প্রকাশ পাইতেছিল। তাঁহার স্বামীর উদ্বেগ হইলেই মুখে একরূপ বিশেষ রকমের সঙ্কোচ দেখা যাইত। দেখিলেন, মূর্ত্তির মুখে সেইরূপ সঙ্কোচ এখন বিদ্যমান। তিনি খুব ভাল করিয়া স্বামি-মূর্ত্তির পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। এইরূপ ভাবে দে তাঁহার বরাবরই অভ্যাস ছিল। আরও লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে জড়-করা হাত-দুটির মধ্য হইতে বুকের উপরকার যে সাদা কামিজটা দে যাইতেছে, তাহাতে রক্তের দাগ নাই। কামিজটাও বেশ সাদা ধপধপে আছে। তাঁহার মনে হইল, যেন ঐ মূর্ত্তি বেদনাপ্রযুক্ত সম্মুখ দি ঝুঁকিয়া পড়িতেছে আর যেন কথা বলিবারও চেষ্টা করিতেছে; কি কোনরূপ স্বর বাহির হইতেছে না। মূর্ত্তিটা এইরূপ ভাবে এক মিনিট দেখা দিয়াছিল। তাহার পরই মিলাইয়া গেল।

“রমণী মূর্ত্তিটি দেখিয়া প্রথমে ভাবিলেন—আমি সত্যই জাগিয়া আ না স্বপ্ন দেখিতেছি? জাগিয়া আছেন কি না, ভাল করিয়া বুঝিবার তিনি বিছানার চাদরের একটা মোড় তুলিয়া ভাল করিয়া চোখ মুছিলেন। চোখ মুছিতে মুছিতে বুঝিলেন যে, সত্যই জাগিয়া আছে তাঁহার একটি ছোট ভাই-পো তাঁহার কাছে ঘুমাইতেছিল। তার বুকের উপর নীচু হইয়া কান পাতিয়া তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিলেন তখন বুঝিতে পারিলেন যে, স্বপ্ন নয়, বাস্তবিকই জাগিয়া আছেন। রাত্রে তাঁহার ঘুম হইল না।

“রাত্রি প্রভাত হইলে তাঁহার মায়ের কাছে এই সমস্ত ব্যাপার বলিলেন। আর বলিলেন—‘মা, যদিও আমার স্বামীর কোন স্থানে

দাগ দেখি নাই, তথাচ আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, তিনি হয় নিহত হইয়াছেন, নয় গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন।' এই ভূতযোনি দেখিয়া স্বামীর মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার এতই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি শোকে অধীরা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি মনের কষ্টে কোন স্থানে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেন না। কেহ নিমন্ত্রণ করিলে ফিরাইয়া দিতেন। একদিন তাঁহার একজন সখী তাঁহাকে বলিল—'ভাই, আমার স্বামী মণ্টা নামক দ্বীপ হইতে আমার জন্য একটা সুন্দর পোষাকী জামা পাঠিয়েছেন। আজ সেটা পরিয়া নাচ করিব। তোমাকে, ভাই, সাজিয়া গুজিয়া আমার সঙ্গে যাইতেই হইবে।' শুনিয়া তিনি বলিলেন—'যত দিন না আমি আমার স্বামীর হাতের পত্র পাই, তত দিন বুঝিতেই পারিতেছি না, আমি বিধবা কি সধবা; এ অবস্থায় আমি কখনই আমোদ-প্রমোদ করিতে পারি না, আমাকে আর অনুরোধ করিও না; ১৪ই তারিখের পরের পত্র পাইলে বুঝিব, তিনি বাঁচিয়া আছেন, নচেৎ বুঝিব, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।'

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, মঙ্গলবারে, সেনাপতি হুইটক্রফটএর মৃত্যু-সংবাদের টেলিগ্রাম লণ্ডনে প্রচারিত হইল। টেলিগ্রামে প্রকাশ— তিনি ১৫ই নভেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌ সহরের নিকট নিহত হইয়াছেন।

"এই দারুণ সংবাদটি লণ্ডনে প্রাতেই সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়। উহা মিঃ উইল্‌কিন্‌সনের চোখে পড়ে। তিনি লণ্ডনের একজন উকীল। সেনাপতির সংসার দেখাশুনার ভার ঐ উকীলের উপর ন্যস্ত ছিল। কিছুকাল পরে তিনি সেনাপতির স্ত্রীর নিকট যাইয়া এই দারুণ সংবাদ দিলেন। রমণী বলিলেন, 'আমি ইহা পূর্ব্বেই জানিয়াছি; আর আপনি বলিতেছেন, আমার স্বামী ১৫ই নভেম্বর মারা গিয়াছেন, সেটা ভুল কথা, তিনি তাহার আগেই মারা পড়িয়াছেন। আমি ১৪ই শেষ রাত্রে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি প্রেতমূর্ত্তিতে আমায় দেখা দিয়াছিলেন।'

"যুদ্ধ-অফিস হইতে একটা মৃত্যুর সার্টিফিকেট লওয়া তখন মিঃ উইল্‌কিন্‌সনের কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। শুধু টেলিগ্রামের উপর নির্ভর করা চলে

না, তাই তিনি সার্টিফিকেট লইলেন। তাহাতেও ঐ ১৫ই তারিখে মৃত্যুর কথাই পাওয়া গেল। সার্টিফিকেটখানা এইরূপ :—

নং ৯৫৭৯ যুদ্ধ-অফিস;
৩০শে জানুয়ারী, ১৮৫৮

এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতেছে যে, এই অফিসের কাগজপত্র দেখিয়া মনে হয়, ৬নং অশ্বারোহী গার্ড দলের সেনাপতি জর্ম্মান্ হুইটক্রফ্ট ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

(স্বাক্ষর) বি, হাউজ।

"মিঃ উইল্‌কিন্‌সন্ টেলিগ্রামে ও সার্টিফিকেটে মৃত্যুর তারিখ দেখিলেন —১৫ই নভেম্বর; আবার সেনাপতির স্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন, ঐ তারিখ ১৪ই নভেম্বর। কাজে কাজেই উইল্‌কিনসনের মন সন্দেহের দোলায় দুলিতে লাগিল। কোন্ তারিখটা ঠিক, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না, ঠিক এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। তাহাতে তাঁহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে টেলিগ্রামের ও সার্টিফিকেটের তারিখ হয় তো ভুল। ব্যাপারটা এইরূপ :—উইলকিন্‌সন এক দিন জনৈক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বন্ধুর স্ত্রী প্রায়ই ভূত-প্রেত দেখিতে পাইতেন। সারাটি জীবনই তাঁহার ঐ দশা। যত ভূত তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া চাপিত। আবার বন্ধুটিও প্রায় সেইরূপ। তাঁহার ঘাড়েও অতি সহজে ভূত আসিত। তাঁহাদের নাম-ধাম আমরা খুব ভালরূপই জানি, কিন্তু প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় পরিচয় দিতেছি না। পাঠক মনে করুন, যেন তাঁহাদের নাম মিঃ ও মিসেস্ এন্। উঁহারা যে সহজে ভূতাবিষ্ট হইতেন, সে কথা উঁহাদের বন্ধু-বান্ধব ব্যতীত বাহিরের লোকে বড় একটা জানিত না।

"তাই বলিতেছিলাম, মিঃ উইলকিন্‌সন এক দিন ঐ বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করিতে যান। যাইয়া গল্পপ্রসঙ্গে উঁহাদিগকে হুইটক্রফটের স্ত্রীর স্বপ্ন-বৃত্তান্তটা বলিলেন। কেমন করিয়া তাঁহার প্রেতমূর্ত্তি বুকের উপর হাত

জড় করিয়া আসিয়া স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল—সমুদয় গল্পটি করিলেন। শুনিয়া মিসেস্ এন তাঁহার স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'যে দিন আমরা ভারতবর্ষের আলোচনা করিতেছিলাম, সেই দিন একটা মূর্ত্তি দেখিতে পাই, মনে আছে ত? এ ঠিক সেই মূর্ত্তি! মিঃ উইলকিন্‌সন যেরূপ পোষাকের কথা বলিতেছেন, যেরূপ হাত জড় করিয়া বুকের উপর রাখার কথা বলিতেছেন, যাতনায় সম্মুখদিকে যেরূপ ঝুঁকিয়া পড়ার কথা শুনি-তেছি—এ সবই ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইতেছে।' মিসেস্ এন বক্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ, ঠিক, এই মূর্ত্তি ঠিক, সে দিন আমার স্বামীর পিছন দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার বাঁ কাঁধের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল।'

"উইলকিন্‌সন জিজ্ঞাসা করিলেন—'তাহার নিকট হইতে আপনারা কোন সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন কি?'

"মিসেস্ এন বলিলেন—'হ্যাঁ। ভূতটি আমার স্বামীর ঘাড়ে আসিয়া চাপিল, সুতরাং স্বামীর মুখ দিয়া সে একটা সংবাদ দিয়া গেল।'

'আপনার সে সংবাদের তাৎপর্য্যটা মনে আছে কি?'

"মিসেস্ এন্ বলিলেন—'যে দিন দেখা দিল, সেই দিনই বৈকালে ভারতবর্ষে লোকটি মারা গিয়াছিল; বুকে দারুণ আঘাত লাগায় মৃত্যু হইয়াছিল। আরও জানা গিয়াছিল যে, শবটা তখনও কবর দেওয়া হয় নাই।' মিসেস্ এন্ আরও বলিলেন যে, ভূতের কথাগুলি তাঁহার বেশ মনে আছে।

'কখন এই ভূতযোনি আপনাদের এখানে আসিয়াছিল?'

'কয়েক সপ্তাহ হইল, রাত্রি প্রায় ৯টার সময়; কিন্তু তারিখটা আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না।'

'তারিখটা মনে পড়ে, এমন অন্য কোন ঘটনা সেদিন ঘটে নাই কি? এই প্রশ্ন শুনিয়া—মিসেস্ এন্ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—'কই এমন তো কিছু মনে পড়িতেছে না। কেবল একটা কথা মনে

আছে যে, ঠিক সেই দিন এক জন ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম। ঠিক সেই সময় একটি লোক জর্ম্মাণদেশীয় ভিনিগার বিক্রয় করিতে আইসে। আমিও বলিলাম যে, ইংলণ্ডের ভিনিগার ভাল। শুধু কহি নহে, আমি পরীক্ষার জন্য এক বোতল কিনিয়াও রাখিলাম।'

'তার দাম সে সময় দিয়াছিলেন কি ?'

'হ্যাঁ ; আমি চাকর দিয়া দাম পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।'

'দাম পাইয়া বিক্রেতা রসিদ দিয়াছে কি ?'

'আমার মনে হইতেছে—দিয়াছে। কিন্তু রসিদখানি উপরে আছে, দাঁড়ান দেখি।' মিসেস এন্ বিল ও রসিদ আনিলেন। দেখা গেল তাহাতে তারিখ রহিয়াছে—১৪ই নভেম্বর।

"এই তারিখ দেখিয়া মিঃ উইল্‌কিনসনের ধ্রুব বিশ্বাস হইল যে, হুইট্‌ক্রফটের স্ত্রীর স্বপ্নই সত্য—তাঁহার ধারণাই ঠিক। বুঝিলেন, মৃত্যু ঠিক ১৪ই নভেম্বরই হইয়াছে। তখন মেসার্স কক্‌স এণ্ড গ্রীনউডের আফিসে গেলেন। যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা হুইট্‌ক্রফটের যে মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তাহাতে তারিখ সম্বন্ধে কোনরূপ ভুল আছে কি না ? কিন্তু আফিসের কর্ম্মচারীরা কোনরূপ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন না।

'স্যর কলিন্ কাম্বেল দুইটি বিবরণের মাঝে সেনাপতি হুইট্‌ক্রফটের মৃত্যুর কথা লিখিয়াছেন। দুইটিতে ১৫ই নভেম্বরের কথা। এই তারিখের সঙ্গে টেলিগ্রামের তারিখেরও খুব মিল।'

"ভুল সংশোধনের আপাততঃ আর কোন উপায় রহিল না। কাজেই সকলে কিছুদিন চুপচাপ করিয়াই থাকিলেন। অবশেষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে হুইট্‌ক্রফটের স্ত্রী সেনাপতি জি, সি-র নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। পত্রখানি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌ হইতে লিখিত। পত্রপাঠে জানা গেল, সেনাপতি হুইট্‌ক্রফট

নভেম্বর তারিখে বৈকালে লক্ষ্ণৌর সন্নিকটে বীরত্বের সহিত সৈন্য পরিচালন করিতে করিতে বুকে একটি গোলা লাগায় মারা পড়িয়াছেন। সেনাপতি জি, সি লিখিয়াছেন যে, ক্যাম্বেল ১৫ই তারিখে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা ভুল। মৃত্যু ১৪ই তারিখের বৈকালে হইয়াছে। হুইট্‌ক্রফট ও আমি, আমরা দুজনে একসঙ্গে সৈন্য চালাইতেছিলাম। তিনি আমার পার্শ্বে মারা পড়িলেন। আমি স্বচক্ষে তাঁহার মৃত্যু দেখিয়াছি। গোলার আঘাত লাগার পর তিনি আর কথা বলেন নাই। দিলকুশা নামক স্থানে তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে। ৯নং ভল্লধারী অশ্বারোহী সেনাদলের লেপ্টনাণ্ট আর হুইট্‌ক্রফটের বন্ধু। ইনি কবরের উপর একখানি কাঠের ক্রুশ পুতিয়া দিয়াছেন। সেই ক্রুশে সংক্ষেপে জি, ডবলিউ লেখা আছে ; ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে মৃত্যু—এ কয়টি কথাও ক্ষুদিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"যুদ্ধের আফিস পরিশেষে মৃত্যু-তারিখের ভ্রম সংশোধন করিয়াছিল। সংশোধনটা কিন্তু এক বৎসর পরে করা হয়। বেশ অবসর পাওয়ায় মিঃ উইল্‌কিন্‌সন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আর একখানি সার্টিফিকেট পাইবার দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঠিক আগেকার মত একখানি সার্টিফিকেট দেওয়া হইল। কেবল তারিখের বেলায় ১৫ই নভেম্বর না দিয়া এবার ১৪ই নভেম্বর লিখিয়া দেওয়া হইল।

"এই অদ্ভুত কাহিনীটি মিঃ আউয়েন হুইট্‌ক্রফটের স্ত্রীর নিকট হইতে সোজাসুজি ভাবেই পাইয়াছিলেন। তিনি আউয়েনকে সেনাপতি সি-র পত্রখানিও দিয়াছিলেন ; কেন না, তাহাতে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর যথাযথ বর্ণনা ছিল। আউয়েন পত্রখানি মিঃ উইলকিন্‌সনকেও দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, যতটা আমি জানি, পত্রের লিখিত ব্যাপার সত্য বলিয়া আমার ধারণা। আর খুব ভাল মতে জানা গিয়াছে যে, মিসেস্ এনের প্রদত্ত বিবরণও খুব খাঁটি সত্য।

"মিঃ আউয়েন বলেন যে, ভূতের আবির্ভাব দেখিয়া আফিসের নথিপত্রের

ভুল ধরা—এরূপ অদ্ভুত ঘটনা এইটি ছাড়া আর বোধ হয় ঘটে নাই। আর কাগজগুলিও বড় সোজা নহে।—প্রধান সেনাপতির প্রদত্ত বিবরণ, তা ছাড়া যুদ্ধ-অফিসের প্রদত্ত মৃত্যু-সার্টিফিকেট। এমন সব গুরুতর দলিলে ভুল! আর এ কথাও বলা চলে না যে, এক জন রমণীর কাছে ভূতের গল্পটি শুনিয়া আর এক জন রমণী মিথ্যা করিয়া একটি গল্প রচনা করিয়া লইল। তা বলা চলে না; কারণ, হুইট্‌ক্রফ্‌টের স্ত্রী ছিলেন কেম্ব্রিজে, আর মিসেস্ এন্ ছিলেন লণ্ডনে। আর দুই জনের দৃষ্ট ব্যাপার এক সপ্তাহ পরে পরস্পরের কাছে ব্যক্ত হয়। দৈবাৎ হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা কথাটি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। প্রথম, মিসেস্ এন্ ভূতটিকে দেখিলেন, দ্বিতীয়, মিসেস্ হুইট্‌ক্রফ্‌টও দেখিলেন, তৃতীয়, মৃত্যুর তারিখ সকলেই একইরূপ দেখিলেন। আবার রমণী দুই জনের দেখা তারিখে আর সেনাপতি সি-প্রদত্ত বিবরণের তারিখে কেমন সুন্দর মিল!”

আমরা ঐ গল্পটিই প্রথমে বলিলাম; কেন না, মিঃ আউয়েন্ উহার সুন্দর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গল্পটিতে কয়েকটি সুন্দর বিষয় বুঝিয়া লইবার আছে। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, হুইট্‌ক্রফ্‌টের প্রেতাত্মা মিঃ ও মিসেস্ এনের জাগ্রত অবস্থায়ই আসিয়া দেখা দিল, অথচ নিজের স্ত্রীর কাছে আসিয়া তাঁহার নিদ্রিত অবস্থায় প্রথমে দেখা দিল। ইহার তাৎপর্য্য কি? ভারতে বৈকালে হুইট্‌ক্রফট্ মারা পড়েন। তখন বিলাতে প্রাতঃকাল। অতএব তাঁহার প্রেতাত্মা অন্ততঃ ১০ ঘণ্টা কাল সূক্ষ্ম-জগতে অবস্থান করিবার পর লণ্ডনে আসিয়া মিসেস্ এন্‌কে দেখা দিল। আরও ৩।৪ ঘণ্টার পর কেম্ব্রিজে নিজের স্ত্রীর কাছে আসিল। স্ত্রীকে যে শুধু স্বপ্নে দেখা দিয়াছিল, তাহা নহে। স্ত্রী জাগিলেও স্পষ্টতঃ দেখা দিল। ভূতেরা কখন কখন স্থূল-শরীর ধারণ করে। কিন্তু হুইট্‌ক্রফ্‌টের প্রেতাত্মা স্থূল-শরীর গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।

মিঃ আউয়েন্ "বিবাদভূমি" নামক পুস্তকের ২১৯ পৃষ্ঠায় আর একটি গল্প বলিয়াছেন। গল্পটি আরও চমৎকার। একটি স্ত্রীলোক মারা গিয়াছিল, তাহার প্রেতাত্মা আর এক জন স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া নিজেই সেই মৃত দেহটি দেখাইয়া দিয়াছিল। দেখাইবার সময় নিজে অতি চমৎকার উজ্জ্বলমূর্ত্তিতে সেই দেহটার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। মিসেস্ এল্ নাম্নী এক জন মহিলা আউয়েনকে ঐ গল্পটি বলেন। গল্পটি এইরূপ—

ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ

মিসেস্ এল্ নাম্নী রমণীর ভগিনীর নাম এস্থার। সম্প্রতি বিবাহ হওয়ায় এস্থার এই নূতন স্বামীর ঘর-কন্না করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ হইল কালিফোর্ণিয়ায় গিয়াছেন। মিসেস্ এল্ এস্থারও তাঁহার স্বামীর পৌছান সংবাদ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। এক দিন রাত্রে মিসেস্ এল্ স্বপ্ন দেখিলেন, যেন এস্থার তাঁহার বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—"সিসিলিয়া, আমার সঙ্গে কালিফোর্ণিয়ায় আইস!" মিসেস্, এল্ বলিলেন—"না, স্বামীকে ফেলিয়া, ছেলেপুলে ফেলিয়া আমি এত দূরদেশে যাইতে পারিব না, আর যাওয়াও বড় কষ্টকর।"

এস্থার বলিলেন—"আমরা খুব শীঘ্রই যাইতে পারিব; ভোর না হইতেই তুমি আবার আসিয়া পৌছিবে।"

স্বপ্নে মিসেস্ এলের মনে হইল যে, শীঘ্রই আসা যাইবে; তাই তিনি বিছানা হইতে উঠিলেন। তাহার পর তিনি ভগিনীর অর্থাৎ এস্থারের হাত ধরিয়া যেন খুব উপরে উঠিয়া একটা বিপুল শূন্যমার্গ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পরে উপর হইতে নামিয়া একটি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীটি খুব ভাল নহে। মিসেস্ এল্ ভাবিতেন যে, ভাগ্যের উন্নতি করিবার নিমিত্ত তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতি

বিদেশে যাইয়া হয় তো খুব সুন্দর বাড়ীতে বাস করিতেছেন ; কিন্তু এখন দেখিলেন, তাহা নহে। বাড়ীটি খুবই বিশ্রী রকমের। বাড়ীতে ঢুকিয়াই সিসিলিয়া তাঁহার ভগিনীপতিকে দেখিলেন, দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, তাঁহার ভগিনীপতি খুব দুঃখিতভাবে শোকের পোষাক পরিয়া বসিয়া আছে। এস্থার সিসিলিয়াকে লইয়া একটি ঘরের মধ্যে গেলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা কফিন (মড়ার বাক্স), বাক্সের মধ্যে একটা মড়া। এস্থার আঙ্গুল দিয়া মড়াটা দেখাইলেন। সেটি এস্থারের নিজেরই মৃত দেহ। মৃত্যু হওয়ায় দেহটা মলিন, বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মিসেস্ এল্ বিস্মিত হইয়া একবার সেই বিবর্ণ মড়াটার দিকে, আবার নিকটে দণ্ডায়মানা এস্থারের জীবন্ত সমুজ্জ্বল মূর্ত্তির দিকে নীরবে চাহিতে লাগিলেন। ভগিনীর এই বিস্ময়ভাব দেখিয়া এস্থারের প্রেতমূর্ত্তি বলিল—"হাঁ, দিদি, ওটা আমারই দেহ; ব্যারামে ঐরূপ হইয়াছে। আমার কলেরা হইয়াছিল। আমি তাই মরিয়া এখন সূক্ষ্ম-জগতে আসিয়াছি। আমার মৃত দেহটা তোমাকে দেখাইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তোমাকে লইয়া আসিয়া দেখাইলাম। শীঘ্রই তুমি আমার মৃত্যু-সংবাদ পাইবে।"

তাহার পরে মিসেস্ এল্ স্বপ্ন-ঘোরেই যেন একা একা আবার উর্দ্ধে উঠিলেন। পরে বিপুল শূন্য-রাজ্য অতিক্রম করিয়া নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যে দুইটি গল্প বলা হইল, তাহার দুইটি সূক্ষ্ম-মূর্ত্তিই ভূত-যোনি। মরণের পর জীবাত্মা ঐরূপভাবে আসিয়া দেখা দিয়াছিল। উহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মরণের পরও মানুষের জ্ঞানের কিছুমাত্র এদিক্-ওদিক্ হয় না। বাঁচিয়া থাকিতে যেমনটি ছিল, মরিয়া গেলেও ঠিক সেইরূপই থাকে। ঐ ভূত-যোনি দুইটির কোনটিই স্থূল-শরীর ধারণ করিয়াছিল না। করিলে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিগোচর হইত। তাহা হইলে সে-সে তাহাকে দেখিতে পাইত, যখন-তখন দেখা যাইত। আমরা এখন আ

একটি গল্প বলিব। সেটি আরও অদ্ভুত। সে গল্পের ভূতটি স্থূল-শরীর ধারণ করিয়া ঘণ্টা বাজান, গল্প করা প্রভৃতি পর্য্যন্ত করিয়াছিল।

ডাঃ ফ্রেডারিক্ জর্জ্জলী "গোধূলি-আভাস" নামক গ্রন্থের ১০৮ পৃষ্ঠায় বিবরণটি সন্নিবেশিত করিয়া বলিতেছেন—"এ গল্পটি খুব খাঁটি সত্য, ইহার এক বিন্দুও মিথ্যা নহে; আমি এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রমাণ লইয়াছি।" আমরা এখানে গল্পটি সংক্ষেপে বলিব। গল্পটি এইরূপ :—

খালাসী বালকের প্রত্যাগমন

গ্রীন্‌উইচ সহরের ক্রুম শৈলের উপরে হ্যামাণ্ড—নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। মিসেস্ পটার নাম্নী তাঁহার একজন চাকরাণী ছিল। পটারের একটি ছেলে। ছেলেটির বয়স ১৫ বৎসর। ডোরিস নামক একখানি যুদ্ধ-জাহাজে ঐ বালক খালাসীর কাজ করিত। দেখিতে শুনিতে দিব্য সুচেহারা, কিন্তু বড়ই অস্থির। মাঝে মাঝে জাহাজ হইতে চলিয়া আসিত। তাই তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা তাহাকে লইয়া বড়ই জ্বালাতন হইত। জাহাজের অধ্যক্ষকে বলিয়া কহিয়া তাহাকে আবার চাকুরীতে বসান হইয়াছিল আর অধ্যক্ষকে বলা হইয়াছিল, আপনি দয়া করিয়া উহার প্রতি একটু নজর রাখিবেন, দেখিবেন, যেন আর না পলায়। কিছু দিন পরে বালকের মা হ্যামণ্ডের বাড়ীর চাকুরী ছাড়িয়া দিল। ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় বিবাহ করিল; কিন্তু বালকটি চাকুরীতে আবদ্ধ হইয়া দূরে ছিল, তাই মায়ের বিবাহের কথা জানিতে পারে নাই। গল্পটির পরের অংশ আমরা লীর কথাতেই বর্ণনা করিব। লীর বর্ণনা এইরূপ—

"১১৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের রাত্রে হ্যামণ্ডের বাড়ীর রাস্তার উপরকার দরজার ঘণ্টাধ্বনি হইল, তখন সে বাড়ীতে মেরী নাম্নী এক জন চাকরাণী ছিল। মেরী আসিয়া দরজা খুলিল। দুই একটি কথার পরই আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল। হ্যামণ্ডের স্ত্রীর অসুখ,

তিনি শুইয়া ছিলেন। যে ঘরে ছিলেন, সেখান হইতে সদর দরজা দেখা যাইত; এমন কি, দরজায় দাঁড়াইয়া কথা বলিলে, তাহাও শুনা যাইত। যখন মেরী আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলিতেছিল, তখন তিনি শুইয়া শুইয়াই শুনিতেছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া বেশ বুঝিতেও পারিলেন যে, এটা টম্‌পটারের গলার স্বর। রমণী তখন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মেরী, দরজায় কে কথা বল্‌ছে?' মেরী বলিল—'মা, ও একটা ছোট খালাসী বালক; মায়ের খোঁজে এসেছিল। আমি বলিলাম —তোমার মায়ের খবর আমি জানি না। এই বলিয়া উহাকে বিদায় দিয়া দিলাম।'

"হ্যামণ্ডের স্ত্রী বড়ই ব্যস্ত হইলেন; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বালকটি দেখিতে কেমন?' মেরী বলিল—'মা, বেশ ফুট-ফুটে ছেলেটি, গায়ে জাহাজের খালাসীর পোষাক, পা দুখানি খালি—জুতা নাই। আমি দেখিলেই এখন তাহাকে চিনিতে পারি। ছেলেটি বড়ই ম্লান মুখে এসেছিল, বড়ই কষ্টে আছে বলিয়া মনে হইল। আমি যখন বলিলাম, তোমার মা এখানে নাই, তখন সে কপালে হাত দিয়া বলিল— হায় রে! এখন কি করি!

"রমণী তখন হ্যামণ্ডকে বলিলেন, 'আজ এক জন লোক আসিয়া বলিয়া গেল যে, টম্‌পটার আবার জাহাজ হইতে পলাইয়াছে।'

হ্যামণ্ড ও তাঁর পত্নী দুই জনেই তখন টম্‌পটারের মায়ের নিকটে পটারের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত লোক পাঠাইলেন। শুনিলেন, মা তার খবর জানে না। তখন তাঁহারা পটারের শিক্ষক ডাঃ টডের কাছে যাইয়া ব্যাপারটা বলিলেন। টড্ শুনিয়া বলিলেন—'টম্‌পটার জাহাজ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে, এ কথা অসম্ভব। দুই মাস হইল, আমি তার হাতের পত্র পাইয়াছি। পত্রে লিখিয়াছিল, সে বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে কার্য্য কর্ম্ম করিতেছে।' ডাঃ টডের কাছে তাঁহার অনেকগুলি ছাত্রের ফটোগ্রাফ ছিল। টম্‌পটারেরও একখানি ছবি তাহার মধ্যে ছিল। টড্ মেরীকে

সম্মুখে ছবিগুলি রাখিলেন। তার পর তাহাকে বলিলেন—'তুমি যে বালকটিকে দেখিয়াছিলে, তাহার চেহারাখানি বাছিয়া লও দেখি।' অন্য একখানি চেহারা লইয়া মেয়েটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন, এই বালকটি নয়? বোধ হয়, এই বালকই জাহাজ থেকে পলাইয়া আসিয়াছে।' মেরী দেখিয়া বলিল—'না, মা, ইহাকে আমি দেখি নাই।' এই বলিয়া যেখানি টম্‌পটারের চেহারা, সেইখানি ছোঁ দিয়া তুলিয়া লইল। লইয়া বলিল—'এই যে সেই বালক! ইহাকেই আমি দেখিয়াছিলাম। আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি যে, সে এই।'

"শীঘ্রই রহস্যের মীমাংসা হইয়া গেল। পরের মাসেই ডাঃ টড জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষের কাছ হইতে একখানি পত্র পাইলেন। কর্ত্তৃপক্ষ লিখিতেছেন—'মহাশয়, টম্‌পটারের মায়ের ঠিকানা না জানার দরুণ আপনাকেই লিখিতেছি যে, ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে জ্যামেকার নিকটে জাহাজে দারুণ দুর্ঘটনা ঘটায় টম্‌পটার মারা পড়িয়াছে।' মৃত্যুর ঠিক দুই দিন পরেই তাহার প্রেতমূর্ত্তি হ্যামণ্ডের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।'

"মেরী নাম্নী চাকরাণী যদি অত তাড়াতাড়ি তাহাকে বিদায় দিয়া দরজা বন্ধ না করিত, তাহা হইলে আমরা টম্‌পটারের ভূতযোনির নিকট হইতে অনেক কথাই জানিতে পারিতাম। কিন্তু টম্‌পটার নিজের মৃত্যু বুঝিতে পারিয়াছিল কি না, বুঝিতে পারিয়া সেই সংবাদ তাহার মাকে দিতে আসিয়াছিল কি না, অথবা নিজের মরণটি আদৌ বুঝিতে পারে নাই, এ সব ব্যাপার আমাদের জানিবার আর কোনই উপায় নাই। সূক্ষ্ম-জগতের সঙ্গে একটু পরিচিত হইলেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার মা যেখানেই থাকুক না কেন, তাহার কাছে যাইয়া উঠা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত নহে। মরিতে মরিতেই সেটুকু হয় তো সে জানিতে পারে নাই; তাই বলিয়াছিল,—'হায় রে, এখন কি করি?' স্থূল-জগতে যেরূপ

ঘটে, টম্‌পটারেরও প্রথম প্রথম সেইরূপ ঘটিয়াছিল। সে যেখানে তাহার মাকে রাখিয়া চাকুরী করিতে গিয়াছিল, প্রেতমূর্ত্তিতে প্রথমে সেই-খানেই তাহাকে খুঁজিতে আসিল।”

আমরা আর একটি গল্প বলিব। এ ক্ষেত্রেও একটি ছেলে তাহার মাতাপিতার কাছে আসিয়া তাহার আকস্মিক মরণের কথাটা বলিয়া-ছিল। এ গল্পটাও অদ্ভুত রকমের।

এক জন পরোপকারী সাধুর প্রেতমূর্ত্তি

সাউদম্‌টন জেলার অন্তর্গত আর্টার্‌স্ লজ্ বাসী মিঃ জেম্‌স্ উইল্‌ডের পুত্র ফিলিপ সেণ্ট এড্‌মণ্ড কলেজে পড়িত। স্কুল-কলেজের ছেলেরা ছুটীর পর নৌকায় চড়িয়া প্রায়ই ব্যায়াম করিত। এক দিন নৌকায় উঠিয়া খেলা-ধূলা করিতে করিতে ফিলিপ জলে ডুবিয়া মারা গেল। কলেজের অধ্যক্ষের নাম—ডাঃ কক্‌স্। পরদিন প্রাতে এই দারুণ সংবাদ ফিলিপের পিতাকে দিবার নিমিত্ত কক্‌স্ নিজেই তাঁহার কাছে যাইয়া উঠিলেন। পিতা উইল্‌ড পড়িবার ঘরে বসিয়া ছিলেন। কক্‌স্ যাইবামাত্র চাকরেরা তাঁহাকে উইল্‌ডের ঘরে পৌঁছাইয়া দিল। কক্‌স্ দেখিলেন, উইল্‌ড চোখের জলে ভাসিতেছেন। কক্‌স্‌কে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—“প্রিয় মহাশয়, যে জন্য আসিয়াছেন, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। আমি আগেই জানিয়াছি ফিলিপ মারা গিয়াছে। গত কল্য আমার কন্যা ক্যাথেরাইনের সঙ্গে আমি মাশুল-ফটক-ওয়ালা বড় রাস্তার উপরে বেড়াইতে বেড়াইতে দিনে দুপুরে ফিলিপকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, রাস্তার উচ্চ বাঁধের উপর সে আর এক জন যুবকের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে। যুবকটির পোষাকের গাঢ় দেশ কালো রঙের। আমার কন্যাই প্রথম ফিলিপকে চিনিয়াছিল। কন্যা আমাকে বলিল—‘বাবা দেখ দেখ, ঐ যে ফিলিপ দাঁড়িয়ে আছে।’ আমি চলিলাম, দেখিলাম, ফিলিপই সত্য। আমি তখন আমার মেয়েকে

বলিলাম—'সত্যই ত ফিলিপ! কিন্তু উহাকে আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।' সে কেন ওখানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম বটে, কিন্তু সে যে মারা গিয়াছে, তাহা একবারও মনে আসিল না। আমি তাহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত তাহার কাছে চলিলাম। আর অল্প একটু গেলেই তাহার নিকটে যাইতে পারি, এমন সময় একটা মজুর সেই বাঁধের উপর দিয়া যাইতেছিল। দেখিলাম, সেই লোকটা আমার পুত্রের ও তাহার সঙ্গীর দেহের আড়াল দিয়া যখন চলিয়া গেল, তখন ফিলিপদের দেহ দ্বারা সে একটু ঢাকা পড়িল না। মনে হইল, যেন উহাদের দুই জনের দেহ স্বচ্ছ। চমৎকার ব্যাপার! এইরূপ কাণ্ড দেখিবামাত্র আমি বুঝিলাম যে, ফিলিপ ও তাহার সঙ্গী প্রেতমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। আমি কন্যার সঙ্গে তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে যাইতেছিলাম। তখন ফিলিপ আমাদের দিকে চাহিয়া মুখ মুচকিয়া হাসিল। তাহার পরই তাহারা মিলাইয়া গেল।"

উইল্‌ডের মুখে এইরূপ শুনিয়া কক্‌স বড়ই ব্যথিত হইলেন। তিনি তখন শোকার্ত্ত পিতাকে মৃত্যুর কাহিনী বলিলেন। আর বলিলেন—"আপনি যখন ঐ প্রেত-মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, ঠিক তখনই ফিলিপও মারা গিয়াছে।"

কক্‌স্ উইল্‌ডকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, কালো পোষাকপরা একটি যুবক আপনার পুত্রের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, আর আপনি বলিতেছেন, তাহার মূর্ত্তিও বেশ দেবদূতের মত অতি সুশ্রী, সে লোকটি কে?" উইল্‌ড বলিলেন, "আমি তাহাকে একেবারেই চিনি না।"

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে মিঃ উইল্‌ড একদিন ল্যাঙ্কাশায়ারের অন্তর্গত ষ্টোনীহর্ষ্ট নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন একটি জায়গায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। প্রাতে সেখানকার গির্জ্জায় উপাসনা-কার্য্য শেষ করিয়া গাড়ীর প্রতীক্ষায় আছেন, এমন সময় তাঁহাকে গির্জ্জার চাকর আসিয়া বসিবার ঘরে লইয়া গেল। তিনি তখন বেড়াইতে বেড়াইতে আগুন

রাখিবার স্থানটির কাছে যাইয়া উঠিলেন। ধূম-নির্গমনের চিমনীর কাছে একখানি ছবি দেখিতে পাইলেন। ছবিটির গায়ে কালো পোষাক। এই মূর্ত্তিটিকেই তিনি ফিলিপের সঙ্গে দেখিয়াছিলেন। ছবির নীচে লেখা ছিল "সাধু ষ্ট্যানিস্‌লচ কোচ্‌ক।" খৃষ্টানদের মধ্যে ইনি একজন খুব বড় সাধু। ফিলিপ "সমর্থন-অনুষ্ঠানের" সময় ইঁহাকেই মনোনীত করিয়াছিল। "সূক্ষ্মজগতের আভাস" নামক গ্রন্থের ২য় অঃ, ৫১ পৃষ্ঠা।

ডাঃ লী বলেন যে, ঐ গল্পটি খাঁটী সত্য ঘটনা। উহা যে সত্য, সে বিষয়ের বিস্তর প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। বিস্তর পত্র, বিস্তর সার্টিফিকেট প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, গল্পটির এক বর্ণও মিথ্যা নহে। ফিলিপ যেমন মৃত্যু সময়ে বা মরণের খুব অল্প সময়ের পরই তাহার পিতার সঙ্গে প্রেত-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল, সেরূপ দেখা বহুলোকে বহু সময়ে দিয়াছে। টম্‌পটারের ভূতযোনি ও সার উইন্‌ডের পুত্রের ভূতযোনি—এ দুইটির মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। টম্‌পটারের ভূতযোনি স্থূলদেহ ধারণ করিয়াছিল আর শেষোক্ত ভূতযোনি সেরূপ করে নাই। ফিলিপ যদি স্থূলদেহ ধারণ করিত, তবে যে মজুর তাহার কাছ দিয়া যাইতেছিল, সে অবশ্যই তাহাকে দেখিতে পাইত; কিন্তু সে দেখিতে পায় নাই। পিতা ও ভগিনী যে তাহার সূক্ষ্মদেহ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। তাহার উপর ইহাদের খুব স্বাভাবিক স্নেহ ছিল, কারণ, ইহাদের শরীরের পরমাণুগুলিকে সূক্ষ্ম-দেহ দেখিবার মত স্পন্দিত করিয়া তোলা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া উঠে। আর মজুরের সহিত ভালবাসার সেরূপ কোন আকর্ষণ না থাকায় ঐরূপ একটা স্পন্দন সেখানে করিতে পারে নাই। তাই সেই মজুর তাহার প্রেত-মূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। তাই সে সটান সোজা ভূতের কাছ দিয়া চলিয়া গেল। ভূত মোটেই তাহার চোখে পড়িল না। এরূপ গল্প আরও অনেক আছে। "থিওজফিক্যাল্ রিভিউ" নামক মাসিক পত্রিকায় কয়েক বৎসর হইল "যুদ্ধশিক্ষার্থীর গল্প" শীর্ষক একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। ই

গল্পটি পড়িলে জানা যায়, একজন মেজরের ভূতযোনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে দেখা দিয়াছিলেন। কিন্তু নাবিকরা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই; কেন না, তাহাদের সঙ্গে ততটা ভালবাসা ছিল না।

একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা

ফিলিপ প্রেতমূর্ত্তিতেই দেখা দিয়াছিল। তাহার গল্পটির মধ্যে একটু অসাধারণ ব্যাপার দেখা যায়। সে ব্যাপারটা এই যে, উহার সঙ্গে অন্য একটি মৃত ব্যক্তির ভূতযোনিও উপস্থিত ছিল। অথচ সেটি চেনা নহে। পরে একখানি ছবি দেখিয়া জানা গিয়াছিল যে, সে একজন সাধু। এই সাধুর প্রেতাত্মা সম্বন্ধে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু কোন্ ব্যাখ্যাটি ঠিক, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে যে, সাধুর যে মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল, তাহা যথার্থ-ই সেই সাধুর। সাধু হয় তো ভুবর্লোকে ছিলেন, পরে মৃত ভক্ত ফিলিপের সঙ্গে আসিয়া জুটিয়া পড়িলেন। সাধু সেণ্ট ষ্ট্যানিস্‌লচ কোচকা হয় তো ভুবর্লোকে থাকিয়া তাঁহার বিশেষ ভক্তবৃন্দকে নূতন বলে বলীয়ান্ করিতেছিলেন। বলীয়ান্ করিবার নিমিত্ত বিশেষ সঙ্কটসময়ে শিষ্যবৃন্দকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ভুবর্লোকে আজও অবস্থান করিতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে ভক্ত ফিলিপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এরূপ হওয়া অসঙ্গত নহে। কথাটা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আবার অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সাধু ষ্ট্যানিস্‌লচ কোচকা বহু বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মত ব্যক্তি এত দিনও যে ভুবর্লোকে আছেন, তাহা নিতান্তই অসম্ভব। যাঁহারা কম বয়সে মারা যান, তাঁহারা দীর্ঘকাল ভুবর্লোকে থাকেন সত্য, আর তিনিও খুব কম বয়সে মারা গিয়াছিলেন, সে কথাও সত্য। তথাচ তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে এত উচ্চ ছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে এত দীর্ঘকাল ভুবর্লোকে থাকা একান্তই অসম্ভব। আর এত দীর্ঘকাল তথায় থাকিতে হইলে খুব বেশী ইচ্ছা-শক্তি

থাকা চাই। আরও সেরূপ ভাবে থাকিতে হইলে অসম্ভব ঘটনারও সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। যে সব লোক দুশ্চরিত্র, নর-পিশাচ, ঘোর পাপাত্মা অথচ যাহাদের ইচ্ছাশক্তি বলবতী, তাহাদের পক্ষে এরূপ দীর্ঘকাল ভুবর্লোকে থাকা সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু যাঁহার স্বভাব খুব ভাল, যাঁহার চরিত্রে ভক্তি ও পবিত্রতার উৎস নিরন্তর ক্ষরিতেছে সেরূপ দেব-চরিত্র ব্যক্তি কদাচ ভুবর্লোকে এত দীর্ঘকাল থাকিতে পারেন না।

আবার অন্যভাবেও আলোচনা করা যাইতে পারে। মনে করা যাইতে পারে যে, সাধুর ঐ মূর্ত্তিটি আদৌ ভূত-যোনি নহে। উহা হয় তো একটা চিন্তামূর্ত্তি। জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, ফিলিপ নিজেই হয় তো ঐ মূর্ত্তির উদ্ভব ঘটাইয়াছিল। অনেক সময় সূক্ষ্মজগতে আমাদের নিজের চেষ্টাতেই এরূপ বহু সঙ্গী আমরা আনিয়া ফেলি। সে বিষয় পরে আমরা অনেক কথা বলিব।

ফিলিপ এক জন ধার্ম্মিক যুবক ছিল। পরমাত্মঘটিত ধ্যান-ধারণা করিতে বসিয়া সে নিশ্চয়ই তাহার গুরু ও আদর্শস্থানীয় ঐ সাধুর একটা চিন্তা-মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিল। মৃত্যুকালে বা মৃত্যুর পরেই হয় তো সে ঐ সাধুর চিন্তা করিয়াছিল। হয় তো এইরূপ ভাবিয়াছিল যে, সাধু তাহার সহায়রূপে তাহার কাছেই আছেন। এইরূপ ভাবনার ফলে সাধুর মূর্ত্তি স্থূলদেহবৎ ফিলিপের পিতার ও ভগিনীর চক্ষুগোচর হয়।

মরণের পর সাধুগণ সূক্ষ্ম-দেহ ধারণ করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করেন—আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। এই সুন্দর বিশ্বাসটি আমরা নষ্ট করিতে বসি নাই। ফিলিপের সঙ্গে অন্য একটি মূর্ত্তির দেখা হওয়ার মত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিলে তাহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা কতটা করা যাইতে পারে, মাত্র আমরা তাহারই চেষ্টা করিতেছি। তাই যত প্রকার কথা বৈজ্ঞানিক বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, একটা একটা করিয়া তাহারই উল্লেখ করিতেছি। তাই আমরা

বলিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সাধুর মূর্ত্তিটি ফিলিপেরই নিজের তীব্র কল্পনার ফল হওয়া অসম্ভব নহে। আমরা কিন্তু উহাকে চিন্তামূর্ত্তি বলি না।

মনে করা যাক্ যে, সাধুর ঐ মূর্ত্তিটি একটি চিন্তা-মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ মূর্ত্তির সহিত পিতাকে দেখা দিবার উদ্দেশ্য কি? ফিলিপ জানিত, তাহার পিতা তাহার দারুণ মৃত্যু-সংবাদ অচিরাৎ পাইবেন। তিনি যাহাতে হঠাৎ মর্ম্মাহত হইয়া না পড়েন, সে জন্য তাঁহাকে একটু প্রস্তুত করিয়া লওয়া ফিলিপের উদ্দেশ্য হইয়াছিল। আর সে মনে করিল, পিতা যদি দেখেন, তাহার কাছে সাধুর মূর্ত্তি সঙ্গিরূপে আছেন, তাহা হইলে তাঁহার কতকটা দুর্ভাবনা যাইবে। ফিলিপ পূর্ব্বে তীব্র-ভক্তির সঙ্গে উপাসনা করিয়াছিল। তাহারই ফলে পিতা ও ভগিনীকে সান্ত্বনা দিবার এই উপায়টি সে করিয়া তুলিতে পারিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সাধুর মূর্ত্তিটি ফিলিপ ইচ্ছা করিয়াও গড়িয়া তুলিতে পারে কিংবা গড়িয়া তুলিবার একটা উদ্দেশ্য না থাকিতেও পারে। দুই-ই সম্ভব। আর যদি ইচ্ছা করিয়াই ঐ মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া আসিয়া থাকে, সেটাও আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে; কেন না, ওরূপ ঘটনা আমাদের অনেক জানা আছে।

সাধুর মূর্ত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট। তবুও আমাদের আর একটি কথাও মনে আইসে। কথাটি যেন আমাদের আরও ভাল বলিয়া বোধ হয়। ভুবর্লোকে অনেক অদৃশ্য সহায় থাকেন। তাঁহারা আমাদের বন্ধুর মত হিতৈষী। ফিলিপ জীবিত অবস্থায় সাধুর বিষয় চিন্তা করিয়া চিন্তা-মূর্ত্তিটি গড়িয়া তুলিয়াছিল, এখন সূক্ষ্মজগতের কোন অদৃশ্য বান্ধব সেইটি লইয়া তাহার উপকারার্থ ব্যবহার করিতে পারেন। মানুষ এই পৃথিবীতে জীবিতকাল অহরহঃ চিন্তা করিয়া হয় তো কত চিন্তা-মূর্ত্তি গড়িয়া তুলে। হয় তো কেন, সত্যিই গড়িয়া তুলে। মৃত্যুর পর ঐ মূর্ত্তি তাহার সঙ্গিরূপে তাহার কাছে কাছে থাকে। সূক্ষ্ম-জগতের অনেক পরোপকারী সাধু ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে

সদুপদেশ দিয়া, তাহার প্রাণে নূতন বলের সঞ্চার করিয়া, নূতন আশায় উৎসাহিত করিয়া, তাহার বিশেষ উপকার করেন। ফিলিপের উপকার করিবার উদ্দেশ্যে যদি কোন মহাত্মা তাহার চির-পোষিত, চির-পরি চিন্তা-মূর্ত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে তাহাই বা অসম্ভব হইবে কেন ?

এইরূপ ব্যাখ্যাই যদি সত্য হয়, তবে মনে করিতে হয় যে, কোন ব্যোমচারী মহাত্মা সাধুর চিন্তা-মূর্ত্তির মধ্যে ঢুকিয়া ফিলিপের পিতা ও ভগিনীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন; কেন না, তাহা হইলে পিতা স্নেহে অভিভূত হইয়া পড়িবেন, এই ভাবনায় ফিলিপ আর অস্থির হইবে না। ফিলিপের মনে একটু শান্তি আনাই ঐ মহাত্মার উদ্দেশ্য। অতএব মূর্ত্তিটি যথার্থই সাধু ষ্ট্যানিস্‌লসের হইতে পারে; আবার না-ও হইতে পারে। কেবল চিন্তা-মূর্ত্তিরূপে তাহার সঙ্গী হইয়াও থাকিতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঐ সাধুর মূর্ত্তিটি বাস্তবিক পক্ষে সাধুর প্রেতাত্মা নহে। কোন বন্ধু হয় তো অল্পদিন আগে মরিয়াছিল; তাহারই প্রেতাত্মা ফিলিপের উপকার করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সাধুর মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার কাছে কাছে ঘুরিতেছিল। কেন না, ঐ মূর্ত্তির উপর ফিলিপের একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল বলিয়া মৃত বন্ধুর জীবাত্মা হয় তো ভাবিয়াছিল যে, ঐ মূর্ত্তি ধরিয়া বেড়াইলে ফিলিপের সম্ভবতঃ বেশী শান্তি হইবে। ইহাতে আমরা আর একটা যথার্থ ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই।

নিম্নে আর একটি সত্য ভূতের গল্প দেওয়া হইল। গল্পটি আগেরটার মত অতটা সুন্দর নহে। একটা মানুষ মরিতে মরিতেই ভূত হইয়াছিল, সেই বিষয় বলা হইয়াছে। এক জন সুইডেন্‌-দেশীয় পুরোহিত গল্পটি অপরকে বলেন। আমরা তাঁহার কাছে শুনিয়াছি। 'থিওজফিক্যাল রিভিউ' নামক পত্রিকার ২৩ খণ্ডের ১৭৭ পৃষ্ঠায় উহার বিবৃতি আছে। আমরা গল্পটি যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম। পুরোহিত নিজেই ঘটনা দেখিয়াছিলেন। ব্যাপারটা এই :—

ষোল জনে ভূতটিকে দেখিয়াছিল

পুরোহিত বলিয়াছেন ঃ—টীংষ্টেড্ নামক পুরোহিত-পল্লীতে একটা স্কুলে বাল্যকালে আমি কয়েক বৎসর পড়িয়াছিলাম। স্কুল হইতে আমার বাড়ীটা দূরবর্ত্তী হওয়ায় আমি একটি স্ত্রীলোকের বাড়ীতে বাসা লইয়াছিলাম। আমার মত আরও অনেকে সেই বাড়ীতে ঘর ভাড়া করিয়াছিল। আমরা সব শুদ্ধ ষোল জন ছিলাম। যাঁহার বাড়ীতে ছিলাম, তাঁহার নাম ফ্রু স্মিথ্। ইহার অবস্থা ভাল নয় বলিয়া ইনি ছেলেদের বাসা দিয়াছিলেন। বাসা দেওয়া, খাইতে দেওয়া—এই সব কাজে দুপয়সা লাভ হইত। সেই লাভে ফ্রু স্মিথ্ কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাইতেন। তাহা ছাড়া তিনি মাঝে মাঝে ধাত্রীর কাজও করিতেন। আমি যে ঘরটিতে থাকিতাম, তাহাতে আর একটি ছাত্রও থাকিত।

ঘোর শীতের সময়। এক দিন সন্ধ্যার আগে ফ্রু স্মিথ্ বলিলেন, "আমি আজ রাত্রে স্থানান্তরে চলিলাম, আজ আর ফিরিব না, কা'ল প্রাতে আসিব। আজ তোমাদের খাবার ব্যবস্থা করিয়া গেলাম। তোমরা আলো আর আগুন সম্বন্ধে খুব সতর্ক হইবে।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমরা সন্ধ্যাকালে পড়াশুনা করিতাম, সে দিনও সন্ধ্যায় পড়া মুখস্থ করিতে বসিলাম। অন্য দিনের মত সে দিনও সাড়ে নয়টার সময় শুইলাম। শুইবার আগে আমাদের ঘরের দরজার তালা বন্ধ করিয়া আলোটি নিভাইয়া দিলাম। আমাদের ঘরে কাঠের আগুন করা হইত। আগুন রাখিবার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। তাহাকে উনন বলা যাউক। সেই উনন হইতে খুব গন্‌গনে আগুনের একটা আভা আসিতেছিল। সেই আভাতে ঘরের মধ্যে বেশ দেখা যাচ্ছিল। আমরা দুই জনে শুইয়া শুইয়া আস্তে আস্তে গল্প-সল্প করিতেছিলাম—এমন সময় দেখি, একটা দীর্ঘ পুরুষমূর্ত্তি আমাদের বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। লোকটা মধ্যবয়স্ক, দেখিতে কৃষকের

মত, গায়ের পোষাক সাধারণ লোকের ন্যায়—ধূসর রঙের। আমাদে
মনে হইল, তাহার বুকে ও বাঁ পায়ে কি যেন একটা সাদা উঁচু জিনি
লাগিয়া আছে। আমার সঙ্গীটি আমাকে ঐ মূর্তি দেখাইবার নিমি
চুপে চুপে বেশ একটু জোরে ঠেলা দিল। ঠেলা দিয়া আমার কা
কানে বলিল—"ঐ কিম্ভূত-কিমাকার লোকটা কে?" আমি তাহাকে
চুপ করিতে ইঙ্গিত করিলাম। তাহার পর দুই জনেই আগ্রহের স
দেখিতে লাগিলাম যে, লোকটা কি করে।

লোকটা অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহা
পর ফিরিল। ফিরিয়া সমস্ত ঘরটার মধ্যে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইবা
সময় কেমন একটা বিকট শব্দ হইতে লাগিল, মনে হইল, লোকটা যে
বরফের উপর দিয়া হাঁটিতেছে। তাহার পর দেরাজের কাছে যাই
দেরাজের সব খোপগুলি খুলিল, আবার তখনই সেগুলি বন্ধ করি
দেখিয়া মনে হইল, লোকটি যেন কি খুঁজিতেছে। তাহার প
আবার উননের কাছে গেল। সেখানে যাইয়া ফুঁ দিয়া আগুন
একটু গন্‌গনে করিয়া তুলিল। পরে হাত দুইটা আগুনের উপর বাড়া
দিল, মনে হইল, যেন হাত দুইটা একটু গরম করিয়া লইতেছে। ই
পরেই সে আবার আমাদের বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমা
দিকে চাহিয়া রহিল, আমরাও তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু এ
অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম। দেখিলাম যে, তাহার দেহের ভিতর দি
দেহের আড়ালের জিনিসপত্র দেখা যাইতেছে। দেহটা যেন স্বচ্ছ! ঘ
আর এক মোড়ে একটা তাকওয়ালা ডেক্স ছিল। সেটাকে ত
দেহের ভিতর দিয়াও দেখা গেল। আমরা বিস্মিত হইয়া তাহার দি
তাকাইয়া থাকিতে থাকিতেই সে আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল—
বেমালুম শূন্যে মিলাইয়া গেল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা যে
একরকম হইয়া গেলাম। আমরা বিছানা হইতে উঠিতে পারিলাম
জড়সড় হইয়া পড়িয়া রহিলাম। তাহার পর ঘুমাইয়া পড়িলাম।

প্রাতে উঠিলাম। তখনও আমাদের ঘর তালা-বন্ধ ছিল। তালা খুলিয়া বাহিরে আসিলাম। অন্যান্য লোক যাহারা সেই বাড়ীতে ছিল, তাহাদিগকে রাত্রির এই অদ্ভুত গল্পটি বলিলাম। সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল যে, তাহারাও রাত্রে ঐরূপ দেখিয়াছে। সকলের ঘরেই তালাবন্ধ ছিল, অথচ প্রত্যেক ঘরেই ঐ মূর্ত্তি ঢুকিয়া ঐরূপ ভাবে দেখা দিয়াছে। ষোল জনের প্রত্যেকেই দেখিয়াছে। তাহা ছাড়া আমাদের মধ্যে যাহারা ঐ বাড়ীতে অনেক কাল ছিল, তাহারা বলিল যে, ঐ লোকটা ফ্রু স্মিথের স্বামী। ইহাকে তাহারা দেখিয়াই চিনিয়াছে। আর বলিল, লোকটা অতি বিশ্রীস্বভাবের, কোন কাজ-কর্ম্মই করে না, কয়েক বৎসর যাবৎ কেবল বাহিরে বাহিরে থাকে, আপন স্ত্রীর খোঁজ-খবর রাখে না।

ইহার পরে লোকটার সম্বন্ধে সকলেরই কেমন একরূপ কৌতূহল হইল। সে আর কাহাকেও দেখা দিয়াছে কি না, জানিবার নিমিত্ত সকলে তখন অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিল। অনুসন্ধান করিতে করিতে জানা গেল যে, ঠিক ঐ রাত্রে ৯॥০টার সময় দুই মাইল দূরবর্ত্তী একটা গোলাবাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছিল। সেখানে যাইয়া বলে যে, আমাকে রাত্রে একটু আশ্রয় দাও। সেখানে স্থান না থাকায় তাহাকে বলা হয়, এখানে স্থানাভাব; এই ক্ষেত্রটার ওধারে খুব নিকটে একটা গোলাবাড়ী আছে, সেখানে যাও। অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, বরফের উপর তাহার পায়ের দাগ রহিয়াছে। দাগ ধরিয়া কিছু দূর গেলেই দেখা গেল, একখানা কাঠের জুতা পড়িয়া রহিয়াছে। আর একটু গেলেই দেখা গেল, লোকটা মরিয়া পড়িয়া আছে, বরফের মধ্যে দেহটার প্রায় অর্দ্ধেক ডুবিয়া গিয়াছে। মড়াটাকে টানিয়া বাহির করিলে দেখা গেল, একটা বরফের চাংড়া তাহার বাঁ বুকের উপর জমিয়া আঁটিয়া রহিয়াছে, আর একটি চাংড়া ঐরূপ ভাবে বাঁ হাঁটুতে লাগিয়া রহিয়াছে। প্রেতমূর্ত্তি ঘরের মধ্যে বেড়াইবার সময় ঠিক ঐ দুইটি স্থানেই সাদা উঁচু কি একটা দেখা গিয়াছিল। আমি যে সময় এই ব্যাপার দেখি, তখন আমি নিতান্ত বালক। তবুও এই ঘটনাটি আমার মনে খুব স্পষ্টই অঙ্কিত আছে।

এরূপ ঘটনা সচরাচরই ঘটে। কিছুই অসাধারণ নহে। অসাধারণের মধ্যে এই যে, এই প্রেতমূর্ত্তি একই সময়ে অনেকগুলি লোককে দেখা দিয়াছিল। ঘটনাটি ভাবিলে মনে হয় যে, এই ভূতযোনি কতকটা স্থূল-শরীর ধারণ করিয়াছিল। নচেৎ একই সময়ে এতগুলি লোককে দেখা দেওয়া সম্ভব হইত না। তাহার পর দেরাজ খোলা ও বন্ধ করা প্রভৃতি কার্য্যও স্থূল-শরীরেরই ব্যাপার। উহার মনে একটু আশ্রয় পাইবার তীব্র ইচ্ছা হইয়াছিল। ঘরগুলি পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়াছিল। ইহাতে মনে হয়, সে তাহার স্ত্রীর টাকা-কড়ি লইবে, এইরূপ মতলব ছিল। আগুনে হাত সেঁকা দেখিয়া মনে হয় যে, সে নিজেও নিজের মরণের কথাটা টের পায় নাই। যে সময় ঐ প্রেতমূর্ত্তি ঘরের মধ্যে ঐ রকম কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছিল, তখন বাস্তবিকই সে মরিয়াছে কি মরণের পূর্ব্বকালীন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিল, তাহার কোন ভালরূপ প্রমাণ নাই। লক্ষ্য করিতে হইবে—অন্যান্য ভূতের মত ইহারও কার্য্যকলাপ। স্থূল-শরীরের অনুরূপ দেহে অন্যান্য ভূতেরা যেমন দেখা দেয়, এও সেইরূপ দেখা দিয়াছিল। স্থূল-শরীরে যে বরফ লাগিয়াছিল, প্রেতমূর্ত্তিতে পর্য্যন্ত সেই বরফের কামড়িয়া ধরা চাঙড়া। বরফের উপর বেড়াইবার শব্দ পর্য্যন্ত প্রেতের পায়ের তলায় শুনা গিয়াছিল।

এই প্রেতযোনি মিজের মরণের কথা ছেলেদিগকে বলিবার জন্য আসিয়াছিল, এমনটি আমাদের মনে হয় না। ছেলেগুলির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকায় আমাদের মনে হয় যে, হয় তো উহার কৌতূহল হইয়াছিল যে, ইহারা কে? কিম্বা ভাবিতেছিল, ইহাদের দ্বারা কোন উপকার হইতে পারে কি না। মরিবার সময় কোন মানুষের যদি কোন কিছুর তীব্র ইচ্ছা থাকে, তবে ভূতযোনি সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে। এরূপ ঘটনা ভূরি-ভূরি দেখা গিয়াছে। এই লোকটা যখন বরফের মধ্যে পড়িয়া মারা যাইতেছিল, তখন নিশ্চয়ই উহার মনে একটু আশ্রয় পাইবার ইচ্ছা তীব্রভাবে দেখা দিয়াছিল। সেই জন্যই ভূতযোনিকে আশ্রয় খুঁজিতে ও আগুনে হাত সেঁকিতে দেখা গিয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

মরা মানুষ সাহায্য করিতে আইসে—মায়ের স্নেহ

মরিয়া যাইবার পরও কোন কোন ব্যক্তি পৃথিবীবাসী আত্মীয়দিগের উপর খুব নজর রাখেন; যাহাতে তাহাদের উপকার হয়, যাহাতে তাহাদের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, সে বিষয়ে তাঁহার খুব দৃষ্টি থাকে। ডাক্তার জন্ নীল এ সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প বলিয়াছেন। লেড্ বিটার সাহেব "অদৃশ্য সহায়" নামক পুস্তকে সেই গল্পটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। গল্পটি অতি চমৎকার। গল্পটি এই :—কিছু দিন আগে জনৈক ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা যায়। ভদ্রলোক ছেলেপুলেগুলি লইয়া পল্লীগ্রামে কোন একটি বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ীটির নীচের তলার পথগুলি এঁধো। ছেলেগুলি যাইয়াই মহা আনন্দে নীচে খেলিতে লাগিল। কিছু পরেই তাহারা মুখ ভার করিয়া উপরে যাইয়া তাহাদের পিতাকে বলিল— "বাবা, এইমাত্র মা'র সঙ্গে দেখা হইয়াছে, মা বলিল, তোমরা এ দিকে আসিও না। এই বলিয়াই মা মিলাইয়া গেল।" পরে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, ছেলেদের মা যে দিকে যাইতে ছেলেগুলিকে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই দিকে একটা পাতকূয়া আছে। কূপটি অনাবৃত, খেলিতে খেলিতে তাহাদের তাহার মধ্যে পড়িয়া যাওয়া খুব সম্ভব। তাই মায়ের প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া এই দারুণ দুর্ঘটনা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন।

এই গল্পে দেখা যাইতেছে যে, মা মরিয়া গেলেও সূক্ষ্মজগৎ হইতে ছেলেগুলির উপর স্নেহদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা আরও অনেক ঘটিয়াছে। ছেলেগুলিকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ একটা তীব্র বাসনা সূক্ষ্ম-জগতেও মায়ের মনে উদয় হইয়াছিল। তাই

তিনি মূর্ত্তি ধরিয়া ছেলেপুলের সম্মুখে দেখা দিতে ও কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার ঐ মায়ের মূর্ত্তি মা না হইয়া অপর কোন অদৃশ্য সহায়ও হইতে পারেন। সূক্ষ্ম-জগতে পরোপকারী মহাত্মার অভাব নাই। হয় তো ঐরূপ কোন মহাত্মা মায়ের মূর্ত্তি ধরিয়া ছেলেগুলিকে সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। মায়ের মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিলে তাহাদের ভয় হইবে না, তাই ঐরূপ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছিলেন। মা বা মহাত্মা দুই-ই হইতে পারেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এটি মায়েরই মূর্ত্তি; কারণ, মরণের পর মায়ের স্নেহ কিছুমাত্র কমে না।

সূক্ষ্ম-জগদ্বাসী পরোপকারী মহাত্মারা ইচ্ছা করিলে যে কোন মূর্ত্তি ধরিতে পারেন। আবার যাঁহারা মরিয়া গিয়া ভুবর্লোকে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারাও ইচ্ছামত মূর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবীর আত্মীয়-স্বজনকে দেখা দিতে পারেন। সঙ্কটসময়ে তাঁহারা এরূপ করিয়াও থাকেন।

ভূতে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল

"সূক্ষ্ম-জগতের সংবাদ" নামক গ্রন্থে এইরূপ একটা গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে। পিয়ার্স ফিল্ডবাসী কর্ণেল স্মিথের কুমারী কন্যা এলিজাবেথ স্মিথের জীবনে উইর নদীর উপরে এই ব্যাপারটি ঘটে। এই রমণী নিজেই গল্পটি লিখিয়াছেন। গল্পটি এইরূপ :—"পাহাড়ের উপর উঠিয়া নক্সা তুলিয়া লইবার নিমিত্ত এক দিন এই রমণী পাহাড়ের উপরে উঠেন। কাছে 'আয়রা ফোর্স' নামক একটা অতলস্পর্শ ভয়ানক গহ্বর ছিল। পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে এমন একটা স্থানে গিয়া উঠিলেন যে, সেখান হইতে উঠিবারও যো নাই, আবার নামিবারও উপায় নাই। ভয়ানক সঙ্কট। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—এখনই পড়িয়া যাইব। পড়িলেই মহা বিপদ; ভয়চকিত হইয়া তিনি চারি দিক্‌টা একবার দেখিলেন। নিজের বিপদ বুঝিয়া বড়ই ভীতা হইলেন। এমন সময়ে দেখিলেন, তাঁহার কাছ হইতে দুই শত গজ দূরে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার

পরণে সাদা মছলিন কাপড়ের পোষাক। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা তখন প্রাতঃকালে এইরূপ পোষাক পরিতেন। সেই সাদা পোষাক-পরা মেয়েটি হাতছানি দিয়া ইঁহাকে ডাকিতেছিল। ঐ ডাক শুনিয়া ইঁহারও যাইতে ইচ্ছা হইল। আগে ইনি মহা চেষ্টা করিয়াও নামিতে পারিতেছিলেন না, নামিবার পথও দেখিতে পাইতেছিলেন না, আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন একটি ছোট পথ ইঁহার চক্ষুতে পড়িল। ইনি নামিয়া সেই স্ত্রীলোকটির দিকে চলিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি গহ্বরের অন্য পার্শ্বে আসিয়া পড়িলেন। তখন দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি তাঁহার নিজের ভগিনী। এই কুমারী যখন নক্সা তুলিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিলেন, তখন ইঁহার ভগিনী বাড়ীতে পড়াশুনা করিতেছিল। এখন কেন এইরূপভাবে সে ইঁহার অনুসরণ করিয়া এরূপ ভয়ানক স্থানে আসিয়াছে, এই ভাবিয়া ইনি বিস্মিত হইলেন। কিন্তু এখন যেরূপ বিপদ, তাহাতে উহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা ইনি আবশ্যক মনে করিলেন না। তাহার পর সেই ভগিনী-রূপী মূর্ত্তি হাতছানি দিয়া তাঁহাকে আরও নীচে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর লইয়া গেল। সেখান হইতে যে কোন ব্যক্তি খুব সহজেই নামিতে পারে। সেখানে যাইয়া কুমারী স্মিথ একটু দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন—একটু দম লই, পরে ভগিনীকে গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু কোথায় সে ভগিনী! আর সে মূর্ত্তি নাই। সে মূর্ত্তি মিলাইয়া গিয়াছে। তাহার পর তিনি বাড়ী আসিলেন। বাড়ী ফিরিতে দুই ঘণ্টা লাগিল। আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার ভগিনী তখনও পড়াশুনা করিতেছে। সকলের মুখে শুনিলেন যে, সেই ভগিনী একটিবারও উঠে নাই।"

কোন জীবিত লোকের আত্মা যাইয়া কুমারী স্মিথকে সাহায্য করিয়াছিলেন কি সূক্ষ্ম-জগতের কোন মহাত্মা আসিয়া ঐরূপ কাণ্ড করিলেন, তাহা গল্পটি পড়িয়া বুঝা যায় না। বাড়ীর ভগিনী যদি ঐ সময় নিদ্রিতা হইয়া পড়িত, তবে আমরা ধরিয়া লইতাম যে, তাহার প্রেতাত্মা যাইয়া বিপন্না কুমারীকে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু সে ধারণা করিবার যো

নাই ; কারণ, সে তখন ঘুমায় নাই, বেশ জাগিয়া পড়া করিতেছিল। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, অন্য কেহ ভগিনীর মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু সেটা যে কোন মরা লোকেরই প্রেতমূর্ত্তি, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এক ব্যক্তি অপরের মূর্ত্তি ধরে, এরূপ ঘটনা বিরল নহে। এরূপ মূর্ত্তি ধরিয়া উপকার অপকার দুই-ই করা যায়। মূর্ত্তি ধরিয়া অপকার করিয়াছে, এরূপ ঘটনাও আমরা অনেক জানি। অনেকে আজকাল জানেন যে, চক্র বা বৈঠক করিয়া মরা মানুষের আত্মাকে হাজির করা যায়। তাহাকে প্রেত-বৈঠক বলা যাউক। এইরূপ প্রেত-বৈঠকে এক জন অপরের মূর্ত্তি ধরিয়া আইসে। সাধারণে সে মূর্ত্তি দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না। সাধনা দ্বারা যাঁহারা দৃষ্টির উন্মেষ করিয়া লইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, এটি আসল মূর্ত্তি, আর ওটি নকল মূর্ত্তি।

ভূতে এক জন পুরোহিতকে ডাকিয়া আনিয়াছিল

ডাক্তার লী "ছায়ারাজ্য" নামক গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠায় দুইটি অতি চমৎকার গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। পার্থিব আত্মীয়ের পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিয়া মরা মানুষের জীবাত্মা পুরোহিতকে ডাকা প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছিল। প্রথম গল্পটি এই :—এক জন বৃদ্ধা প্রায় দশ বৎসর হইল মারা গিয়াছিল। হঠাৎ এক দিন সে সশরীরে জনৈক পুরোহিতের কাছে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, 'এক জন ভদ্রলোক অমুক স্থানে মর-মর হইয়াছেন। পারলৌকিক কার্য্যের নিমিত্ত আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া সেখানে যান।' এই কথা শুনিয়া পুরোহিত সেখানে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন, কাহারও অসুখ-বিসুখ নাই ; কেবল এক জন ক্যাথলিক ধর্ম্মের লোক সেখানে আছেন ; তিনি ধর্ম্মকর্ম্ম বড় একটা করেন না, লোকটার যেন নাস্তিক ভাব। তাহার সঙ্গে পুরোহিতের গল্প-স্বল্প দেখা সাক্ষাৎ হইল। পুরোহিত তাহার মতি-গতি দেখিয়া অনেক উপদেশ দিয়া তাহাকে অনেকটা ধর্ম্মপথে আনিলেন। ঠিক এই ঘটনার পরদিনই রাত্রে

লোকটা হৃদ্‌রোগে মারা গেল। তাহাকে সমাধিস্থ করিবার সময় পুরোহিত আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন, সেই বৃদ্ধার একখানি চেহারা বাঁধান রহিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, বৃদ্ধা মৃত ব্যক্তির মা। আরও শুনিলেন, বৃদ্ধা দশ বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। আর একটি গল্প এই—দুইটি ছেলে এক দিন এক পুরোহিতের কাছে যাইয়া বলিল, 'অমুক ঠিকানায় আমাদের পিতা মর-মর হইয়াছেন, আপনি অন্তিম কার্য্যের জন্য সেখানে চলুন।' পুরোহিত সেখানে যাইয়া দেখিলেন যে, লোকটি মর-মর বটে, কেবল এই বলিয়া দুঃখ করিতেছে—"হায় হায়, জগতে আমার কেহই নাই, আমি একা একা মরিতেছি, পারলৌকিক কার্য্য করিবার নিমিত্ত পুরোহিতকে ডাকিয়া দেয়, এমন লোকটাও নাই।" পুরোহিত বলিলেন, "কেন, তোমার এই রকম চেহারার দুইটি পুত্র আমাকে ডাকিতে গিয়াছিল। তাহারা কোথায় গেল?" মুমূর্ষু লোকটি বলিল,—"আমার সেই দুইটি ছেলে কিছুদিন হইল মারা গিয়াছে।" ব্যাপারটা যে কোন্ সনের কোন্ দিন ঘটিয়াছিল, ডাঃ লী তাহা বলেন নাই।

গল্প দুইটি আলোচনা করিলে দেখা যায়, পার্থিব আত্মীয়ের বিশেষ বিপদ্ হওয়ায় মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। ইহারা খুব অল্পসময়ের জন্য মাত্র একটিবার সাহায্য করিয়াই চলিয়া গিয়াছিল; বার বার আইসে নাই। কিন্তু মরা মানুষের প্রেতযোনি অনেক দিন ধরিয়া আসিতেছে ও পার্থিব লোকের পুনঃ পুনঃ উপকার করিতেছে, এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে। এরূপ ঘটনা খুব বেশী দেখা যায় না। কেন না, যাঁহারা পরোপকারী সাধুপ্রকৃতি, মরণের পর তাঁহাদের প্রেতাত্মা ভুবর্লোকে অনেক দিন বড় থাকে না। শীঘ্রই তাঁহাদের উর্দ্ধগতি হয়। তাই তাঁহারা খুব বেশী আসিতে পারেন না। বিশেষ কোন একটা কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ভুবর্লোকে কেহ কেহ কোন কোন সময় একটু দীর্ঘকাল থাকেন সত্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এক জন স্বামীর প্রেতাত্মা স্নেহ-মায়ায় আবদ্ধ হইয়া স্ত্রীর কাছে কাছে অনেক দিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

ডাঃ মিনট্ জে স্যাভেজ ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের "আইন্‌স্লীদ ম্যাগাজিন" নামক পত্রিকায় একটি বিবরণ দিয়াছেন। উহা পড়িয়া দেখা যায় যে, এক জন সাধুপ্রকৃতির লোক মরণের পরও সেবাধর্ম্মে নিরত ছিলেন। গল্পটি নবম খণ্ডের ১১৭ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। খুব সংক্ষেপে গল্পটি বলিতেছি। ব্যাপারটি এই ;—

ভুবর্লোকে থাকিয়া একটি ভূত পরোপকার করিত

কয়েক বৎসর হইল, বোষ্টন সহরে এক জন সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক দরিদ্র লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। দরিদ্রের জগতে বড় একটা বন্ধু-বান্ধব থাকে না। কিন্তু ইনি ও ইঁহার স্ত্রী দুই জনেই গরীব লোক-দিগের প্রতি বিশেষ অনুকূল ছিলেন। প্রচারক যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন আর এক জন সহযোগী জুটিয়া গেল। সহযোগী, প্রচারক ও তাঁহার স্ত্রী, এই তিন জন তখন গরীব লোকগুলিকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। কালক্রমে এই তিন জনই মারা গেলেন। কেবল সহযোগীর পত্নী জীবিত রহিলেন। ইনি অনেক সময় ভূতপ্রেত দেখিতে পাইতেন। ধর্ম্মপ্রচারক ও তাঁহার স্ত্রী মারা গেলেও গরীব লোকগুলির উপর তাঁহাদের আগেকার মত ভালবাসা ও প্রাণের টানই ছিল। উঁহারা মারা গেলে গরীব লোকদের মধ্যে অনেকে অন্য গ্রামে উঠিয়া গেলেও প্রচারক ও তাঁহার স্ত্রী সূক্ষ্ম-জগৎ হইতেই তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা সহযোগীর জীবিত পত্নীকে সেই গ্রামে যাইয়া সেই সকল স্নেহাস্পদ গরীব লোকগুলিকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্তি দিতেন। সেই সব লোকগুলির অভাব-অভিযোগ তাঁহারা সূক্ষ্ম-জগৎ হইতেই জানিতে পারিতেন।

এইরূপ ভাবে তাঁহারা অনেক দিন ধরিয়া পরোপকারব্রত পালন করিয়াছিলেন। সেই জন্য যশের আশা, খ্যাতির আশা কোনরূপ আশা তাঁহাদের প্রাণে কোন দিন জাগে নাই। বরং তাঁহাদের সেবাধর্ম্ম কেহ না জানিতে পারে, এইটিই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল। সেই জন্য তাঁহাদিগের

অনেক সময় দিতে হইত, বিস্তর অর্থ-ব্যয়ও করিতে হইত। তাঁহাদের এই সেবা-ধর্ম্মের কথা দুই তিনটি প্রাণের বন্ধু ছাড়া আর কেহই টের পায় নাই। * * * সহযোগীর বিধবা পত্নী বোষ্টন সহরের কাছেই বাস করিতেন। অদৃশ্যভাবে প্রচারকের ও তাঁহার স্ত্রীর প্রেতাত্মা তাঁহাকে বলিয়া দিতেন—"তুমি সহরের অমুক ষ্ট্রীটের এত নম্বর বাড়ীতে যাইয়া অমুক অমুক লোকের সঙ্গে দেখা কর; তাহারা এইরূপ এইরূপ অবস্থায় আছে; তুমি যাইয়া এইরূপ উপকার কর।"

এইরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছে। মৃত প্রচারক ও তাঁহার স্ত্রীর এইরূপ আদেশ পাইলেই সেই বিধবাটি তদনুসারে সেই সেই স্থানে যাইয়া, সেহ সেই লোকের সঙ্গে দেখা করিয়া সেই সেই কার্য্য করিতেন। প্রেতাত্মার কাছে যেমন যেমন শুনিতেন, যাইয়া দেখিতেন, ঘটনাও বাস্তবিক সেই সেইরূপই বটে। একদিনও এদিক ওদিক হয় নাই। এক দিন এইরূপ আদেশ পাইয়া তিনি সহরে গেলেন। প্রেতাত্মার কাছ হইতে যেমনটি শুনিয়া গিয়াছিলেন, যাইয়াও তাহাই দেখিলেন। তাহার পরে নিজের কর্ত্তব্য করিলেন। তাঁহাকে সব সময় একরূপ কাজই করিতে হইত না। কোন কোন সময় উপদেশ দিয়া তাঁহাকে অসৎপথ হইতে অনেককে সুপথেও আনিতে হইত। সে অসৎ পথ এমনই বিশ্রী যে, তাহার বিবরণ পড়িলে গা শিহরিয়া উঠে।

এই ধর্ম্ম-প্রচারক সম্বন্ধে আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার আছে। সেটাও বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। এক দিন ধর্ম্মপ্রচারকের প্রেতাত্মা সহযোগীর বিধবা পত্নীর ঘাড়ে চাপিয়া নিজের মেয়েকে আদেশ করিলেন যে, অমুক সহরের অমুক লোকের নামে কুড়িটি টাকার নোট একখানা খামে পূরিয়া পাঠাও। সে লোকটির নাম ও ঠিকানা ভূতাবিষ্ট বিধবার মুখে প্রকাশ পাইল, তাহা তিনি পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই। কন্যা এইরূপ ভাবে টাকা পাঠাইবেন কি না, ভাবিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, টাকাটা মারা না যায়, এমন ভাবেই পাঠান যাইবে। তখন প্রেতাত্মা

আবার জিদ্ করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। প্রচারক কন্যাকে বিধবার মু দিয়া জানাইলেন—টাকা পাঠান নিতান্ত আবশ্যক, বিলম্ব করিলে বিশে দুর্ঘটনা ঘটিবে। কন্যা তখনই টাকা পাঠাইলেন; দশ টাকার করি দুইখানি নোট খামে পাঠাইয়া দিলেন। যিনি টাকা পাইলেন, তি অবশ্যই প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। লেড্‌বিটার সাহে নিজে সে পত্রখানিও দেখিয়াছেন। পত্রখানি পেন্সিল দিয়া লেখা; দেখিলে মনে হয়, যেন কেহ খুব কষ্টের সঙ্গেই লিখিয়াছেন; ব্যাকর শুদ্ধও নহে; আবার রাশি রাশি বানান ভুল। পত্রখানা পড়িয়া জা যায়, এক জন স্ত্রীলোকের স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্রী কু-ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটি ছেলে পুলে লইয়া খুব কষ্টে পড়িয়াছেন। ঘরের জিনিসপত্র সব বাঁধা দি খাইয়াছেন। আর এক দিনও চলিবার উপায় নাই। শেষে মনে করিয়া ছেন যে, ছেলেপুলে সব শুদ্ধ বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় ঐ টাকা তাঁহার হাতে গিয়া পৌছি

এই ঘটনাটি খুব অল্পদিন হইল ঘটিয়াছিল। গল্পটি বেশ চিত্তাকর্ষক কিন্তু এরূপ ব্যাপার খুব বিরল। তথাচ ইহা ঠিক যে, মৃত আত্মীয় ব বন্ধু অনেক সময় এরূপ সাহায্য করিয়া থাকে। উপকারী প্রেতাত্মা আম দের কাছে নানা রকমে আইসে—কখন প্ল্যানচেট্ নামক যন্ত্রে আইসে, কখন ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ দ্বারা নিজের আসা ব্যক্ত করে, আবার কখ বা স্বপ্নের মধ্যে আইসে। কিন্তু খুব বেশী সময়ই মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা বা ভাব জাগাইয়া দেয়।

গ্যাস্‌পার নামক একটা ভূতের কথা

অনেক সময় ভূতটাকে দেখা যায় না। অথচ তাহার কথা বেশ শু যায়। অবশ্য এরূপ ঘটনা খুবই কম ঘটে। আমরা এরূপ ঘটনার একটা গল্প বলিব। "সূক্ষ্ম-জগতে পদসঞ্চার" নামক গ্রন্থের

পৃষ্ঠায় এই রকম একটা গল্প বলা হইয়াছে। একটা ভূত দেখা দিত না, অথচ কথা বলিয়া এক গৃহস্থকে তিন বৎসর যাবৎ সদুপদেশ দিত ; অহরহঃ তাহাদের সঙ্গী হইয়া থাকিত। তাহাকে কেহ কখন দেখিতে না পাইলেও তাহার গলার স্বর বাড়ীর চাকর-চাকরাণীরা পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্ট শুনিয়াছে। ভূতটির নাম—গ্যাস্‌পার। তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হইত—"তোমার বাড়ীটা কোথায় ছিল, তোমার আত্মীয়-স্বজন কে আছে, তুমি কি করিতে, কেমন করিয়া কোন্ সময় মরিয়াছ", এ সব কথায় সে কোন উত্তর করিত না। সে এতই হিতৈষী ছিল যে, তাহার কথা শুনিলেই গৃহস্থ বড়ই আনন্দিত হইয়া উঠিত। তাহার উপদেশে সেই গৃহস্থের বরাবরই ভাল হইয়া আসিয়াছে। মাত্র দুইবার তাহাকে দেখা গিয়াছিল। দেখা দিবার সময় কখনও বাড়ীর মধ্যে দেখা দেয় নাই। বাড়ীর বাহিরে মূর্ত্তি ধরিয়া চক্ষুর্গোচর হইয়াছিল। সে সময় দেখা গেল, তাহার গায়ে খুব ঝুলওয়ালা বড় জামা, আর মাথার টুপীটাও একটু অন্য প্রকার। সেরূপ জামা ও টুপী প্রায়ই ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণাংশের লোকেরাই বেশী বেশী পরে। গ্যাস্‌পার কখনই ধর্ম্মবিষয়ের আলাপ-পরিচয় করিত না। তবে শান্তি ও সদ্‌গুণ ভালবাসিত।

এই ব্যক্তি ঐ গৃহস্থের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ নহে। হঠাৎ গৃহস্থের উপর ইহার ভালবাসা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাই ইহাদের কাছে কাছেই ভালবাসার টানে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু একটা বিষয় বলা উচিত। এই গৃহস্থের বাড়ীর মধ্যে এমন একটা লোক ছিল, যাহার ঘাড়ে সহজেই ভূতাবেশ হইতে পারিত। গ্যাস্‌পার সেই লোকটার দেহ হইতে স্থূল জড়াংশ আকর্ষণ করিয়া লইয়া মানুষের গলার মত স্বর বাহির করিত। যে দুইবার দেখা দিয়াছিল, সে দুইবারও তাহার দেহ হইতে ঐরূপ জড়াংশ গ্রহণ করে। কিছু দিন পরে ঐ গৃহস্থ অন্য স্থানে যাইয়া বাস করিতে থাকে। গ্যাস্‌পার তখন তাহাদের সঙ্গে গেল না। হয় ত তখন ঊর্দ্ধলোকে গিয়া উঠিয়াছিল, তাই আর দেখা দিতে পারিল না।

কথন কথন শুধু উপদেশ দিবার নিমিত্ত মরা মানুষের আত্মা আসিয়া হাজির হয়। সেইরূপ একটা গল্প নীচে দেওয়া হইল। গল্পটি খুব চমৎকার।

জনতাপূর্ণ বড় রাস্তার উপর ভূত আসিয়া দেখা দিল

৯৮ নং শচীহল ষ্ট্রীটের মিঃ ডেভিড্ ডিক্ এইরূপ একটি ভূত দেখিয়াছিলেন। ডিকের বয়স ৩৫ বৎসর, বেশ বলিষ্ঠ বিবাহিত যুবক। ইনি গ্লাসগো রস্কিন্-সমিতির এক জন সদস্য। তাঁহার সঙ্গে ষ্টেড্ সাহেবের নিম্নলিখিত প্রকার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

ডিক্। আমি ভূতটিকে দেখিয়াছি। সেটা ভূত ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না।

ষ্টেড্। সেটা জীবিত মানুষের ছায়াদেহ না মরা মানুষের?

ডিক্। মরা মানুষের।

ষ্টেড্। লোকটা কত দিন হইল মারা গিয়াছে?

ডিক্। ছয় বৎসর।

ষ্টেড্। কোথায় দেখিয়াছিলেন?

ডিক্। গ্লাসগো সহরে।

ষ্টেড্। দিনে না রাত্রে?

ডিক্। দিনের বেলায় বৈকাল সাড়ে তিনটার সময়।

ষ্টেড্। কিরূপ ব্যাপার হইল, বলুন।

ডিক্। আমি বৈকালে সাড়ে তিনটার সময় শচীহল্ ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইলাম। বিশেষ কোন কার্য্যে আমি সেণ্ট ভিনসেণ্ট ষ্ট্রীটে যাইতেছিলাম। যে কাজে যাইতেছিলাম, তখন সেই চিন্তাতেই বিভোর ছিলাম। শচীহল্ ষ্ট্রীট বাহিয়া শেষে রেন্‌ফিল্ড ষ্ট্রীটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখনই ভূতটি আসিয়া উপস্থিত হইল।

ষ্টেড্। তাহাকে ভূত বলিয়া জানিতে পারিলেন?

ডিক্। খুব ভাল করিয়াই পারিলাম।

ষ্টেড্। ভূত, তাহা কি করিয়া বুঝিলেন ?

ডিক্। কারণ, তখনই তাহাকে চিনিয়া ফেলিলাম।

ষ্টেড্। ভূত আপনার সঙ্গে কথা বলিল ?

ডিক্। হাঁ, বলিল।

ষ্টেড্। কি কথা বলিল ?

ডিক্। সেটি বলিব না। একটা গোপন কথা ; আমি ছাড়া আর কেহই তাহা জানে না।

ষ্টেড্। আপনি তাহার কথায় জবাব দিয়াছিলেন ?

ডিক্। দিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া স্বাভাবিক মানুষের মত সে আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর চলিল। আমরা একসঙ্গে কথা বলিতে বলিতে বরাবর রেন্‌ফিল্ড ষ্ট্রীট দিয়া দক্ষিণদিকে চলিলাম। ঠিক সাধারণ মানুষের মত। কেহই তাহাকে ভূত বলিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহার গায়ে কালো রঙের একটা কোট ছিল। মাথায় চ্যাপ্টা রকমের পশমী টুপী। লোকটা যখন বাঁচিয়া ছিল, তখন আমি তাহাকে ঐ টুপীটা আর এক দিন পরিতে দেখিয়াছিলাম। আমরা একসঙ্গে প্রায় ২৫০ গজ পথ গিয়াছিলাম। এ পথটা গ্লাস্‌গো সহরের মধ্যে একটা খুব জনপূর্ণ পথ। যখন ভিন্‌সেণ্ট ষ্ট্রীটের কাছে যাইয়া পৌঁছিলাম, তখন ভূতটা অদৃশ্য হইল। ভূতের আসা বা যাওয়ার ভঙ্গীটা আমি দেখি নাই।

ষ্টেড্। আপনার ভয় হইল না ?

ডিক্। কিছুমাত্র নয়।

ষ্টেড্। ভূতকে আপনি কোন প্রশ্ন করিয়াছিলেন ?

ডিক্। না, প্রশ্ন করি নাই। কেবল সে যে কথা তুলিয়াছিল, তাহাই বলাবলি করিয়াছিলাম।

ষ্টেড্। ভূতটি হঠাৎ গেল ভাবিয়া আপনার বিস্ময় হইয়াছিল কি ?

ডিক্। না ; আসিবার সময়ও সে জাঁক করিয়া আইসে নাই, যাইবার

সময়ও নীরবেই গেল। মিলাইয়া যাওয়াটা আমি দেখি নাই। কেবল দেখিলাম, আর নাই।

ষ্টেড্। আপনি ভূতটিকে চিনিতে পারিয়াছিলেন ?

ডিক্। ভাল করিয়াই চিনিয়াছিলাম।

ষ্টেড্। আচ্ছা, ভূতটি কে ?

ডিক্। সেটি আমার পিতার প্রেতাত্মা।

ষ্টেড্। আপনি কি আপনার পিতার ভাবনা ভাবিতেছিলেন ?

ডিক্। আদৌ না।

ষ্টেড্। যখন সেই ভূতযোনিটি কথা বলিল, তখন আপনি বোধ হয় বিস্মিত হইলেন ?

ডিক্। একটুও নহে।

ষ্টেড্। কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও ইচ্ছা হইল না ?

ডিক্। না। সেটা যেন স্বাভাবিক ঘটনার মতই মনে হইল। আমি যেখানে যাইতেছিলাম, সেখানকার কথাই ভাবিতেছিলাম। পরের দিন যখন মনে হইল যে, কা'ল বাবার সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে কর্ত্তাবার্ত্তা বলিয়াছি, তখন মনে হইল, বাবা আজ ছয় বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। এত দিন পরে জনপূর্ণ বড় রাস্তার উপরে তাঁহাকে দেখিলাম। এই সব ভাবিতে ভাবিতে একটু বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। সেই বাবারই প্রেতাত্মা, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ও-রূপ ব্যাপার আমার জীবনে আর কখনও হয় নাই। বাবা মরিয়া গেলে ছয় বৎসর পরে আমি তাঁহার সঙ্গে রেনফিল্ড রাস্তার উপরে বেড়াইয়াছি, এই অদ্ভুত কথা চিরদিনই আমার মনে থাকিবে।

ডিক্ আরও বলিলেন—"ভূতযোনি আমাকে একটু ইসারায় জানাইলেন যে, 'তুমি একটা তুচ্ছ বিষয়ে এত ভাবিতেছ কেন ? অত ভাবিবার প্রয়োজন নাই। যা হইবে, তা হইবেই। সে বিষয়ে অন্যরূপ করা তোমার সাধ্য নহে। নিরর্থক দুশ্চিন্তা কেন ?' ভূতযোনির মুখে কোনরূপ

আশা-ভরসার প্রতিশ্রুতি বাহির হয় নাই। তাহা যদি হইত, তবে সেটিকে আমি কোন জুয়াচোরের প্রেতাত্মা মনে করিতাম; কেন না, আমার পিতা কাহাকেও আশ্বাস-বাণী দিতেন না। তিনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিখ্যাত মৌনী উইলিয়ম দি সাইলেণ্টও বাবার তুলনায় বাচাল।”

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ডিকের সঙ্গে ষ্টেডের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি “প্রকৃত ভূতের গল্প” নামক পুস্তকের ১৮৪ পৃষ্ঠায় এই গল্পটি লিখিয়াছেন। জনপূর্ণ সহরে রাস্তার উপরে দিনের বেলায় ভূত-যোনি আসিয়া দেখা দিল; এইটুকুই গল্পটির নূতনত্ব। কিন্তু রাস্তার অন্য লোকেও সেটাকে দেখিয়াছিল ও ভূত বলিয়া বুঝিয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। তাই মনে হয়, ঐটি ঠিক ভূত-যোনি নহে, হয় তো পিতার চিন্তা-রাশি ডিকের কাছে ঐরূপ মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল। গল্পটির মধ্যে আর একটু বিশেষত্ব এই যে, ডিক নিজের কাজের চিন্তায় এতই বিভোর হইয়াছিলেন যে, তিনি যে পিতার সঙ্গে গল্প করিতেছেন, তাহাও প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। অথচ সেই পিতা ছয় বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন! এ স্থলে পুত্রকে একটু উপদেশ দিবার ইচ্ছা মৃত পিতার মনে জাগিয়াছিল। তাই তিনি চিন্তামূর্ত্তিটি পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু যে বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন, সে বিষয়টি এত গুরুতর নহে—যাহাতে সূক্ষ্ম-জগতের সাহায্য আবশ্যক হয়।

এরূপ তুচ্ছ বিষয়ের নিমিত্ত মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রায়ই ব্যাকুল হয় না। গুরুতর বিষয়েই—পার্থিব আত্মীয়ের সঙ্কট-সময়েই—মৃত আত্মীয়গুলি আসিয়া সাহায্য করে। বৃটনদিগের বিশ্বাস এই যে, আমরা যদি সংসারের তুচ্ছ খুটী-নাটি লইয়া বিভোর না থাকি, তবে অনেক সময়েই মরা মানুষের দেখা পাই। সংসার লইয়া ব্যস্ত থাকি বলিয়াই তাহারা যখন তখন আসিয়া সাহায্য করে না; যখন খুব বিপদে পড়ি, কেবল তখনই আইসে। খুব ভালবাসা লোক শীঘ্রই মারা যাইবে বুঝিলে তাহারা আসিয়া তাহাকে সে কথা জানাইয়া দেয়। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

এরূপভাবে জানাইবার দুইটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ, যদি আমরা আমাদের মরণের কথা জানিতে পারি, তবে পারলৌকিক কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হই। দ্বিতীয়তঃ, তাহা হইলে সংসারের একটা বিলি-ব্যবস্থাও করিতে পারি। তাহা ছাড়া আত্মীয়-স্বজনকে আগে হইতে প্রবোধ দিয়া এমনটি করিতে পারি যে, মরণ হইলে তাহারা শোক সহ্য করিতে অনেকটা পারগ হয়। ঠিক এই রকম একটি প্রেতের কথা ডাঃ মিন্‌ট জে, স্যাভেজ পূর্ব্বকথিত পরোপকারী ধর্ম্ম-প্রচারকের গল্পের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গল্পটি এই :—

মরা পিতা আসিয়া মরণের কথা বলিয়া গেল

নিউ ইয়র্ক সহরের কাছে প্রায় দুই বৎসর হইল, এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। এক জন যুবক অন্যত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিত। হিড্‌লবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পড়িত। যুবক দেখিতে বেশ লম্বা ও বলিষ্ঠ। খুব বলিষ্ঠ বলিয়া তাহার একটা খ্যাতিও ছিল। তাড়িৎ, গণিত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি পড়িতে খুব ভালবাসিত। এক দিন অবকাশে বেশ সুস্থ-দেহে বাড়ীতে মায়ের কাছে আসিল। দুপুরে খাইবার পর যুবক চুরুট খাইতে খাইতে বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইত। বরাবরই তাহার এই অভ্যাসটা ছিল। এক দিন সন্ধ্যাকালে সে কাহারও সহিত কথাবার্তা না কহিয়া নীরবে বাড়ী আসিয়া শুইতে গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে, খুব সকালে মায়ের শুইবার ঘরে প্রবেশ করিল। তখনও মা ঘুমাইতেছে। সেখানে যাইয়া মাকে জাগাইবার জন্য খুব আস্তে আস্তে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। তখন সে বলিল—"আমি তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে আসিয়াছি। তুমি প্রাণটাকে একটু কঠিন করিয়া শুন।" মা এইটুকু শুনিয়াই চমকিতা হইলেন। বলিলেন—"কি ভয়ানক কথা বলিবে?" যুবক বলিল—"মা, আমি বলিতে আসিয়াছি যে, আমি খুব শীঘ্রই মারা যাইব।"

মা এই কথা শুনিয়াই চমকাইয়া উঠিলেন। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিলেন—"এরূপ বলিতেছ কেন?" যুবক বলিল—"গত রাত্রে আহারের পর যখন আমি ঘোরান বারান্দায় চুরুট খাইতে খাইতে বেড়াইতেছিলাম, তখন একটা ভূত আমার কাছে আসিয়া আমার সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। তাহার কাছে আমার মরণের আর দেরী নাই শুনিলাম। মা, আমি তবে শীঘ্রই মরিব।" মায়ের প্রাণ সহজেই আকুল হইয়া উঠিল। মা মনে করিলেন,—হয় তো পুত্রের মাথা খারাপ হইয়াছে। তাই তিনি ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডাক্তার আসিলে ছেলের কথাগুলি তাঁহাকে সমস্তই বলিলেন। ডাক্তার যুবকের শরীর বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। বলিলেন—"ওটা কিছুই নহে; হয় তো একটা খারাপ স্বপ্ন দেখিয়াছে; আপনি কিছুই মনে করিবেন না, চিন্তা দূর করুন। দুদিন পরে যখন বুঝিবেন যে, মিথ্যা বিষয় লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তখন আর হাসি সংবরণ করিতে পারিবেন না।" এই বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

প্রাতে দেখা গেল, যুবক একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আবার ডাক্তারকে আনা হইল। এবারও ডাক্তার বলিলেন—অসুখ-বিসুখ কিছুই নাই। তিনি যুবকের মরণের কথা, প্রেত দেখার কথা, সমস্তই হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। পরের দিন প্রাতেও যুবকের শরীর অসুস্থ হইল; এ দিন আরও বেশী খারাপ বোধ হইতে লাগিল। ঐ ডাক্তারকে আবার আনা হইল। এবার তিনি দেখিলেন, যুবক অন্ত্র-প্রদাহ-রোগে আক্রান্ত। অস্ত্র করিলেন। কিন্তু রোগী দুই দিনের দিন মারা গেল। প্রেত আসিয়া মরণের কথা বলিবার পাঁচ দিনের মধ্যেই যুবক মারা পড়িল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে যুবকের মা নিউ ইয়র্ক সহরে জনৈক সূক্ষ্ম-দর্শীর কাছে গেলেন। যাইবেন বলিয়া আগে হইতে কোন পত্র লেখা-লেখি করেন নাই। দেখা করিবার কোন বন্দোবস্তই আগে ছিল না।

হঠাৎই যাইয়া উঠিলেন। সেই সূক্ষ্মদর্শীর ঘাড়ে মৃত যুবকের আত্মা আসিয়া চাপিয়া বসিল। পরে তাহার মুখ দিয়া অনেক কথা মাকে বলিল। এমন সব কথা বলিল, যাহা সেই সূক্ষ্মদর্শী কিছুমাত্র জানিতেন না। তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে দিন কোন প্রেত তোমাকে তোমার মরণের কথা বলিয়া গিয়াছিল? তুমি কাহাকে দেখিয়াছিলে?" প্রেতাত্মা উত্তর করিল—"বাবার জীবাত্মা আমাকে মরণের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন।" যুবকের পিতা কয়েক বৎসর আগে মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যুবকের মা আবার বিবাহ করিয়াছেন।

অনেক পরিবারের মধ্যেই শুনা যায় যে, তাহাদের মৃত আত্মীয়েরা বরাবরই মরণের কথা জানাইয়া আসিতেছে। মরা মানুষের এরূপভাবে সংবাদ দিতে আসিবার অনেকগুলি কারণ থাকিতে পারে। হয়, অভিজাত বংশের লোক বলিয়া তাহাদের একটা অপরিমিত গর্ব্ব আছে; নয়, জীবিতকালে ঐ সকল লোক অনেক পাপ করিয়াছিল, এখন কতকটা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে; কিংবা নিজেদের বংশের প্রতি খুব স্নেহ আছে, বংশমর্য্যাদার দিকে খুব লক্ষ্য আছে, তাই মরণের কথা বলিতে আইসে। খুব বড় বড় বংশেই এইরূপ কাহিনী বেশী বেশী শুনা যায়।

বংশগত ভূতের কাহিনী

যতগুলি বংশগত ভূতের গল্প জানা আছে, তাহার মধ্যে নিউহজ নামক স্থানের শ্বেত-বসনা রমণীর গল্পটিই খুব বিশ্বাসযোগ্য। রমণীর পিতার নাম—অল্‌রিচ ভন্ রোজেন্‌বার্গ; মায়ের নাম—ক্যাথেরাইন্ অব্ ওয়ার্টেন্‌বার্গ। রমণী পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় এ পৃথিবীতে ছিল। তাহার বিবাহটা বড়ই অসুখকর হয়। বিধবা হইবার পর সে এক দিনও সুখী হয় নাই, বড়ই কষ্টে ছিল। তাই মৃত্যুর পরে ভুবর্লোকে যাইয়া তাহাকে অনেক দিন থাকিতে হইল। বিবাহিত জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা যদি আমরা না জানিতাম, তবে রমণী কেন এত দিন ভুবর্লোকে

প; এ কথার কোন উত্তর করিতে পারিতাম না। কারণ, তাহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা আর বড় একটা জানি না। যাহা হউক, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মাঝে মাঝে আমরা তাহাকে দেখিতে পাইতেছি। আর, তাহার কাজই হইতেছে বড় বড় বংশের জীবিত লোক-গুলিকে মরণের পূর্ব্বে আসিয়া সংবাদ দেওয়া। অবশ্য সে সব বংশের সহিত তাহার সম্পর্ক আছে। ঐ সকল বংশের লোকগুলির বিশ্বাস যে, রমণীর উদ্দেশ্য খুব ভাল আর যথাসময়ে মৃত্যু-সংবাদ জানাইয়া রমণী বিশেষ উপকারই করিয়া আসিতেছে।

এইরূপ আর একটি গল্প বলিব। ডার্ম্মষ্ট্রীট সহরের কৃষ্ণবসনা রমণীর কথাও অদ্ভুত। "ছায়ারাজ্য" নামক পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠায় ডাক্তার লী ঐ গল্পটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই রমণী তিনবার দেখা দিয়াছিল; তিন-বারই একটি করিয়া লোক মারা যায়। ইহাকে যে উড়োতাড়া করিয়াছে, সেই হঠাৎ মারা পড়িয়াছে। এইটুকুই বিশেষত্ব। একবার জনৈক যুবক ইহাকে ধরিবার চেষ্টা করে, না ধরিতে পারিয়া ইহাকে গুলী করে। দেখা গেল, হঠাৎই যুবক মারা পড়িল অথচ মরিবার মত ব্যারাম-স্যারাম বা অন্য কোন কারণ কিছুই ছিল না। আর দেখা গেল যে, বন্দুকটি ভাঙ্গা পড়িয়া রহিয়াছে, বন্দুকের নলটি স্ক্রুপের মত মুচড়াইয়া পাকান অবস্থায় আর এক স্থানে পড়িয়া আছে।

বংশের মৃত ব্যক্তিরা জীবিত লোকের আসন্ন মৃত্যুর কথা কখন কখন অন্য উপায়ে জানাইয়া দেয়। সেই উপায়টি তাহার কাছে খুব সহজ বলিয়া মনে হয়; কেন না, তাহাতে বারে বারে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিতে হয় না। সকল দেশেই দুর্লক্ষণ বলিয়া ব্যাপার আছে। তাহারা জীবিত ব্যক্তির সম্মুখে ঐ দুর্লক্ষণ উপস্থিত করিয়া তাহাকে জানাইয়া দেয় যে, তাহার মরিবার আর দেরী নাই। আমাদের মনে হয়, দুর্লক্ষণ দেখিলেই যে মরণ হয়, তাহা সকল সময় হয় না। দুর্লক্ষণ দেখিলে কি হয় না হয়, সে সব বিষয় আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

যে আগে মরিবে, সে অপরকে দেখা দিয়া সূক্ষ্ম-জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত অনেক সময় অনেকে করিয়াছে। এরূপ গল্প আমাদের অনেকগুলি জানা আছে। কিন্তু মরিয়া গিয়াও অনেকে দেখা দিতে পারে নাই। না পারিবার অনেক হেতু আছে। আবার কেহ কেহ ঠিক বন্দোবস্ত অনুসারে দেখা দিয়াছে, এমন গল্পও আমরা জানি। সেরূপ দুই তিনটি গল্প বলিতেছি। মিঃ অ্যাণ্ড ল্যাং "স্বপ্ন ও ভূত" নামক পুস্তকের ৯৭ পৃষ্ঠায় লর্ড ব্রাউহ্যামের একটা বিখ্যাত গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। গল্পটি অদ্ভুত বলিয়া যে বিখ্যাত বলিতেছি, তাহা নহে। কেন না, সেরূপ গল্প অনেকই শুনা যায়। বিখ্যাত বলিতেছি এই জন্য যে, লেখক এক জন খুব সুবিখ্যাত লেখক ও গ্রন্থকার। গল্পটি আমরা খুব সংক্ষেপেই বলিব।

লর্ড ব্রাউহ্যামের কাহিনী

সুইডেন দেশে আমরা এক দিন রাত্রি ১টার সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি হোটেলে প্রবেশ করিলাম। ভাবিলাম, এখানে রাত্রিটা কাটাইব। বেশ সুন্দর দুইটি ঘর লইলাম। পূর্ব্বদিন খুব ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল, তাই ভাবিলাম, গরম জলে স্নান করিয়া একটু সুস্থ হওয়া যাউক। নাইতে যাইয়াই একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। এতই অদ্ভুত যে, আমি গল্পটি আগাগোড়াই বলিতে ইচ্ছা করি।

"হাই স্কুলের পড়া শেষ হইলে আমি কলেজে ঢুকি। জি, আমার প্রাণের বন্ধু। সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে কলেজে প্রবেশ করিল। দুই জনে বেশ একসঙ্গেই পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। * * * এক দিন আমরা একটা পাগলামি করিয়া বসিলাম। পরামর্শ করিলাম—আমাদের মধ্যে যে আগে মরিবে, সে আসিয়া অপরকে দেখা দিবে। শুধু পরামর্শ নহে, আমাদের দেহের রক্ত দিয়া সেই বন্দোবস্তটি কাগজে লিখিয়া রাখিলাম। আমরা ভাবিলাম, এইরূপভাবে দেখা দিলে মরণের পরও যে আমাদের আত্মা থাকে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকিবে না। তাহার

পর পড়া-শুনা শেষ করিয়া আমরা সংসারে লিপ্ত হইলাম। বন্ধু জি, ভারতবর্ষে কাজের চেষ্টায় গেল। সেখানে অনেক দিন থাকিল। বহু দিন তাহার কোন চিঠিপত্রও পাইলাম না। মোটের উপর তাহাকে একরূপ ভুলিয়াই গেলাম। আগেই বলিয়াছি, গরম জলে নাইবার জন্য স্নানের ঘরে গিয়াছিলাম। বেশ আরাম করিয়া নাইতে নাইতে চেয়ারখানির দিকে চাহিলাম। সেই চেয়ারের উপর কাপড়-চোপড় ছিল। সেই চেয়ারের দিকে চাহিয়াছি, অমনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার চক্ষুতে পড়িল। দেখিলাম—তাহার উপর জি বসিয়া আছে, আর আমার দিকে শান্তভাবে চাহিতেছে। কেমন এক রকম বিহ্বল হইয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। কেমন করিয়া আসিলাম, তাহাও মনে পড়ে না। যখন আমার ভ্যাবাচাকা ভাবটা গেল, যখন মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হইল, তখন দেখি যে, আমি মেঝের উপর আলুথালুভাবে পড়িয়া আছি। জির প্রেতমূর্ত্তি আর নাই; অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমি ব্যাপারটা দেখিয়া বড়ই স্তম্ভিত হইলাম। তাই ঘটনাটা আগাগোড়া লিখিয়া রাখিলাম। এই ব্যাপারটা ডিসেম্বর মাসের ১৯শে তারিখে ঘটে, তাহাও লিখিলাম। ঘটনাটা এত চমৎকার যে, আমার টাটকা মনে রহিয়াছে।”

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে নিজের জীবনচরিত লিখিবার সময় লর্ড ব্রাউহাম ঐ কাহিনীটির নকল করিয়া সেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন যে, এডিনবার্গ সহরে গিয়া একখানা পত্র পাইয়াছিলেন। পত্রখানা ভারতবর্ষ হইতে যায়। তাহাতে সংবাদ ছিল যে, ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে জি মারা গিয়াছে।

আর এক জন লোকও পূর্ব্ব-বন্দোবস্ত অনুসারে মরার পরে আসিয়া দেখা দিয়াছিল। ঐ গল্পটি খুব বিশ্বাসযোগ্য। অক্সফোর্ড সহরের এক জন বড় দরের পুরোহিতের নাম রেভারেণ্ড থিওডার বাকলী। মরণের তিন দিন পরে তিনি তাঁহার বন্ধু মিঃ কেনেথ ম্যাকেঞ্জীকে দেখা দেন। গল্পটি ‘গোধুলি আভাস’ গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় বিবৃত আছে।

মরণের পর আসিয়া দেখা দিবার জন্য আর একটা বন্দোবস্তের কথাও বলিব। মেজর সিডেন্‌হ্যাম্ ও কাপ্তেন ডাইকের মধ্যেও এইরূপ বন্দোবস্ত হয়। কথা হয়, যে আগে মরিবে, তাহাকে মৃত্যুর পর ঠিক তিন দিনের দিন সিডেন্‌হ্যামের বাগানবাড়ীতে দুপুর রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। মেজরই আগে মরিলেন। তখন কাপ্তেন ডাইক্ সঙ্কেতস্থানে গেলেন—দেখিতে হইবে, মেজরের ভূত-যোনি আইসে কি না! কাপ্তেন রাত্রি সাড়ে এগার হইতে দুইটা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন; কিন্তু মেজরের খোঁজ নাই। মেজর ভূত হইয়া আসিয়া দেখা দিতে পারিলেন না। তাহার পর দেড় মাস পরে মেজরের ভূতযোনি কাপ্তেনের শয়নঘরে স্পষ্টভাবে যাইয়া হাজির! মেজর বলিল—"ভাই, আমি ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারি নাই; বন্ধু, মরণের পরও মানুষ বাঁচিয়া থাকে, এখন হইতে মনের সঙ্গেই বিশ্বাস করিও।" নির্দ্দিষ্ট দিনে মেজর কেন আসিতে পারে নাই, সে সব কথা তিনি কিছুই বলিলেন না। কিন্তু আমরা সেটা অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমাদের মনে হয়—মরিতে মরিতেই মেজর মরণের কথাটা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। জ্ঞানের অবস্থাটা তখন হয় তো ঠিক আইসে নাই, কিংবা জ্ঞানের অবস্থা আসিলেও হয় তো স্থূল-শরীরে দেখা দিবার শক্তি তখনও হয় নাই। অনেক কারণেই এই শক্তি হয় না। এই গল্পটি গ্লানভিল্ প্রণীত 'সাদ্দ্‌সিস্ মস্ ট্রাইম্‌ফেটস' পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভূতেরাও অনেক সময় মানুষের কাছে সাহায্য চায়

ভূতেরা সূক্ষ্মজগৎ হইতে আসিয়া আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির উপকার করিয়া থাকে, তাহা এ পর্য্যন্ত আমরা বলিলাম। এখন অন্য রকমের কথা বলিব। ভূতেরাও মানুষের কাছে, আত্মীয়-বন্ধুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে—এখন সেই সব ব্যাপার বলিব। জীবিত মানুষেরাও ইচ্ছা করিলে ভূতের বিস্তর উপকার করিতে পারে। বস্তুতঃ ভূতের কোন অভাবই থাকিতে পারে না। কিন্তু তা বলিলে কি হয়? তাহারা তুচ্ছ অভাবকেও বড় রকমের অভাব বলিয়া মনে করে। তাহাদের সকল অভাবই মনগড়া, প্রথাজনিত, অতি তুচ্ছ খুটিনাটি লইয়া। মনে কর, কেহ ভাবিল—আমার দেহটার যথারীতি কবর হইল না; কেহ ভাবিল, আমার মরা দেহটা পড়িয়া রহিল, এখনও পোড়ান হইল না; কেহ ভাবিল—আমার দেনাগুলি শোধ হইল না; কেহ ভাবিল—বিস্তর টাকা গুপ্ত স্থানে রাখিয়া আসিলাম, কাহাকেও দেওয়া হইল না, হয় তো চোরে লইবে; কেহ ভাবিল—মোটেই টাকাকড়ি রাখিয়া আসিলাম না, ছেলেপুলে কি খাইয়া বাঁচিবে? কেহ ভাবিল—জীবিতকালে গুরুতর অপরাধ করিয়া আসিয়াছি, কাহারও কাছে ব্যক্ত করি নাই, ব্যক্ত করিয়া আসিলেই ভাল হইত, প্রায়শ্চিত্ত করাই কর্ত্তব্য ছিল; কেহ ভাবিল—হায়! হায়! কেনই অমুক পাপ করিয়াছিলাম! কেহ ভাবিল—অমুকের উপর প্রতিশোধ লইতেই হইবে। ভূতের অভাবগুলো এই প্রকার। উহাদের যেগুলি উদ্বেগের কারণ, সেগুলি আমাদের কাছে কিছুই নয়। আবার দুই একটি স্থলে বেশ ভাল কারণেই উহারা আসিয়া হাজির হয়। তখন মনে হয়, এ সময়ে ভূতের আসারই প্রয়োজন। কয়েকটা গল্প বলিব, যাহাতে দেখা যায় যে, ভূত হারানো উইলের কথা বলিয়া গেল, বা নিরুপায় ছেলেপুলেগুলির একটা ব্যবস্থা করিল।

সেনাপতি ব্লম্‌বার্গের ভূত-যোনি

সেনাপতি ব্লম্‌বার্গের গল্পটি অতীব চমৎকার। সসৈন্যে "মাটিনিক্" নামক স্থানে অবস্থানকালে বিশেষ কার্য্যবশতঃ তিনি এক দিন খানিক দূরে গিয়াছিলেন। পথের মাঝে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। মাটিনিকস্থ বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে আর দুই জন কর্ম্মচারীও থাকিতেন। ব্লম্‌বার্গ মারা পড়িলে তাঁহার প্রেতযোনি ঐ দুই কর্ম্মচারীর কাছে আসিয়া হাজির! হাজির হইয়াই বলিল—"এই রাত্রেই আমার মৃত্যু হইয়াছে; বন্ধুগণ! অনুগ্রহ করিয়া আমার পিতৃহীন ছেলেটির ভার গ্রহণ কর।" আর বলিল —"লণ্ডনে অমুক অমুক ব্যক্তি ছেলের আত্মীয়, তাঁহারা অমুক অমুক ঠিকানায় থাকেন, উহাকে তাঁহাদের কাছে পাঠাইয়া দিও।" আবার বলিল, "অমুক দেরাজের মধ্যে দলীল আছে, তাহার বলে আমার ছেলে কতকগুলি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে, সেই দলীল যাহাতে ও পায়, তাহাও করিও।" পরে কর্ম্মচারীরা দেখিলেন যে, ঠিক সেই ঠিকানায় সেই সেই আত্মীয়কে পাওয়া গেল, দলীলখানিও ঠিক সেই স্থানে মিলিল। এই ঘটনাটি শনৈঃ শনৈঃ দেশময় ছড়াইয়া পড়িল, সকলেই শুনিল, পরে রাণী সার্লটীর কানেও গেল। রাণী শুনিবামাত্র ছেলেটির ভার লইয়া নিজের বাড়ীতে তাহাকে মানুষ করিতে লাগিলেন। রাণী তাহাকে স্কুল-কলেজে পড়াইলেন। পরিশেষে এই বালকই এক জন সুবিখ্যাত উচ্চ-শ্রেণীর ধর্ম্মপ্রচারক হইয়াছিলেন। জন্ এইচ ইন্‌গ্রাম প্রণীত "ভূতের বাড়ী ও ভূতের গল্প" নামক পুস্তকের ৬৩৭ পৃষ্ঠায় এই গল্পটির খুব ভাল বর্ণনা আছে।

আচ্ছা, ভূতেরা সর্ব্বদা দেখা দেয় না কেন ?

সাধারণ মানুষের চিন্তার ধরণটা যেন একই রকমের। সকলেই যেন একই ভাবের কথা বলে। উপরের ঐ গল্পটি শুনিলে সাধারণ শ্রেণীর একটা

মানুষ জিজ্ঞাসা করিয়া বসে,—"আচ্ছা, ঐ রকম ব্যাপারই যদি হবে, তবে খুব বেশী বেশী ঐরূপ ঘটনা হয় না কেন? কত লোক ত হঠাৎ মরিয়া যায়, তাহারা সকলেই ছেলে-পুলের ভাবনা ভাবিয়া একটা ব্যবস্থা করিতে আইসে না কেন? কত দলীলপত্র গুপ্তস্থানে থাকিয়া যায়, সেগুলিকে না পাওয়ায় কত লোকের কত স্বত্ব নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তবে কেন মরা আত্মীয় ঐ রকম ভাবে আসিয়া ঐ সব দলীলের কথা বলিয়া যায় না?"

যে সকল সত্য ঘটনা ঘটে, সেগুলিকে সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ ও পরীক্ষা করাই আমাদের কার্য্য। ঘটনাগুলি ঐরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইল না কেন, রোজই ঐরূপ ঘটনা হয় না কেন, সে সব চিন্তা করিয়া বাহির করা আমাদের কাজ নহে। অদ্ভুত ঘটনা খুব বেশী ঘটে না বলিয়াই যেগুলি ঘটে, সেগুলিকেও বিশ্বাস করিতে হইবে না, তাহার কোন হেতু নাই। যাঁহারা সূক্ষ্ম-জগতের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ প্রশ্নের একটা জবাবও দিতে পারেন। সর্ব্বদাই ভূত কেন দেখা দেয় না, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহাদের খুব কঠিন নহে।

আমরা ভাবি, ভূত-প্রেত খুব কমই দেখা দেয়, বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। ভূতযোনি আমাদের কাছে খুব বেশী সময়ই আসিয়া থাকে, অথচ আমরা সেটা বড় একটা লক্ষ্য করি না। তবে সকল সময়ই যে তাহারা মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়, তাহা নহে। তাহারা তীব্র বাসনা করিয়া সেই বাসনা-গুলিকে জীবিত আত্মীয়ের মনের ভিতর চালাইয়া দেয়। সেই ইচ্ছার প্রভাবেই জীবিত আত্মীয়েরা কার্য্য করিয়া অনেক সময় উপকৃত হয়। এইরূপ ভাবে হারানো দলীলও অনেক সময় মিলিয়া যায়। মোটের উপর এই কার্য্য-গুলি ভূত-প্রেতেরই কার্য্য। ভূতপ্রেতরা যখন দেখে যে, বাসনা চালাইয়া বিশেষ কোনরূপ সুফল হইল না, তখন আসিয়া দেখা দেওয়া, কথা বলা এই সব ব্যাপার আরম্ভ করে। আর একটি কথা—ভূতের ব্যাপার জানিলেও লোকে তাহা প্রকাশ করে না, গোপন করিয়া রাখিবারই চেষ্টা করে। জগতের লোকে এই কারণে অনেক সত্য কথাও জানিতে পারে না।

সেনাপতি ব্রম্‌বার্গের ভূত-যোনি

সেনাপতি ব্রম্‌বার্গের গল্পটি অতীব চমৎকার। সসৈন্যে "মাটিনিক্" নামক স্থানে অবস্থানকালে বিশেষ কার্য্যবশতঃ তিনি এক দিন খানিক দূরে গিয়াছিলেন। পথের মাঝে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। মাটিনিকস্থ বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে আর দুই জন কর্ম্মচারীও থাকিতেন। ব্রম্‌বার্গ মারা পড়িলে তাঁহার প্রেতযোনি ঐ দুই কর্ম্মচারীর কাছে আসিয়া হাজির! হাজির হইয়াই বলিল—"এই রাত্রেই আমার মৃত্যু হইয়াছে; বন্ধুগণ! অনুগ্রহ করিয়া আমার পিতৃহীন ছেলেটির ভার গ্রহণ কর।" আর বলিল —"লণ্ডনে অমুক অমুক ব্যক্তি ছেলের আত্মীয়, তাঁহারা অমুক অমুক ঠিকানায় থাকেন, উহাকে তাঁহাদের কাছে পাঠাইয়া দিও।" আবার বলিল, "অমুক দেরাজের মধ্যে দলীল আছে, তাহার বলে আমার ছেলে কতকগুলি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে, সেই দলীল যাহাতে ও পায়, তাহাও করিও।" পরে কর্ম্মচারীরা দেখিলেন যে, ঠিক সেই ঠিকানায় সেই সেই আত্মীয়কে পাওয়া গেল, দলীলখানিও ঠিক সেই স্থানে মিলিল। এই ঘটনাটি শনৈঃ শনৈঃ দেশময় ছড়াইয়া পড়িল, সকলেই শুনিল, পরে রাণী সার্লটীর কানেও গেল। রাণী শুনিবামাত্র ছেলেটির ভার লইয়া নিজের বাড়ীতে তাহাকে মানুষ করিতে লাগিলেন। রাণী তাহাকে স্কুল-কলেজে পড়াইলেন। পরিশেষে এই বালকই এক জন সুবিখ্যাত উচ্চ-শ্রেণীর ধর্ম্মপ্রচারক হইয়াছিলেন। জন্ এইচ ইন্‌গ্রাম প্রণীত "ভূতের বাড়ী ও ভূতের গল্প" নামক পুস্তকের ৬৩৭ পৃষ্ঠায় এই গল্পটির খুব ভাল বর্ণনা আছে।

আচ্ছা, ভূতেরা সর্ব্বদা দেখা দেয় না কেন?

সাধারণ মানুষের চিন্তার ধরণটা যেন একই রকমের। সকলেই যেন একই ভাবের কথা বলে। উপরের ঐ গল্পটি শুনিলে সাধারণ শ্রেণীর একটা

মানুষ জিজ্ঞাসা করিয়া বসে,—"আচ্ছা, ঐ রকম ব্যাপারই যদি হবে, তবে খুব বেশী বেশী ঐরূপ ঘটনা হয় না কেন? কত লোক ত হঠাৎ মরিয়া যায়, তাহারা সকলেই ছেলে-পুলের ভাবনা ভাবিয়া একটা ব্যবস্থা করিতে আইসে না কেন? কত দলীলপত্র গুপ্তস্থানে থাকিয়া যায়, সেগুলিকে না পাওয়ায় কত লোকের কত স্বত্ব নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তবে কেন মরা আত্মীয় ঐ রকম ভাবে আসিয়া ঐ সব দলীলের কথা বলিয়া যায় না?"

যে সকল সত্য ঘটনা ঘটে, সেগুলিকে সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ ও পরীক্ষা করাই আমাদের কার্য্য। ঘটনাগুলি ঐরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইল না কেন, রোজই ঐরূপ ঘটনা হয় না কেন, সে সব চিন্তা করিয়া বাহির করা আমাদের কাজ নহে। অদ্ভুত ঘটনা খুব বেশী ঘটে না বলিয়াই যেগুলি ঘটে, সেগুলিকেও বিশ্বাস করিতে হইবে না, তাহার কোন হেতু নাই। যাঁহারা সূক্ষ্ম-জগতের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ প্রশ্নের একটা জবাবও দিতে পারেন। সর্ব্বদাই ভূত কেন দেখা দেয় না, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহাদের খুব কঠিন নহে।

আমরা ভাবি, ভূত-প্রেত খুব কমই দেখা দেয়, বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। ভূতযোনি আমাদের কাছে খুব বেশী সময়ই আসিয়া থাকে, অথচ আমরা সেটা বড় একটা লক্ষ্য করি না। তবে সকল সময়ই যে তাহারা মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়, তাহা নহে। তাহারা তীব্র বাসনা করিয়া সেই বাসনা-গুলিকে জীবিত আত্মীয়ের মনের ভিতর চালাইয়া দেয়। সেই ইচ্ছার প্রভা-বেই জীবিত আত্মীয়েরা কার্য্য করিয়া অনেক সময় উপকৃত হয়। এইরূপ ভাবে হারানো দলীলও অনেক সময় মিলিয়া যায়। মোটের উপর এই কার্য্য-গুলি ভূত-প্রেতেরই কার্য্য। ভূতপ্রেতরা যখন দেখে যে, বাসনা চালাইয়া বিশেষ কোনরূপ সুফল হইল না, তখন আসিয়া দেখা দেওয়া, কথা বলা এই সব ব্যাপার আরম্ভ করে। আর একটি কথা—ভূতের ব্যাপার জানিলেও লোকে তাহা প্রকাশ করে না, গোপন করিয়া রাখিবারই চেষ্টা করে। জগতের লোকে এই কারণে অনেক সত্য কথাও জানিতে পারে না।

এটি সকলের মনে রাখা আবশ্যক যে, মানুষ মরিয়া অনেকটা সময় অজ্ঞানাবস্থায় থাকে, বেশ খানিকটা সময় তাহার জ্ঞান থাকে না; এ কথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। জ্ঞান হইলেই তাহারা দেখে যে, তাহারা নূতন অবস্থার মধ্যে যাইয়া পড়িয়াছে। তখন সেখানে কেমন করিয়া চলিতে হইবে, এ অবস্থা কেন হইল,—এই সব লইয়াই, এই সব ভাবনাতেই তাহারা মহা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সূক্ষ্ম-জগতের অবস্থা সকলেরই জানা উচিত; ইহা সকলেরই পক্ষে বড়ই আবশ্যক বিষয়। অথচ অধিকাংশ লোকেই তাহা জানে না। তাই সূক্ষ্ম-জগৎ হইতে কিরূপ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া দেখা দেওয়া যায়, কিরূপ করিয়া পৃথিবীর শোকসন্তপ্ত আত্মীয়গুলিকে প্রবোধ দেওয়া যায়—সে কথা সে মরিতে মরিতে ভাবিয়াই স্থির করিতে পারে না। সূক্ষ্মজগৎ হইতেও যে নিজের চিন্তা তাহার প্রাণের কথা জীবিত আত্মীয়ের মনের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়—সে ধারণাই তাহার তখন থাকে না। সে ইচ্ছা করিলে যে স্থূলদেহ ধারণ করিয়া শোকাকুল আত্মীয়কে দেখা দিতে পারে, সে জ্ঞানও তখন তাহার ফোটে না।

আবার জীবিত আত্মীয়গুলিও কাঁদাকাটাই করে সত্য, কিন্তু মরা আত্মীয়গুলির আশাটা যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক, সেরূপ ভাবে লইতে প্রস্তুত থাকে না। শোকাকুল আত্মীয়েরা কেবল স্থূলবিষয় লইয়া বিভোর থাকে, কেবলই ভাবে—হায়! হায়! আমাদের অমুক আত্মীয় চিরদিনের মত আমাদের ছাড়িয়া গেল! কিন্তু মরা আত্মীয়টি যে আসিয়া আমাদের উপকার করিতে পারে, কিংবা আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে পারে, অথবা অনেক কথা ইসারা-ইঙ্গিতে আমাদিগকে জানাইতে পারে, তাহা আমরা একবারও ভাবি না। কেবল হা-হুতাশ করিয়াই মরি। অতএব সরল কথা এই যে—সাধারণ মানুষ মরিয়া গেলে, তাহার ভূতযোনি আত্মীয়-বন্ধুকে দেখা দিবার ইচ্ছা থাকিলেও. কেমন করিয়া দেখা দিতে হয়, তাহা না জানার দরুণই দেখা দেয় না। ভূতেরা যে খুব বেশী আসিতে পারে না, সেটা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দেখা দিবার পক্ষে তিনটা খুব

বড় বাধা আছে। সেই বাধা তিনটি না থাকিলে সকলেই আসিয়া দেখা দিতে পারিত। ঐ বাধা ঠেলিয়া আসিতে পারে না, এইটুকুই আশ্চর্য্যের বিষয়।

প্রথম বাধা—ঘোর অজ্ঞান।

দ্বিতীয় বাধা—অহঙ্কার মিশানো অবিশ্বাস।

তৃতীয় বাধা—কঠিন কুসংস্কার।

অতএব দেখা যাইতেছে—সূক্ষ্ম-জগতের বিষয় কিছু কিছু জানা আবশ্যক, নতুবা আসিয়া দেখা দেওয়া যায় না। ইহা মানি না, তাহা মানি না, এইরূপ নাস্তিক ভাবটাও বড় দোষের। যাহাদের প্রাণে কথায় কথায় এইরূপ সন্দেহ-সংশয় লাগিয়া থাকে, তাহারা মরিয়া যাইবার পরও আসিয়া দেখা দিতে পারে না। আর, যে সকল লোক ভয়ানক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন—শত শত উপদেশ পাইতেছে, কিন্তু সেই ভুল বিশ্বাসটি কিছুতেই যাইতেছে না—এমন লোকও দেখা দিতে পারে না। যদি একটু জ্ঞানী ও বিনীত হইতে পারি, তবে আমাদের জীবন কতই সুন্দর হইতে পারে। মরা মানুষরা জীবিত আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা করিয়াও দেখা করিতে পারে না। সব সময়েই যে নিজের দোষে পারে না, তাহাও নহে। না পারিবার অন্য কারণও থাকে। আমরা স্থূলদেহী, তাহা ছাড়া নিজের কাজকর্ম্ম লইয়াই ঘোর ব্যস্ত থাকি। তাই সূক্ষ্ম-জগতের খুব ভাল জিনিসও আমাদের চক্ষুতে পড়ে না। বুনিয়ান্ সাহেব "তীর্থযাত্রীর অগ্রগতি" নামক পুস্তকে একটি লোকের কথা বলিয়াছেন। লোকটি কাদা-মাটীর মধ্যে টাকা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; আর এক জন দেবদূত মাথার উপরে শূন্যে থাকিয়া বলিতেছে;—'টাকা খুঁজিও না, এই সোনার মুকুট দিচ্ছি লও।' লোকটা তবুও উপরের দিকে চাহিতেছে না। অন্ধের মত একমনে কাদার মধ্যে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া টাকাই খুঁজিতেছে। আমাদের অবস্থাও অনেকটা ঐরূপ। কেবল তুচ্ছ জড়জগৎ লইয়া ব্যস্ত। সুন্দর সূক্ষ্ম-জগতের দিকে একটিবারও চোখ ফিরাইতে চাই না।

এক এক দেশে এক এক রীতি আছে। আমরা জীবিতকালে সেই রীতি লইয়াই ঘোর ব্যস্ত থাকি। আবার মরিয়া গেলেও সেই রীতির কথা ভুলিতে পারি না। মানুষ মরিয়া গেলেও, ভূতযোনি 'রীতি রীতি' করিয়া পাগল হয়, এমন বিস্তর ঘটনা দেখা গিয়াছে। মরিতে মরিতেই অনেকের ভূতযোনি বলিয়া থাকে যে, তাহাদের শ্রাদ্ধ-শান্তিটায় যেন অনেক লোকজন খাওয়ান হয়, যেন ভাল করিয়া দুঃখের সাজসজ্জাটার আয়োজন হয়। দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, শ্রাদ্ধ-শান্তিটা ভাল করিয়া করা হইলে মরা মানুষটার খুব তৃপ্তি হয়। শুধু যে এখনকার লোকই শ্রাদ্ধটা ভাল করিয়া করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহা নহে। পুরাকালেও লোকে এরূপ ব্যস্ত হইত। তখন আবার আরও কুসংস্কার ছিল। তখনকার লোকের ধারণা এই ছিল যে, মরা দেহটাকে ভাল করিয়া না পুড়াইলে, বা ভাল করিয়া কবর না দিলে আত্মার গতি হয় না।

ভূতে খড়াং খড়াং করিয়া শিকলের শব্দ করিল

প্লীনি সাহেব একটা ভূতের বাড়ীর গল্প লিখিয়াছেন। বাড়ীটি এথেন্স সহরে। ভূতের উপদ্রবে কেহই সে বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারিত না। অনেক দিন বাড়ীটি পড়িয়া রহিল। পরে এক দিন অ্যাথেনে ভোরাম্ নামক জনৈক পণ্ডিত ভূতের বাড়ীটা ভাড়া লইলেন। ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রথম রাত্রে তিনি খুব সাহস করিয়া ঘরে ঢুকিলেন। চাকরগুলিকে বলিলেন, 'তোমরা তোমাদের ঘরে যাইয়া শোও, আমি একাই এই ভূতের ঘরে থাকিব।' এই বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিয়া তিনি নিজে সেই ঘরে বসিয়া খুব মন দিয়া আপন কাজ করিতে লাগিলেন। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে পাছে ভূতের কথা মনে আইসে, এই জন্য লেখায় মন দিলেন। খানিকটা সময় বেশ কাটিল। ভূতের কোন সাড়া শব্দ নাই। মনটাও বেশ লেখার মধ্যে বসিয়া গেল। তিনি বেশ একমনে লিখিতেছেন, এমন সময় শিকলের খড়াং খড়াং শব্দ তাঁহার কানে গেল।

ঠিক এই শব্দ শুনিয়াই বহু লোক এ ঘর হইতে পলাইয়াছিল। তিনি শব্দ শুনিবেন না মনে করিয়া কান বন্ধ করিলেন। তাহার পর মনটাকে স্থির করিয়া আবার লিখিতে লাগিলেন। লিখিবার সময় মাথা তুলিয়া কোন দিকে চাহিলেন না।

খড়াং খড়াং শব্দটা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শব্দ ক্রমে দরওয়াজার কাছে আসিল। তাহার পরে ঘরের মধ্যে আসিল। তখন তিনি মাথা তুলিয়া একটিবার চারিদিকে দেখিলেন। আশ্চর্য্য! একটি বৃদ্ধ রোগা চেহারা, ময়লা পোষাক-পরা, চুলগুলি আলুথালু, লম্বা-লম্বা দাড়ি—এই রকম একটি বিকট মূর্ত্তি চোখে পড়িল। দেখিলেন—হাত উঁচু করিয়া তাঁহাকে সে ইসারায় ডাকিতেছে। তিনি ঐ মূর্ত্তিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন যে, একটু অপেক্ষা কর। এইরূপ করিয়া আবার লিখিতে লাগিলেন। তখন ঐ মূর্ত্তিটি আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর তাঁহার মাথার উপরে শিকলের শব্দ করিতে লাগিল। পণ্ডিত আবার মুখ তুলিলেন। দেখিলেন—ভূতটা তাঁহাকে আবার হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। তখন তিনি উঠিলেন। উঠিয়া ভূতের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ভূত ধীরপাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল—যেন শিকলে বাঁধা পড়িয়াছে বলিয়াই চলিতে পারিতেছে না। এইরূপ চলিতে চলিতে শেষে উঠানের মধ্যে একটা স্থানে যাইয়া দাঁড়াইল। স্থানটা দুইটি ঘরের মাঝামাঝি জায়গায়। ঐ রকম ভাবের বাড়ী করা তখন গ্রীস দেশের প্রথা ছিল। সেই স্থানটিতে যাইয়াই ভূতটি মিলাইয়া গেল। স্থানটি চিনিয়া রাখিবার জন্য পণ্ডিত সেখান হইতে কতকগুলি ঘাস-পাতা ছিঁড়িয়া আনিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে বাড়ীর মালিককে বলিয়া সেই জায়গাটা খুঁড়িলেই দেখা গেল—মাটীর নীচে একটি শিকল-জড়ানো মানুষের কঙ্কাল রহিয়াছে। তখন সেই কঙ্কালটিকে তুলিয়া যথারীতি পুরোহিত আনিয়া কবর দেওয়া হইল। সেই অবধি ঐ বাড়ীর ভূতের উপদ্রব দূর হইল।

এখানে একটু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, জীবিত অবস্থায় এই হতভাগ্য

ব্যক্তির অঙ্গে শিকল ছিল। শিকল শুদ্ধই তাহাকে মরণের পর পুতিয়া রাখা হয়। তাই উহার প্রেতাত্মা তখনও মনে করিতেছিল যে, সে শিকল-বাঁধাই রহিয়াছে। ভূতযোনির এই মিথ্যা অথচ তীব্র ধারণা হওয়ায় তাহার মুক্তিও হয় নাই; অধিকন্তু অপরের কানে পর্য্যন্ত শিকলের শব্দ আনিয়া ফেলিয়াছিল। তীব্র চিন্তার কি অদ্ভুত ব্যাপার!

নিম্নে আমরা একটি গল্প দিতেছি। পড়িলে জানা যায় যে, ভূতযোনি তাহার মরা দেহটাকে ভাল করিয়া কবর দেওয়াইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। কিন্তু শুধুই এইটুকুই নহে। ভূতযোনির প্রাণে আরও অন্য রকম বাসনা ছিল। "সূক্ষ্ম-জগতের আভাস" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, ৬১ পৃষ্ঠায় ডাক্তার লী গল্পটি বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই গল্পটি অনেকে অনেক রকম করিয়া কহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত বিবরণই খাঁটি সত্য; কেন না, যাঁহারা এই ব্যাপারটি খুব ভালরূপ জানেন, তিনি তাঁহাদের কাছ হইতেই উহা সংগ্রহ করিয়াছেন। তাই এ গল্পটি খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। গল্পটি এই :—

অষ্ট্রেলিয়াবাসী জনৈক পশুপালকের ভূতযোনি

"প্রায় ২৫ বৎসর হইল, দুই জন পশুপালক অষ্ট্রেলিয়ায় আসিয়া বাস করিতে থাকে। তাহারা দুই জনে একত্র কাজ-কারবার করিত; দুই জনে খুব বন্ধুত্ব ছিল। কালক্রমে তাহাদের অনেক বিষয়-সম্পত্তি হইল। দুই জনে বেশ সুখস্বচ্ছন্দে আছে, এমন সময় হঠাৎ এক জন নিরুদ্দেশ! কোথায় যে গেল, কেহ বলিতে পারিল না। একেবারে নিরুদ্দেশ!

এই নিরুদ্দেশের তিন সপ্তাহ পরে অপর ব্যক্তি এক দিন সন্ধ্যাকালে একটি ছোট গলীপথ দিয়া বাড়ী আসিতেছিল। পথের কাছে একটা গভীর বড় রকমের জলাশয়। গোধুলির অল্প অল্প অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। জলের ধারে লম্বা লম্বা গাছ, ঘাস ও জঙ্গল। ঐ সব গাছগাছালির জন্য অস্তগামী সূর্য্য আড়ালে পড়িয়াছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই

সে দেখিতে পাইল যে, তাহার সেই নিরুদ্দিষ্ট সঙ্গীটি জলের ধারে বসিয়া আছে। একেবারে যেন জীবন্ত মানুষটা বসিয়া রহিয়াছে! বাম হাতখানি বাম হাঁটুর উপর বক্রভাবে ন্যস্ত। সে সঙ্গীটির সঙ্গে কথা বলিবার জন্য যেমন যাইতে চেষ্টা করিল, অমনই মূর্ত্তিটি অস্পষ্ট হইয়া পড়িল। মুখশ্রী যেন ম্লান হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া সে থমকাইয়া দাঁড়াইল। আর গেল না। আবার মূর্ত্তিটি একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিল; ডান হাতখানি উঁচু করিয়া তর্জ্জনী আঙ্গুলটা দিয়া একটা আঁধার গভীর গর্ত্ত দেখাইয়া দিল। সেখানে তখনও জল ছিল। জলটা স্থির ও কালো। আর ঠিক তাহার ধারে একটা গাছ; গাছের ডালপালাগুলি জলের উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে। ভূতযোনিটা দুইবার অঙ্গুলি দিয়া ঐরূপভাবে জলের মধ্যে দেখাইয়া দিল। তাহার পরই আস্তে আস্তে মিলাইয়া গেল।

পরদিন প্রাতেই সেইটা অনুসন্ধান করা হইল। অদ্ভুত ব্যাপার। খুঁজিতে খুঁজিতে সেই নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির দেহটা বাহির হইয়া পড়িল। ভূতযোনি যে স্থানটি অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল, ঠিক সেইখানেই একটা ঘড়া পাওয়া গেল। শুধু ঘড়াটা নহে, একখানা কুঠারও সেখান হইতে উঠিল। দেখা গেল, এক খণ্ড খুব বড় পাথর ঘড়াটার গায়ে বাঁধিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কুঠার দেখিয়া মনে হইল—কে যেন উহা দ্বারা লোকটাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। মৃত ব্যক্তির খানকতক দলীলপত্র একটা অপরিচিত লোকের কাছে পাওয়া যায়। সন্দেহ করিয়া তাহাকেই আসামী বলিয়া ধরিয়া তাহার উপরে খুনের অপরাধ চাপান হয়। মোকর্দ্দমায় পড়িয়া সেই লোকটা শেষে খুনের অপরাধ স্বীকার করে। বিচারশেষে লোকটার ফাঁসি হয়।"

এখন যদি আমরা মনে করি—নিরুদ্দিষ্ট লোকটার ভূতযোনি তাহার জীবিত বন্ধুকে কেন দেখা দিয়াছিল, তাহা হইলে আমরা তাহার দুইটি উদ্দেশ্য অনুমান করিতে পারি। এক উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে মরা দেহটার যথারীতি কবর হয়, বন্ধু দ্বারা তাহা করিতে হইবে। অপর উদ্দেশ্য—

তাহার মৃত্যুর কথাটি তাহার বন্ধুকে জানান। বন্ধু যাহাতে খুনের প্রতিশোধ লইতে পারে, এ ভয়ানক ইচ্ছাও তাহার ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। যাঁহারা খুব উন্নত শ্রেণীর লোক, তাঁহাদের এরূপ প্রতিহিংসার ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু নিহত ব্যক্তি তত উন্নত ছিল না। সুতরাং প্রতিহিংসার ইচ্ছা তাহার থাকাই সম্ভব। বিস্তর ভূতের প্রাণে প্রতিহিংসার ইচ্ছা দেখা গিয়াছে। প্রতিহিংসার কথা উঠিলেই আমাদের চেষ্টার-লী ষ্ট্রীটের সেই বিখ্যাত গল্পটি মনে পড়ে। উহাতে আমরা দেখি যে, জনৈক রমণীকে কে হত্যা করিয়াছিল। রমণী প্রেত হইয়া এক জন কলওয়ালাকে তিনবার দেখা দেয়। দেখা দিয়া বলে—'তুমি যদি হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি না দেওয়াও, তবে আমি এইরূপ ভাবে আসিয়া প্রত্যহ তোমাকে জ্বালাতন করিব।' গত্যন্তর না দেখিয়া কলওয়ালা তখন হত্যাকারীকে ধরাইয়া উপযুক্ত শাস্তি দেওয়াইলেন।

মানুষ মরিয়া গেলে তাহার দেখিবার শক্তিটা আরও বাড়ে। তাই মরিবার পর অনেকের প্রেতাত্মা তখন বুঝিতে পারে যে, পৃথিবীতে জীবিতকালে তাহারা কত অন্যায় কাজই করিয়াছিল। তাই তাহারা অনেক সময় ক্ষমা-ক্ষান্তি চাহিতেও আইসে। মিসেস্ ক্রো-নাম্নী এক জন রমণী "প্রেতদ্রষ্ট্রী" ও "প্রকৃতির সূক্ষ্মদিক" নামক পুস্তকে এইরূপ অনেকগুলি গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। একটা গল্পের বেশ বিশদ বর্ণনাই করিয়াছেন। উইন্‌বার্গ নামক স্থানের কারাগারে ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আর একটা কাণ্ড নেকারষ্টীনা নামক স্থানে ঘটে। এক জন কাঠের সওদাগর মরিয়া ভূত হইয়াছিল। সওদাগর খুব ধনী। জীবিতকালে সে আত্মীয়ের যে অন্যায় করিয়াছিল, মরণান্তে তাহার জন্য ক্ষমা চাইতে আসে। লোকে জানিতে পারিয়া একটা কুৎসা পর্য্যন্ত রটাইয়া দেয়। শেষে আত্মীয়েরা কুৎসারটনাকারীর নামে মানহানির নালিশ করে। ভূত ক্ষমা চাহিতে আসায় এতটা কাণ্ড পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল।

"অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য-বিবরণ" নামক পত্রিকার ৯৩ পৃষ্ঠায়

অল্পদিন হইল একটা ঘটনা বাহির হইয়াছে। ঘটনাটি পড়িয়া জানা যায় যে, এক ব্যক্তি জনৈক পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করিতে বড়ই ইচ্ছুক হয়, অনেক চেষ্টাতেও দেখা হইল না। শেষে মরণের পর ভূত হইয়া পুরোহিতকে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু দেখা করিবার উদ্দেশ্যটা বলিয়া উঠিতে পারিল না।

দিনের বেলায় একটা ভূত আসিয়া হাজির

এইরূপ গল্প সেণ্টপাল্ পল্লীর রেভারেণ্ড জিরালড লুই বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"গ্রীষ্ম-কালে এক দিন বৈকালে একটা ঘটনা ঘটে। ঘটনাটা যেন কা'ল ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। গল্পটা এতই টাট্‌কা মনে রহিয়াছে। বৈকাল-বেলা। রৌদ্র ঝক্-ঝক্ করিতেছে। সেই সময় খুব বড় রাস্তার উপরে আমি বেড়াইতেছিলাম। "পি" নামক এক ব্যক্তির বাড়ীর কাছ দিয়া যাইতেছিলাম। যাইতে যাইতে দেখিলাম, বাড়ীটার জানালাগুলি বন্ধ। বৈকালের রৌদ্র ঘরের মধ্যে পড়ায় পাছে জিনিসপত্র-গুলি নষ্ট হয়, এই জন্যই যেন জানালাগুলি আটকানো রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল। আমি জানিতাম, ঐ বাড়ীর গৃহস্বামিনীর একটা অহঙ্কার ছিল যে, তাহার মত জিনিসপত্র আর কাহারও নাই। সুতরাং সেগুলিকে রৌদ্রবাতাসের হাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা অসম্ভব নহে, মনে করিলাম। গৃহ-স্বামিনীর এ সব গর্ব্ব ও খেয়াল মনে করিয়া আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। তাহার পর আর একটু যাইয়াই রাস্তা ত্যাগ করিয়া পাশের ফুটপাথে উঠিলাম। সেখান হইতে মুখ উঁচু করিয়া বাড়ীটির সম্মুখস্থ ঘেরা উঠানটার দিকে চাহিলাম। উঠানের কাছেই ঘরে ঢুকিতে যে দরজাটা আছে, ঠিক সেই স্থানে দেখি, একটা লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকটা যুবা; গায়ে কালো পোষাক, মাথায় টুপী নাই; বয়স ২০ বৎসর বলিয়া বোধ হইল। লোকটার চেহারা অনেকটা আমার বন্ধু "পি"র মত; তাই মনে করিলাম, যুবক বোধ হয় বন্ধুর পুত্র। আমি

বেশ করিয়া যুবককে দেখিলাম, যুবকও আমার দিকে চাহিয়া রহিল। দুই জনই দুই জনকে বেশ ভাল করিয়া দেখিলাম। তাহার পর হঠাৎ যুবক আমার দিকে খানিকটা সরিয়া আসিয়া অনিমেষভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমার দিকে চোখ বিস্ফারিত করিয়া চাহিতে লাগিল। আমার বেশ মনে হইল, যেন সে আমার সঙ্গে কথা বলিতে ইচ্ছুক। তাহার মুখ দেখিয়া সে ইচ্ছাটা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। মুখ দিয়া কথা বাহির না হইলেও আমরা চোখ দেখিয়া অনেক সময় মনের ভাব বুঝিতে পারি। প্রাণের কথা অনেক সময় চোখে বাহির হয়। তাই যুবকের চোখ দেখিয়া বুঝিলাম যে, তাহার মনে যাতনা ও ভর্ৎসনা করিবার একটা ইচ্ছা যেন জড়াজড়ি করিতেছে। ঐরূপ চাহনি দেখিয়া আমি প্রথমে স্তম্ভিত হইলাম; তাহার পর একটু বিরক্তও হইলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, "কেন রে বাপু! আমার দিকে ঐরূপ করিয়া চাহিতেছ কেন?" আমি আর দাঁড়াইলাম না। ও কথা আর মনে স্থান না দিয়া আমি সেখান হইতে চলিয়া গেলাম।

বুধবারে সেখানকার গোরস্থানে যাইয়া আমাকে কিছু পারলৌকিক কাজ করিতে হইয়াছিল। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, বন্ধু "গ"র সেই পুত্রটিকে সমাধিস্থ করিবার জন্য আনা হইয়াছে। আমি খুব শীঘ্রই বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। বন্ধুপত্নী বাড়ীতেই ছিলেন। তাঁহার মুখে যে সব কথা শুনিলাম, তাহাতে আরও অবাক হইলাম। শুনিলাম, যুবক ছটফট করিয়া মরিয়াছে; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমাকে দেখিতে চাহিয়াছে; বৃহস্পতিবারে মারা গিয়াছে, আরও শুনিলাম, যুবক উঠানের সম্মুখে নীচের ঘরে মারা গিয়াছে। মড়াটা ঘরেই ছিল। পরে আজ বুধবারে সমাধিস্থ করা হইল। বৃহস্পতিবারের পরের রবিবারে আমি তাহার প্রেত-মূর্ত্তিটিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম।

যুবক মরিয়া ঘরে পড়িয়া ছিল। যাহাতে ভালরূপে যথারীতি দেহটাকে কবর দেওয়া হয়, সেই জন্য যুবকের প্রেত-যোনি ব্যস্ত হইয়াছিল। তাহার চেহারা দেখিয়া, আমার মনে হইয়াছিল, সে যেন কোন গুপ্ত কথা—প্রাণের কোণে লুকানো পাপ ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক। এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার বাসনা হইয়াছিল। পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করিতে একটা তীব্র বাসনা প্রথমে তাহার মনে জন্মে। আর সেই জন্যই প্রেত-মূর্ত্তিতে দেখা পর্য্যন্ত দিতে পারিল। কিন্তু দেখা দিতে হইলে অনেকটা শক্তি ব্যয় হইয়া যায়। যুবকেরও দেখা দিতে আসিয়া তাহার সমস্ত শক্তি ব্যয় হইয়া গেল। তখন আর সে কথা বলিতে পারিল না। অথবা পুরোহিত যদি আর একটু থাকিতেন, তাহার কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, তাহার কাছে তাহার কথাগুলি শুনিবার চেষ্টা করিতেন, তবে হয় তো সে কথা বলিত। পুরোহিত চলিয়া যাওয়ায় যুবকের কথা শুনিবার আর কোনই উপায় রহিল না।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভূতের অনুতাপ

ভূতেরা অনেক সময় মানুষের কাছে উপকার পাইবার আশায় আইসে। হয় ত তাদের মুক্তি হইতেছে না—গতি হইতেছে না। যেই মানুষের কাছে মনের মত উপকারটা পাইল, অমনই তাহাদের উদ্ধার হইল। এরূপ ঘটনা আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি।

মানুষ মরিয়া গেলেও অনেক সময় তাহার বাসনা থাকিয়া যায়। পৃথিবীতে জীবিতকালে সে যে সকল অন্যায় কাজ করিয়াছিল, সে সব কথা তাহার মনে থাকে। তখন মনে হয়—"যাই, যাহাদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, তাহাদের কাছে যাইয়া ক্ষমা চাহিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি গে।" এই ভাবিয়া তাহাদের মরণের পরও ভূতযোনি হইয়া দেখা দেয়। দেখা দিয়া প্রাণের লুকানো পাপের কথা স্বীকার করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করে। যত দিন অনুতাপের আগুন জ্বলিতে থাকে, যত দিন দোষ-ঘাট স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাওয়া না হয়, তত দিন পৃথিবীর কাছে কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তত দিন স্বর্গে যাইতে পারে না, গতি হয় না, মুক্তি হয় না। অনেক ভূত এই জন্য শত শত বৎসর পৃথিবীতে আসা-যাওয়া করে। এখন আমরা একটা গল্প বলিব। গল্পটিতে জানা যায় যে, সামান্য একটু চুরি করিয়া মরণের পর এক জনের অনুতাপ হয়, আর সেই জন্য লোকটাকে ভূত হইয়া ৩০ বৎসর পৃথিবীতে আসিতে হইয়াছিল।

চুরি করিবার ফলে ভূত হইয়া অনুতাপ

"ভী"-নাম্নী একটি কুমারী তাহার কাকার বাড়ীতে যাইয়া কিছু দিন ছিল। এক দিন রাত্রিতে সে দেখিল, এক জন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি

তাহার বিছানার কাছে আসিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে। অথচ তাহার মুখ দিয়া কোন স্বর বাহির হইতেছে না। পরণে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন পদস্থা চাকরাণী। "ভী" দেখিল যে, ঐ মূর্ত্তিটি অল্পসময়ের মধ্যেই শূন্যে মিলাইয়া গেল। দেখিয়া তাহার খুবই ভয় হইল।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে "ভী" এক জন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া সেখানে কিছু দিন ধরিয়া বাস করিতেছিল। ভূত-প্রেত সম্বন্ধে তত্ত্ব-তল্লাস করা বন্ধুটির ভারী স্ফুর্ত্তির কাজ। তিনি ভূত নামাইতেন, ভূতের সঙ্গে গল্প করিয়া অনেক ব্যাপার শুনিতেন, কিছু দিন ধরিয়া এই আমোদেই ছিলেন। "ভী"ও তাঁহার কাছে বসিয়া ঐ সব কাণ্ড দেখিত। এক দিন একটি প্রেতিনী আসিয়া বলিল যে, তাহার নাম—সারা ক্লার্ক। "ভী"র বন্ধু কখন এই প্রেতিনীটাকে চিনিতেন না, "সারা" এই নামটাও আর কখন শুনেন নাই। প্রেতিনীটা বলিল—"আমি কুমারী 'ভী'র কাকার বাড়ীতে অনেক দিন আগে প্রধানা পরিচারিকা ছিলাম; কুমারী এক দিন তাহার কাকার বাড়ীতে ছিল, আমি রাত্রিতে তাহাকে দেখা দিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিবারও..চেষ্টা করিয়া কথা বলিতে পারি নাই। আমার প্রাণে একটা পাপের কথা আছে, তাই স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিব, এই-টুকুই আমার ইচ্ছা; পাপের ক্ষালন না হইলে, ক্ষমা না পাইলে, দোষ বলিয়া ফেলিতে না পারিলে আমার গতি হইবে না; এই জন্যই আমার আজ পর্য্যন্ত গতি হয় নাই, আর এই জন্যই আমি মাঝে মাঝে যাইয়া সেই বাড়ীতে দেখা দেই। জীবিতকালে যে ঘরটিতে আমি থাকিতাম, এখনও সেই ঘরের মধ্যে প্রেতিনী হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই; আমার পাপটা শুন—আমি খান-কতক বাসন চুরি করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একটা রূপার বাটিও ছিল। কুমারী "ভী" যদি এই কথাগুলি তাহার কাকীমাকে বলিয়া দেয়, আর যদি তিনি আমাকে ক্ষমা করেন, তবে আমার বিশেষ উপকার হয়, আমার মুক্তি হয়; আমার মনে সেই চুরির জন্য বড়ই অনুতাপ হইতেছে।"

কিছুদিন পরে "ভী" যখন কাকার বাড়ীতে আবার গিয়াছিল, তখন তাহার কাকীমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা কাকীমা, আপনি সারা ক্লার্ক নাম্নী কোন স্ত্রীলোকের কথা কি জানেন ?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই তাহাকে চিনি। ৩০।৪০ বৎসর আগে সে আমাদের বাড়ীতে প্রধানা চাকরাণী ছিল। ঘর-গৃহস্থালী দেখাশুনার ভার তাহার উপরেই দিয়াছিলাম।"

"সে লোকটা কেমন ছিল ? স্বভাব-চরিত্র কেমন ?"

"সে বেশ সৎস্বভাবা, খুব হুঁসিয়ার, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল।"

"আচ্ছা, কাকীমা ! যখন সেই চাকরাণীটা ছিল, তখন কি আপনার কোন রূপার জিনিস চুরি গিয়াছিল ?" এই কথা শুনিয়া "ভীর কাকীমা একটু ভাবিয়া বলিলেন—"হাঁ, আমার মনে হইতেছে, চুরি গিয়াছিল বটে। চিনি রাখিবার একটা বাটি, আরও কতকগুলি জিনিস তখন চুরি যায়। চুরিও অদ্ভুত চুরি, কেমন করিয়া কে নিল, কিছুই জানা গেল না। আচ্ছা, তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?"

"আপনি কি সারাকে সন্দেহ করিয়াছিলেন ?"

"না, না, বাসনগুলি যদিও তারই হেঁপাজতে থাকিত, তাহা হইলেও তাহার উপর সন্দেহ হয় নাই। তাহাকে খুব বিশ্বাসী বলিয়াই আমাদের ধারণা ছিল।"

তখন কুমারী "ভী" বন্ধুর বাড়ীতে সারার প্রেতিনী মূর্ত্তির কাছে যে সকল কথা শুনিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে বলিল। কাকীমা দেখিলেন যে, প্রেতিনী যে সকল জিনিস চুরি করা স্বীকার করিয়াছে, বাস্তবিক সেই-গুলিই হারাইয়াছিল। তিনি বলিলেন—"সারা যদি সত্যই চুরি করিয়া থাকে, তবে আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম।" এই গল্পটির মধ্যে একটি কথা একটু ভাবিবার আছে। পরে কথাটি বলিতেছি। ইহার পর হইতে ঐ বাড়ীতে আর প্রেতিনীর উপদ্রব হয় নাই, আর কখনও কেহ সারার প্রেত-মূর্ত্তিটি দেখিতে পায় নাই।

মিঃ আর, ভী আউয়েন "বিতর্কভূমি" নামক পুস্তকের ২২৬ পৃষ্ঠায়

এই গল্প লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সেখান হইতে গল্পটি জানিয়াছি। তিনি বলেন, যাঁহাদের বাড়ীতে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাঁহারা তাঁহার খুব পরিচিত ও সম্ভ্রান্ত। এ গল্পটি না কি খুব খাঁটী সত্য। গল্পটিতে আমাদের একটু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সারা ক্লার্কের প্রেতিনী মূর্ত্তি চোরা জিনিসগুলি ফিরাইয়া দিল না। হয় তো অনেক দিন হইয়া যাওয়ায় ফিরাইবার কোন উপায় ছিল না। চুরি করাটা স্বীকার করিল, আর ক্ষমা পাইল। ইহাতেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল।

আমরা আর একটা গল্প বলিব। সেটি কিন্তু আর এক রকমের ব্যাপার। একটা লোক বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়া ভূত হয়। সেই কাজের ফলে খুব একটা গুরুতর কু-ফল ফলিবার সম্ভাবনা ছিল। সেইটি যাহাতে না ফলিতে পারে, এই জন্য তাহাকে ভূত হইয়া প্রায় ৮০ বৎসরকাল পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। গল্পটি কিছু দিন আগে আমরা এক বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, ব্যাপারটি খুব সত্য। গল্পটি নিম্নে দিলাম।

পাপ-স্বীকার

যে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এই গল্পটি বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের মুখের কথা এই :—"পল্লীগ্রামে এক জন ভদ্রমহিলার বাড়ীতে আমরা নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলাম। যে সময় যাইবার কথা, তাহার একটু আগেই উপস্থিত হই। গেলে পরে চাকররা আমাকে বৈঠকখানা-ঘরে বসিতে বলে। আমি সেই ঘরে যাইয়া বসিলাম। যিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সে রমণী তখনও নীচে আইসেন নাই। আমি ঘরের মধ্যে বসিতে যাইয়াই দেখি, এক জন কাথলিক্ পুরোহিত বসিয়া খুব মনোযোগের সহিত একখানা বড় বই পড়িতেছেন। লোকটি আমার কাছে একেবারেই অপরিচিত, একটুও চিনিতে পারিলাম না। আমি ঘরে গেলেই তিনি একটিবার চোখ তুলিয়া আমাকে মাথা নাড়িয়া নীরবে অভিবাদন করিলেন, আবার কিছুই

না বলিয়া পড়িতে লাগিলেন। দেখিলাম, পুরোহিত মহাশয়ের বেশ বলিষ্ঠ দেহ, চেহারা বেশ থরথরে কাজের লোকের মত, বেশ হৃষ্টপুষ্ট; কিন্তু মুখে যেন কেমন একরকম উদ্বেগ ও অশান্তি প্রকাশ পাইতেছিল। আমি সেটুকু বেশই লক্ষ্য করিলাম। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম, তাই ত, লোকটি কে, আর ইহার নিমন্ত্রণই বা কেন হইয়াছে? অল্পসময়ের মধ্যে আরও অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়া জুটিলেন। তখন গৃহ-কর্ত্রীও নামিয়া আসিলেন। আমাকে যথাসময়ে আসিয়া আদর-আপ্যায়ন করিতে পারেন নাই, আমি একাকী বসিয়া আছি, এই জন্য ত্রুটি স্বীকার করিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, তাঁহার কাছে এই পুরোহিতের কথা জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু তিনি আসিলে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলাম। তাহার পর খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হইল। আমি গৃহকর্ত্রীর কাছেই বসিয়াছিলাম। হঠাৎ পুরোহিতের কথাটা আমার মনে পড়িয়া গেল। তখন তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ভাল কথা। বৈঠকখানায় এক জন পুরোহিতকে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম; কৈ, তাঁহার সঙ্গে ত আপনি আমাকে পরিচিত করিয়া দিলেন না!?"

তাহার পর আমি সমবেত লোকগুলিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম; কিন্তু পুরোহিতকে না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"কৈ, সেই পুরোহিত ত খাইতে আসেন নাই!"

আমার কথা শুনিয়া গৃহ-কর্ত্রীর মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি আমাকে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অ্যাঁ, তবে কি আপনিও তাঁহাকে দেখিয়াছেন?"

আমি বলিলাম—"নিশ্চয়ই দেখিয়াছি। হয় তো কথাটা তুলিয়া অন্যায় করিয়াছি; কারণ, আপনাকে যেন কেমন একটু বিরক্ত দেখিতেছি। আমি অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়াই কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া অন্যায় করিয়াছি, ত্রুটি লইবেন না। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি আমাদেরই মত এক জন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক, তাই তাঁহার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। অধিক

তাঁহার চেহারাটা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেও ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহার কথা যদি গোপন রাখা আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আর আমি এ বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিব না। আর আমার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইবে না।"

গৃহ-কর্ত্রী গলার স্বর আরও ছোট করিয়া বলিলেন,—"না, আমি বিরক্ত হই নাই। আমার ভাবটা আপনি উল্টা বুঝিয়াছেন। আমার গোপন করিবার কিছুই নাই। এ ব্যাপারটার আলোচনা হয়, ইহা আমার স্বামীর ইচ্ছা নয়। পুরোহিত যে আপনাকেও দেখা দিয়াছেন, ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি; কেন না, আমাদের বাড়ীর লোক ভিন্ন ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কাহাকেও দেখা দেন নাই। আপনি যাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নহেন; তিনি ভূতযোনি!"

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম,—"ভূতযোনি!" গৃহ-কর্ত্রী আবার বলিতে লাগিলেন—"হ্যাঁ, ভূতযোনি; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমরা দুই বৎসর যাবৎ এই বাড়ীতে বাস করিতেছি। ইহার মধ্যে আমি ও আমার স্বামী আমরা দুই জনে ১২ বার উঁহাকে দেখিয়াছি। আমরা যে অবস্থায় দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের ভ্রম হওয়া একেবারেই সম্ভব নহে। এই ভূতযোনির কথা আমরা কাহাকেও বলিব না ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি যখন দেখিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আপনাকে একটা অনুগ্রহ করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম—"সাধ্য হইলে নিশ্চয়ই করিব।" তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"বরাবরই আমার একটা সঙ্কল্প আছে যে, যদি কোন সাহসী লোক পাই, তবে তাঁহাকে ঐ ভূতযোনির কাছে পাঠাইয়া দিয়া উঁহার দেখা দিবার কারণটা জিজ্ঞাসা করাইব। আপনি কি উঁহার কাছে সাহস করিয়া যাইয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন? জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যাহাতে আর না আসেন, এমনটি করিতে পারেন কি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আমি শেষে গৃহকর্ত্রীর কথায় স্বীকার

করিলাম। আমি এতক্ষণ তাঁহার সঙ্গে খুব মৃদু মৃদু স্বরে ভূতযোনির বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম। কেহই আমাদের কথা শুনিতে পায় নাই। এখন একটু উচ্চস্বরে সকলকে শুনাইয়া বলিলাম, "নীচে আমার একটু দরকার আছে, শীঘ্রই আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া আমি নীচে সেই বসিবার ঘরে আসিলাম। আমার চাকরটিও আসিতেছিল; তাহাকে হাতের ইসারায় ফিরাইয়া দিলাম। ঘরে যাইয়াই দেখি, ভূতযোনিটা ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া আছেন, সেই রকম করিয়াই পড়িতেছেন। দেখিয়া ভয় ও বিস্ময়ে গা-টা কাঁপিয়া উঠিল। তথাপি সাহসে ভর করিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ভূতটি তখন আগেকার মত আমাকে আর একবার অভিবাদন করিলেন। আগে অভিবাদন করিয়াই বহিতে মন দিয়াছিলেন; এবার কিন্তু তাহা নহে। এবার বহির দিকে না তাকাইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। চোখ দুইটিতে খুব একটা অবসাদের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। শুধু অবসাদও নহে, একটা চাপা উৎকণ্ঠার ভাবও ছিল।

অল্প একটু পরেই আমি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে, আর কেনই বা এখানে আসিয়া থাকেন? ঈশ্বরের দোহাই, মিথ্যা বলিবেন না।"

আমার কথা শুনিয়া ভূতযোনি বহিখানি বন্ধ করিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু স্বরে অথচ খুব সুস্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন:—

"সত্য কথা বলিবার নিমিত্ত আমাকে ইহার পূর্ব্বে এ রকম ভাবে আর কেহ কখন দিব্য দেয় নাই। আমি কে, আর কেন আসি, তাহা বলিতেছি। আমাকে দেখিয়া আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এক জন পুরোহিত। ৮০ বৎসর আগে আমিই এই বাড়ীর মালিক ছিলাম। আমি খুব ভাল ঘোড়-সোয়ার ছিলাম। সুবিধা পাইলেই ঘোড়ায় চড়িয়া শীকার করিতাম; কারণ,

শীকারের দিকে আমার বিশ্রী ঝোঁক ছিল। এক দিন শীকারে বাহির হইব, ঠিক এমন সময় খুব একটা বড় ঘরের যুবতী মহিলা আসিয়া বলিল, 'আমি ভয়ানক পাপ করিয়া ফেলিয়াছি। যাহাতে প্রায়শ্চিত্ত হয় করুন।' মহিলা যাহা যাহা বলিল, আমি তাহা বলিব না। তবে এটুকু বলিতে পারি যে, সে অতি ভয়ানক পাপ। শুনিয়া আমি এতই ব্যথিত হইলাম যে, কথাগুলি একখানি কাগজে লিখিয়া লইলাম। লেখাটা ভয়ানক অন্যায় কাজ হইল; ওরূপ পাপের স্বীকার-উক্তি লিখিয়া লওয়া আমাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই লিখিয়া বসিলাম। মহিলার কথাটা লিখিয়া লইতে আমার শীকারে যাইবার নির্দ্দিষ্ট সময় প্রায় যায় যায় হইয়া উঠিল। খুব তাড়াতাড়ি তাহাকে বিদায় দিয়া আমি ছুটিলাম। কিন্তু অত ব্যস্ততার মধ্যেও তাহার পাপের কথাগুলি মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। কি বিশ্রী পাপ। অত ব্যস্ততার মধ্যেও সেই পাপের বিবরণওয়ালা কাগজখানিকে সাবধান করিয়া রাখিয়া যাইতে ভুলিলাম না। এই বাড়ীর কোন একটা স্থানের ৩ খানি ইট আল্গা করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল। আমি এখন তাহা প্রকাশ করিব না। ইট সরাইলে একটা বেশ কুলুঙ্গী দেখা দিত। আমি ভাবিলাম, সেই কুলুঙ্গী-তেই ঐ কাগজখানি রাখাই ব্যবস্থা। তাহা হইলে বেশ গোপনে থাকিবে। আর ভাবিলাম, শীকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেশ ভাল করিয়া পড়িয়া ব্যাপারটা জানিয়া লইব। তাহার পর এই সাংঘাতিক কাগজখানি পুড়াইয়া ফেলিব। তাই শীকারে যাইবার আগেই সেখানিকে তাড়াতাড়ি একখানি পুস্তকের পাতার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া বহিখানা কুলুঙ্গীর মধ্যে রাখিলাম। তাহার পর ইট কয়খানা বেশ করিয়া তাহার উপরে সাজাইয়া দিলাম। কুলুঙ্গীটা আর তখন দেখা গেল না; বেমালুম ঢাকা পড়িয়া গেল। তাহার পর ঘোড়ায় চড়িয়া পূর্ণবেগে ছুটিলাম।

শীকার করিতে করিতে মাঠে ঐ দিনই ঘোড়া হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িলাম। তৎক্ষণাৎ সেই মাঠেই আমার মৃত্যু হইল। তখন হইতেই

আমার এই দশা—আমার এই দারুণ অদৃষ্ট ! আমি পুরোহিত হইয়া ধর্ম্মের নিষেধ পায়ে ঠেলিয়াছিলাম, পাপের কাহিনী লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহারই ফল হাতে হাতে পাইতেছি। পাছে সেই মহিলার গুপ্ত পাপের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই কাগজখানিকে পাহারা দিবার জন্য ভূত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আপনি যেমন সাহস করিয়া আমার সমক্ষে আসিয়া আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলেন, ইহার আগে এমনটি আর কেহ কহে নাই। এর পূর্ব্বে আর কেহই আমাকে সাহায্য করিতে আসে নাই। কেহই আমার গতির বিষয়, মুক্তির বিষয় ভাবে নাই বা আশা-ভরসাও দেয় নাই। এখন আপনি আসিয়াছেন। আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া আমার গতি করিবেন ? আপনি যদি গুরুতর শপথ করিতে পারেন যে, এক বর্ণও না পড়িয়া বা কাহাকেও না বলিয়া কাগজখানি পুড়াইয়া ফেলিবেন, তাহা হইলে আমি সেখানি আপনাকে দেখাইতে পারি। দিব্য করিবেন কি ?”

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম—“আমি দিব্য করিতেছি, আমি আপনার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিব।”

আমার কথা শুনিয়া ভূতযোনি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বাপ রে ! সে চাহনিটা কি ভীষণ—কি অন্তর্ভেদিনী ! মনে হইতে লাগিল, যেন আমার অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইতেছেন। তাহার পর আমার কথায় যেন বিশ্বাস হইল, যেন প্রাণের একটা বোঝা নামিয়া গেল, এইরূপ আশ্বস্তভাবের একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“তবে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন।”

ক্রমে ভূত-যোনি অলি-গলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা সরুপথে চলিলেন। সেই পথটি ধরিয়া একটা চোর-কুঠারীর মত স্থানে গিয়া উঠিলেন। সেখানে যাইয়া হঠাৎ দাঁড়াইলেন, আর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—“এই স্থানটিতে সেই বই ও কাগজখানি আছে। এই যে এই স্থানটি; এখানকার ইট খুলিয়া ফেলিলেই আপনি তাহা দেখিতে পাইবেন। এই

জায়গাটা খুব ভাল করিয়া ঠিক করিয়া রাখুন আর দিব্য করার কথাটা স্মরণ রাখিবেন।"

ভূত-যোনিও যেমন স্থানটি দেখাইয়া দিলেন, আমিও সরিয়া গিয়া সেটি চিনিয়া লইলাম। তাহার পর দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তাঁহার দিকে চাহিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দেখিলাম, ভূত-যোনিও নাই, কেহই নাই,—আমি সেই আলো-আঁধারি স্থানটিতে একেবারেই একা রহিয়াছি। ভূত-যোনি মিলাইয়া যাইবেন, তাহা আমি জানিতাম—সে নিমিত্ত পাছে ভয় পাই, তাহার জন্য সাহসও করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু বলিলে কি হয়, আমার প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে ফিরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে সেই খাবার ঘরে গিয়া উঠিলাম। ভয়ে তখনও আমার নিশ্বাস পড়িতেছে না। বিস্ময় ও ভয়ে কেমন একরূপ জড়-ভরত হইয়া পড়িলাম।

খাবার ঘর হইতে আমি হঠাৎ গিয়াছিলাম কেন, কেনই বা এত দেরি হইতেছে, এই সব দেখিয়া ভাবিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে অনেক রকম টীকা-টিপ্পনী করিতেছিলেন। তাহার পর আমি এইরূপ ব্যস্তসমস্ত হইয়া বিস্ময়-বিহ্বল ও ভয়-চকিত-ভাবে যাইয়া উঠিলে আমার দিকে সকলেরই নজরটা যেন আসিয়া পড়িল। গৃহ-কর্ত্তা আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারি, তখন আমার তেমন অবস্থা নহে। তাই ইসারা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, আমার কথা আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন। উনিই সব বলিবেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া গৃহকর্ত্রী আমাকে যে কার্য্যের জন্য বাহিরে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে বলিলেন। শুনিয়া ঘরের সমস্ত লোক—গুলিই কেমন এক রকম কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। ভূতের কথা শুনিলে সকলেই উৎসুক হইয়া উঠে। তাহার পর একটু সামলাইয়া লইয়া আমি ব্যাপারটা আগাগোড়া সবই বলিলাম; বলিতে বাধ্যই হইলাম। সকলে এত উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে,

আমি কোন কথা গোপন করিতে পারিলাম না। সেরূপ ক্ষেত্রে গোপন অসম্ভব।

বক্তা বলিয়া আমার একটা খ্যাতি ছিল। একে বক্তা, তাহার উপর আবার একটা সত্য ভূতের কথা বলিতেছি। কথাটা যে সকলে কিরূপ মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কথা বলা শেষ হইলে সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—এখনই—এই মুহূর্ত্তে রাজমিস্ত্রী আনিয়া ভূতের দেখান দেওয়ালের সেই জায়গাটা ভাঙ্গিয়া দেখা যাক্। দেখা যাক্, এই অদ্ভুত ব্যাপারটা সত্য কি না। মিস্ত্রী আনিতে পাঠান হইল। মিস্ত্রীও শীঘ্রই আসিয়া পড়িল। তখন আমরা সকলেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া সেই জায়গাটার কাছে যাইয়া উঠিলাম। সে স্থানে যাইয়া আমার প্রাণটা আর একবার কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলাম—বাপ্ রে! এখানেই সেই ভূতটা হঠাৎ মিলাইয়া গিয়াছিল! আমি মিস্ত্রীকে দেওয়ালের সেই স্থানটা ঠিক ঠিক দেখাইয়া দিলাম। সেও ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল।

আমাদের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিলেন—"গাঁথুনিটা খুব শক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।" গৃহকর্ত্তা বলিলেন—"হাঁ, শক্ত বই কি! আর বেশী দিনের গাঁথুনিও নহে। শুনিয়াছি, এ স্থানগুলি অনেক দিন অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর আমার আগে যিনি এখানে ছিলেন, তিনি না কি এই সব স্থান আবার চূণ-শুরকী দিয়া নূতন করিয়া মেরামত করাইয়াছেন। আর সে-ও বেশী দিনের কথা নহে।"

এই সকল কথা হইতে হইতে মিস্ত্রী চূণ-বালি ভাঙ্গিয়া ইট খুলিয়া ফেলিল। আর বলিল—"এই যে, এখানে কুলুঙ্গীর মত কি একটা দেখা যাইতেছে।" শুনিয়া সকলেই যেন বিস্ময়ে একটু কাঁপিয়া উঠিল। দেখা গেল, কুলুঙ্গীটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দুই ফিট, আর গভীরতাটা ১৮ ইঞ্চি। গৃহস্বামী ঝুঁকিয়া পড়িয়া কুলুঙ্গীটি দেখিলেন, তাহার পর ভূতের নিষেধের কথাটা মনে হওয়ায় পিছনে সরিয়া আসিলেন। তখন আমি নিজেই

সেখানে গেলাম। গৃহ-স্বামী বলিলেন :—'কেমন এক রকম উৎসুক হইয়া আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার পর ভূতের নিষেধের কথাটা মনে পড়িল। তাই ফিরিয়া আসিলাম। আপনারই যাইবার অধিকার। আপনিই যাইয়া দেখুন।'

আমি ভয়ে যেন সাদা হইয়া গেলাম। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া কুলুঙ্গী-টির কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ভিতরের দিকে একটিবার চাহিয়াই হাত ঢুকাইয়া দিলাম। একখানি সেকেলে ধরণের বহি পাইলাম, সেখানির গায় রাশীকৃত ধূলা-মাটী। বহিখানি দেখিয়া সকলেরই প্রাণটা যেন কেমন দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কিন্তু সকলেই চুপ করিয়া রহিল। আমি ভক্তির সঙ্গে বহিখানি খুলিয়া ২।১টা পাতা উল্টাইবার পরই একখানা হাতের লেখা কাগজ পাইলাম। অনেক দিনের বলিয়া কাগজখানি হল্‌দে হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম, খানিকটা লেখা। লেখাগুলি এলোমেলো ভাবের। দেখিয়া মনে হয় যেন কেহ খুব তাড়াতাড়ি ঐগুলি লিখিয়াছিল। যেমন বুঝিলাম, এইগুলি ভুতযোনির গুপ্ত লেখা, অমনই চোখ ফিরাইলাম, আর পড়িবার চেষ্টাও করিলাম না। তখন আমরা সকলেই সেখান হইতে কাছের একটা ঘরের মধ্যে আসিলাম। আসিয়াই যজ্ঞে আহুতি দিবার মত করিয়া উনানের মধ্যে সেই পত্রখানিকে নিক্ষেপ করিলাম। পত্রখানি যতক্ষণ পুড়িতে লাগিল, ততক্ষণ কাহারও মুখে একটি টুঁ শব্দও নাই, সকলেই একদৃষ্টিতে পুড়িয়া যাওয়াটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কাগজখানি ভস্মীভূত হইয়া যাইবার পর অনেকে বলিয়া উঠিলেন—"আশ্চর্য্য ব্যাপার! অদ্ভুত কাণ্ড!! না দেখিলে কে ইহা বিশ্বাস করিত?" সকলেই বিস্মিত হইলেন। আমার মনে হইল, আজ এই ব্যাপার যাঁহারা স্ব-চক্ষে দেখিলেন, তাঁহারা কেহই কখন ইহা ভুলিবেন না। আমি ত ভুলিবই না। ব্যাপারটা অনেক দিনের হইলেও আমি যখনই এইটি কাহাকেও বলিতে যাই, অমনই প্রাণটা যেন ভয় ও বিস্ময়ে আলোড়িত হইয়া উঠে। আর

একটি কথা। ঐ কাগজখানি পুড়াইয়া ফেলার পর আর কখনও ঐ পুরোহিতের প্রেত-মূর্ত্তিকে দেখা যায় নাই।

হঠাৎ মরিয়া যাইবার পর পুরোহিতের মনের ভাবটা যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আমরা সহজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি। তাঁহার জীবাত্মা বেশ বুঝিলেন যে, অন্যায় কাজ করা হইয়াছে, তাহার আর সংশোধনের উপায় নাই। তাহা ছাড়া পাপের ব্যাপারটা এমনই গুরুতর যে, আর কাহাকেও বলিবার উপায় ছিল না। পুরোহিতের প্রেতাত্মার কেবলই ভাবনা হইত, পাছে বুঝি পাপটা কেহ টের পায়। যাহা দ্বারা কাগজখানি পুড়ান হইতে পারে, এমন লোকই তিনি খুঁজিতেছিলেন। কাগজখানি লইয়া—গুপ্ত পাপের ঘটনাটি লইয়া ভূতযোনি বাস্তবিকই একটু মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন।

আমরা আর এক জন পুরোহিতের কাহিনী বলিব। তাঁহার পাপটা অন্য প্রকারের। সেটা—স্বার্থতাড়িত হইয়া কর্ত্তব্যের ত্রুটি। সে ত্রুটির জন্য পৃথিবীতে যে খুব বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা নহে বা সে জন্য ভূত হইয়া তাঁহার আসাও আবশ্যক হয় নাই। তবে মরণের পর নিজের অন্যায়টা তিনি বুঝিয়াছিলেন বা অন্য কোন মৃত পুরোহিতের প্রেতাত্মা তাঁহাকে তাঁহার অন্যায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অনুতাপ হইয়াছিল, নিজের পাপ প্রকাশ করিয়া একটা প্রায়শ্চিত্তের ইচ্ছাও প্রাণে জাগিয়াছিল। এ জগতেই হউক, আর সূক্ষ্ম-জগতেই হউক, পাপের জন্য অনুতাপ এক সময়ে হইবেই হইবে। "পেন্‌ভেন্নু" নামক স্থানের চার্চ্চ করী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এই গল্পটি মিসেস্ এ, ই, হোয়াইট হেড্ প্রণীত "প্রেতালোচনা" নামক পুস্তকের ১১৭ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পুরোহিত ভূতের উপাসনা

আমার ঠাকুরদাদার নাম চ্যাটন। তিনি কিছু টাকা আদায়ের জন্য „পেম্পল নামক গ্রামে গিয়াছিলেন। এক দিন সন্ধ্যাকালে সেখান হইতে

বাড়ী আসিতেছিলেন। সে দিনটা বড়দিনের পর্ব্ব। সারাটা দিন বরফ পড়ায় পথ-ঘাট সাদা ধপধপে হইয়া উঠিয়াছিল। মাঠের পথগুলিও চিনিবার উপায় ছিল না। বরফে সব স্থান সাদা। বরফে পাছে পদস্খলন হয়, সে জন্য তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছিলেন।

বাড়ী আসিতে হইলে একটা গির্জ্জার কাছ দিয়া আসিতে হইত। গির্জ্জাটি আর নাই। তবে ভাঙ্গা, জঙ্গলপূর্ণ ঘরদোরগুলি ছিল মাত্র। ঠাকুরদাদা যখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ঢং ঢং করিয়া ১২টা বাজিল। দুপুর রাত্রি, উপাসনার সময় ঘণ্টা বাজে। তিনি অত রাত্রিতে সেই ঘণ্টার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

ঘণ্টার ধ্বনি শুনিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—তাই ত, সেণ্ট ক্রাইষ্টোফার গির্জ্জাটা কি আবার মেরামত করিয়া লওয়া হইয়াছে? প্রাতঃকালে যখন এই পথ দিয়া গিয়াছি, কৈ, তখন তো গির্জ্জাটার দিকে লক্ষ্য হয় নাই! হয় তো ও দিকে মন ছিল না বলিয়াই দেখিতে পাই নাই।

আবার শুনিলেন, ক্রমাগত ঘণ্টা বাজিতেছে। তখন ভাবিলেন— যাই, গির্জ্জায় যাইয়া দেখি, ব্যাপারটা কি হইতেছে। চন্দ্র-কিরণে দেখিলেন, সে গির্জ্জাটা নূতন, আর অতি সুন্দর। আর দেখিলেন— বিস্তর আলো জ্বলিতেছে, জানালার মধ্য দিয়া আলোর উজ্জ্বল রশ্মিগুলি বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে। তিনি বাহির-দরজার গায়ে ঘোড়াটা বাঁধিলেন। তাহার পর গির্জ্জার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে যাইয়া দেখিলেন—ঘরের মধ্যে লোকে লোকারণ্য। লোকগুলি সকলেই একমনে উপাসনায় বিভোর। এতটা তন্ময়ভাব সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। গির্জ্জার মধ্যে অন্য শব্দ না হইলেও দুই এক জন কখন কখন কাসিয়া থাকে। কিন্তু এখানে কাসির শব্দটা পর্য্যন্ত নাই—একেবারে ঘোর নীরবতা। ঠাকুর-দাদা ঘরে ঢুকিয়াই দরজার কাছে জানু পাতিয়া উপাসনা করিতে বসিয়া গেলেন।

গির্জ্জার মধ্যে বেদীর কাছে পুরোহিত ছিলেন। ঠাকুরদাদা ভাবিতে লাগিলেন—"যাহা হউক, রাত দুপুরেও উপাসনাটা করা ভাল।" উপাসনা করিবার সময় তিনি মৃত আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গল কামনা করিতেন। আজও তাই করিতে লাগিলেন। খানিক পরে সমবেত লোকগুলিকে আশীর্ব্বাদ দিবার জন্য পুরোহিত সকলের দিকে চাহিলেন। সে চাহনিটার মধ্যে কেমন-যেন একটু অস্বাভাবিক দীপ্তি। সেটা ঠাকুরদাদা বেশ লক্ষ্য করিলেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার বোধ হইল, পুরোহিত যেন তাঁহাকেই খুঁজিতেছেন। তাঁহার দিকেই পুরোহিত চাহিয়া রহিলেন। ইহাতে ঠাকুর-দাদার যেন একটু কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল।

পুরোহিত একটি পাত্র হইতে একখানি মন্ত্রপূত রুটী লইয়া উহাকে দুই আঙ্গুলের মধ্যে ধরিয়া চাপা-স্বরে বলিলেন—"এইখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে লইতে পারে, এমন কি কেহই নাই?" কেহই উত্তর দিল না। তিনি পর-পর তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাইলেন না। তখন ঠাকুরদাদা উঠিলেন। পুরোহিতের কথায় কেহ উত্তর দিল না বলিয়া ঠাকুরদাদা তাহাদের দিকে একটু ঘৃণার সঙ্গে চাহিলেন।

ঠাকুর-দাদা বলিলেন—"পূজ্যপাদ মহাত্মন্! আমি ভাবিয়াছিলাম, আগামী কল্য বড়দিন, সুতরাং অন্তিম উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য কল্যই করিব। আপনি যদি ঐগুলি আজই করিতে বলেন, তাহাতেও আমার দ্বিধা নাই।" এই কথা শুনিয়া পুরোহিত বেদী হইতে নামিলেন। ঠাকুরদাদাও লোকগুলির ভিতর দিয়া বেদীর কাছে যাইয়া জানু পাতিয়া বসিলেন।

পরে পুরোহিতের নিকট হইতে ভক্তির সঙ্গে সেই পবিত্র বস্তু গ্রহণ করিলেন। পুরোহিত তখন বলিলেন—"তোমাকে আমি আশীর্ব্বাদ করি। সে আজ তিন শত বছরের কথা, এইরূপ বড়দিনের পূর্ব্বরাত্রে এইরূপ সারাটা দিন ধরিয়া বরফ পড়িয়াছিল। আমি শুনিলাম, একটী লোক মর-মর অবস্থায় আছে। তাহাকে অন্তিম উপদেশ দেওয়া আমার

কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু আমি লোকটার কাছে যাই নাই। এই পাপে আজ তিনশ বছর ধরিয়া আমি দুঃসহ নরকে কষ্ট পাইতেছি। যদি কোন জীবিত ব্যক্তি আমার নিকট অন্তিম উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তবে আমার মুক্তি হইবার কথা। আজ তোমাকে পাইয়া আমার যাহা দিবার ছিল, তাহা দিলাম। এখন আমার মুক্তি হইল।"

পুরোহিতের কথাগুলি শেষ হইবামাত্র সমস্ত আলো নিভিয়া গেল। ঠাকুর-দাদা তখন দেখিলেন যে, তিনি একটা ভাঙ্গা, ছাদশূন্য, জঙ্গলপূর্ণ গির্জ্জার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। তখন অতি কষ্টে সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাহার পর ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ী আসিতে লাগিলেন।

এই গল্পটিতে আমরা দুইটি বিষয় বুঝিতে পারি। জীবিতকালে কর্ত্তব্যের ত্রুটি করিলে পরলোকে যাইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যক হয় ও ইচ্ছা জন্মে। তাহা ছাড়া ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভূতযোনিরা বিস্তর কাণ্ড ঘটাইয়া থাকে ও ঘটাইতে পারে। যে গির্জ্জার কথা বলা হইল, হইতে পারে, পুরোহিত জীবিতকালে ঐ স্থানেই কাজ করিতেন। আর এখন যে গির্জ্জা, সমবেত লোক, আলোক প্রভৃতি দেখা গেল, হয় তো এগুলি আসল জিনিস নহে। পুরোহিত বহুদিন ধরিয়া এই সকল চরিত্রের যে চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই চিন্তাই এখন দৃশ্যমান হইয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিল। ঠাকুর-দাদা কেন, যে কেহই হয় তো উহা দেখিতে পাইতেন। ব্যাপারগুলি সবই মৃত পুরোহিতের চিন্তাগঠিত দৃশ্য, এরূপ ভাবিবারই বা প্রয়োজন কি? এগুলি অন্যরূপও হইতে পারে। ভুবর্লোক হইতে পুরোহিত ইচ্ছাশক্তি প্রেরণ করিয়া চ্যাটনকে হয় তো অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাই খানিকটা সময়ের জন্য চ্যাটনের সূক্ষ্ম-দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ঐরূপ কাণ্ড দেখিতেছেন বলিয়া মনে করিলেন। বাস্তবিকপক্ষে স্থূল-জগতে হয় তো কিছুই দেখেন নাই। ব্যাপারটিতে এইরূপ নানাপ্রকার ব্যাখ্যাই আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়,

ঐ সব ব্যাখ্যা ঠিক নহে। খুব সম্ভবতঃ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের যে সকল মহাত্মা মারা গিয়াছেন, তাঁহারা ঐ পুরোহিতের ত্রুটি জানিয়া প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহার উপকার করিবার নিমিত্ত ঐরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পুরোহিতের উপকার করিব স্থির করিয়া সকলে মিলিয়া শুভকামনা করিতেছিলেন। সেই কামনাগুলি স্থূল মূর্ত্তিতে চ্যাটনের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। এইটিই বোধ হয় ঠিক ব্যাপার; নচেৎ অত লোক, অত আলো, এমন সুন্দর গির্জ্জা এতগুলি ব্যাপার এক জনের চিন্তাশক্তির বলে হইল, এরূপ ভাবিয়া উঠা যায় না। অনেকের চিন্তাশক্তির ফলে এমনটি হওয়া বেশ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

আর একটু ভাবিবার আছে। পুরোহিত-ভূতের ধাঁ করিয়া গতি হইয়া গেল। যেই প্রায়শ্চিত্ত, অমনই মুক্তি। ইহাতে মনে হয়, তিনি আদৌ বদ্ধ ছিলেন না, প্রত্যুত মুক্তই ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই এরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিতেন। সে জন্য এত দীর্ঘকাল ভূত হইয়া থাকারও তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। ইচ্ছামাত্রই এরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে অগ্রসর হইতে পারিতেন। তিন শত বৎসর কাহাকেও ভূতলোকে সাধারণতঃ থাকিতে হয় না। অতটা সময় নরকভোগ করা নিতান্ত অসঙ্গত ব্যাপার। প্রতি বৎসরে একবার বড়দিনের পর্ব্ব হয়; আর সেই দিনেই যদি প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যক হইয়া উঠে, তাহা হইলে পুরোহিত-ভূতের এত দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিবার আবশ্যক কি ছিল?

মরণের পর ভূত হইয়া অনেকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে আইসে। তাহাদের কাহিনীগুলি বড়ই চমৎকার দেখা যাইতেছে। কিন্তু স্যার রবার্ট ফার্ণলের কাহিনীর মত অদ্ভুত কাহিনী শোনা যায় না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসের সংখ্যা "থিওসফিষ্ট" নামক পত্রিকায় এই কাহিনী বাহির হইয়াছিল। গল্পটি খুব বড়; তাই এখানে আমরা সমস্তটা বলিতে পারিব না। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই :—একটা কো

জীবিতকালে অন্যের অপকার করিয়াছিল। তাহার পরে মরণকালে এই জন্য খুব একটা অনুতাপ আইসে। ভয়ানক অপরাধের জন্য লোকটির কয়েদ হয়। কয়েদীরা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, এক রকম অনশনেই মারা যায়। তাই কয়েদের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সে শেষে আত্মহত্যা করে। মরিবার সময় একখানি কাগজে এইরূপ লিখিয়া যায়—"আমি অমুক স্থানে প্রচুর টাকা রাখিয়া গেলাম, আর অমুক লোকটার বড় ক্ষতি করিয়াছি, এখন খুব অনুতাপ হইতেছে, আমার টাকাটা লইয়া যদি কেহ সেই লোকটাকে তাহার অর্দ্ধেক দেয়, তবে আমার পাপের কতকটা শান্তি হইবে, আর অর্দ্ধেকটা সে নিজে যেন লয়।" মরণের পর বহু বৎসর ধরিয়া লোকটা ভূত হইয়া টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল; কেহ তাহার ইচ্ছামত কাজ করে কি না, কেবল পাহারা দিয়া তাই দেখিতেছিল। যে বংশে এই ব্যাপার ঘটে, সেই বংশের ভদ্রলোকেরা এখনও বাঁচিয়া আছেন। নাম প্রকাশ হইলে পাছে অখ্যাতি রটে, তাই তাঁদের নাম না দিয়া মন-গড়া নাম দিয়া আসল ঘটনাটি প্রকাশিত করা হইয়াছে। লেড্‌বিটার সাহেব বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, গল্পটি খাঁটী সত্য।

বিংশ অধ্যায়

অনেকে ভূত হইয়া পৃথিবীর উপর ঘুরিয়া বেড়ায়

মানুষ জীবিতকালে পাপ করিলে তাহার জন্য মরণের পর অনুতাপ হয়। আর প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ভূত হইয়া মানুষের সঙ্গে দেখা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করে, এই সব কথা আমরা পূর্ব্ব-অধ্যায়ে বলিয়াছি।

অনেক ভূত পৃথিবীর উপর ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদিগকে "পৃথিবী-বদ্ধ" বলা চলে। পূর্ব্ব-অধ্যায়ে আমরা এ রকম অনেক ভূতের কথা বলিয়াছি। এ সব ভূতগুলা এক রকমের নহে। অনেকে অনেক উদ্দেশ্যে "পৃথিবীবদ্ধ" থাকে। সেন্ট মার্টিন্ বলেন—অনেকগুলি ভূত ভুবর্লোক হইতে আসিয়া হাজির হয়, আবার চলিয়া যায়। কিন্তু আর কতকগুলি এমন ভূত আছে, যাহারা চলিয়া যায় না, মানুষের কাছে সারা দিন-রাতই থাকিয়া যায়, চলিয়া যাইবার শক্তি তাহাদের নাই, যাইতে পারে না। তবে, মুক্তির বিশেষরূপ ব্যবস্থা ঘটিলে যাইতে পারে। ঠিক ঐরূপ একটা গল্প "অদৃশ্য সহায়" নামক পুস্তকের ৮৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। গল্পটি এই ঃ—এক ব্যক্তি দুইটি ছোট ছেলে রাখিয়া মারা যায়। তাহাদের খাওয়া-পরার কোন ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারে নাই। সেই জন্য লোকটি কেবলই ছেলে দুইটির ভাবনা ভাবিতে থাকে। সূক্ষ্ম-জগতে বিস্তর অদৃশ্য সহায় আছেন। ঐরূপ এক জন সহায় লোকটার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বুঝিতে পারিয়া তাহার উপকারের জন্য ছেলে দুইটির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তখন সেই মৃত পিতার মনে শান্তি হওয়ায় সে স্বর্গে যাইতে পারিল। আবার এমন অনেক ভূত দেখা যায় যে যাহাদের দেখা দেওয়ার উদ্দেশ্যটা খুব ভাল করিয়া আমরা বুঝিতে পারি না।

ওয়ের নাম্নী একটি পেত্নীর কথা

ইংলণ্ডের নর্দ্ধামটন্ জেলায় বার্বী নামে একটা ছোট পল্লী আছে। এই পল্লীর একটি বাড়ীতে অনেক দিন ধরিয়া একটা প্রেতিনীর উপদ্রব ছিল। জীবিতকালে ইহার নাম ছিল ওয়ের। এই ওয়ের ভয়ানক কৃপণ ছিল। লোকে ভাবিল, কৃপণ লোকের গুপ্তধন থাকার খুব সম্ভাবনা; বোধ হয়, উহারও কোন স্থানে টাকা লুকানো আছে, তাই প্রেতিনী হইয়া সেই টাকা পাহারা দিতে আইসে। লোকের মনে এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় সকলেই উহার টাকা খুঁজিতে লাগিল। আশ্চর্য্য! সত্য সত্যই লুকানো টাকা বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু তবুও প্রেতিনীর আসা বন্ধ হইল না। তখন তাহার বন্ধুরা ভাবিতে লাগিলেন, হয় তো উহার দেনা আছে, সেগুলির পরিশোধ না হইলে উহার মুক্তি হইবে না। দেনা আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য বন্ধুরা তখন অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, সত্য সত্যই কিছু দেনা আছে। তখন তাঁহারা দেনা শোধ করিয়া দিয়াছিলেন। আর সেই অবধি প্রেতিনীর আসাও বন্ধ হইয়া গেল। ঋণ-শোধের সঙ্গে তাহার মুক্তি হইল।

তিন শিলিং দশ পেন্স দেনার জন্য এক জন ভূত হইয়াছিল

মরণের পর এক জনের মনে হইল—আমি পৃথিবীতে তিন শিলিং দশ পেন্স দেনা করিয়া আসিয়াছি, শোধ দিতে পারি নাই। তখন শোধ দিবার নিমিত্ত সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশ্য এ কথায় বেশ বুঝা যায়, সে লোকটা খুব সাঁচ্চা ছিল। উহার কাহিনী ডাঃ এড্ওয়ার্ড বীণস তাঁহার "নিদ্রাতত্ত্ব" নামক পুস্তকের ৪৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন। দেনা শোধ হইয়া গেলে উহার মুক্তি হইয়াছিল। বীণস বলিতেছেন—"ইহা অপেক্ষা সত্য ঘটনা পৃথিবীতে আর হইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না।" গল্পটি এই—'পার্থ' নগরের এক জন স্ত্রীলোক

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের জনৈক পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করিয়া বলেন, "মহাশয়, একটি প্রেতিনী প্রত্যহ আমাকে জ্বালাতন করিতেছে। সে আমাকে বলে, তুমি কোন এক জন পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করিয়া বল যে, আমার কিছু দেনা আছে, তিনি যেন দয়া করিয়া দেনাটা শোধ দিয়া দেন, নচেৎ আমার মুক্তি হইতেছে না। তাই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। যাহা ভাল হয় করুন; আমি প্রেতিনীর উপদ্রবে আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।" দেনাটা না কি তিন শিলিং দশ পেন্স; আর এই দেনার জন্য ভুবর্লোকে সে আদৌ শান্তি পাইতেছে না; কাহার কাছে যে সেই দেনা, তাহা স্ত্রীলোকটি পুরোহিতকে বলিলেন না। না বলিলেও, তিনি অল্প একটু বেগ পাইয়াই জানিতে পারিলেন যে, "মালয়" নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের সত্য সত্যই এক মুদীর দোকানে তিন শিলিং দশ পেন্স্ দেনা ছিল। আর প্রেতিনীর নামটা যে "মালয়," তাহা সে নিজেই প্রকাশ করিয়াছিল। মুদী মালয়ের মৃত্যুসংবাদ জানিত না; তাহার দেনার কথাও মনে ছিল না। পুরোহিতের কাছে সবিশেষ শুনিয়া দোকানের হিসাব-বহি খুলিয়া দেখিল যে, বাস্তবিকই তিন শিলিং দশ পেন্স মালয়ের নামে দেনা লেখা আছে। পুরোহিত ঐ দেনাটা শোধ দিয়াছিলেন। ঋণ তখন থেকে সেই মালয় প্রেতিনীকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। ঋণশোধের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুক্তি হইয়া গেল।

দেনা যত সামান্যই হউক না কেন, উহা শোধ দিবার চেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসার কথা। কিন্তু আমাদের একটা কথা মনে হয়, যে স্ত্রীলোকটী পুরোহিতকে প্রেতিনীর সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন, তিনি এত কথা বলিলেন অথচ কাহার কাছে দেনা, তাহা বলিলেন না কেন? আর কেনই বা তিনি এক জন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পুরোহিতকে দেনা শোধ দিতে অনুরোধ করিলেন, অথচ মালয় পুরোহিতের নিকটে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিতা। আবার ইহাও মনে হয় যে, হয় তো এ সব ব্যাপারের মধ্যে কোন বিশেষ অভিসন্ধি ছিল না। লোকে খুব বেশী সময় যুক্তি-অযুক্তি দেখিয়া

চলে না, কিছু একটা করিতে হইবে, তাই করে, সেটা ঠিক হইতেছে কি না, তাহা বড় একটা ভাবে না। এটা গেল দেনা শোধ দিতে আসিবার কথা। আবার ভূতেরা কখন কখন দেনা আদায় করিতেও আইসে। ভূতের টাকার দরকার নাই। তবে দেনা আদায় করিতে আইসে কেন? দেনা আদায় করিয়া সেই টাকা আত্মীয়স্বজনকে দিয়া যায়।

লণ্ডন সহরের মরগ্যান্ নাম্নী ভদ্র মহিলা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে "প্রেত-তত্ত্ব" নামক একখানি পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ১২১-২৩ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত গল্পটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গল্পটি তিনি লর্ড আস্কিনের কাছে শুনিয়াছিলেন। ব্যাপারটি এই :—

আর্ল্ অব্ বুকানের খানসামা

আমার যৌবনকালে আমি এক সময় কিছু দিন স্কট্লণ্ডে অনুপস্থিত ছিলাম। যে দিন এডিনবার্গ সহরে ফিরিলাম, সেই দিন প্রাতে যেমন আমি এক জন পুস্তক-বিক্রেতার দোকান হইতে বাহির হইতেছি, অমনই দেখি, আমাদের বাড়ীর পুরাতন খানসামা আমার সম্মুখে হাজির। দেখিলাম, তাহার চেহারাটা খুব বদ্লাইয়া গিয়াছে; রুগ্ন, গায়ে যেন রক্ত নাই, পাতলা যেন ভূত! আমি বলিলাম—"অ্যাঁ, তুমি এখানে কেন?" সে বলিল —"আপনার সঙ্গে দেখা করিতেই আসিয়াছি। কর্ত্তার কাছে আমার কিছু পাওনা আছে, যদি তাঁহাকে বলিয়া অনুগ্রহ করিয়া আমার পাওনাটা লইয়া দেন, তবে বিশেষ উপকার হয়। আমার হিসাব না করিয়াই দেওয়ান মারা গিয়াছেন, তাই এ পর্য্যন্ত পাওনাটা পাই নাই।"

আমি তাহার দুর্দ্দশাগ্রস্ত চেহারা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। তাহাকে বলিলাম, "আমার সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া আমি পুস্তক-বিক্রেতার দোকানে প্রবেশ করিলাম। পরে পিছনে চাহিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া দেখি, সে আর নাই।

সেই লোকটার স্ত্রী সহরে সামান্য একটু ব্যবসায় করে, সে কথা আমার

মনে ছিল, এমন কি, তাহার বাড়ীটাও আমি চিনিতাম; কেন না, বাল্য-কালে তাহার বাড়ীতে প্রায়ই বেড়াইতে যাইতাম। খুঁজিতে খুঁজিতে এখন আবার তাহার বাড়ীতে গেলাম। যাইয়া দেখি, তাহার স্ত্রীর বিধবার বেশ। শুনিলাম, কয়েক মাস হইল, লোকটি না কি মরিয়া গিয়াছে। আরও শুনিলাম, মরিবার সময় সে বলিয়া গিয়াছে, আমার পিতার দেওয়ান অন্যায় করিয়া তাহার কিছু টাকা দেন নাই। আমি বাড়ী আসিলে দেও-য়ানের এই অবিচারের না কি প্রতীকার হইবে। এই সব কথা বলিয়া সে মারা গিয়াছে।

"অবিচারের প্রতীকার করিব" বলিয়া আমিও অঙ্গীকার করিলাম। তাহার অল্প দিনের মধ্যেই খানসামার স্ত্রীকে পাওনা টাকা কয়টি দিয়াছিলাম।

খানসামার এই ভূত হওয়া ব্যাপারটাতে আমাদের মনে হয় যে, সে সামান্য টাকা কয়টির জন্য খুব বেশী ব্যস্ত হয় নাই; স্ত্রীর মায়া, স্ত্রীর ভাবনাই তাহাকে বেশী কাতর করিয়াছিল। স্ত্রী অর্থাভাবে কষ্ট পাইবে, এই ভাবনা ভাবিয়াই সে কাতর হইয়াছিল। তাই তাহাকে টাকা কয়টি দিয়া সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ভূতেরা অনেক সময় আত্মীয়-স্বজনের উপকার করিতে আসে। অর্থই অনর্থের মূল। টাকাকড়িওয়ালা মানুষ মরিয়া গেলে মরণের পর সেই টাকার ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হয়। আর যদি কোন স্থানে টাকা লুকাইয়া মারা যায়, তবে তাহার দুর্গতির শেষ থাকে না, সেরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই তাহাকে ভূত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। ওয়ের নাম্নী প্রেতিনীর কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। এবার আর একটা ঐরূপ গল্প বলিতেছি:—

এক জন কৃপণ রমণী মরিয়া প্রেতিনী হইয়াছিল

"লম্ব" নামক স্থানের কাছে একটা বড় রাস্তা আছে। রাস্তাটিতে বেশী আলো না থাকায় কতকটা আঁধার থাকিত। সন্ধ্যাকালের অল্প অল্প

আঁধার যখন ধরণীর উপর ছড়াইয়া পড়ে, ঠিক সেই সময় দেখা যাইত, এক জন জীর্ণ-শীর্ণ স্ত্রীলোক, পরণে সেকেলে রকমের পোষাক, ঐ রাস্তার উপর বেড়াইতেছে। রাস্তার নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক কৃষক ঐ স্ত্রীলোকের মূর্ত্তিটা দেখিয়াছিল। কিন্তু কেহই ভয়ে তাহার সঙ্গে কথা বলে নাই। দেখা যাইত, সেই প্রেতিনীটা একখানা বাঁকা লাঠির উপর ভর দিয়া মুখ-খানি নীচু করিয়া নীরবে পথ বাহিয়া চলিয়া যাইতেছে। লাঠিখানিও অদ্ভুত রকমের। সেরূপ লাঠিও না কি কেহ কখন দেখে নাই। মাঝে মাঝে গোলাঘরের মধ্যে, কখনও বা কাহারও ঘরের ভিতর তাহাকে দেখা যাইত। কিন্তু বেশী সময়ই দেখা যাইত যে, সে বাগানে আতা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া আছে। আতা গাছটা বেশ ঝাঁকড়া ছিল। তাহার নীচে ঐ প্রেতিনীর টাকা পোতা ছিল, মাটী খুঁড়িয়া না কি শেষে লোক ঐ টাকা পায়। এই প্রেতিনী বহুকাল ধরিয়া ঐ রকম ভাবে আতা গাছের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। প্রেতিনীর দেহটা একেবারে বুড়ীর মত লোল, ঘাগ্‌রার ছাঁট-কাটও অদ্ভুত রকমের, গায়ের জামাটায় ডোরা ডোরা দাগ, লাঠিখানিও সৃষ্টিছাড়া। একটা লোক বেশ একটু লক্ষ্য করিয়া ঐ সব দেখিয়াছিল। দেখিয়া, তাহার খুব ভয় হয়; ভয় হইবামাত্র ভোঁ করিয়া দৌড় দিয়া সে পলাইল। হাঁপাইতে হাঁপা-ইতে লোকটি আসিয়া বলিল—"বাপ্‌ রে! আমি একটা আতা আনিতে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে তাহাকে দেখিনি, সে প্রেতিনীটা তখন সেখানে ছিল না। কিন্তু যাই আতা ছিঁড়িবার জন্য হাতখানি উঁচু করিয়াছি, আর অমনই প্রেতিনীটা আসিয়া একেবারে আমার সামনে হাজির।" তাহার পরে একটি লোক মদ খাইয়া মদের নেশায় একটু সাহস হওয়ায় মনে করিল, "কুচ পরোয়া নেই, আমি প্রেতিনীর কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিব, কেন, বাবা, তুমি কি জন্য এমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?" সে তাই করিল; মদ খাইয়া বেশ একটু নেশা জমকাইয়া তুলিয়া প্রেতিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে, কি জন্য আসিয়া লোককে দেখা দাও?"

প্রেতিনী একটি কথাও না বলিয়া বাগানের একটা স্থান সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল, স্থানটি একটা অনেক কেলে আতা গাছের কাছে। পরে অনুসন্ধান করায় সেইখানে অনেকটা মাটীর নীচে কতকগুলি টাকা পোতা পাওয়া গেল। যখন গর্ত্ত করিয়া টাকা তোলা হইয়াছিল, তখনও সেই প্রেতিনীর মূর্ত্তি সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিল। অনেকগুলি ভাঁড়ে টাকা পূরা ছিল। যখন শেষ ভাঁড়টা তোলা হইল, তখন প্রেতিনীর শীর্ণ মুখখানিতে একটা অস্বাভাবিক হাসি দেখা গেল, আর তখনই প্রেতিনীর মূর্ত্তিটা আস্তে আস্তে মিলাইয়া গেল। সেই অবধি আর কেহ কখন তাহাকে দেখে নাই।

জন্, এইচ্ ইন্গ্রাম "বিলাতী ভূতের বাড়ী ও ভূতের গল্প" নামক পুস্তকের ৫৭৮ পৃষ্ঠায় ঐ গল্পটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গল্পটি একটু অদ্ভুত রকমের; কেন না, প্রেতিনীটার দেনাও ছিল না, আবার টাকাগুলি কাহাকেও দিবার কথাও সে বলিল না। তবে কি জন্য শুধু শুধু প্রেতিনী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এ কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠা যায় না। তবে এইটুকু মনে হয়, তাহারই বুদ্ধির দোষে এতটা টাকা অকেজো হইয়া মাটীর নীচে থাকিল ভাবিয়া সে একটা অশান্তি বোধ করিতেছিল। তাই তাহার একটা ইচ্ছা হইয়াছিল যে, টাকাটা লোকের চোখে পড়ুক আর তাহাতে সংসারের কাজ হউক। যে ইচ্ছা সে লউক, তাহাতে প্রেতিনীর আপত্তি ছিল না।

প্রেতিনী একটা বদ্‌মায়েসকে উপযুক্ত প্রতিফল দিয়াছিল

দেনা শোধ দেওয়া হয় নাই ভাবিয়া মরণের পর অনেক ব্যক্তি ভূত হইয়া অশান্তি ভোগ করে সত্য, আর এটা তাহাদের প্রশংসারও কথা। কিন্তু অন্য কারণেও ভূতের অশান্তি ঘটে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তও মানুষ মরণের পর দৃঢ়সংকল্প হইয়া থাকে। যত দিন প্রতিশোধ না নিতে পারে, তত দিন সে ছট্‌ফট করে। মরণের পরও মানুষের রাগ

যায় না। "সূক্ষ্ম-জগতে পদসঞ্চার" গ্রন্থের ৩২৬ পৃষ্ঠায় এই রকম একটা গল্প আছে। এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারী একটি যুবতীকে ফুসলাইয়া পাপের পথে লয়; আবার কিছুদিন পরে তাহাকে পরিত্যাগ করে। ঘটনাটা "কানাডা" নামক দেশে ঘটে। ইহাতে যুবতী রাগান্ধ হইয়া উঠিল। কিছু দিন পরে যুবতী মারা গেল। কিন্তু রাগ কিছুমাত্র কমিল না। সে দশ বৎসর ধরিয়া ঐ কর্ম্মচারীকে জ্বালাতন করিতে লাগিল। সর্ব্বদা তাহার ঘরের মধ্যে আসিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দ করিত, কখন কখন জানালা-দরজায় ধাক্কা দিত। সেই শব্দ ও সেই ধাক্কা এত জোরে ও এত ঘন ঘন দিত যে, তাহাতে ভীষণ শব্দ হওয়ায় এক রাত্রিও সেই কর্ম্মচারী ঘুমাইতে পারিত না। কর্ম্মচারী বাড়ীতেই থাকুক আর বাহিরেই থাকুক, যেখানেই থাকুক না কেন, তাহার ঘরে আলো জ্বালিবার যো ছিল না। আলো জ্বালিলেই প্রেতিনীটা আসিয়া নিবাইয়া দিত। কর্ম্মচারী যদি পাখী পুষিত, প্রেতিনীটা আসিয়া ঘাড় মটকাইয়া পাখীটি মারিয়া ফেলিত। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া কর্ম্মচারী দেখিত, তাহার সাধের পাখীটি খাঁচার মধ্যে মরিয়া পড়িয়া আছে। কর্ম্মচারী শুইবার ঘরে কুকুর রাখিত। অনেক সময় কুকুর যেন কাহাকেও দেখিয়া ছুটিয়া আক্রমণ করিতে গেল, আর ফিরিল না। প্রেতিনীটা নিরন্তর এইরূপ ভাবে জ্বালাতন করায় কর্ম্মচারী বাধ্য হইয়া চাকরী ছাড়িয়া দিল। অর্দ্ধেক বেতন স্বীকার করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। কিন্তু তখনও প্রেতিনীর রাগ গেল না। তখনও ঘোর জ্বালাতন করিতে লাগিল। তখন কর্ম্মচারী আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সে অঞ্চল ত্যাগ করিয়া খুব দূরদেশে চলিয়া গেল। না যাইয়া উপায় কি?

প্রেতিনী দ্বারা এরূপ ভাবে জ্বালাতন হওয়া কর্ম্মফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রেতিনী উপলক্ষ; বস্তুতঃ কর্ম্মফলটাই প্রেতিনীর বিদ্বেষের মধ্য দিয়া ফলিয়া গেল বলিতে হইবে। আবার কর্ম্মচারীও বেশ ভালরূপ একটু শিক্ষা পাইল। সে আর কখনও ঐরূপ কাজ নিশ্চয়ই করে নাই। পরাবিদ্যার লোকেরা এ ঘটনাটিকে অন্য ভাবে দেখেন। তাঁহারা মনে

করেন, কর্ম্মচারীকে ঐরূপ ভাবে জ্বালাতন করায় প্রেতিনীর পক্ষেও অন্যায় হইল। সে জন্য তাহাকে ভাবী কালে অশেষ কষ্ট পাইতে হইবে।

হতাশ প্রেমিকের কাহিনী

ঐ পুস্তকে ৩১৮ পৃষ্ঠায় কতকটা এই ভাবের আর একটি গল্প আছে। এক জন ফরাসী অভিনেত্রীর প্রতি অনেক লোক অনুরক্ত হয়। জনৈক যুবকের উপর তাহার কৃপা-কটাক্ষ পড়ে। একটু মেশামেশির পর যুবকের কতকগুলি দোষ তাহার চোখে পড়িল। অভিনেত্রী তখন তাহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। কিছু দিন পরে মর্ম্মাহত যুবকের মৃত্যু হয়। মরিবার সময় সে বলিয়া গেল—যত কাল আমি এই অভিনেত্রীকে জানিয়াছি, তত দিন ধরিয়া মরণের পরও আমি ভূত হইয়া উহাকে জ্বালাতন করিব। অভিনেত্রী নিজে নিজের জীবনী লিখিয়া গিয়াছে। তাহা পড়িলে জানা যায়, যুবককে পরিত্যাগ করিলেও সে তাহার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে নাই। কিন্তু তাহা করিলে কি হইবে? যুবক তাহার উপর খুব চটিয়াছিল।

যুবক ত মরিল। মরিল আবার রাত্রি ঠিক ১১টার সময়। মরণের পর প্রত্যহ ঠিক এই ১১টার সময় সে ভূত হইয়া আসিয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে আরম্ভ করিত, এত চীৎকার যে, শুনিলে লোকে পাগল হইয়া উঠে। যেখানেই অভিনেত্রী থাকুক না, চীৎকার সমানভাবে হইতে লাগিল, ইহাতে অভিনেত্রী ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। কয়েক মাস ধরিয়া এইরূপ চলিল, তাহার পর উপদ্রবটা আর এক রকম হইয়া উঠিল। ঠিক ১১টার সময় খুব কাছে বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। এ উৎপাতটা যেন আরও অসহনীয়। তিন মাস ধরিয়া এ উৎপাত খুব চলিল। প্যারিস সহরের পুলিস এই উৎপাত বন্ধ করিবার নিমিত্ত খুব চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কেন শব্দ হয়, কোথা হইতে হয়, তাহা কেহ ঠিক করিতে পারিল না। তাহার পর আবার অন্য রকমের উৎপাত

দেখা দিল। এইরূপ আড়াই বৎসর ধরিয়া ভূতটা উৎপাত করিয়াছিল। অভিনেত্রীর সঙ্গেও যুবকের জীবিতকালে ঠিক আড়াই বৎসরই সম্ভাব ছিল।

উপরের দুইটি গল্পেই আমরা দেখিতে পাই যে, ভূত হইয়া এক ব্যক্তি অনেক দিন ধরিয়া উপদ্রব করিতেছে। দুই রকম ভাবে আমরা এইরূপ ব্যাপার বুঝিতে পারি। ভূতগুলি সত্যই ভূত, এইরূপ ভাবিলে বলিতে হইবে যে, ঐ ভূতের প্রাণে খুবই বিদ্বেষ ছিল। সেই বিদ্বেষ এতই ভয়ানক যে, সচরাচর মানুষের ঐরূপ ভাব দেখা যায় না বা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু জগতে এরূপ বিদ্বেষ যে একেবারেই দেখা যায় না, তাহা আমরা বলি না। কদাচিৎ দেখাও যায়। কর্ম্মচারী ও প্রেতিনীটার গল্পে ঐ বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়।

আবার অন্য রকম ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়। ঐ উপদ্রবগুলি হয় তো আদৌ ভূতকৃত নহে। ঐগুলি হয় তো কোন চিন্তামূর্ত্তি বা অস্থায়ী মূর্ত্তির কাণ্ডকারখানা। উহারা আপনা-আপনি ঐরূপ উৎপাত করিয়াছিল। অভিনেত্রীর উপর যে প্রকারের উপদ্রব হইয়াছিল, সেরূপ করা চিন্তামূর্ত্তির পক্ষে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। কোন লোক যদি একমনে একটা চিন্তা করে, তবে সেই চিন্তার দিব্য একটি মূর্ত্তি তৈয়ারী হয়। শুভ অশুভ দুই রকম চিন্তারই মূর্ত্তি হইতে পারে। চিন্তার একটি মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে হইলে ভাসা ভাসা, আল্‌গা আল্‌গা, পাতলা পাতলা চিন্তা করিলে হইবে না। খুব গাঢ়, খুব একাগ্র, খুব গভীর চিন্তা করা চাই, তদ্‌গত হইয়া তন্ময়ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়ায়। ঘড়ীর যন্ত্রের মধ্যে যেমন নড়া-চড়ার শক্তি পূরা আছে, সেই শক্তিতে ঠিক ঠিক সময়ে ঘড়ী চলে ও বাজে; আবার তাড়িৎ তৈয়ার করিবার ভাণ্ডগুলিতে যেমন অদৃশ্যভাবে বিপুল শক্তি নিহিত থাকে, সেখান হইতে তাড়িৎ নিঃসৃত হয়, ঠিক সেইরূপ ভাবে ঐ চিন্তা-মূর্ত্তিতেও একটা কার্য্য করিবার ক্ষমতা নিহিত থাকে। তাহারই বলে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময় বা বৎসরের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে,

বা কোন একটা ঘটনার সহযোগে ঐ মূর্ত্তি কাজ করিয়া থাকে। "ভুবর্লোক" নামক গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠায় ঐরূপ চিন্তা-মূর্ত্তির একটা গল্প বলা হইয়াছে। মূর্ত্তি আসিয়া মৃত্যুসংবাদ দিয়া যাইত। চিন্তা-মূর্ত্তির কি চমৎকার কাণ্ড!

তাই বলিতেছি, তীব্র ইচ্ছা, প্রণয় বা বিদ্বেষের কঠোর একাগ্র উদ্যোগ থাকিলে এইরূপ একটা মূর্ত্তি তৈয়ার হয়। মূর্ত্তি তৈয়ার হইলে তখন কাজ করিতে থাকে। যাহার ইচ্ছা-শক্তিতে মূর্ত্তি হইয়াছে, তাহার আর সে মূর্ত্তির উপর কোন হাত থাকে না। আমার চিন্তা-মূর্ত্তি তোমার অনিষ্ট করিতে লাগিল—তখন আমি যদি মনে করি, আচ্ছা, তোমার উপর যেন ও আর অত্যাচার না করে, তাহা হইলে আমার সেরূপ মনে করায় বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। তোমার উপর অত্যাচার বন্ধ করা আমার সাধ্য হইবে না। বন্দুক ছুড়িয়া ফেলিলে সেই নিক্ষিপ্ত গুলীর উপর যেমন আর কোন প্রভুত্ব থাকে না, ধনুক হইতে তীর ছুড়িয়া ফেলিলে সেই তীরের উপর যেমন আর হাত থাকে না, চিন্তা-মূর্ত্তি তৈয়ারী হইয়া গেলে, তাহার উপরও তেমনই আর হাত থাকে না। চিন্তা-মূর্ত্তি কাহারও অনিষ্ট করিতেছে, সে অবস্থায় তাহার একটা প্রতীকারের ব্যবস্থা আছে। যাহার বিদ্বেষফলে ঐ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি তৈয়ার হইয়াছিল, সেই যদি আবার খুব ভালবাসার ভাবনা ভাবিতে থাকে, তবে আস্তে আস্তে আগেকার মূর্ত্তিটির কঠোরতা কমিয়া যায়।

কিন্তু ভালবাসার ভাবনা না ভাবিয়া সে যদি তখনও বিদ্বেষের চিন্তাই করিতে থাকে, তবে আগেকার মূর্ত্তিটা আরও প্রচণ্ড, আরও ভয়ঙ্করী হইয়া উঠে। সে মূর্ত্তি আরও অনিষ্ট করিতে থাকে। চিন্তা-মূর্ত্তির এই সকল কাণ্ড হইতে পারে, আর জগতে সত্য সত্যই হইতেছে। অথচ যাহার চিন্তা-মূর্ত্তি এই সব করিতেছে, সে এ সব ব্যাপার কিছুই জানিতেছে না। কোন এক ব্যক্তি কঠোর, তীব্র, একাগ্র চিন্তা করিল। তাহার ফলে মূর্ত্তি তৈয়ার হইল, জগৎ-যন্ত্রের নিয়মে নিয়মিত হইয়া মূর্ত্তির কাজ চলিতে

লাগিল। দেখিতে গেলে যে লোকটা এইরূপ একটি কল চালাইয়া দিল অথচ এত বড় একটা কাজের বিন্দুবিসর্গও সে জানিতে পারিল না। কিন্তু এতটা না জানিলেও মানুষমাত্রেই জানে যে, বিদ্বেষের চিন্তা করা ভাল নহে। অতএব ঐরূপ চিন্তা করা অকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অসচ্চিন্তা করিয়া জগতের অহিত করে, তাহাকেও তাহার জন্য দায়ী হইতে হয়। ভগবানের কাছে সেজন্য সে নিশ্চয়ই অপরাধী।

লেড্‌বিটার সাহেব ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের "থিওসফি" নামক মাসিক পত্রিকায় নভেম্বর সংখ্যায় একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষ মরিয়া গেলেও কখন কখন ভয়ানক বিদ্বেষ থাকে; তাহার অতি ভয়ানক পরিচয় সেই গল্পটিতে পাওয়া যায়। গল্পটির নাম—'টম্‌-প্রাইচ্‌।' ব্যাপারটি এই :— একটি যুবতীর প্রেমে দুই জন মজিয়াছিল। এক জন রেলগাড়ীর "ড্রাইভার" বা চালক। এই ড্রাইভার মারা গেল, মারা গেল বটে, কিন্তু অন্য প্রেমিকের উপর বিশ্রী একটা বিদ্বেষ থাকিল। বিদ্বেষটা এত বিশ্রী, এত ভয়ানক ও মর্ম্মান্তিক যে, তাহার চিন্তা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একটা দুর্ঘটনার সৃষ্টি করিল। আর সেই দুর্ঘটনার পাকে পড়িয়া সেই অপর প্রেমিকটা নিহত হইল। মরণের পরও মানুষ এতটা অনিষ্ট করিয়া বসিতে পারে। এরূপ ভয়ানক বিদ্বেষ খুব বেশী দেখা যায় না। কিন্তু এমন ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে যে, নিহত ব্যক্তি ভূত হইয়া হত্যাকারীদের পিছনে পিছনে ফিরিয়া অবশেষে তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছে।

আত্মীয়-স্বজন মরিয়া গেলে তাহাদের জন্য কান্নাকাটি করা খুব অন্যায়। তাহাদের মৃত আত্মীয়েরা প্রাণে ব্যথা পায়। এ সব কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কাঁদাকাটা করিলে মরা আত্মীয়েরা দুঃখিত হইয়া থাকে; দেখা দিয়া কাঁদাকাটা করিতে নিষেধ পর্য্যন্ত করিয়া যায়, এইরূপ ব্যাপারও আমরা কয়েকটা জানিয়াছি। নিম্নে আমরা এই রকম একটি অদ্ভুত গল্প বলিতেছি। অদ্ভুত—কেন না, মরা মানুষটা একটা অদ্ভুত রকমের উপায়ে নিজের প্রাণের ব্যথা জানাইয়া গিয়াছিল। গল্পটি এই :—

বা কোন একটা ঘটনার সহযোগে ঐ মূর্ত্তি কাজ করিয়া থাকে। "ভুবর্লোক" নামক গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠায় ঐরূপ চিন্তা-মূর্ত্তির একটা গল্প বলা হইয়াছে। মূর্ত্তি আসিয়া মৃত্যুসংবাদ দিয়া যাইত। চিন্তা-মূর্ত্তির কি চমৎকার কাণ্ড!

তাই বলিতেছি, তীব্র ইচ্ছা, প্রণয় বা বিদ্বেষের কঠোর একাগ্র উদ্যোগ থাকিলে এইরূপ একটা মূর্ত্তি তৈয়ার হয়। মূর্ত্তি তৈয়ার হইলে তখন কাজ করিতে থাকে। যাহার ইচ্ছা-শক্তিতে মূর্ত্তি হইয়াছে, তাহার আর সে মূর্ত্তির উপর কোন হাত থাকে না। আমার চিন্তা-মূর্ত্তি তোমার অনিষ্ট করিতে লাগিল—তখন আমি যদি মনে করি, আচ্ছা, তোমার উপর যেন ও আর অত্যাচার না করে, তাহা হইলে আমার সেরূপ মনে করায় বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। তোমার উপর অত্যাচার বন্ধ করা আমার সাধ্য হইবে না। বন্দুক ছুড়িয়া ফেলিলে সেই নিক্ষিপ্ত গুলীর উপর যেমন আর কোন প্রভুত্ব থাকে না, ধনুক হইতে তীর ছুড়িয়া ফেলিলে সেই তীরের উপর যেমন আর হাত থাকে না, চিন্তা-মূর্ত্তি তৈয়ারী হইয়া গেলে, তাহার উপরও তেমনই আর হাত থাকে না। চিন্তা-মূর্ত্তি কাহারও অনিষ্ট করিতেছে, সে অবস্থায় তাহার একটা প্রতীকারের ব্যবস্থা আছে। যাহার বিদ্বেষফলে ঐ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি তৈয়ার হইয়াছিল, সেই যদি আবার খুব ভালবাসার ভাবনা ভাবিতে থাকে, তবে আস্তে আস্তে আগেকার মূর্ত্তিটির কঠোরতা কমিয়া যায়।

কিন্তু ভালবাসার ভাবনা না ভাবিয়া সে যদি তখনও বিদ্বেষের চিন্তাই করিতে থাকে, তবে আগেকার মূর্ত্তিটা আরও প্রচণ্ড, আরও ভয়ঙ্করী হইয়া উঠে। সে মূর্ত্তি আরও অনিষ্ট করিতে থাকে। চিন্তা-মূর্ত্তির এই সকল কাণ্ড হইতে পারে, আর জগতে সত্য সত্যই হইতেছে। অথচ যাহার চিন্তা-মূর্ত্তি এই সব করিতেছে, সে এ সব ব্যাপার কিছুই জানিতেছে না। কোন এক ব্যক্তি কঠোর, তীব্র, একাগ্র চিন্তা করিল। তাহার ফলে মূর্ত্তি তৈয়ার হইল, জগৎ-যন্ত্রের নিয়মে নিয়মিত হইয়া মূর্ত্তির কাজ চলিতে

লাগিল। দেখিতে গেলে যে লোকটা এইরূপ একটি কল চালাইয়া দিল অথচ এত বড় একটা কাজের বিন্দুবিসর্গও সে জানিতে পারিল না। কিন্তু এতটা না জানিলেও মানুষমাত্রেই জানে যে, বিদ্বেষের চিন্তা করা ভাল নহে। অতএব ঐরূপ চিন্তা করা অকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অসচ্চিন্তা করিয়া জগতের অহিত করে, তাহাকেও তাহার জন্য দায়ী হইতে হয়। ভগবানের কাছে সেজন্য সে নিশ্চয়ই অপরাধী।

লেড্‌বিটার সাহেব ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের "থিওসফি" নামক মাসিক পত্রিকায় নভেম্বর সংখ্যায় একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষ মরিয়া গেলেও কখন কখন ভয়ানক বিদ্বেষ থাকে; তাহার অতি ভয়ানক পরিচয় সেই গল্পটিতে পাওয়া যায়। গল্পটির নাম—'টম্‌-প্রাইচ্‌।' ব্যাপারটি এই :— একটি যুবতীর প্রেমে দুই জন মজিয়াছিল। এক জন রেলগাড়ীর "ড্রাইভার" বা চালক। এই ড্রাইভার মারা গেল, মারা গেল বটে, কিন্তু অন্য প্রেমিকের উপর বিশ্রী একটা বিদ্বেষ থাকিল। বিদ্বেষটা এত বিশ্রী, এত ভয়ানক ও মর্ম্মান্তিক যে, তাহার চিন্তা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একটা দুর্ঘটনার সৃষ্টি করিল। আর সেই দুর্ঘটনার পাকে পড়িয়া সেই অপর প্রেমিকটা নিহত হইল। মরণের পরও মানুষ এতটা অনিষ্ট করিয়া বসিতে পারে। এরূপ ভয়ানক বিদ্বেষ খুব বেশী দেখা যায় না। কিন্তু এমন ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে যে, নিহত ব্যক্তি ভূত হইয়া হত্যাকারীদের পিছনে পিছনে ফিরিয়া অবশেষে তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছে।

আত্মীয়-স্বজন মরিয়া গেলে তাহাদের জন্য কান্নাকাটি করা খুব অন্যায়। তাহাদের মৃত আত্মীয়েরা প্রাণে ব্যথা পায়। এ সব কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কাঁদাকাটা করিলে মরা আত্মীয়েরা দুঃখিত হইয়া থাকে; দেখা দিয়া কাঁদাকাটা করিতে নিষেধ পর্য্যন্ত করিয়া যায়, এইরূপ ব্যাপারও আমরা কয়েকটা জানিয়াছি। নিম্নে আমরা এই রকম একটি অদ্ভুত গল্প বলিতেছি। অদ্ভুত—কেন না, মরা মানুষটা একটা অদ্ভুত রকমের উপায়ে নিজের প্রাণের ব্যথা জানাইয়া গিয়াছিল। গল্পটি এই :—

মরা আত্মীয়ের জন্য শোক করিও না

এক সময়ে "করে" নামক স্থানে একটা ছোট মেয়ে ছিল। তাহার মা মরিয়া গেল। সে শোকে অধীরা হইয়া পড়িল। বিশ্রী কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। দিন-রাত্রি কান্না, কেহই প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা দিতে পারিল না। এক দিন সে উপাসনা-গৃহে জানু পাতিয়া দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত মা'র জন্য প্রার্থনা করিতেছিল। দেখিল, তাহার সাম্‌নে দিয়া অনেকগুলি মরা মানুষ সারি বাঁধিয়া যাইতেছে। দেখিল, লোকগুলি নীরবে চলিয়াছে, পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত হইতেছে না। আকাশের উপর দিয়া যেমন মেঘগুলি নীরবে চলিয়া যায়, ইহাদের যাওয়াটাও ঠিক যেন সেইরূপ।

"সে দেখিল, ঐ সারির শেষের লোকটা খুব যেন কষ্টে যাইতেছে, তাহার পিঠের উপর একটা মস্ত ভারি জলপাত্র, পাত্রটা জলে টাপ্-টুপ্ করিতেছে, তাহার ভারে মানুষটা নীচু হইয়া পড়িয়া অতি কষ্টে চলিয়াছে। আর সেই জল কালো, দেখিতে বিশ্রী। বালিকা দেখিল—সে তাহার মায়ের মূর্ত্তি। মাকে দেখিয়াই সে চিনিল। মা'র কষ্ট দেখিয়া তাহার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল।

পরলোকে মা'র কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া বালিকা ঘরে আসিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। মা'র পিঠে ঐরূপ বিশ্রী জলের ভার কেন, সে তাই ভাবিতে লাগিল। প্রভাত হইবামাত্র সে বৃদ্ধ পুরোহিতের কাছে যাইয়া এই সব ব্যাপার বলিল।

পুরোহিত এই সব শুনিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আজও আবার উপাসনা-গৃহে যাইও, তাহা হইলে আরও অনেক তথ্য জানিতে পারিবে।"

বালিকা দেখিল—আবার ঠিক দুই প্রহর রাত্রিতে সেই লোকগুলি সেইরূপ নীরব সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। বালিকা জানু পাতিয়া বসিয়া দেখিতেছিল। দেখিল, তাহার মা সারির একেবারে শেষে আসিতেছে। দেখিল, মা'র কষ্ট আজ আরও বাড়িয়াছে, আজ পিঠে দুইটা জলপাত্র,

তাহার ভারে মা একেবারেই চলিতে পারিতেছে না, মাথাটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ভয়ানক ভারে মা'র পা দুটা যেন ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, যাতনায় মুখখানি কালী হইয়া গিয়াছে।

ইহা দেখিয়া বালিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, তোমার এত কষ্ট কেন ? তোমার দশা এমন হইল কেন ?"

বালিকা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র মা বেগে তাহার কাছে আসিয়া বলিল—"আমার দশা এমন হইল কেন, তাই আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ ? বাছা ! আমার জন্য আর কাঁদিও না। তোমার কান্না বন্ধ হইলে আমি বাঁচিতাম। এই যে আমার পিঠের উপর দুটো জলের ভার দেখিতেছ, এ তোমার চোখের জল। তোমার কাঁদা-কাটা বন্ধ না হইলে চিরকালই এই বোঝা আমাকে টানিয়া মরিতে হইবে। মনে রাখিও—মরা মানুষের জন্য কাঁদা-কাটা করা ভাল নহে। আত্মার দুঃখ নাই—আত্মা সকল সময়েই সুখী ; কেবল আত্মীয়-স্বজনের হা-হুতাশে তাহার সুখ নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ছাড়া স্বর্গে যাইবারও ব্যাঘাত ঘটে, বিলম্ব ঘটে। আত্মীয়েরা চোখের জল ফেলিলে সেগুলি যেন মরা মানুষের গায়ে আগুনের বৃষ্টির মত বোধ হয়, তাহাতে মরা মানুষটার খুব যাতনা হয়।"

আবার পরদিন বালিকা পুরোহিতকে যাইয়া ঐ সকল বলিল। তিনি শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এইরূপ দেখার পর কি তুমি আর কাঁদিয়াছ ?"

বালিকা বলিল—"না, না ; আর কাঁদি নাই ; আর কখনই কাঁদিব না।" পুরোহিত তখন বলিলেন—"আচ্ছা, আজ আবার উপাসনা-গৃহে যাইয়া দেখ। বোধ হয়, আজ তোমার মায়ের অবস্থা দেখিয়া সুখী হইবে।"

বালিকা বাস্তবিকই সে দিন রাত্রিতে মায়ের অবস্থা ভাল দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। আজ দেখিল—মা লোকগুলির আগে আগে আসিতেছে, তাহার মুখ আজ স্বর্গীয় আনন্দে প্রফুল্ল, উদ্ভাসিত।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কুইমপার নামক স্থানের ষ্টন্-নাম্নী রমণী এই গল্পটি

প্রচার করেন। এ, ই, হোয়াইট্‌হেড লিখিত "মৃত ব্যক্তির সহিত ব্য-হার" নামক পুস্তকের ১৫৮ পৃষ্ঠায় এই বিবরণটি বিবৃত হইয়াছে।

এই গল্পটিতে মায়ের পিঠের উপরে জলের ভার ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত দৃশ্য। বিলাতের সেকেলে লোকগুলির এইরূপ বিশ্বাস ছিল। গল্পটিতে সেই সেকেলে লোকের বিশ্বাসের মত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। মরা মানুষ রোজ রোজ রাত্রিকালে উপাসনা-গৃহে আসিতেছে কেন, ইহা ভাবিয়া সেই বালিকা বা সেই বৃদ্ধ পুরোহিত কেহই অবাক্ হইল না। আর মরা মানুষগুলাকে বালিকা চর্ম্মচক্ষুতেই দেখিতে পাইল, সেটাও খুব অদ্ভুত কথা। সার কথা, এই মানুষ মরণের পর কিছুদিন আমাদের খুব কাছেই থাকে, আর আমাদের শোকপ্রকাশে তাহারা খুব কাতর হয়। হোয়াইট্‌হেড্ গল্পটি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"আমাদের শোকপ্রকাশে মৃত আত্মীয়েরা ব্যথিত হয়, বিলাতের লোকগুলি বরাবরই এ কথা বিশ্বাস করে। বিস্তর গল্পে ঐ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।" (উক্ত পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠা)। সে কালের সরলহৃদয় লোকগুলি কত প্রকৃত তথ্য, কত মহীয়ান্ সত্য জ্ঞাত ছিলেন। পরবর্ত্তী লোকেরা আপনাদিগকে খুব বেশী জ্ঞানী বলিয়া অহঙ্কারে মত্ত আছেন, অথচ কোন খবরই রাখেন না।

একবিংশ অধ্যায়

পূর্ব্ব-অধ্যায়ে আমরা ভূতের প্রতিশোধ লইবার কথা বলিয়াছি। টাকার মায়াতে মানুষ মরণের পর ভূত হইয়া টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে কথাও বলিয়াছি।

জীবিতকালে কোন অপরাধ করিলে বা কোন কর্ত্তব্য বিষয়ে ত্রুটি হইলে, মরণের পর ভূত হইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত বা সংশোধন করিতে হয়। বিস্তর ভূতকে এরূপ করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু যে সকল অন্যায় বা ত্রুটি বা দুর্ঘটনার কোন রকমেই প্রতিকার হইবার উপায় নাই, তাহার জন্যও মরণের পর একটা ভয়ানক অনুতাপ আসিয়া দাঁড়ায়। সেই অনুতাপ ও আত্ম-গ্লানির ফলেও মানুষকে ভূত হইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

এক জন পুরোহিত ভূত হইয়াছিল

ঐ রকম ভয়ানক পাপ করিয়া একটা মানুষকে ভূত হইতে হইয়াছিল। গল্পটি স্যার ন্যাথেনাল র‍্যাক্স্ হল প্রণীত "আমার সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনা" নামক পুস্তকের ২১৮-২২৬ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত আছে, তথায় উহার বিশদ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। আমাদের স্থান অল্প, তাই সংক্ষেপে বলিব। এক জন পুরোহিত একটি নূতন স্থানে নিযুক্ত হইয়া গেলেন। বিলাতে পুরোহিতদের পৃথক্ বাড়ী থাকে; সেখানে কেরাণী, চাকর, শোবার ঘর প্রভৃতি সবই থাকে। ইনি যাইবার পূর্ব্বে যে পুরোহিত সেখানে ছিলেন, তিনি মরিয়া ভূত হন। আমাদের এই নূতন পুরোহিত যাইয়া দেখিলেন, একটি ছায়া-মূর্ত্তি শুইবার ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইনি এইরূপ লিখিয়াছেন—"আমি দেখিলাম, দিনে দুপুরে একটা মূর্ত্তি হাজির; তাহার গায়ে একটা ঢিলে পোষাক; লোকটা একটু

টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া একখানি প্রকাণ্ড পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছে, দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট ছেলে। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মাঝে মাঝে সেই ছেলে দুটির দিকে চাহিতেছে। সে দৃষ্টি বেশ স্নেহপূর্ণ। কিন্তু ছেলের দিকে চাহিয়াই লোকটি ফোঁস করিয়া যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, ইহাও বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে বইখানা বন্ধ করিয়া দুই হাতে ছেলে দুইটির হাত ধরিয়া লোকটি আস্তে আস্তে ঘর হইতে চলিয়া গেল। আমি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে উহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, উহারা ঐ ঘরের একটা কোণে একটা প্রকাণ্ড ষ্টোভের পিছনে চলিয়া গেল। যিনি আমার আগে সেখানে পুরোহিতের কাজ করিতেন, তাঁহার একটা চিত্র ছিল। চিত্রখানি দেখিয়া বুঝিলাম যে, ছায়া-মূর্ত্তিটা অবিকল তাঁহারই। অনুসন্ধানে জানিলাম, লোকে তাঁহাকে খুব ভালবাসিলেও তাঁহার একটা বিশ্রী চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছিল। এক জন যুবতীর প্রেমে তিনি পড়িয়াছিলেন, তাহারই ফলে দুইটি সন্তান জন্মে। ছেলে দুইটি ৪।৫ বৎসরের হইল, এমন সময় তাহারা যে কোথায় গেল, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। হঠাৎ ছেলে দুইটি যে গুম্ হইয়া গেল। সেই শোকে তাহাদের পিতা অর্থাৎ সেই পুরোহিত না কি ভগ্নহৃদয় হইয়া মারা পড়িলেন। এ কথা আমার বেশ বিশ্বাস হইল, কেন না, আমিও দেখিলাম, পুরোহিতের মূর্ত্তির কাছে দুইটি ছোট ছোট ছেলে বেড়াইতেছে। কিছুদিন ঐ ভূতের মূর্ত্তি আর আসিল না। আমি ক্রমে ক্রমে উহাদের কথা ভুলিয়া গেলাম। শীতকাল আসিল। ষ্টোভ জ্বালিবার প্রয়োজন হইল। ষ্টোভে আগুন দেওয়া হইলে বিশ্রী দুর্গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। আর আগুনও ভাল জ্বলিল না, ধূঁয়া হইতে লাগিল। তখন ষ্টোভ-মেরামতের নিমিত্ত মিস্ত্রীকে ডাকাইলাম। মিস্ত্রী ষ্টোভ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, উহার মধ্যে দুইটি মরা মানুষের কঙ্কাল রহিয়াছে। কঙ্কাল দুইটি অল্পবয়স্ক মানুষের; ৪।৫ বৎসর বয়সের শিশুর কঙ্কাল। কি কি আশ্চর্য্য! সেই কঙ্কালের কাছে একটা ভূতও বাহির হইল

পুরোহিত মরিয়া ভূত হইয়াছেন, এই কথা পূর্ব্ব হইতেই রটিয়াছিল, তাহার পর এই কঙ্কাল বাহির হইল, তাহা ছাড়া সাক্ষাৎ ভূতও দেখা গেল। তবে ভূতের কথা খাঁটী সত্য! এই ভাবিয়া সেখানকার কেরাণী সেই মুহূর্ত্তেই চাকরী ছাড়িয়া দিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পুরোহিত জীবিতকালে খুব শান্তপ্রকৃতি ছিলেন, তবে তাঁহার প্রেতমূর্ত্তিকে কেন যে কেরাণী এত ভয় করিয়া বসিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝা গেল না।"

এক জন পদস্থ ব্যক্তি ভূত হইয়া অস্থির হইয়া বেড়াইত

ডাক্তার লী "ছায়ারাজ্য" নামক গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠায় একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিজে ঐ ঘটনার বিষয় অবগত হয়েন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ এই—"১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আমি পল্লীগ্রামের একটি পুরোহিত-বাড়ীতে ছিলাম। দুই প্রহর রাত্রিতে এক দিন আমার ঘরে ভূতের উপদ্রব হইতে লাগিল—হঠাৎ আমার সাম্‌নে একটা মানুষের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। মূর্ত্তিটি খুব স্পষ্ট নহে, ছায়া-ছায়াভাব; আমার বিছানার চারিদিকে কেমন একরকম হুটাপুটি করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। মূর্ত্তিটির গায়ের রঙ ধূসর; খুব লম্বা একটা পোষাক পরা, বিছানার এক প্রান্ত হইতে অতি বেগে ছুটিয়া আর এক প্রান্তে আসিয়া হাজির! খানিকটা সময় আমি উহার দিকে একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। বিস্ফারিত চোখেই চাহিয়া রহিলাম। ভূতটি এক রকম ভাবেই ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমি উহার মাথা, কাঁধ ও হাত দুখানা বেশ স্পষ্টই দেখিলাম; কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। তখন একটা দেশালায়ের বাক্‌স লইয়া আলো জ্বালিলাম। ঘরের বাতীটা জ্বালিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তখনও ভূতটি সেই রকম ভাবেই হুটাপুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। আমি বেশ ভাল করিয়া উহার রকম-সকম দেখিতেছিলাম। উহার গতিরও পরিবর্ত্তন নাই, গায়ের বর্ণটাও বদলাইল না। দুই তিন মিনিট এইরূপ কাণ্ড করিয়া মিলাইয়া গেল।"

কিছু দিন পরে এই ভূতের বিবরণটি জানা গেল যে, ৩০ বৎসর আগে এক জন পদস্থ ভদ্রলোক ঠিক ঐ ঘরেই একটি লোককে হত্যা করিয়াছিল। সেই পর্য্যন্ত ভদ্রলোক ভূত হইয়া ঐ ঘরে আসা-যাওয়া করিতেছে। ঐ ঘরে আরও অনেকে ঐ ভূতটাকে ইহার পূর্ব্বে দেখিয়াছে। তাহারাও দেখিয়াছে যে, ঠিক ঐ রকম করিয়া বিছানার চারিদিকে ভূতটা ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়ায়।

হত্যা করিবার পর, ভূতটা একটা ঘোর অনুতাপ—একটা সার্ব্বক্ষণিক দুঃখ অনুভব করিতেছিল। তাই এত চঞ্চলভাবে ছুটাছুটি। ঐ ছুটাছুটি দেখিয়াই তাহার মনের অবস্থা বেশ বুঝা যায়। ৩০ বৎসর হইয়া গিয়াছে, তবুও মনের যাতনা, অনুতাপের বেগ যায় নাই।

এরূপ সত্য সত্য ভূত অনেক বাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি সত্যই ভূত। আবার অনেকগুলি ভূতের মত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভূত নহে। মরণের পর মানুষ হয় তো তীব্র চিন্তা করিয়া বসিল, সেই চিন্তা স্থূল মূর্ত্তি ধরিয়া মানুষের চর্ম্মচক্ষুর সম্মুখে আসিয়া নানারূপ কাণ্ডকারখানা দেখাইতে থাকে। সেগুলিকে চিন্তা-মূর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। কোন্‌গুলি আসল ভূত, আর কোন্‌গুলিই বা চিন্তা-মূর্ত্তি, তাহা বুঝিয়া উঠা বেশ একটা শক্ত ব্যাপার। আমরা এমনই একটা গল্প বলিব, তাহাকে ভূত বলাও চলে, আবার চিন্তা-মূর্ত্তি বলিলেও বলা যায়। গল্পটি হারল্যাণ্ডের "ল্যাঙ্কাশায়ার কিংবদন্তী" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ব্যাপারটা এইরূপ :—

"প্রতি বৎসর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক জন অশ্বারোহী 'উইকলার হল' নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত। ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট-বংশের রাজারা যে সময় রাজত্ব করিতেন, তখনকার প্রচলিত পোষাক এই ভূতটার গায়ে দেখা যাইত। তাহার ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জামও কেমন একরকম বিশ্রী গড়নের। লোক শুনিতে পাইত, ঐ ব্যক্তি খুব বেগে ঘোড়া দৌড়াইয়া শব্দ করিয়া একটা ছোট রকম সাঁকোর উপর দিয়া আসিয়া ঐ হল নামক

স্থানে হাজির হইত। তাহার পর ঘোড়া হইতে নামিয়া একটা ওক্-কাঠের বড় সিঁড়ি বাহিয়া ঐ বাড়ীর একটি উপরের ঘরে যেন প্রবেশ করিল। তাহার পরই যেন সেই ঘরটা হইতে একটি স্ত্রীলোকের ভীষণ চীৎকার শুনা গেল। আবার মুহূর্ত্তমধ্যেই ঐ চীৎকার কমিতে কমিতে শেষে যেন ফোঁপাইয়া কান্নার মত মৃদু হইয়া পড়িল। তাহার পরই অশ্বারোহী নীচে দরজার কাছে আসিয়া ঘোড়ায় চড়িল। চড়িয়াই খুব বেগে ঘোড়া ছাড়িয়া দিল। লোকে বলে, ঐ স্থানে এইরূপ ব্যাপার প্রতি বৎসরই না কি ঘটিয়া থাকে।

ঐ অঞ্চলে প্রকাশ, ঐ অশ্বারোহী ঠিক ঐ ঘরে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিল। পরে অশ্বারোহী মরিয়া এই পাপের জন্য ভূত হইয়া প্রতি বৎসর একবার করিয়া এখানে আসিতেছে। এইরূপে না কি তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।”

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ঐ রকম ভূত হইয়া প্রতি বৎসর আসা অসম্ভব নহে ; পরন্তু খুবই সম্ভব। কিন্তু ইহার অপেক্ষা আমাদের আর একটা কথা বেশী সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। আমাদের মনে আইসে যে, হত্যা করিবার সময় ঐ অশ্বারোহী ও তাহার স্ত্রী দুই জনের মনেই একটা ভয়ানক আবেগ-উদ্বেগ দেখা দিয়াছিল। সেই আবেগ-উদ্বেগটাই সূক্ষ্ম-জগতের মূর্ত্তি ধরিয়া বিচরণ করিতেছে। সেই মূর্ত্তিই বৎসরে বৎসরে মানুষের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়। মানুষরা অশ্বারোহীকে দেখে, ঘোড়ার দড়বড়ি শোনে, আর স্ত্রীর মরণকালের কান্নার স্বরটাও যেন শুনিয়া ফেলে। এইরূপে কাণ্ডটা ঘটে। আবেগ-উদ্বেগের যে এইরূপ স্থূলমূর্ত্তি হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিব। আরও এই রকম গল্প আমরা কয়েকটা বলিব। কিন্তু যে গল্পটি বলিলাম, তাহাতে এটা ভূত কি চিন্তা-মূর্ত্তি, তাহা বুঝা যায় না।

জীবিতকালে পাপ করিলে মরণের পর অনুতাপ হয়। সেই অনুতাপ-ফলে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত ঘটে। সকলেই যে বৎসরে একবার করিয়া দেখা

দেয়, তাহা নহে। অনেক সময় পাপের স্থানটিতে ভূত ২৪ ঘণ্টাই হাজির থাকে। শুধু হাজির নহে, নানা প্রকার উপদ্রব করে। এইরূপ ক্ষেত্রেই লোকে বলিয়া থাকে, অমুক বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আছে। কিন্তু আবার ভূত না থাকিলেও অনেক কারণে ভূতের উপদ্রবের মত কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়া থাকে। এই উপদ্রবও নানা রকমের আছে। কোন কোন স্থানে অকারণে চীৎকার, গোলমাল, ধূপধাপ শব্দ শুনা যায়; কোন স্থানে দেখা যায়, জিনিসপত্র চলিয়া যাইতেছে, অথচ কে যে লইয়া যাইতেছে, তাহা দেখা যায় না, মনে হয়, জিনিসপত্রগুলা আপনা-আপনিই চলা-ফেরা করিতেছে; কোন স্থলে স্থূলশরীর ধরিয়া দেখা দেয়, ২৪ ঘণ্টা ভয়ানক চীৎকার, ভয়ানক উৎপাত, ভয়ানক উপদ্রব করে। সে এমন ভয়ানক বজ্জাতি যে, সেখানে কাহারও তিষ্ঠিবার যো থাকে না।

মানুষ মরিয়া গেলেও অনেক সময় পার্থিব জিনিসের মায়া ছাড়িতে পারে না। তাহার জিনিস অন্যে লইবে, এটা সে সহ করিতে পারে না। তাই ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ বজ্জাতি করিয়া নিজের বাড়ী বা নিজের কোন জিনিস কখন কখন রক্ষা করে। আবার কখন কখন কাহারও উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যও ঐরূপ কাণ্ড করিয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন এমনও দেখা যায় যে, প্রতিশোধও নিচ্ছে না, নিজের জিনিসও রক্ষা করিতেছে না, অথচ বজ্জাতি। এইরূপ ক্ষেত্রে বজ্জাতির কারণ বুঝা যায় না। মরণের পর মানুষের মনটা চঞ্চল থাকে, কিছুই তাহাদের ভাল লাগে না, আপনাদিগকে তাহারা বড়ই কষ্টে আছি বলিয়া মনে করে। মনের এই অশান্তি—এই দুঃখের ভাব সবগুলি একত্র হইয়া একটা শক্তিতে পরিণত হয়। সেই শক্তিই অনেক সময় পৃথিবীতে নানারূপ উৎপাত উপদ্রব ঘটাইতে থাকে। অথচ মৃত ব্যক্তি হয় তো তাহা জানিতেও পারে না বা ঐ রকম উপদ্রব করা হয় তো তাহার আদৌ ইচ্ছা নহে। কখন কখন দেখা যায়, ভূতেরা কিছু চায়। তাই না কি তাহারা মানুষের মনোযোগটা আকর্ষণ করিবার মানসে উপদ্রব আরম্ভ করে। কিন্তু

উপদ্রব করিয়া প্রাণের ব্যথা জানাইতে আসা কার্য্যটি বড়ই নিন্দনীয়। তাহারা ভুবর্লোক হইতে অতি সহজে অতি ভদ্র উপায়ে প্রাণের ব্যথা জানাইবার সুযোগ পাইতে পারে। তবে উপদ্রবের পথে যায় কেন? তাহার কারণ আছে। মরিতে মরিতেই ভুবর্লোকের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারে না, ঐ স্থানের সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। তাই উৎপাত-উপদ্রব করিয়াই মানুষের চৈতন্য ফুটাইতে চায়। আবার এমন দেখা যায়, ভূতটা কিছু দিন উৎপাত-উপদ্রব করিয়া স্বর্লোকে চলিয়া গিয়াছে অথচ তাহার একটা চিন্তা-মূর্ত্তি বহুদিন যাবৎ পৃথিবীতে অল্প-বিস্তর উৎপাত করে। সেই স্বর্গবাসী ভূতটা হয় তো এই চিন্তা-মূর্ত্তির কোন কথাই জানে না। আমরা কয়েকটি গল্প বলিব, তাহাতে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভূত ও চিন্তা-মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মেজর মুর এক জন বিখ্যাত গ্রন্থকার। তিনি "হিন্দুর বহু দেবতার একেশ্বরবাদ" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহারই লেখা একটা ভূতের বিবরণ পাওয়া যায়। হ্যামপশায়রের অন্তর্গত ক্রণ্ডল্ জেলায় ঈশট নামক বাড়ীতে বিলিংবেল নামক একটা বিশ্রী ভূতের উপদ্রব হয়। ঐ উপদ্রবের কথা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখা হইতে আমরা নিম্নের গল্পটি বর্ণনা করিব। গল্পটি এই :—

ঈশট বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব

"দুই প্রহর রাত্রি; বাড়ীর সমস্ত লোকগুলি ঘুমুচ্ছে। এই অবস্থায় কেহ যে উঠিয়া ভয় দেখাইতে আসিবে, এটা কল্পনাও করা যায় না। ঠিক এই সময় ঐ বাড়ীটাতে শব্দ শুনা যাইত। শব্দ খুব স্পষ্ট স্পষ্ট; শব্দ একটা নয়, পর পর অনেকগুলি হইত। মনে হইত, কে যেন খুব একটা ভারী জিনিস দিয়া কোন একটা ফাঁকা দেওয়াল বা মেঝের উপরে আঘাত করিতেছে। রাত্রি ১২টা হইতে ২টার মধ্যেই এইরূপ শব্দ হইত। এমন বিশ্রী শব্দ যে, লোকে ঘুমাইয়া থাকিলেও উহাতে জাগিয়া উঠিত। আবার

কখন কখন এত আস্তে আস্তে হইত যে, ভাল করিয়া কানেই আসিত না; কখন কখন খুব দ্রুতভাবে হইত, আবার কখন বা অনেকক্ষণ পর পর শুনা যাইত, কিন্তু শব্দ যেরূপ ভাবেই হউক না কেন, সেটা যে একটা ভূতের কাণ্ড, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিত। এক দিন যে শব্দ করার ভঙ্গীটা শুনিয়াছে, পরদিন তাহাকে বুঝিবার জন্য বেগ পাইতে হইত না। শব্দ করার মধ্যে এমনই একটু রকমারী ছিল যে, উহাকে ভূতের কাণ্ড ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইত না। কিন্তু শব্দটা যে কোন্ স্থান হইতে আইসে, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিত না। আর ওটা যে ঘরের ভিতরেই হয়, এমন কথা নিশ্চিন্তভাবে বলা যাইত না।

"কোথা হইতে শব্দটা আইসে, জানিবার জন্য মাঝে মাঝে লোকে খুব চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হয় নি। প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ আমরাও ঐ শব্দ শুনিতেছি। এ পর্য্যন্ত আমরাও উহার তথ্য জানিতে পারি নি। অনেক দিন ধরিয়া শব্দটা হইতেছে। এত অনেক দিন যে, ঐ বাড়ীর কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আর লোকজন যখন ঘুমায়, সেই দুই প্রহর রাত্রিতে এই কাণ্ড হইয়া থাকে আর তথ্য জানিবার জন্য রীতিমত চেষ্টাও হইয়াছে, অথচ জানা যায় নাই। এই সমস্ত ব্যাপার একসঙ্গে করিয়া ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় যে, আমোদ করিয়া ভয় দেখাইবার জন্য কোন লোকের এরূপ করা সম্ভব হইতে পারে না। তাই বাড়ীর লোকগুলি স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, মানুষের বুদ্ধিতে এ ব্যাপারের মীমাংসা হইতে পারে না।"

স্ট্যামফোর্ড নামক স্থানে ভূতের উপদ্রব

"স্ট্যামফোর্ড ভূতের কাহিনী" নামক পুস্তিকায় রেভারেণ্ড ক্যানেং গি কোল্টন্ একটি ভূতের ব্যাপার লিখিয়াছেন। এই ভূতটা আগেকার ভূতটির মত ভদ্রলোক নহে, এটা ভয়ানক দুশ্চরিত্র। এ ভূতটাও বিশ্রী চীৎকার করিত। শুধু তাহাই নহে। এ অনেককে মারিয়া বসিত। কে মারিতেছে, তাহা দেখা যাইত না, অথচ এক জনের গায়ে দুম্-দাম্

করিয়া কিল, ঘুসি, চপেটাঘাত পড়িতে লাগিল। এ প্রহার বড় সহজ নহে, অনেকের হাত-পা ভাঙ্গিয়া যাইত; গা ফুলিয়া উঠিত। ডিভল্ জেলার অন্তর্গত টিভার্টন সহরের কাছে স্যাম্‌ফোর্ড পিতারিল্ নামক পল্লীর একটা বাড়ীতে ভূতের এই উপদ্রব ঘটিত।

২৪ ঘণ্টা ভূতের উপদ্রব হইতেছে, এমনও দেখা যায়

"প্রকৃত ভূতের গল্প" নামক পুস্তকের ২৬—৮৯ পৃষ্ঠায় দুইটি বিখ্যাত ভূতের গল্প আছে। একটি নর্দ্দাম্বারল্যাণ্ডের উইলিংটন মিল্ নামক স্থানের ভূত, অপরটি ব্রোক্ হাউজ নামক স্থানের। দুইটি গল্পেই একটু বেশ মিল আছে। একটি প্রায় অপরটির মতই। শব্দ হইত, অথবা উহা কোথা হইতে আসিত, তাহা জানিবার যো ছিল না; ঘরের জিনিস-পত্রগুলি চলা-ফেরা করিয়া বেড়াইত, অথচ কোন লোককে দেখা যাইত না; লোকের পিঠে ধূপ্‌ধাপ করিয়া কিল-চড় পড়িত, অথচ কে মারিত, তাহা কেহ দেখিতে পাইত না। দুইটি স্থলে এইরূপ ব্যাপার। আবার কখন কখন বা ভূত স্থূলমূর্ত্তি ধরিয়াও আসিয়া দেখা দিত। এরূপ ব্যাপার আমরা আগেও বলিয়াছি। ঠিক একই রকম ঘটনা। তবে একটু বিশেষত্ব এই যে, এখানকার উপদ্রবগুলি খুব সুস্পষ্ট আর খুব দীর্ঘকাল-ব্যাপী। উইলিংটনের উপদ্রব এখন একটু কমিয়া আসিতেছে। অনেক প্রচলিত গল্প দ্বারাই ভূতের অনেকটা তথ্য জানা যায়। কিন্তু ঐ দুইটি স্থানে এমন কোন গল্প প্রচলিত নাই, যাহা দ্বারা আমরা ঐ দীর্ঘকালব্যাপী উপদ্রবের একটা মীমাংসা করিয়া লইতে পারি।

অনেক সময় রসিকতা করিয়াও ভূত মহাশয়রা উপদ্রব করিয়া থাকেন

আমরা এইরূপ একটা ব্যাপার বলিব। এ বড় অদ্ভুত কাণ্ড। ভূতেরা আমোদ করিয়া—রসিকতা করিয়া যখন উপদ্রব করে, তখন সেটা অনেক

দিন ধরিয়া করে না। সেরূপ অত্যাচার অল্পদিন বা অল্পক্ষণ পরেই আর দেখা যায় না। কিন্তু যাহার উপর অত্যাচারটা হয়, সে বিশেষ কষ্ট পায়। তাহার প্রাণটা তখন ওষ্ঠাগতই হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে ভূতেরা কখন কখন ঘণ্টা বাজাইয়া শব্দ করে; আবার কখন কখন ইটপাটকেল মারিতে থাকে; ঘরের ও বাড়ীর জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া রসাতলে দেয়, এখাকার জিনিস সেখানে ফেলে, সেখানকার জিনিস ওখানে ফেলে—এইরূপ কাণ্ড। জিনিসপত্র ফেলা-ছড়ার সময় কেহ তাহাদিগকে দেখিতে না পাইলেও তাহারা নিশ্চয়ই একটা স্থূল-দেহ ধারণ করে; নচেৎ জিনিসপত্র কি করিয়া নড়াইবে? সূক্ষ্ম-দেহে স্থূল জিনিস নড়ান যায় না। আর ভূতেরা যে স্থূল-শরীর ধরিয়া থাকে বা ধরিতে পারে, সে কথা আমরা পরে বুঝাইয়া দিব।

খুব বেশী দেখা যায়, ভূতেরা কাহারও ঘাড়ে চাপিয়া হাজির হয়। জিনিসপত্র ফেলা-ছড়া করে, এরূপটা প্রায়ই দেখা যায় না। এরূপ হইতে দেখিলে অজ্ঞান লোকেরা ভাবে যে, ইহা হইতে পারে না; ইহা নিশ্চয়ই কোন বদমায়েস লোকের কাণ্ড। অবশ্য, এরূপ ব্যাপার বদমায়েসেরা যে অনেক সময় না করে, তাহা নহে। মানুষকে জ্বালাতন করিবার জন্য, বিদ্বেষ-বুদ্ধির প্রেরণায় ভূতেরা অনেক সময় এরূপ কাণ্ড করে, আবার কখন কখন আমোদ করিবার নিমিত্তও করে। জীবিত মানুষদের মধ্যেও দেখা যায়, অনেক সময় আমোদ করিয়া অপরের পিঠে হয় ত ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিল বা কেহ কাহাকেও ভয় দেখাইয়া বসিল, বা আমোদ করিয়া এক জন অপরের একটা দামী জিনিস নষ্ট করিয়া ফেলিল। মানুষের মধ্যেও অনেকে অনেক সময় এরকম অবিবেচনার কাজ করিয়া বসে। এই সব অবিবেচক লোক মরিয়া গেলে তাহারা হঠাৎ পণ্ডিত হইয়া যায় না। মরিল বলিয়াই যে তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি বুদ্ধ-চৈতন্যের মত ফুটিয়া উঠিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। মরণের পর ভূত হইয়া ঐ সকল পাষণ্ডেরাই মানুষের উপর খামখেয়ালিভাবে অত্যাচার করিয়া থাকে।

দেবতা ছাড়া. ভূত ছাড়া আর এক রকম উপদেবতা আছে। তাহারা হয় ত কোন বনে, নয় কোন পাহাড়ে, নয় কোন নদীতে, নয় কোন বিলে—এইরূপ সব স্থানে থাকে। তাহারা একটু নিম্ন-শ্রেণীর জীব। তাহারা ফুর্ত্তিবাজ। বানরের মত নকল করিতে ওস্তাদ। তাহারাও সময় সময় মানুষকে জ্বালাতন করিয়া থাকে। কিন্তু ভাল লোক মরিয়া কখনই এরূপ অত্যাচার-উৎপীড়ন করেন না। খামখেয়ালী ভূতের গল্প সংবাদ-পত্রেও অনেক বাহির হইয়াছে। আমরা খবরের কাগজ হইতে একটা গল্প বলিতেছি। লেখক বলিতেছেন যে, 'ঘটনাটি নেহাত সত্য আর এত অদ্ভুত যে, আমিও যদি না দেখিতাম, তবে বিশ্বাস করিতাম না।' গল্পটি এই :—

ওয়ার্কশপ নামক স্থানে ভূতের উপদ্রব

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখে শনিবারে ওয়ার্কশপ নামক সহরটি একটা সংবাদে তোলপাড় হইয়া উঠিল। শুনা গেল, জোসেপ হোয়াইট নামক জনৈক ব্যবসায়ীর ঘরের জিনিস-পত্র ভূতে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, ফেলিয়া ছড়াইয়া, সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছে। জোসেপের বাড়ীর কাছে ঐ কাণ্ড দেখিবার জন্য লোকে লোকারণ্য। সারাদিন ধরিয়া মানুষ কৌতূহলী হইয়া সেখানে যাইয়া উঠিতেছে। আমিও দেখতে গেলাম। দেখিলাম, এক-খানি চেয়ার আপনা-আপনি ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, তাহার পর এক এক টুকরা আপনা-আপনি ভাঙ্গিয়া সরিয়া যাইতেছে; আমি একটা বালককে বলিলাম—'ঐ টুক্‌রাটি তুমি ধর গিয়া।' সে বলিল—'ভয় করে, আমি পারিব না।' এই অদ্ভুত কাণ্ডের কথা আমি সকলের সঙ্গে বলাবলি করিতেছি, এমন সময় মাংস রাখার একখানি পাত্র আস্তে আস্তে আমার মাথার কাছে উঠিয়া আসিল, তাহার পর আমার পায়ের কাছে ধপাৎ করিয়া পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অমনি চূরমার। পাত্র কেমন করিয়া আপনি উঠিয়া আসিল, আমি কিছুতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, আলোটা কিন্তু মিট্‌মিটে। আমরা এই

অদ্ভুত কাণ্ডেরই আলোচনা করিতেছিলাম। গৃহস্বামী একটা ময়দা রাখার পাত্রের গায়ে হেলান দিয়া বলিতেছিলেন যে, "এ সব ঘটনা বড়ই রহস্য-জড়িত।" তাঁহার যেমন এই কথা বলা আর অমনই একটা পাত্র আপনা-আপনি তাঁহার মাথার উপর শূন্যে উঠিয়া পড়িল। উপরে লোহার শিকের সঙ্গে মাংস টাঙ্গান ছিল। পাত্রটি সেই মাংসের কাছে উঠিল। তাহার পর সেখান হইতে সটান সোজাভাবে নীচে ধপ্ করিয়া পড়িল। পড়িয়াই চূর্ণ-বিচূর্ণ। আমরা ছয় জন ঘরে ছিলাম। ছয় জনই এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়াছি। আমি বেশ করিয়া দেখিলাম যে, এই কাণ্ড কোন মানুষের দ্বারা হইতেছে না। গৃহস্বামী আমি দুই জনই ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া-ছিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমি সাম্নের ঘরেও গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেওয়ালের দিকে যাইতে বলিলেন আর কহিলেন—'দেখুন, ঐ ঘড়ী আর গ্লাসকেসের মধ্যস্থ পায়রাটি ছাড়া দেয়ালের গায়ে আর কোন জিনিসই নাই। সবই ভূতে চুরমার করিয়াছে। কেবল ঐ দুইটি জিনিস ফ্রেমে আবদ্ধ আছে।'

বাজা ঘড়ীটি বিছানার উপর একটা কোণের দিকে দেওয়ালের গায়ে আটকানো ছিল। হোয়াইট যখন আমার সঙ্গে দেরাজটি ভূতের হাতে পড়িয়া উলট্ পালট হইয়াছে বলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় একটা জিনিস চুরমার হইবার শব্দ আমার কানে গেল। ফিরিয়া দেখিলাম, ঘড়ীটির দফা রফা হইয়াছে। মেঝের উপর পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। ঘড়ীটি ছিল বিছানার দিকে এক প্রান্তে; কিন্তু উহা বিছানা ডিঙ্গাইয়া ঘরের অপর এক প্রান্তে আগুন রাখিবার স্থানটির কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ঘড়ীটি পড়িবামাত্র চাকরাণী বালিকা দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। হোয়াইট বা ঐ বালিকা যদি কোন মতলবে ঘড়ীটি ঐ রকম করিয়া ফেলিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতাম; কেন না, আমি একেবারে ঘড়ীটির কাছেই দাঁড়াইয়া ছিলাম।

তাহার পর আমরা রান্না-ঘরে গেলাম, আমি আগুনের দিকে

করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম ; বালিকা আমার বাঁ পাশে থাকিয়া ঘরের কাজ-কর্ম্ম করিতেছিল, হোয়াইট আমার ডান দিকে ছিলেন। ঠিক সেই সময় আর একটি দ্রব্য আমার সমক্ষে কোথা হইতে আসিয়া পড়িল, আর খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সেই জিনিসটি একটি তাকের উপর ছিল। কোন্ সময়ে যে উহা সেখান হইতে কেমন করিয়া ছিটকাইয়া আসিল, তাহা আমি টের পাইলাম না। জিনিসগুলি যেন বিদ্যুদ্বেগে আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। যাওয়াটা আদৌ দেখিতে পাই নাই। যখন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল, তখনই বুঝিলাম যে, জিনিসগুলি ছিট্কাইয়া আসিয়াছে। টেবিলের উপরে মাখন রাখিবার একটা পাত্র ছিল। সেটাও লাফাইয়া আসিয়া মেঝেয় পড়িল ও চুরমার হইয়া গেল। কেন যে এরূপ কাণ্ড হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আর এই সব কাণ্ড-কারখানা যদি আমি স্বচক্ষে না দেখিতাম, তাহা হইলে আমিও জিনিস-পত্রের এইরূপ চলা-ফেরার কথা বিশ্বাস করিতাম না।

ঐ গল্পটি সংক্ষেপেই বলা হইল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ তারিখের "ওয়ার্কশপ ও গেন্স্‌বরো নামক স্থানের সংবাদ" প্রবন্ধে উহার বিশেষ বর্ণনা আছে। এরূপ ঘটনা আরও অনেক দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটিয়াছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আরও কয়েকটা পূর্ব্ববৎ গল্প

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ষ্টক্ওয়েল্ নামক স্থানে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। একখানি সংবাদপত্রে এই কাণ্ডের যথাযথ বিবরণ বিবৃত আছে। ইহার অনেক সাক্ষীসাবুদও ছিল। ব্যাপারটি ঠিক পূর্ব্বেরই মত। থালা, বাটি, গেলাস ধুপ-ধাপ করিয়া মেঝেয় পড়িতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া চুরমার! রূপা-দস্তার রেকাবী ও পিতলের পিলসুজগুলি ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল, কাচের থাম ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইল। শান্তিময় সহরতলীর স্থানটিতে প্রায় ২০ ঘণ্টা যাবৎ নরকের বীভৎস রঙ্গ চলিতে লাগিল। দর্শকদের মধ্যে কেহই ঐ সকল জিনিস স্পর্শও করিল না। কিন্তু দেখা গেল যে, এক জন চাকরাণীর সম্মুখেই যেন ঐ সব কাণ্ড বেশী ঘটিতে লাগিল; চাকরাণীকে ঐ বাড়ী হইতে সরাইয়া দিবার পরই উপদ্রব থামিয়া গেল। আমাদের মনে হয়, ঐ চাকরাণীই হয় তো "মিডিয়ম্" ছিল। উহার ঘাড়ে চাপিয়া ভূতেরা সহজেই হয় তো আসিতে পারিত। মস্কোরোড নামক স্থানে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ঠিক ঐরূপ এক ঘটনা ঘটে। তাই বলিতেছি, এ রকম ঘটনা অনেক স্থানেই ঘটিয়াছে।

ভূতেরা ঢিল ছুড়িয়া মারে

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিস্ নগরের "রু সেণ্ট অনার" নামক স্থানে ভূ[তেরা] ঢিল ছুড়িয়াছিল। আবার কেথনেভ নামক স্থানেও অনেক দিন ধ[রিয়া] ইট্পাটকেল ছোড়া দেখা যায়। এমন কাণ্ড কেন ঘটে, কেহই বুঝি[য়া] উঠিতে পারিল না। ঐ দুই স্থলে ভূতের কত অদ্ভুত কাণ্ডই ঘটিল। এ[মন] ভাবে ঢিল ছুড়িতে লাগিল যে, তাহাতে কেহই আঘাত পাইল না, ...

সেগুলি দর্শকদের পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে এরূপ ব্যাপার হইতেছিল, অথচ ঘর চারিদিক্ হইতে সুন্দরভাবে বন্ধ করা ছিল। ঘর বন্ধ, অথচ ঢিল পড়িতেছে। বড়ই চমৎকার কাণ্ড!

এক জন অধ্যাপকের উপর ভূতের অত্যাচার

টেডওয়ার্থ নামক স্থানের এক জন বাদকের উপর ভূতের অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়া গল্প আছে। আর একটি গল্প আছে, জিসেন্ নামক স্থানের অধ্যাপক স্কুপার্ট সম্বন্ধে। অত্যাচারটা না কি ছয় বৎসর ধরিয়া হইয়াছিল, তবে নিরন্তর না হইয়া মাঝে মাঝে হইত। হয় তো এক দিন রাত্রিতে দরজায় ভয়ানক ধাক্কা মারার শব্দ হইতে লাগিল। পরদিন ঘর বন্ধ অথচ ঘরের মধ্যে বোঁ বোঁ শব্দে চারিদিকে ঢিল ছুটিতে লাগিল। ঢিল কাহারও গায়ে লাগিল না, কেহ আঘাতও পাইল না বটে, কিন্তু জানালা-গুলি সবই ভাঙ্গিয়া চূরমার হইল। আবার সাসি নূতন করিয়া লাগান হইল। সেগুলিও চূরমার। দিনরাত্রি সমানভাবে অধ্যাপকের গালে ঠাস ঠাস শব্দে চড় আসিয়া পড়িতে লাগিল! তাঁহার শান্তি নাই, প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল। সরকার বাহাদুর এই অত্যাচারের প্রতীকার করিবার নিমিত্ত অধ্যাপকের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে দুইটি লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারাও অধ্যাপকের ন্যায় চড় খাইতে লাগিল। ভূতের চড় তাহাদের গালেও আসিয়া পড়িতে লাগিল। অধ্যাপক পড়িতে-ছেন, এমন সময় আলোটা টেবিলের উপর হইতে দিব্য উপরে উঠিয়া গেল। তাহার পর যাইয়া ঘরের অন্য একটা স্থানে গিয়া রক্ষিত হইল। তিনি পড়িতেছেন, এমন সময় ফর্‌ফর্ করিয়া বইখানি ছিঁড়িয়া গেল, একেবারেই টুক্‌রা টুক্‌রা! তাহার পর ছেঁড়া টুকরাগুলি রাশীকৃত হইয়া তাঁহার পায়ের কাছে পড়িল। তিনি হয় তো কোন একটা পাতা খুলিয়া বক্তৃতা করিতে-ছেন—ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছেন, সেই সময় ঐ অত্যাচারী ভূতটা তাঁর সেই

পাতাখানি ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। অধ্যাপকের আর নিস্তার নাই; বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। তখন নিজে নিজে মাথার উপরে তরবারি ঘুরাইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন বা অন্য কেহ তাঁহার মাথার উপর তরবারি ঘুরাইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। টেডওয়ার্থবাসী ব্যক্তির উপরেও না কি অনেকটা এইরূপ অত্যাচারই হইয়াছিল। অধ্যাপক স্কুপার্ট বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এই সব ব্যাপার বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথা সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল। মিসেস ক্রো প্রণীত "প্রকৃতির নৈশ দিক্" নামক গ্রন্থে ৪২৯-৪৩০ পৃষ্ঠায় ঐ গল্পটি সন্নিবেশিত আছে।

ঐ শেষোক্ত গল্পগুলি পড়িলে মনে হয়, ভূতেরা বদমায়েসী করিয়াই লোককে কষ্ট দিয়াছিল। টেডওয়ার্থে বাদকের বেলায় শুনা গিয়াছে, একটা জীবিত লোক না কি সয়তানী করিয়া ঐ সব কাণ্ড করে। কিন্তু মম্পেসন নামধারী সেই বাদক সে কথা স্বীকার করে না। আমরা শুনিয়াছি, সেটা ভূতের কাণ্ড নহে, অথচ মম্পেসন্ বলে, সেটা ভূতই। অধ্যাপকের ঘটনায় অত্যাচারীটা মানুষ কি ভূত, তাহা জানা যায় না, আর অত্যাচার-উৎপীড়নের কারণই বা কি, তাহাও বুঝা যায় না। অধ্যাপক নিজে হয় তো অত্যাচারের কারণ জানিতেন; কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মাথার উপর তরবারি ঘুরাইবার কথাটায় একটু তথ্য পাওয়া যায়। মনে হয়, ভুতটা তাহা হইলে স্থূলদেহ ধারণ করিয়া অত্যাচার করিতে আসিত। তাই তরবারি দ্বারা তাহাকে নিবারণ করা হইত। নচেৎ সূক্ষ্ম দেহে থাকিলে তাহাকে তরবারির আঘাত-ভয় করিতে হইবে কেন? স্থূল অস্ত্রে সূক্ষ্ম-দেহের কোন ক্ষতিই হইতে পারে না।

ভূতেরা কোন কোন সময় ঘণ্টার ধ্বনি করিয়া থাকে

কখন কখন ভূতেরা ঘরের মধ্যে ঘণ্টা বাজাইবার শব্দ করিয়া থাকে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সাফোক্ জেলায় উডব্রিজ সহরের কাছে "গ্রেট বিলিংস্" পল্লীতে এই রকম একটা ঘটনা ঘটে। মেজর মুর বিবরণটি লিপিব

করিয়াছিলেন। তিনি "রয়াল সোসাইটী" নামক সভার সভ্য ছিলেন। তিনি হিন্দুর "একেশ্বরবাদ" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকখানির কথা অনেকে না জানিলেও সেখানি খুব বিখ্যাত বই। বই-খানির নাম—"বিলিংস গ্রামের ঘণ্টাধ্বনি।" তিনি বলিয়াছেন, ঐ স্থানে একটা ঘরে ৫৭ দিন ধরিয়া মাঝে মাঝে ঘণ্টার শব্দ হইতে থাকে, কে যে সেই শব্দ করিতেছে, তাহা জানা যায় না। তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, ঐ ব্যাপারের মধ্যে কাহারও সয়তানী নাই, ওটা কোন দুষ্ট লোকের কৃত নহে। তখন সংবাদ-পত্রে এই কথা লিখিলেন। এ সম্বন্ধে কেহ কিছু নূতন ব্যাখ্যা দিতে পারে কি না, এইটা জানাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সংবাদটি সংবাদপত্রে প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু কোন তথ্যই কেহ জানাইতে পারিল না। মাত্র এইটুকু জানা গেল যে, এরূপ ঘটনা আরও অনেক স্থলে অনেক সময় ঘটিয়াছে। ১৪ জন তাঁহাকে ১৪ খানি পত্র লিখিয়া জানাইল যে, এরূপ ঘটনা সম্প্রতি তাহারাও জানিয়াছে। তাহারা লিখিল, আমরা নিজেরাও এরূপ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আপনি আমাদের নাম প্রচার করিতে পারেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। ঐ সব পত্র পড়িয়া জানা গেল—এক স্থানে ১৮ মাস ধরিয়া ঘণ্টার শব্দ হয়; আর একটা জায়গায় মাত্র ২৷৷০ ঘণ্টা শব্দ হইয়াছিল। "বিতর্কভূমি" নামক পুস্তকের ২৪১ পৃষ্ঠায় মিঃ আর, ডি, আউয়েন এরূপ একটা গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। একটা ঘণ্টা বাজিয়া বাজিয়া বড়ই বিরক্ত করিত। তাই কাপড় ও দড়ি দিয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। যাহাতে বাজিতে না পারে, এমন করিয়াই শক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু করিলে কি হইবে? ভূতের কাণ্ডই অদ্ভুত। ঘণ্টা আরও জোরে জোরে আগেকার অপেক্ষাও ভয়ানক শব্দে বাজিতে লাগিল। শেষে ভূতটা ঘণ্টাটা ছিঁড়িয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল। মাটীতে পড়িয়াও ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। চমৎকার ব্যাপার! "প্রকৃত ভূতের গল্প" নামক পুস্তকেও ঠিক ঐ রকম একটা

গল্প আছে। সেটা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ঘটে। এই ব্যাপারে শুধু ঘণ্টা বাজা নহে, আরও কাণ্ড হইয়াছিল। আলোগুলি সব নিভিয়া যায়, তাহা ছাড়া ভূতটা সয়তানী করিয়া কতকগুলি কাপড়-চোপড় স্নান করিবার ঘরের মধ্যে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল।

* * * *

কোন মতলব নাই, অথচ অনেক ভূত
দেখা দিয়া থাকে।

মহাত্মা বাকের বীণা-যন্ত্র

"বিতর্কভূমি" নামক পুস্তকের ৩২৫ পৃষ্ঠায় মিঃ আর, ডি, আউয়েন মহাত্মা বাকের বীণাযন্ত্র সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিয়াছেন। গল্পটি বেশ একটু মজার ধরণের। বাকের দাদামহাশয়ের পিতা খুব ভাল গান রচনা করিতে পারিতেন। বাক্ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে একটি ভাল বীণা কিনিলেন। ভাল হইলেও পুরাতন। তাহাতে সন লেখা ছিল—১৫৬৪। যে দিন কিনিলেন, ঠিক তাহার পরদিনই তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক জন সুন্দর, সুশ্রী যুবক তাঁহার কাছে আসিয়া যেন বলিতেছে—"উহা আমার জিনিস, ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় হেনরী আমাকে উহা দিয়াছিলেন। রাজা একটা নূতন সুরের গান রচনা করিয়াছিলেন, তিনি সেই গান যন্ত্রে বাজাইতেন, উহার সাহায্যে গানটি মনে করা যায়।" এই যন্ত্র সেকেলে জিনিস, চাবি দিয়া আটকানো যাইত, এখন আর প্রচলিত নাই।

মিঃ বাকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখনও সেই করুণ রসের গানের ভাবটা তাঁহার মনে ছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন রাত্রি দুইটা। তিনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। সে রাত্রিতে আর স্বপ্ন দেখিলেন না। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়াই যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়ে তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না। কি অদ্ভুত কাণ্ড! তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার বিছানার উপরে গান-লেখা একখানা কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। স্বপ্নে

গানের কথা, সুরের কথা দেখিয়াছিলেন, এটি সেই গান, সেই সুর। এখনকার দিনে যে সঙ্কেতে গান লেখা হয়, এ সে সঙ্কেত নহে। গানের সঙ্কেত ও শব্দযোজনা সব সেই প্রাচীনকালের মত। ঘুমের ঘোরে তিনিই ঐ গানটি লিখিয়া ফেলিলেন, কি সেই স্বপ্নের ভূতটা লিখিয়া দিয়া গেল, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। গানটি দেখিলে সেকালের একটা ভাল নমুনা পাওয়া যায়। যাঁহারা খুব পুরাকালের আলোচনা করেন, গানটা তাঁহাদের কাছে খুব একটা মূল্যবান জিনিস।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি একটা পেন্সিল লইয়া বসিলেন। তাঁহার ঘাড়ে সেই ভূতটি আসিয়া চাপিল। ভূতটি তাঁহার হাত দিয়া কয়েকটা কথা লিখাইল। লেখায় ব্যক্ত হইল যে, 'ঐ পুরাতন যন্ত্রটির মাঝে এক টুক্‌রা কাগজে একটা গান আছে, গানটি রাজা নিজের হাতে লিখিয়াছিলেন। গানটি এই' বলিয়া গান যথাযথ লিখিয়া দিল। জ্ঞান হইলে, বাক্ খুঁজিয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিকই ঐ গান-লেখা একখানি কাগজ সেই যন্ত্রের মধ্যে রহিয়াছে। যে স্থানটিতে ঐ কাগজ-টুক্‌রা ছিল, ভূতটা তাহা বলিয়া দেয়, আর ঠিক সেইখানেই উহা পাওয়া গেল।

অচেতন অবস্থায় ভূতের সাহায্যে পেন্সিল দিয়া গানটা আগেই তিনি লিখিয়াছিলেন। এখন রাজার নিজের লেখাও পাওয়া গেল। তাৎপর্য্য অংশটা এক, কিন্তু দেখা গেল. গানের কথাগুলা একরকম ভাবে সাজান নহে; তাহা হইলেও ভূতের কথাটার উপর খুব বিশ্বাস জন্মিল। এই ব্যাপার লইয়া প্যারিস সহরে তখন হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বাকের বন্ধু-বান্ধবেরা যেখানে-সেখানে এই কথার গল্প-স্বল্প করিতে লাগিলেন। ক্রমে ব্যাপারটি সংবাদ-পত্রেও প্রচারিত হইয়া পড়িল। গানটি তখন খুব ছড়াইয়া গেল। অনেকে গানটি এক এক খণ্ড কিনিয়াও রাখিল।

পৃথিবীতে দেখা যায়, যে, যে রকম-লোক, তাহার সঙ্গে সেইরূপ লোক দেখা করিয়া থাকে। এটাও কতকটা সেই ভাবের দেখা করা। বাক্ নিজেও গান-বাজনা ভালবাসিত, আবার ভূতটাও গান-বাজনা-জানা

এক রকম স্বভার, তাই দেখা দিয়া বসিল। বাকের সঙ্গে ভূতের এই দেখা করা ব্যাপারটিতে ভূতের একটা উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। তবে যাঁহারা ভূতের তত্ত্ব খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহাদের কাছে এই গল্পটি মূল্যবান; এটি ভূতের অস্তিত্ব বিষয়ে একটা খাঁটি প্রমাণ। ভূতটা যে বহুকাল ধরিয়া ভুবর্লোকে ছিল, ইহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এত দিন ধরিয়া ভুবর্লোকে থাকা খুবই অস্বাভাবিক। সাধারণতঃ লোক এত দিন সেখানে থাকে না। তাই বলিয়া এত দিন থাকাটাও অসম্ভবও নহে। লোকটির খুব স্ফূর্ত্তির প্রাণ ছিল, আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়াইতে ভালবাসিত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম বড় বুঝিত না, খুব উচ্চ অঙ্গের আশা-আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। তাই বোধ হয়, তাহাকে ভুবর্লোকে এত দিন থাকিতে হইয়াছিল।

এ রকম গল্প পড়িয়া আমাদের মনে হয়, ভূতের দেখা করিবার কি আবশ্যক ছিল? সূক্ষ্ম-জগৎ হইতে তো ঐ যন্ত্রের সকল কথাই সে জানিতে পারে! ইহার পূর্ব্বে ঐ নূতন সুর—নূতন গান সবই তো বাকের মনের মধ্যে জাগাইয়া দিতে পারিত! সে রকম জাগাইয়া দেওয়া সূক্ষ্ম জগদ্বাসী ভূতের পক্ষে খুবই সহজ কথা। সুরটি খুবই সুন্দর। উহা জগতে প্রচার করিলে কত লোক তৃপ্তি পাইতে পারে। যাহারা গান-প্রি... অথচ ভূত হইয়া ভুবর্লোকে গিয়াছে, এই নূতন সুর লোকের প্রাণে জাগাইয়া দেওয়া তাহাদের খুবই প্রীতিকর কার্য্য। তাই মনে হয়, সেই ভূতটা আগে এরূপভাবে বাকের সুরটি জানায় নাই কেন? কেহ কেহ বলেন, সেরূপ করা না কি ভাল নহে; তাই জানায় নাই। কিন্তু তাহা নহে কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, ভূতটা দেখা ... করিয়াও যখন সুরটি জানাইয়া দিল, তখন যে তাহার হৃদয়টা ভাল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের মনে হয়, আরও আগে সুরটি জানাইয়া দিলে খুবই ভাল হইত।

আমরা আর একটা গল্প বলিব। এক জন বড় ঘরের যুবতী মরিয়া যাইবার পর প্রেতিনী হইয়া দেখা দিয়াছিল। দেখা দিবার মধ্যে আ...

কোন মতলব ছিল না, শুধু শুধু দেখা দিয়াছিল, আগেকার ঘটনার নয় বৎসর পরে এটা ঘটে। গল্পটি আমরা অনুসন্ধান-সমিতির কাছে জানিতে পারিয়াছি। গল্পটি মিঃ এণ্ড্রু ল্যাঙ্গের "স্বপ্ন ও ভূত" নামক পুস্তকের ৭৪ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত আছে।

প্রেতিনীর মুখে একটা আঁচড়ের দাগ

"কুমারী 'জি' ১৮ বৎসর বয়সে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট লুই নামক স্থানে হঠাৎ কলেরায় মারা যায়। তাহার এক জন ভাইয়ের নাম—এফ্ জি। এই ভাইটি তাহাকে খুব ভালবাসিত। এক দিন এফ্ জি সেণ্ট জোসেফ্ নামক স্থানে খুব কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যই তাহার কাজ। মনিবদিগের চিঠি-পত্র অনেকগুলি লিখিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া এক দিন একটু বিশ্রাম করিতেছে ; মুখে চুরুট ; হাতের কাজ তখনও ফুরায় নাই, হাতে কলম আছে। এমন সময় তাহার মনে হইল, যেন তাহার বাঁ দিকে কে বসিয়া আছে, আর টেবিলের উপর যেন তাহার একখানা হাতও রহিয়াছে। তাহার মনে হইল, যেন তাহার বোন্ সেই কুমারী "জি"ই আসিয়াছে। তখনই সে বোন্‌কে স্নেহালিঙ্গন করিবার নিমিত্ত লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু কোথায় কুমারী ! দেখিল, সেখানে কেহই নাই। যুবকের হাতের কলমে তখনও কালি, মুখে তখনও আগুনশুদ্ধ চুরুট, তখনও বোনের কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু কৈ, সে বোন্ কোথায় ? বোন্ সেখানে না থাকিলেও যুবক তাহার মুখের ভাব, তাহার পোষাক, তাহার চোখের কাতর চাউনি, তাহার গায়ের লাবণ্য সবই দেখিয়াছিল। আর একটি জিনিস দেখিয়া সে অবাক্ হইল। সে দেখিল, কুমারীর গালে একটা লাল দাগ।

কুমারীর মৃত্যুর কথা যুবক জানিত না। তাই তাহার মনটা এই রকম দেখিয়া কেমন একরূপ হইয়া গেল। সে তখনই ট্রেণে উঠিয়া বাড়ী পৌছিল। বাড়ী যাইয়া মাতাপিতাকে কুমারীর কথা বলিল। তাহার

মরণের সংবাদও পাইল। পিতা শুনিয়া বিশ্বাস করিলেন। কিন্তু মা শুনিয়া শোকে যেন কাতর হইয়া পড়িলেন। মনের বেগ একটু সামলাইয়া বলিলেন যে, মরণের পর তাহার দেহটাকে জুত-বরাত করিয়া রাখিবার সময় তাহার পোষাকের একটা আল্‌পিনের খোঁচায় গালে ঐ দাগটা হইয়া গিয়াছে। মরা মেয়ের গালে দাগ হওয়ার কথা সেই মা ভিন্ন আর কেহ জানে না। মা বলিলেন, সে দাগটাকে ঢাকিয়া দিবার জন্য তিনি পাউডার দিয়া সে জায়গাটি মালিস করিয়াও দিয়াছেন। মা যুবকের কথায় খুব বিশ্বাস করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে মাও মারা গেলেন।

এ গল্পটি সত্য বলিয়া পরে যুবকের পিতার কাছেও জানা গিয়াছিল। "এস, পি, আর কার্য্যাবলী" নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় ইহার বিবৃতি আছে।

এণ্ড্রুজ ল্যাংএর ঠিক এই বহিখানি হইতে আমরা আর একটি গল্প উদ্ধৃত করিব। সেটিও বেশ সত্য ঘটনা; অনেক প্রমাণ-প্রয়োগও পাওয়া গিয়াছে। গল্পটি বেশ সুন্দরও বটে। সেটিতেও দেখা যায়, কোন মতলব নাই, অথচ ভূত আসিয়া দেখা দিয়া গেল।

সেনানী বার্টারের গল্প

সেনানী বার্টার সি, বি, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ৭৫ নং সেনাদলের নিম্ন কর্ম্মচারী ছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে মুরী নামক পার্ব্বত্য স্থানে তাঁহাকে কার্য্যোপলক্ষে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি যে ঘরটিতে বাস করিতেন, অল্পদিন হইল, লেপ্‌ট্যান্ট্ "বি" সেটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই "বি" ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে পেশোয়ারে মারা পড়েন। যুদ্ধ আফিসে সৈনিক সেনানী প্রভৃতির মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায়। ঐ আফিসের অনুসন্ধান-ফলে জানা যায় যে, "বি" ঠিক ঐ ২রা তারিখেই মারা যান। যে বাড়ীটির কথা আমরা বলিতেছি, সেটি পাহাড়ের পার্শ্বে; বাড়ীর কাছ হইতে পাহাড়ের খুব উঁচু চূড়া উঠিয়া গিয়াছে; সেই চূড়ার দিকে

একটা বড় রাস্তাও ঘুরিয়া উঠিয়াছে ; সেই রাস্তাটি এই বাড়ী অপেক্ষা ৩।৪ শত গজ উঁচু, বাড়ীটি ঐ রাস্তার ঠিক নীচে। ঐ রাস্তা ছাড়া উপরে যাই-বার আর রাস্তা ছিল না। এই বাড়ী হইতে ঐ বড় রাস্তায় যাইবার নিমিত্ত একটা অশ্বারোহীর রাস্তা ছিল। অশ্বারোহী ভিন্ন আর কাহারও পদব্রজে তথায় চলিবার উপায় ছিল না। এই অশ্বারোহীর রাস্তাটি বড়ই দুরারোহ, খাড়া ভাঙ্গনের মত বলিলেও হয়। মিঃ বার্টারের এই বাড়ীটি হইতে ঐ দুর্গম রাস্তাটিতে উঠিতে হইলে অল্প একটু বাঁধের উপর দিয়া যাইতে হয়।

এক দিন সন্ধ্যাকালে মিঃ ডীন ও তাঁহার স্ত্রী মিঃ বার্টারের গৃহে বেড়াইতে আইসেন। তাঁহারা রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত গল্প-স্বল্প করিলেন। রাত্রিটা পূর্ণিমার রাত্রি। উঁহারা গল্প-স্বল্প করিয়া বাড়ী যাইবার সময় মিঃ বার্টার অশ্বারোহীর রাস্তার কাছ পর্য্যন্ত উঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। তাহার পর ডীন ও তাঁহার স্ত্রী সেই দুর্গম রাস্তাটি ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিলেন। বড় রাস্তা ধরাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। বার্টার খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া চুরুট খাইতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইটি কুকুরও ছিল। তাহার পর বাড়ীর দিকে ফিরিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, যেন কে অশ্বারোহীর রাস্তা দিয়া নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে, ঘোড়ার খুরের শব্দও তাঁহার কানে গেল। চাহিয়া দেখিলেন—প্রথমে একটা লম্বা টুপী, তাহার পর টুপী-পরা লোকটাও তাঁহার চোখে পড়িল। দেখিলেন, লোকটা একটা টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে, সঙ্গে দুই জন এই দেশের চাকর। বার্টার বলিয়াছেন—"ঠিক এই সময় কুকুর দুইটি ভয়ে আমার কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে ডাকিতে লাগিল। সে দিন পূর্ণিমা, এত সুন্দর জ্যোৎস্না যে, সেই আলোতে খবরের কাগজ পর্য্যন্ত পড়া যায়। একেবারে দিনদুপুরের মত পরিষ্কার আলো। আমি সেই লোক তিনটিকে খুব ভাল দেখিলাম। উহারা ৮।১০ ফুট উঁচুতে ছিল। * * * ভোজন করিবার সময় যেরূপ পোষাক পরা হয়, অশ্বারোহীর গায়ে সেই পোষাক ছিল। ওয়েষ্ট কোটটি

সাদা ; টুপীটিও লম্বাকৃতি তাহার ঘোড়াটি পাহাড়ী ঘোড়া ; রং ধূসর, ঘাড়ে কাল কাল কেশর, লেজের চুলগুলিও কাল। লোকটি যেন অন্যমনস্ক হইয়া ঘোড়ার উপরে বসিয়া আছে বলিয়া মনে হইল, লাগাম যেন হাত হইতে ঝুলিয়া পড়িতেছে। সহিস দুই জনই যেন ঘোড়াটিকে চালাইয়া লইয়া আসিতেছে, আর অশ্বারোহীকেও যেন রক্ষা করিতে করিতে আস্‌ছে, এইভাবে তাহারা আসিতেছিল।” মিঃ বার্টার জানিতেন, নীচে তাঁহারই বাড়ী ছাড়া আর যাইবার স্থান নাই। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“কে যায়, তোমরা কি চাও?” শুনিয়া লোক তিন জন দাঁড়াইল। তখন অশ্বারোহী ব্যক্তি দুই হাত দিয়া লাগাম কষিয়া ধরিল, তাহার পর পিছন ফিরিল। ফিরিবার সময় বার্টার দেখিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁহারই আগেকার কর্ম্মচারী, অর্থাৎ সেই লেপ্টন্যাণ্ট “বি।” বার্টার দেখিলেন—গায়ে যেন রক্তের লেশ নাই, মুখখানি যেন মরা মানুষের মুখ, কিন্তু দেহটা বেশ মোটা-সোটা, মাথায় চুলের ঝাপ্‌টা।

দেখিয়া মিঃ বার্টার খুব তাড়াতাড়ি তাহাদের দিকে যাইতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি যাওয়ায় পায়ের নীচে হইতে মাটী খসিয়া গেল। তখন বার্টার পড়িয়া গেলেন। তাহার পর হামাগুড়ি দিয়া কষ্টেসৃষ্টে সেই খাড়া অশ্বারোহীর রাস্তায় উঠিলেন। যেখানে তিন ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেইখানে গেলেন। যাইয়া দেখেন—কেহই নাই। তখন তিনি দৌড়িয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন—এক শত গজ পরিমাণ পথ দৌড়িয়া গেলেন। কিন্তু কাহারও সাড়া-শব্দ পর্য্যন্ত নাই! বার্টার যখন এরূপভাবে যাইতেছিলেন, তাঁহার কুকুর দুটি গেল না। কুকুর দুইটি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল যে, উহারা ভূত।

পরদিন বার্টার তাঁহার বন্ধু ডীনের সঙ্গে গল্প-স্বল্প করিতে করিতে লেপ্ট্‌ন্যাণ্ট্ “বি”র কথা পাড়িলেন। কথাপ্রসঙ্গে ডীন বলিলেন—লেপ্টন্যাণ্ট বি মরণের আগে বিশ্রী মোটা হইয়াছিল। আর ব্যারামে যখন ভুগিতেছিল, তখন চুলের ঝাপ্‌টা হইয়াছিল, আমরা কাটিতে বলিলেও কাটিতে ... বোধ হয়, সেই চুলের ঝাপ্‌টা শুদ্ধই তাহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে।”

বার্টার 'বি'র টাটু ঘোড়াটার অবিকল বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, বি এই ঘোড়াটা কোথায় পান ?"

ডীন বলিলেন—"বি" ওটা পেশোয়ারে কেনেন। অবিবেচকের মত এক দিন পাহাড় ধরিয়া নীচে আসিবার সময় ঘোড়াটা মারা পড়ে।"

এই ঘটনার পর মিঃ বার্টার ও তাঁহার স্ত্রী ঐ অঞ্চলে প্রায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনিতে পাইতেন। তিনি জানিতেন, এটা "বি"র কাণ্ড! "বি"ই ভূত হইয়া ঐরূপ করিতেছে।

সেনানী বার্টার এই গল্পটি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ২৮শে এপ্রিল তারিখে লিখিয়াছিলেন। বার্টারের স্ত্রী ও মিঃ ষ্টুয়ার্ট গল্পটি সত্য বলিয়া প্রমাণ দিয়াছেন; কেন না, যে রাত্রিতে বার্টার সেই ভূতের পিছনেই সাহস করিয়া গিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতির কাছে নিজের দুঃসাহসের গল্পটাও করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারাও এ সব ব্যাপার জানিতেন। ভূতটার মোটা-সোটা হইবার কথা, আর তাহার ঘোড়াটার কথা মূল্যবান্; কেন না, বার্টার ঘোড়াকে কখনই দেখেন নাই, আর ভূত হইবার আগে লোকটি যে মোটা হইয়াছিল, তাহাও তিনি জানিতেন না। ওটা যে বাস্তবিকই ভূত, অবশ্য তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। ওটাকে ভূত বলিয়াই আমাদের মনে হয় না। বার্টারের সঙ্গে ওরূপভাবে দেখা করার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মরণের পর বোধ হয়, উহার মনে এরূপ একটা চিন্তা আসিয়াছিল যে, যেন ঐ অশ্বারোহীর পথ দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া দুই জন সহিসের সঙ্গে সে বাড়ীর দিকে আসিতেছে। জীবিতকালে লোকটি ঐরূপভাবেই আসিত। মরণের পরও সে চিন্তা গেল না। তীব্রভাবে বাড়ী আসার ভাবনা ভাবিতে লাগিল। তাই তার ঐ দশা। তা ছাড়া মরণের আগে লোকটির স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না, ধর্ম্মের ভাবনা এক দিনও ভাবে নাই, তাই মরণের পর ভুবর্লোক তাহার কাছে বড়ই কুস্থান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কাজে কাজেই তখন বাড়ী আসিবার চিন্তাই তাহার মনে আসিয়াছিল। আর বাড়ী আসিবার ভাবনাটা সে

এতই ভাবিয়াছিল যে, সেই ভাবনা হয় তো স্থূলমূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছিল। আগে যে গল্পটি বলা হইয়াছে, সেই সেণ্ট জোসেফ্ নামক স্থানে যে প্রেতিনীটা মুখে আঁচড় দেওয়া মূর্ত্তিতে ভাইয়ের সঙ্গে আসিয়া দেখা করিয়াছিল, সেটাও ঐরূপ তীব্র চিন্তার মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। সেও মরণের আগে তাহার ভাইয়ের কাছে ঐরূপ ভাবে প্রায়ই বসিত, ভাইও তাহাকে খুব ভালবাসিত। তাই মরণের পরও সেইরূপ আদরে সোহাগে স্নেহে বসি-বার কল্পনাটা তাহার মনে আসিয়াছিল, আর খুব তীব্রভাবেই সে ইচ্ছাটা হইয়াছিল। তাই সে ইচ্ছা স্থূল-মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার ভাইয়ের চোখে পড়িল।

বার্টারের গল্পে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। ঘোড়ার সহিস প্রভৃতি আনুসঙ্গিক মূর্ত্তিও ভূতের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। নিজে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেওয়াই শক্ত কথা, তাহার পর দুইটি সহিসের মূর্ত্তি, আর ঘোড়ার মূর্ত্তি গড়াইয়া তোলা নিতান্ত সহজ কথা নহে। ভূতেরা এরূপ না করিতে পারে, এমন নহে। কিন্তু এ স্থলে ঐগুলি আদৌ ভূতের বলিয়াই মনে হয় না। আর যদি ভূতের কাণ্ডই হয়, তবে অতটা মূর্ত্তি ধরিবারই বা প্রয়োজন কি? একটা মূর্ত্তি ধরিয়া আসিলেই ত যথেষ্ট হইত! তাই আমাদের মনে হয়, ওটা আদৌ ভূতের কাণ্ড নহে। ওটা খাঁটি চিন্তামূর্ত্তি। আরও মনে হয়, ঘোড়াটা মরিয়া গিয়াছিল, ঘোড়াটা যদিও ভূত হইয়া মনিবের কাছে থাকিতে পারে, সহিস দুই জনের ভূত হইয়া মনিবের কাছে ঘুরিয়া বেড়ান সম্ভব নহে; কেন না, যে মরিয়া গিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। জীবিতকালে এ দেশীয় সহিস সর্ব্বদাই ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। তাই মরণের পর বাড়ী আসিবার ভাবনা জাগিলে সহিসের কথাও মনে আসিয়াছিল। এইটিই যুক্তিসঙ্গত কথা। ভারত-বর্ষে অনেক সহিস-ভূত আছে স্বীকার করি। কিন্তু মরণের পরও তাহারা মনিবের চাকরী করিতে আইসে, তাহার কোন প্রমাণ বা সম্ভাবনা নাই।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নূতন রকমের ভূত

ভূতেরা সব সময়েই যে পূরাপূরি দেহটা ধরিয়া থাকে, তাহা নহে। কোন সময় বা শুধু মাথাটা, কোন সময় বা শুধু একখানা হাত, এইরূপ শরীরের খানিক খানিক অংশ মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে। এই রকম খানিকটা মাত্র দেখা দেওয়ার ব্যাপারও অনেক ঘটিয়াছে। রেভারেণ্ড এলীন্ টমাস্ এই রকম একটা বীভৎস গল্প লিখিয়াছেন। গ্রীষ্মকাল, এক দিন সন্ধ্যারাত্রে তখন নয়টা বাজিতে আর ২০ মিনিট আছে, এমন সময় তিনি দক্ষিণ ওয়েল্স্ প্রদেশে ল্যাংনীর নামক স্থানের কাছে বেড়াইতে-ছিলেন। সেই সময় একটা ভূতের মাথা তাঁহার চোখে পড়িল। সেটা একটা ভয়ানক কাণ্ড! তাঁহার নিজের মুখের কথাই আমরা নিম্নে লিখিতেছি :—

"আমি বেড়াইতেছিলাম। একবার মুখ ফিরাইয়া দেখি যে, আমার মুখের একেবারে কাছে শূন্যে আর একখানি মুখ ঝুলিতেছে। মুখখানি বুড়া মানুষের, তাহাতে একটি দাঁতও নাই, ঠোঁট দুখানা খুব পাতলা, অল্প একটু হাঁ করিয়া আছে, মুখে রক্তের লেশও নাই, সমস্ত মুখখানির উপর কোঁচকান দাগ। গালদুইটি তুবড়িয়া গিয়াছে, চোখ দুইটি যেন একেবারে গর্ত্তে পড়িয়াছে, কিন্তু খুব ঝক্‌ঝকে, তাহাতে যেন অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি! সেই বিশ্রী মুণ্ডটিতে আবার দুই টুক্‌রা ছিটের কাপড় বাঁধা। টুক্‌রা দুইখানা হলুদ রঙ্গের। একখানি টুক্‌রা থুতনীর নীচে দিয়া গালের উপর দিয়া মাথার উপরে বাঁধা। আর একখানি কপাল বেড়িয়া মাথার পিছনে বাঁধা। "ঐ রকম ধড়াচূড়া-বাঁধা বিশ্রী মুখখানা দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা

কাঁপিয়া উঠিল। আমার ঠ্যাংএ যত জোর ছিল, তত জোরে একটা দৌড় দিয়া আমি একেবারে প্রায় ৬০ গজ দূরে পলাইলাম। তাহার পর একটু দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম, সেই ভয়ানক মুখখানাকে কতটা তফাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, একবার দেখি। এই ভাবিয়া ফিরিয়া চাহিলাম। চাহিবামাত্র দেখি—মুখখানা তখনও আমার মুখের কাছেই রহিয়াছে। এত ছুট দিয়া পলাইয়াছি, তবুও দেখিলাম, উহার কাছ হইতে এক আঙ্গুলও দূরে আসিতে পারি নাই। তখন আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম, আমার আর কথা সরিল না।'

মিঃ টমাস্ ত ঐরূপ দেখিলেন। তিনি আবার খানিকটা দৌড়িলেন, দৌড়িয়া আবার ফিরিয়া দেখিলেন। সেবার দেখিলেন, মুখখানা ক্রমশঃ তাঁহার কাছ হইতে গির্জ্জার কাছে গেল, তার পর গির্জ্জার বাড়ীর প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া পৌছিল। তাহার পর আর দেখা গেল না। যে স্থানটিতে উহা মিলাইয়া গেল, সেখানটা তিনি চিনিয়া রাখিলেন। তিনি যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেখানে যাইয়া এই ব্যাপার বলিলেন। মুখের বর্ণনা শুনিয়া বাড়ীওয়ালা ভূতটাকে চিনিয়া ফেলিয়া বলিল—ও একটা বুড়ো সন্ন্যাসী ভূত, ১৫ বৎসর হইল ও মরিয়াছে। যে স্থানে টমাসের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, তার নিকটে একখানি কুঁড়ে ঘরে বাস করিত, আর যেখানে মিলাইয়া গেল, সেখানে উহার গোর হইয়াছে। "প্রকৃত ভূতের গল্প" নামক পুস্তকের ২০০ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার আরও বিশদ বর্ণনা আছে।

বুড়ো মানুষের মুখ স্বভাবতঃই বিশ্রী হয়, আর ঐ খড়াচুড়া থাকায় আরও বিকট হইয়া উঠিয়াছিল। নচেৎ টমাসের ভয় পাইবার মত কিছুই ছিল না। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। টমাস পুরোহিত ছিলেন। ভূতটা হয় তো মনে করিয়াছিল যে, তিনি তাহাকে উদ্ধার করিয়া দিতে বা কোন রকম সাহায্য করিতে পারিবেন। তাই মনে করিয়া হয় তো সে ঐ রকম ভাবে আসিয়া দেখা দিল। কিংবা এমনও হইতে

পারে যে, জীবিতকালে বহুদিন মানুষের কাছে থাকায় সে মানুষের সঙ্গটা বড়ই ভালবাসিয়াছিল, তাই মরণের পর আবার মানুষের কাছে একটু থাকার খেয়াল জাগিয়া উঠিল। সেই জন্যই সে খানিকটা সময় টমাসের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিল।

"প্রকৃত ভূতের গল্প" পুস্তকে ১৫৩ পৃষ্ঠায় আর একটি ঐ রকম ভাবের গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। সে-ও একটা শুধু মুণ্ডের কথা। কিন্তু সে মুণ্ডটা আরও ভয়ানক। আর সেই মুণ্ডটা যে কেন দেখা দিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। গল্পটা ষ্টেড সাহেব ব্রোকলি নিবাসিনী জনৈক ভদ্রমহিলার কাছে শুনিয়াছিলেন। ব্যাপারটা এই :—

একটা রাক্ষস ভূত

"গ্রীষ্মকাল। একদিন শনিবার সন্ধ্যা আটটার সময় আমি বাড়ীতে একাই ছিলাম। আমার দুটি ছেলেও বাড়ীতে ছিল বটে, কিন্তু তাহারা সে সময় স্নানের ঘরে গিয়াছিল। তাহাদের বয়স ৮।৯ বৎসর। স্নানের ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিয়া আমি সিঁড়ির উপরে ছোট ঘরটিতে গিয়া ভাবিতেছি—যাই, নীচে যাইয়া অমুক জিনিসটি আনি গে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি একবার উপরের দিকে চাহিয়াছি। চাহিয়াই যাহা দেখিলাম, তাহাতে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কি ভয়ানক! সিঁড়ির কোণ হইতে প্রায় ৪ হাত তফাতে আমার মাথার উপরে ৫।৬ ইঞ্চি দূরে একটি অদ্ভুত রকমের আলো। আলোটা আমার সম্মুখ দিকে। আমি ভাবিলাম, হয় তো কোন দিক্ হইতে অন্য একটা আলোর প্রতিবিম্ব ওখানে আসিয়া পড়িয়াছে। তাই চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম—কোন দিকেই আর আলো নাই। সিড়ির ছাদটা খুব উঁচু বলিয়া সিঁড়িতে স্বভাবতঃই অন্ধকার হইত না, আলো জ্বালিয়া দিবারও প্রয়োজন ছিল না।

"আমি আবার আলোটার দিকে চাহিয়া খুব ভাল করিয়া দেখিতে

লাগিলাম। কথাগুলি বলিতে আমার যে সময় লাগিতেছে, তদপেক্ষা খুব কম সময়ের মধ্যেই দেখিলাম যে, ঐ আলোটা আস্তে আস্তে একটা মুখ ও মাথা হইয়া উঠিল ; মুখের রংটা হলুদ ও সবুজে মিশানো ; মাথাটা বিপুল জটার রাশি। দেখিলাম—মুখখানি খুব চৌড়া, সাধারণ মানুষের মুখের অপেক্ষা অনেক বড়, চোখ দুইটি খুব চ্যাপা চ্যাপা, চোখের মণি সবুজবর্ণ, গালের রং হলুদবর্ণ ; মুখে দাড়ি-গোঁপ নাই। এইরূপ একখানা মুখ—শুধু মুখ দেখা গেল। শরীরের আর কোন অবয়ব নাই, শুধু ঐ বিশ্রী বীভৎস একখানা মুখ! মুখখানা বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, দেখিলাম—মুখে বিশ্রী একটা সয়তানী ভাব প্রকাশ পাইতেছে। মুখখানা একদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়াছিল। তখন আমার খুব ভয় ও বিস্ময় দুই-ই হইল। ভয় হইল বটে, কিন্তু আমি বুদ্ধি হারাইলাম না। মূর্তিটার দিকে চাহিয়াই আমি বলিলাম—'খৃষ্টের দোহাই দিয়া আমি বলিতেছি, তুমি চলিয়া যাও।' এই কথা বলিবামাত্র সেই সয়তানী মাথান মুখখানা মিলাইয়া গেল। তাহার পর ওটা আমার চোখে আর পড়েনি।

যে ভদ্রমহিলা এই বিবরণটি ষ্টেড্ সাহেবকে দিয়াছিলেন, তিনি নিজেই বেশ একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। যাহারা কিছু মানিতে চাহে না, তাহারা ঐ কৈফিয়ৎটা শুনিলে কতকটা নিরুত্তর হইয়া থাকিবে। সেই ভুক্তভোগী মহিলা এইরূপ বলিয়াছেন :—"যাহাদের যকৃতের দোষ আছে বা যাহারা পিত্তপ্রধান লোক, তাহাদের ভয় বেশী ; তাহাদের দৃষ্টিভ্রমও ঘটিতে পারে। আমার কখন পিত্ত-দুষ্টি ঘটে নাই বা যকৃতের দোষও নাই! আমি ... সমিতির লোক, সকলেই জানে, আমার মনের বল খুব বেশী।" ... টমাস ... অপেক্ষা এই স্ত্রীলোকটি যে সাহসী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। টমাস যে মুখখানা দেখিয়াছিলেন, সেখানার অপেক্ষা এ মুখখানা সর্বাংশেই ... বেশী ভয়ানক। টমাস ভোঁ দৌড় দিয়া পলাইয়াছিলেন, আর ... স্ত্রীলোকটি শান্তভাবে মুখখানার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন। ... নিশ্চয়ই বেশী সাহসী।

এই ব্যাপারের দুইটি ব্যাখ্যা আমাদের মনে আইসে। এটা হয় তো আদৌ কোন মানুষের মুখ নহে। বোধ হয়, এটা একটা চিন্তা-মূর্ত্তি। অনেক কবি, অনেক লেখক তাঁহাদের পুস্তকের মধ্যে কত রকম বীভৎস মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া চরিত্র আঁকেন, অনেকে সেই সব লেখা পড়িয়া সেই সব মূর্ত্তির চিন্তা করেন। সেই সব চিন্তা মূর্ত্তি ধরিয়া সূক্ষ্ম-জগতে বাস্তবিকই বিচরণ করিয়া বেড়ায়। হয় তো ঐ মহিলাটিকে ঐ রকম কোন একটা মূর্ত্তির বিষয় পড়িয়াছিলেন, পড়িবার পর তিনি মূর্ত্তিটা হয় তো ভাবিয়াছিলেন, এখন তাই দেখিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ঐ স্থানেই বা ঐ মূর্ত্তি আসিল কেন, কেমন করিয়াই বা আসিল, আর দেখা দিবার মত স্থূলরূপই বা কেমন করিয়া ধরিল, স্থূলরূপ ধরিবার শক্তি কোথা হইতে পাইল, আর ঐ মহিলাই বা সূক্ষ্ম-জগতের মূর্ত্তি দেখিবার শক্তি কেমন করিয়া লাভ করিল। এ সকল কথার উত্তর দেওয়া যায় না। গল্পটা আমরা যতটুকু জানি, তাহাতে ঐ সকল কথার উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সকল কথার উত্তর দিতে না পারিলেও আমাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, ঐ মুখখানি চিন্তা-মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। আবার আর এক রকমের ব্যাখ্যাও আছে। হইতে পারে, মূর্ত্তিটা কোন রাক্ষস-শ্রেণীর জীবের। হয় তো ঐ সব জীব বিশেষ কারণ ব্যতীত মানুষের চোখে পড়ে না। আর চোখে পড়াও যেন ভগবানের ইচ্ছা নহে। এখন যেখানে আট্‌লাণ্টিক্ মহাসমুদ্র রহিয়াছে, বহুকাল পূর্ব্বে সেখানে আট্‌লাণ্টিস্ নামক একটা মহাদেশ ছিল। দেশটা কালক্রমে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই আট্‌লাণ্টিস্ মহাদেশের অনেক তথ্য এখনও জানিবার উপায় আছে। সেই দেশে, তখনকার লোকের মধ্যে নাকি এই রকম ভয়ঙ্কর জীব দেখা যাইত। ইহাদের দ্বারা নাকি বিস্তর অনিষ্টও তখন হইয়া গিয়াছে। তাহার পর প্রাচীন কালের পুস্তকাদিতেও এই রকম জীবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ রকম জীবের অনেক গল্পসল্পও প্রচলিত

আছে, দৈত্য-দানবের কথা আজও চলিয়া আসিতেছে। অনেকে না কি অনেক দৈত্য-দানব দেখিয়াওছেন। এইরূপ জীবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। ইহাদের সঙ্গে দেখা হইলে তাহার ফলে অনিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ মুখখানির যেরূপ বর্ণনা শুনা গেল, তাহাতে উহাকে ঐ দৈত্যদানব রাক্ষস-শ্রেণীর জীব বলিয়াই ধারণা জন্মে। দৈত্য-দানব ভাবিয়া লইলেও আমাদের একটা কথা মনে আইসে। মনে হয়, সহরতলীর শান্তিময় কুটীরে হঠাৎ ঐ রকম একটা রাক্ষস আসিয়া হাজির হইল কেন? এ রকম ভাবে আসার কারণটা বুঝিয়া উঠা খুব কঠিন। তাই মনে হয়, ওটা সম্ভবতঃ চিন্তা-মূর্ত্তি। চিন্তা-মূর্ত্তি হইলেও একটু অদ্ভূত রকমের মূর্ত্তি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, স্ত্রীলোকটি একটু ধৈর্য্য না ধরিয়াই খৃষ্টের দোহাই দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ঐরূপ না করিলে হয় তো আরও তথ্য জানা যাইত। অনুসন্ধান-সমিতির লোকেরা ঐরূপ মূর্ত্তি দেখিলে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করিতে পারেন।

কখন কখন ভূত সর্ব্বদাই দেখা দিয়া বিরক্ত করিয়া তুলে

যাহারা একটু সহজ-বিকারী লোক, যাহারা সহজেই উৎফুল্ল হয়, সহজেই দুঃখিত হয়, সহজেই কাতর হয়, এই রকম লোকের ঘাড়েই বেশী ভূত আসিয়া চাপিয়া বসে। ভূতে তাহাদিগকেই বেশী ধরে। মরণের পর স্থূল জগতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য অনেকে ঐরূপ লোকের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকে। যার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, সে বিরক্ত ও জ্বালাতন হইয়া উঠে। সাধারণতঃ ভূতেরা আসিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করে, কখন কখন দরজা প্রভৃতির গায়ে খুব ভয়ানক ধাক্কা মারে, কখন কখন সড় সড় শব্দ করে, কখন কখন বা ফুস ফুস করিয়া কথা বলে। খুব বেশী সময় ভূতেরা এতটাই করিতে পারে। ইহার অপেক্ষা বেশী জানাইবার ক্ষমতা তাহাদের হয় না। কিন্তু কখন কখন তাহারা একখানা হাত প্রকাশ করিয়া সেই হাতখানা স্থূল করিয়া শক্তিশালী করিয়া তুলে। সেই হাতে বেশ

করিয়া কোন কিছু ধরিতেও পারে। যাঁহারা ভূতের বৈঠকে যাওয়া-আসা করেন, তাঁহাদের অনেকেরই সঙ্গে ভূত ফিরিয়া থাকে। বৈঠকে অনেক ভূত আইসে। তাহারা বৈঠকী-ভূত। মরণের পর যে সকল ব্যক্তিকে স্বার্থপর বলিয়া মনে হয়, আর যাহারা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই আবার পৃথিবীতে জন্মাইতে চায়; তাহাদিগকে বৈঠকী-ভূতেরা বৈঠকে আসিতে দেয় না। বৈঠকের লোকের মধ্যে যাহার ঘাড়ে ভূত আইসে, বৈঠকী-ভূত তাহাকে খুব পাহারা দিয়া রক্ষা করে, কিন্তু অন্যান্য লোকগুলির উপর সব সময় ততটা চোখ রাখিতে পারে না। তাই অপর স্বার্থপর ভূত বৈঠকের অন্যান্য সহজ-বিকারী লোকের পিছন লয়। মনে করে, তাঁহাদের দ্বারা ইচ্ছামত কাজ সাধন করিয়া লইবে। এইরূপ ভাবের একটা গল্প "ভূত ও স্বপ্ন" পুস্তকের ২৬৬ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ ঘটনাটি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কথাগুলি যথাযথ আমরা তুলিয়া দিলাম। তাঁহার কথাগুলি এই :—

ভূত কুকুর হইয়া আসিয়া আবার স্থূল হাতে বিছানা টানিল

"ভূতের বৈঠকে ৩।৪ দিন বসিবার পরই আমার বন্ধু বোল্টার কেমন একরকম হইয়া উঠিল। সে আর ঘরে একা শুইতে চায় না। দুইজনে একই বিছানায় শুইলাম, অনেক রাত্রিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গায় দেখিলাম যে, ঘরের মধ্যে বিশ্রী গোলমাল হইতেছে, আর কে যেন হুটাপুটি করিয়া বেড়াইতেছে। দেখিলাম, ঘরের দরজাটাও খোলা। পূর্ণচন্দ্রের কিরণ ভিতরে আসিয়া পড়িতেছে। ঘরের মধ্যে ঠিক যেন দিন হইয়া উঠিয়াছে। চাহিয়া দেখি, ঘরের মধ্যে ৪।৫টা বড় বড় কাল কুকুর! কুকুরগুলি লম্ফঝম্প দিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। একটা আমার বিছানার উপরে চড়িয়া বসিল, আর একটা আমার নাকের সঙ্গে তাহার নাকটা ঘষিয়া দিল। দেখ কাণ্ড! আমি কুকুর

বড় ভালবাসিতাম। যেখানে ভালবাসা, সেখানে ভয়ও কম। তাই অতগুলি কুকুর দেখিয়া আমার ভয় হইল না। আমি উঠিয়া, কুকুর গুলিকে তাড়াইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। তাহার পর আবার শুইয়া পড়িলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, ঐগুলি সত্য সত্যই কুকুর। উহারা যে ভূত, তাহা কখনই ভাবি নাই।

"শুইবামাত্র আমি আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। খানিক পরে আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি—কে যেন বিছানার কম্বলখানা ধরিয়া টানিতেছে! আমার মনে হইল, আমার পিঠের নীচে থেকে কম্বলখানা শুড় শুড় করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমি কম্বলখানা টানিয়া উপরের দিকে আনিলাম। কিন্তু, কম্বল আবার নীচের দিকে আস্তে আস্তে চলিল।

"আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমি আবার উহা টানিয়া লইয়া ধরিয়া রাখিলাম। ধরিয়া রাখিতে রাখিতে আমার আবার ঘুমের ঝোঁক আসিল। একটু পরেই আবার জাগিয়া দেখি যে, কম্বল চলিতেছে, শুড়-শুড়—শুড়-শুড় করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহার পর জোরে একটা হেঁচকা টানে কে যেন উহা মেঝের উপর লইয়া ফেলিল। যখন এই সব কাণ্ড হইতেছিল, তখন আমি কয়েকবার বোল্টারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সে খুব ঘুমাইতেছিল। কিন্তু যখন হেঁচকা টানে কম্বল চলিয়া গেল, তখন আমার ভয় হইল, তখন আমি তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিলাম। জাগাইতে পারিলাম না। সে ঘুম যেন মরা মানুষের ঘুম! কিছুতেই সে জাগিল না, বন্ধুর মুখখানি স্বভাবতঃ খুব সাদা, এখন আবার তাহার উপর জ্যোৎস্না পড়ায় উহা মার্ব্বেল পাথরের মত দেখাইতেছিল। একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি মেঝে হইতে কম্বলখানি আবার বিছানার উপরে আনিলাম এবং খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিলাম। আবার কম্বলে টান পড়িল—টানের জোর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তখন আমার বিশ্রী ভয় হইল। আমার গায়ে যত জোর

আছে, আমি তত জোরে উহা চাপিয়া ধরিলাম। ভয়ে মড়ার মত হইয়া গেলাম।

"পিঠের দিকে কিছু ধরিবার মত আছে কি না দেখিবার জন্য আমি যেই ঘাড় ফিরাইয়াছি, অমনই বোধ হইল, আমার গায়ে কে হাত দিল। কে যেন আঙ্গুল দিয়া আমার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে মাথার দিকে যাইতেছে। ভয়ে তখন আমি পাগলের মত হইয়া উঠিলাম। আমি মহা ভয়ে কম্বল ছুড়িয়া মেঝেয় ফেলিয়া দিলাম; তাহার পর যে হাতখানা আমার গায়ের উপর পড়িয়াছিল, সেখানা চাপিয়া ধরিলাম, মহা ভয়ে হাতখানা চাহিয়া দেখিলাম, তাহার পর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। হাত ছুড়িয়া দেওয়া অদ্ভুত কথা নহে; কেন না, উহা শুধুই একখানা হাত, দেহের সঙ্গে উহা জোড়া নহে! হাতখানার গায়ে খুব লোম, আর দেখিতে কাল। আঙ্গুলগুলা ছোট ছোট, আঙ্গুলের মাথা চ্যাপা চ্যাপা, আঙ্গুলের মাথায় খুব বড় বড় নখ, যেন বাঘ-ভালুকের নখ! আশ্চর্য্য, দেখিলাম বুড়া আঙ্গুলটা নাই! আমার বিশ্রী ভয় হইল, আমি আর উঠিতে পারিলাম না। শুইয়া থাকিলাম, তাহার পর আবার একটু ঘুম আসিয়া পড়িল। ঘুমাইবার আগে বোল্‌টারকে আর একবার জাগাইবার চেষ্টা করিয়াও জাগাইতে পারি নাই। রাত্রি প্রভাত হইলে আমি উঠিয়া তাহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। বন্ধু বলিল, আরও কয়েক জন তাহার কাছে আগে শুইয়াছিল, তাহারাও ঐ হাতখানা দেখিয়াছে। বন্ধু বলিল—"তোমার সৌভাগ্য যে, বড় বড় কাল কাল কুকুরগুলা দেখ নাই; একটা দুটো নহে, একটা পাল!"

মনে হয়, এ ব্যাপারটা ভূতেরই কাণ্ড। ইচ্ছা করিয়াই যেন কোন ভূত বোল্‌টারকে জ্বালাতন করিত। ইহাতে আরও মনে হয়, বোল্‌টার বোধ হয় কোন অসভ্য লোকের উপর কোন দিন একটু আধটু অন্যায় করিয়াছিল, তাই বোল্‌টারের উপর তাহার একটা বিদ্বেষ রহিয়া গিয়াছিল। ঐ রকম কাল, আঙ্গুল কটা, বিশ্রী হাত কখনই শ্বেতাঙ্গ জাতির হইতে

পারে না। ওটা নিশ্চয়ই কোন অসভ্য লোকের হাত। কাল কাল কুকুরগুলির কথা বড়ই অদ্ভুত। যেন ভোজবাজি! কোথা হইতে আসিল, আর গেলই বা কোথায়! কুকুরগুলা যেন পোষা। চমৎকার ব্যাপার! কুকুরগুলার কথা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

"আমাদিগের মধ্যে অদ্ভুত কাণ্ড" নামক পুস্তকের ১০০-১০২ পৃষ্ঠায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ হেন্‌রী স্পাইসার কাপ্তেন মর্‌গানের একটা কাহিনী লিখিয়াছেন। সে গল্পটার সিদ্ধান্ত করাও যার-পর-নাই কঠিন।

পাখী ভূত

"কাপ্তেন্ মর্‌গ্যান্ এক দিন সন্ধ্যাকালে জনৈক বন্ধুর সঙ্গে লণ্ডনে গিয়াছিলেন। একটা সেকেলে ধরণের বড় বাড়ীতে যাইয়া বাসা লইলেন। শুইবার ঘরটি খুব বড়, বিছানাটাও খুব প্রশস্ত।

"যথাসময়ে আহারাদির পর কাপ্তেন শুইলেন ও ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলেন, তাঁহার কাছে একটা পাখীর পাখার শব্দ হইতেছে। সেই পত্-পত্ শব্দেই কাপ্তেনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আর সেই পাখার হাওয়ায় তাঁহার হাড়ের মধ্যে পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছিল। তিনি জীবনে না কি কখন ওরূপ ঠাণ্ডা বোধ করেন নাই। তিনি ধাঁ করিয়া উঠিয়াছিলেন। উঠিয়া বসা যেমন, আর অমনই একটা প্রকাণ্ড কাল রঙের পাখী ডানা বিস্তার করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হাজির। পাখীর চোখ দুটি লাল, যেন আগুনের ফুলকী।

"পাখীটা ঠিক্ সম্মুখে আসিয়া রাগান্ধ হইয়া তাঁহার মুখে ঠোকর মারিতে আসিল। তিনি হাত দিয়া, বালিস দিয়া তাহার আক্রমণ হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আর পাখীটার কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে অবাক্‌ও হইলেন। প্রথমে তিনি ভাবিলেন—পাখীটা হয় তো এই বাড়ীওয়ালার, কোন রকমে ছাড়া পাইয়া এই ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

"পাখীটা বার বার বিশ্রী রাগান্ধ হইয়া কাপ্তেনকে জ্বালাতন করিতে লাগিল। সে এমন বিশ্রী আক্রমণ যে, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। তিনি তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন বটে, কিন্তু একটিবারও পাখীটাকে ছুঁইতে পারিলেন না। কয়েক মিনিট্ ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিল। তাহার পর কাপ্তেনের সত্য সত্যই রাগ হইয়া উঠিল। তখন বিছানা হইতে লম্ফ দিয়া তিনি পাখীটাকে তাড়াইয়া গেলেন। পাখীও পলাইতে লাগিল। কাপ্তেন বেগে ধাইয়া গেলেন। পাখীটা পত্-পত্ শব্দ করিতে করিতে ঘরের কোণে একখানি সোফার কাছে যাইয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িতেছিল। মর্‌গ্যান স্পষ্ট আলোকে দেখিলেন, পাখীটা যেন ভয়ে জড়সড় হইয়া সেই সুন্দর আস্তরণে ঢাকা সোফাখানির উপরে গিয়া বসিয়া পড়িল।

"দুই এক সেকেণ্ড থামিয়াই মর্‌গ্যান্ সেই প্রকাণ্ড কাল পাখীটাকে বেগে ধরিতে গেলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার হাতের মধ্যেই পাখীটা মিলাইয়া গেল। কাপ্তেন যেন বাতাস চাপিয়া ধরিয়াছেন বলিয়া মনে হইল। তখন তিনি আলো হাতে করিয়া ঘরটির সব জায়গার সব কোণে, সব কুলুঙ্গী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। পাখী কোথাও নাই। অনেকক্ষণ খুঁজিয়া না পাইয়া শেষে যাইয়া শুইলেন। রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব হয় নাই।

রাত্রি প্রভাত হইলে কাপ্তেন নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া পোষাক পরিতে পরিতে মনে করিলেন, 'রাত্রির পাখী-ভূতের কথাটা কাহাকেও বলিব না, কিন্তু আজ রাত্রে আমি বন্ধুর ঘরে শুইব আর বন্ধুকে এই ঘরে শুইতে দিব। দেখা যাক্, বন্ধুই বা কি রকম দেখিয়া বসে।' রাত্রি হইলে কাপ্তেন তাহাই করিলেন। বন্ধুর সঙ্গে শোবার ঘর বদলা-বদলি করিয়া লইলেন। বন্ধু পরদিন নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বলিলেন—'কি বিশ্রী ঘর! মস্ত বড় একটা কাল পাখী সারারাত রাত আমাকে বিরক্ত করিয়াছে, ধরিতে গেলাম, ধরিতে পারিলাম না, কোথা দিয়া যে পলাইল, তাহাও টের পাইলাম না। একটা অদ্ভূত পাখী!"

গল্পটিতে যে পাখীর বর্ণনা পড়া যায়, সে রকম পাখী এখন পৃথিবীর কোন স্থানেই দেখা যায় না। মনে হয়, পাখীটা অত বড় নাও হইতে পারে, হয় তো একটু বাড়াইয়া বলা হইয়াছে। অনেকে ইচ্ছা করিয়া ঈগল পাখী পোষে, অনেকে বা শকুনিও পোষে। যদি স্বীকার করাও যায় যে, গল্পের পাখীটা ঐরূপ একটা পোষা পাখীর প্রেতাত্মা, তাহা হইলেও মনে হয়, সে অকারণে এক ব্যক্তিকে ঐরূপভাবে আক্রমণ করিতে আসিল কেন ? আক্রমণ করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, ওটা আদৌ ভূত নহে। হয় তো কোন লোক ঐ ঘরটিতে থাকিত, তাহার ইচ্ছা নয় যে, ঐ ঘরে আর কেহ শোয়। তাই অপরকে তাড়াইবার জন্য ঐ রকম একটা বিকট চিন্তা-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ পাখীর মূর্ত্তিটাকে সেই জন্য একটা চিন্তা-মূর্ত্তি বলিয়াই আমাদের মনে হয়। যে লোকটার এই চিন্তা-মূর্ত্তি, সে জীবিতও থাকিতে পারে, কিংবা হয় তো মরিয়াই গিয়াছে। সূক্ষ্ম-জগতে অনেক নিম্ন-শ্রেণীর দেব-যোনি আছে। তাহাদিগকে উপ-দেবতা বলিলেও অন্যায় হয় না। ঐ পাখী-মূর্ত্তিটা সেই রকম উপদেবতাও হইতে পারে। যদি উপ-দেবতাই হয়, তবে উহার ঐরূপ কাণ্ড করিতে ঘরের মধ্যে আসিবার প্রয়োজন কি, তাহাও বুঝিয়া উঠা যায় না। আমরা নিজে যদি ঐরূপ ব্যাপার দেখিবার সুযোগ পাই, তবেই একটা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, ওটা ভূত, কি চিন্তা-মূর্ত্তি, কি উপদেবতা, কি আর কিছু। অন্যের বিবরণ পড়িয়া, অন্যের মুখে শুনিয়া, একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায় না। ভূতের যতটা কাণ্ডকারখানা আমাদের জানা আছে, তাহার কোনটাতেই উহা মিল খায় না। ওটা একটা নেহাত নূতন রকমের ব্যাপার। এই পৃথিবীতে যেমন কত রকম অদ্ভুত ব্যাপার আছে, সেই রকম সূক্ষ্ম-জগতেও কত রকম সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটে। আমরা যদি নিজেরা একবার সেখানে যাইয়া স্ব-চক্ষে দেখিতে পারি, তবেই প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিতে সমর্থ হই।

একটা প্রেতিনীর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়

"প্রকৃতির নিশা-ভাগ" নামক পুস্তকের ৩৬৯ পৃষ্ঠায় মিসেস্ ক্রো একটা গল্প লিখিয়াছেন। গল্পটি খুব বিখ্যাত, প্রায় সকলেই জানেন। ক্রো বলিতেছেন—দুনিয়ার কিছুই অসম্ভব নহে। তাই তিনি ঐ গল্পটা বলিতেছেন। ব্যাপারটা এই ;—কলেজের এক জন অধ্যাপক একটি যুবতীকে ফুসলাইয়া পাপের পথে আনেন। তাহাকে কিছুদিন উপভোগের পর, অন্য একটি কুমারীকে বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রীলোকটি ইহাতে বড়ই ঝগড়াঝাটি আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে সে হঠাৎ মারা গেল। তাহার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় লোকে মনে করিল, অধ্যাপকই তাহাকে হত্যা করিয়াছে। লোকের এরূপ সন্দেহ হওয়া বাস্তবিকই অন্যায় নহে। এরূপ ধারণা লোকের হইতে পারে। খুনের অপরাধে তাঁহাকে অপরাধীও করা হইল। কিন্তু প্রমাণের অভাবে অধ্যাপক মুক্তি পাইলেন। এই ঘটনার পর হইতে দেখা যাইত, ঐ অধ্যাপক প্রত্যহ সন্ধ্যার পর অনেকটা রাত্রি পর্য্যন্ত কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ঘরে একাকী থাকিতেন। তাঁহার কোন মানুষ সঙ্গী থাকিত না। কিন্তু অনেকেই ভয়-চকিত গলায় বলিতে আরম্ভ করিল যে, উনি একা থাকেন না, যে স্ত্রীলোকটি খুন হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট কথা আমরা শুনিয়াছি, সে প্রেতিনী হইয়াছে, উনি সেই প্রেতিনী লইয়া রাত্রি কাটান।

করিন্থ সহরের কুমারী

মিসেস্ ক্রো ৩৭২ পৃষ্ঠায় একটা অদ্ভুত ব্যাপার লিখিয়াছেন। সেটা গ্রীস দেশের একটি কুমারীর কথা। ব্যাপারটি এই ;—একটি যুবতীর পিতার বাড়ীতে একটি ভদ্রলোক আসিতেন। যুবতী মরিয়া যাইবার ছয় মাস পরে প্রেতিনী হইয়া ঐ ভদ্রলোকের ঘরে এক দিন আসিয়া হাজির। প্রেতিনী তাঁহাকে দুই একটি উপহার দিল, তাঁহার সঙ্গে একটু খাওয়া-দাওয়াও করিল। কাজে কাজেই সে ভদ্রলোক তাহাকে সাধারণ ভদ্র

মহিলাই ভাবিলেন, প্রেতিনী বলিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু ঐ বাড়ীর ধাত্রী প্রেতিনীটাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। সে দৌড়িয়া গিয়া তাহার মা ও বাবাকে বলিল—"আপনাদের সেই মরা মেয়েটি আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে।" তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না। এরূপ কথা কেই বা বিশ্বাস করে? ধাত্রী তখনও সত্য বলিয়া জিদ্ করিতে লাগিল। তখন প্রেতিনীর মা দেখিবার জন্য ধাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, ঘর অন্ধকার, আর সেই আগন্তুক ভদ্রলোকও ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। পরদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, একটি যুবতী রাত্রিতে দেখা করিতে আসিয়া আমার সঙ্গে আঙ্‌টী বদলা-বদলি করিয়াছিলেন।" এই বলিয়া যুবতীর দেওয়া সেই আঙটীটি দেখাইলেন। মাতা পিতা দু জনেই আঙটীটা দেখিয়া চিনিলেন। এটা তাঁহাদেরই মেয়ের আঙটী। এই আঙটীটার সহিতই তাঁহারা মেয়েকে কবর দিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা স্থির করিলেন যে, নিশ্চয়ই বদমায়েসরা মরা মেয়েটার শব কবর হইতে উঠাইয়া এই আঙটী খুলিয়া লইয়াছে।

আগন্তুক ভদ্রলোক বলিলেন—"আপনারা অত ব্যস্ত হইবেন না। সেই যুবতী আজ রাত্রিতেও আসিতে চাহিয়াছে। আসিলেই আপনারা দেখিতে পাইবেন—সে আপনাদের মেয়ে কি অপর কেহ।" তখন যুবতীর মা ও বাপ তাহাই দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। রাত্রিকালে ঠিক সেই প্রেতিনী আসিয়া হাজির। তাহার মা-বাপকে গোপনে সংবাদ দেওয়া হইল যে, যুবতী আসিয়াছে। তাঁহারা মেয়েকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন। মরা মেয়েকে দেখিয়া বাপ-মা মহা আনন্দিত হইলেন; কিন্তু মেয়ে তত আনন্দিত হইল না। মেয়ে বলিল—"আপনারা এমন ভাবে হঠাৎ আসিয়া ভাল করেন নাই; এই লোকটির সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি মাত্র তিন দিনের জন্য আমি পাইয়াছি। এখন আমাকে অন্য একটা স্থানে যাইতে হইবে।" এই কথা বলিয়াই সে মরিয়া পড়িল— তাহার দেহটা সত্য সত্যই সেখানে পড়িয়া রহিল, সকলেই সে দেহ

দেখিল। অল্পসময় পরে দেখা গেল যে, ঘরে আর জন-মানব নাই। একটা মড়ার বাক্স পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহার উপরে সেই ভদ্রলোকের দেওয়া আঙটীটাও আছে। তখন ঐ মড়াটাকে পিশাচীর দেহ মনে করিয়া সহরের বাহিরে কবর দেওয়া হইল। দান-ধ্যান, জাঁক-জমক যতদূর করা উচিত, তাহার ক্রটি হইল না।

যে দুইটি গল্প বলা হইল, তাহার প্রমাণ-প্রয়োগ দেওয়া এখন অসম্ভব। যদি গল্প দুইটি সত্যই হয়, তবে দেখা যায় যে, প্রেতিনী দুইটি আধা-প্রেতিনী আধা-মানুষ হইয়া উঠিয়াছিল। এ অবস্থাটা মোটেই ভাল নহে। আগেকার গল্পটিতে দেখা যায় যে, প্রেতিনীটির সঙ্গে অধ্যাপকের যেন একটা কিছু বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, প্রত্যহ রাত্রিতে অধ্যাপককে আসিয়া দেখা করিতে হইবে। হয় তো প্রেতিনী তাঁহাকে বলিয়াছিল—"যদি তুমি না আইস, তবে তোমাকে আর তোমার নূতন বিবাহিতা স্ত্রীকে আমি ভয়ানক জ্বালাতন করিয়া মারিব।" তাই বোধ হয়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ অধ্যাপক প্রত্যহই প্রেতিনীর সঙ্গে খানিকটা করিয়া রাত্রি কাটাইতেন। আর প্রেতিনী যখন কথা কহিতে পারিয়াছিল, তখন স্থূল-শরীর ধরিয়া অনিষ্ট করা তাহার পক্ষে খুবই সহজ হইত। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রেতিনী ও অধ্যাপক উভয়েরই ক্ষতি হইতেছিল। প্রেতিনীর মুক্তির পথ বন্ধ হইয়া উঠিল; অধ্যাপকও একটা বিশ্রী লোকের সঙ্গে থাকিয়া জীবনের পবিত্রতা হারাইতে লাগিলেন। তাঁহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় গল্পটি আরও অদ্ভুত। এ রকম ঘটনা দেখা যায় না। ইউরোপ মহাদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে রক্ত-শোষক পিশাচীর অনেক গল্প প্রচলিত আছে। ঐ যুবতীর দেহটাকে কেন যে ঐরূপ পিশাচীর দেহ মনে করিয়া তফাতে গোর দেওয়া হইল, তাহা আমরা বুঝি না। সেই সকল পিশাচীর মত তো কোন ব্যাপারই দেখা যায় না। জীবনটিকে যদি সৎপথে চালান যায়, তবে বাঁচিয়া থাকা ভাল; মরিয়া যাওয়া আরও ভাল। কিন্তু জীবন

ও মৃত্যু এই দুইটির মাঝা-মাঝি অবস্থা কখনই ভাল নহে। সে অবস্থাটা বড়ই অস্বাভাবিক। কখন কখন এরূপ অবস্থা ঘটিলেও এরূপ খুব কমই ঘটিয়া থাকে। যাহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া কেবলই নিজের লাভ খুঁজিয়া বেড়ায়, কেবলই সংসার লইয়া মজিয়া থাকে, তাহাদেরই ঐরূপ ভয়ানক অবস্থাটা ঘটে। যে ব্যক্তি সাধারণ ভদ্রলোকের মত জীবন কাটান, তাঁহার ঐ দুর্দ্দশা হয় না। এ পৃথিবীতে রক্ত-শোষক পিশাচ-মূর্ত্তি অনেক আছে। সুখের বিষয়, তাহাদের সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।

আমরা অনেক আগেই বলিয়াছি যে, মানুষ মরণের পর অনেক দিন নিজের মৃত্যুর কথাটা বুঝিতেই পারে না। তাহারা জীবিত মানুষের মতই কাজ-কর্ম্ম করিতে যায়, অথচ পারিয়া উঠে না। তখন আস্তে আস্তে টের পায় যে মরিয়াছে। কেহ বা শীঘ্রই মরণের কথা বুঝিতে পারে, আবার কেহ বা বহু বৎসরেও নিজের মরণটা জানিতে পারে না। এ সম্বন্ধে একটা চমৎকার গল্প বলিতেছি। মিসেস্ ক্রো "প্রকৃতির নিশা-ভাগ" পুস্তকের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় গল্পটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গল্পটি এই :—

মরিয়াও অনেকে মরণের কথা টের পায় না

"আয়র্ল্যাণ্ডের এক জন পদস্থ ধনী ব্যক্তি এক দিন বড় রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, সেই রাস্তায় একটি বৃদ্ধ যাইতেছে, বৃদ্ধকে দেখিয়া মনে হইল—লোকটি কৃষক-শ্রেণীর, কিন্তু তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ মন্দ নহে। রবিবারে যেরূপ পোষাক সে দেশের লোকে পরে, বৃদ্ধের গায়ে সেইরূপ পোষাক। ভদ্রলোকটি দেখিলেন—বৃদ্ধ বহুদিনের প্রাচীন লোক, বয়স বিস্তর হইয়াছে; কিন্তু ঠিক যুবকের মত তর-তর করিয়া পাহাড়ী রাস্তায় উঠিয়া যাইতেছে। দেখিয়া ভদ্রলোক অবাক্ হইলেন। তখন তিনি বৃদ্ধের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার নাম কি? আর বাড়ীই বা কোথায়?' শুনিয়া বৃদ্ধ বলিল—"আমার নাম কার্ক প্যাট্রিক, আমি ঐখানে একটা কুঁড়ে ঘরে থাকি'

এই বলিয়া বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়া তার কুঁড়ে ঘরখানি দেখাইয়া দিল। ভদ্রলোকটি তখন বলিলেন—'সে কি? তুমি ওখানে থাক, অথচ আমি এ পর্য্যন্ত তোমার নাম শুনি নাই! আমি তো ওখানকার সকল লোকের নামই জানি। ও স্থানটা আমারই সম্পত্তি।' বৃদ্ধ বলিল—'আপনি এত দিন আমাকে দেখেন নাই? তাই ত, বড়ই অদ্ভুত কথা! আমি প্রত্যহই ত এখানে বেড়াই।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার বয়স কত?' বৃদ্ধ বলিল—'আমার বয়স একশ পাঁচ; আমি বরাবরই এখানে আছি।'

তাহার পর দুই একটা কথা বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। ভদ্রলোকটি তখন নিকটবর্ত্তী একটা ক্ষেত্রে গিয়া কয়েক জন কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কার্ক প্যাট্রিক নামে কোন বৃদ্ধকে কি চেন?' তাহারা বলিল—'না, আমরা কৈ তাহাকে চিনি না।' তিনি তখন কতকগুলি প্রবীণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল,—'হাঁ৷ মহাশয়, তাহার নাম জানি, তাহার শ্রাদ্ধের সময় আমরা খাইয়াছিলাম, ঐ যে পাহাড়টার উপরে একখানা কুঁড়ে ঘর, সেইখানে বুড়া থাকিত। আজ ২০ বৎসর হইল সে মরিয়া গিয়াছে।' এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোক অবাক্ হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তখন তাহার বয়স কত হইয়াছিল?' কৃষকেরা বলিল—'তখন তাহার বয়স ৮৫ বৎসর হইবে।' ভদ্রলোক দেখিলেন, ৮৫ আর ২০তে একশ পাঁচই হয়। বৃদ্ধ বাঁচিয়া থাকিলে সত্যই ১০৫ই হইত। বৃদ্ধ ঠিকই বলিয়াছে। এই গল্পটা সেই ভদ্রলোকের কাছেই পাওয়া গিয়াছিল! আর তিনি বলিয়াছেন, এটা সত্য ঘটনা। তিনি বলিয়াছেন—'আমি এই রহস্য বুঝিতে পারিলাম না, বৃদ্ধের নামও আমি কখন জানিতাম না। বৃদ্ধ মরিয়া যাইবার কয়েক বৎসর পরে আমি ঐ সম্পত্তি কিনিয়াছিলাম'।"

মানুষ মরিয়া গেলে ২০ বৎসরের মধ্যেও মৃত্যুর কথা বুঝিতে পারে না, এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে না। কিন্তু যে গল্পটা বলা হইল, তাহাতে দেখা যায়, বৃদ্ধ যুবকের মত বেড়াইতে পারে বলিয়া যেন তাহার একটা অহঙ্কারের

ভাব ছিল। খুব সম্ভবতঃ জীবনে তাহাকে একাই অনেক দিন কাটাইতে হইয়াছিল। তাহার সমসাময়িক লোকেরা নিশ্চয়ই অনেক আগে মরিয়া গিয়াছিল। তাই গল্পস্বল্প করিবার মত বৃদ্ধের ইয়ার-বন্ধু কেহই ছিল না। আর বোধ হয়, বৃদ্ধ শেষ জীবনে কালা হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং অন্যের কথাবার্ত্তাও তাহার কানে বড় একটা যাইত না। কিন্তু মনে হয়, বৃদ্ধ হঠাৎ ঐ ভদ্রলোকের কাছে আসিয়া হাজির হইল কেন, আর একবার-মাত্রই বা দেখা দিল কেন? যদি দেখাই দিল, তবে আর কাহাকেও কোন সময় ২।১ বারও দেখা দিল না কেন? শুধু দেখা দেওয়া নহে, ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলিয়া গেল। তবে কি বৃদ্ধ স্থূল দেহ ধরিয়া দেখা দিল ও কথা বলিল, না সেই ভদ্রলোকটার সেই সময়ের জন্য সূক্ষ্ম জগৎ দেখিবার মত দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল? কোন্‌টা সত্য? আমাদের মনে হয়, ভদ্রলোকটারই দিব্য-দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি-শক্তির বিকাশ কেন যে হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা জানি, কোন কোন সময়ে সাধারণ মানুষেরও দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়। কিন্তু সব সময় আমরা তাহার হেতু বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ঐরূপ সাময়িক শক্তির কারণ কখন কখন স্পষ্টতই বুঝা যায়, আবার কখন কখন আদৌ বুঝা যায় না। হয় তো সে শক্তিটা আরও উচ্চ লোক হইতে আইসে। আমরা ততটা উচ্চ স্তরের কথা খুব বেশী জানি না। সে সব বুঝিয়া উঠিবার শক্তি এখনও আমাদের হয় নাই।

কখন কখন ভূতেরা আলো হইয়া দেখা দেয়। "প্রকৃতির নিশাভাগ" পুস্তকের ১১৯ পৃষ্ঠায় এই রকম একটা গল্প দেওয়া হইয়াছে। গল্পটা এই:—

"একজন পুরোহিত সন্ধ্যাকালে গির্জ্জার প্রাচীরের উপর ঠেস দিয়া এদিক্-ওদিক্ দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আলো জ্বলিতেছে। মনে ভাবিলেন, হয় তো কেহ লণ্ঠন লইয়া আসিতেছে। লোকটা কে, দেখিবার নিমিত্ত তিনি দরজা খুলিয়া আলোর দিকে চলিলেন। কিন্তু দেখিলেন—কেহই নাই। আলোটা রাস্তা পার হইয়া দ্রুত চলিয়া

লাগিল, তাহার পর বনের মধ্য দিয়া একটা পাহাড়ের উপর উঠিল। তাহার পর একটা গোলাবাড়ীর কাছে গিয়া নিবিয়া গেল। আলোটা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন কি না পুরোহিত মহাশয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, ঠিক এমন সময় আবার উহা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, যেন ঐ গোলাবাড়ীর মধ্য হইতে উহা বাহির হইয়া আসিল। উহার সঙ্গে আর একটা আলো আসিল, তাঁহার কাছ দিয়া আবার ঠিক আগেকার স্থানটিতে গেল। সেখানে যাইবার পর দুইটাই নিবিয়া গেল। যেখানে আলোটা নিবিয়া গেল, সেটা একটা গোর-স্থান, সে স্থানটি পুরোহিত বেশ করিয়া চিনিয়া রাখিলেন। পরদিন সেটি কার কবর, সন্ধান লইলেন। জানা গেল, পাহাড়ের উপরে যে বাড়ীর সম্মুখে গিয়া প্রথম আলোটা নিবিয়া গিয়াছিল, ঐ কবরটা সেই বাড়ীর একটা লোকের। শুনা গেল, ঐ বংশের নাম—ম্যাকৃতী। বহুকাল না কি ঐ স্থানে গোর দেওয়া হয় নাই। পুরোহিত আরও শুনিলেন, ঐ বংশের একটা ছেলে পূর্ব্বরাত্রে হাম-জ্বরে মারা গিয়াছে।"

ঐ বংশের একটা লোক হয় তো আগে মারা গিয়াছিল। তাহার জীবাত্মা আলো-রূপ ধরিয়া এই নূতন-মরা ছেলেটার প্রাণটিকে আনিতে গেল। আলো আত্মার একটা নিদর্শন-মূর্ত্তি। আলো কখনই কবরের মধ্যে থাকে না। অজ্ঞান লোকেরা মনে করে, উহা মড়াটার সঙ্গে বুঝি মাটীর মধ্যেই থাকিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে।

———

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

ভূতের সঙ্কেত

ভূতেরা অনেক সময় সঙ্কেত করিয়া থাকে। আমরা এখন সেই সব সঙ্কেতের কথাই বলিব। এ সম্বন্ধে মিঃ ষ্টেড্ যাহা বলিয়াছেন, আমরা প্রথমে তাহাই অবিকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব; কেন না, তাঁহার কথাগুলি খুব সত্য। তিনি ভূতের সঙ্কেত সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"ভূতের সঙ্কেতগুলি ঠিক যেন 'ফনোগ্রাফ' নামক গানের যন্ত্রের মত। ঐ যন্ত্রে মানুষের গলার স্বর শুনা যায়, তাহা সকলেই জানেন। মানুষটা মরিয়া গেলেও বহুকাল বা বরাবরই তাহার গলার স্বরটাকে রেকর্ডে পুরিয়া ফনোগ্রাফের সাহায্যে ফুটাইয়া তোলা যায়। সেই রকম মানুষ মরিয়া গেলেও তাহার ইচ্ছা, তাহার ভয় প্রভৃতি সূক্ষ্ম-জগতের পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া থাকে; আর মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠে। মানুষ হয় তো স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে, কিংবা আবার হয় তো আসিয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছে, কিন্তু তবুও তার ভয়, ইচ্ছা প্রভৃতি স্থানবিশেষে ফুটিয়া উঠিতেছে। শুধু যে বায়ুমণ্ডলে মনের আবেগ প্রভৃতি ফুটিয়া উঠিবার মত শব্দই হয়, তাহা নহে। অনেক সময় ঘটনার মত ছবিও দেখা দেয়। লোকের স্থূল চোখে সেই ছবিও পড়িয়া থাকে।"—("প্রকৃত ভূতের গল্প" ৩১০ পৃষ্ঠা)

ষ্টেড্ সাহেবের ঐ কথাগুলি খুব সত্য। বাস্তবিকই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। "সাইকোমেট্রি" নামক বিজ্ঞান-তত্ত্বে আমরা জানিয়াছি যে, প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম জিনিসের মধ্যেও তাহার চারি দিকের ঘটনাবলীর একটা ছাপ লাগিয়া থাকে। ছাপটা চিরকালের জন্যই থাকে। একটা পদার্থে

ভিতরে কোন্ কোন্ ঘটনার ছাপ পড়িয়া আছে, তাহা আমরা স্থূল চোখে দেখিতে পাই না। ঐ ছাপটা সাধারণতঃ খুব সূক্ষ্মভাবেই থাকে। একটু বিশেষভাবে দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেলে ঐ সকল ছাপ দেখা যায়; কিন্তু যে ঘটনার ছাপটা সূক্ষ্মভাবে থাকে, সেটা যদি খুব একটা ভয়ানক রকমের ঘটনা হয়, তবে সেটাকে জানিয়া ফেলিতে খুব বেগ পাইতে হয় না। যাহাদের সূক্ষ্ম-শক্তির বিকাশ হয় নাই, তাহারাও সেটা অনেক সময় টের পায়। ভয়ানক ঘটনার ছাপ খুবই উপরে উপরে থাকে, সেটা ভূতের কাণ্ডের মত প্রায়ই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কোন স্থানে কাহারও খুব বেশী রকম মনের উদ্বেগ-অশান্তি ঘটিলে, কাহারও খুব বেশী ভয়, কষ্ট, দুঃখ, ঘৃণা বা কোন রকম ভয়ানক চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিলে, সূক্ষ্ম-জগতে সেই সব অশান্তির ভয়ানক স্পন্দন হইতে থাকে, সূক্ষ্ম-জগতে সেই দরুণ একটা ভয়ানক আলোড়ন-বিলোড়ন হয়। আর সেই স্থানে সূক্ষ্ম-জগতের পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া ঐ সব দুর্ঘটনার একটা ছাপ তৈয়ারী হইয়া থাকে। যাহার খুব সামান্য একটুও সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আছে, সে-ই তাহা বুঝিতে পারে। মানুষ একটু খিট্‌খিটে, একটু সহজবিকারী, একটু তরলচিত্ত হইলেই ঐ সূক্ষ্ম-জগতের ঘটনার ছাপ স্ব-চক্ষুতে দেখিতে পায়। তাহার মনে হয়, যেন তাহার চোখের উপরই ঐ সব ঘটনা ঘটিতেছে। আবার সময় সময় ঐ ছাপগুলি এমনই স্থূলমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠে যে, তখন যে কোন লোকই তাহা দেখিতে ও শুনিতে পায়।

আবার কখন কখন ভয় প্রভৃতি ভাবগুলির বেশ শব্দ শুনা যায়, মনে হয়, যেন কেহ ভয় পাইয়া দৌড়িতেছে বা কাঁদিতেছে, অথচ কাহাকেও দেখা যায় না, কোন মূর্ত্তি বা দৃশ্য চোখে পড়ে না। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখের "অনুসন্ধান ও মন্তব্য" নামক পত্রিকায় এইরূপ ভাবের একটি সুন্দর গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। টী, ওয়েষ্ট্‌উড্ ঐ গল্পটি প্রচার করিয়াছেন। ব্যাপারটি এই :—

একটা ভয়ের শব্দ

"এনফিল্ড্ চেজ নামক স্থানের কাছে একটা নির্জ্জন জায়গায় একটা পুরাতন বাড়ী আছে। বাড়ীটা বহুকালের পুরাতন; মনে হয় যেন জখম হইয়া গিয়াছে। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দুইটি স্ত্রীলোক সেখানে বাস করিতেন। তাঁহারা সম্পর্কে ভগিনী; বয়সও অনেক হইয়াছিল, অথচ বিবাহ হয় নাই। তাঁহাদের সঙ্গে আমার কতকটা আলাপ-পরিচয় ছিল। একবার তাঁহাদের বাড়ীতে আরও কয়েক জনের সঙ্গে নিমন্ত্রণ খাইতেও গিয়াছিলাম।

"বেশ-ভূষা ঠিক-ঠাক করিয়া লইবার জন্য চাকরেরা ঐ বাড়ীতে আমাকে একটা ঘর দেখাইয়া দিল। ঘরটি উপরের তলায়। আমি ঘরে একাই ঢুকিলাম। চাকর চলিয়া আসিল। ঢুকিবামাত্র একটা অদ্ভুত স্বর আমার কানে গেল। মানুষ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যেমন একটা চাপা শব্দ করে, আমি ঠিক সেইরূপ একটা স্বর ঘরের মধ্যে শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, যেন কেহ ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া ঐ রকম শব্দ করিতেছে। আর মনে হইল, যেন ঐ স্বরটি একেবারেই আমার কাছে হইতেছে। প্রথমে আমি তত গ্রাহ্য করিলাম না; ভাবিলাম, হয় তো চিমনীতে বাতাস বাধিয়া ঐরূপ শব্দ হইতেছে। আবার ইহাও মনে হইল, দরজাটা অল্প একটু খোলা আছে, দমকা বাতাস ঐ দরজায় বাধিয়া এই রকম শব্দের সৃষ্টি করিতেছে। আমি ঘরটার মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, শব্দটি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। আমি যে দিকেই যাই, শব্দটাও সেই দিকে চলে। এমন কি আমি একটি দূরস্থিত কোণে গেলাম, সেখানেও ঐ শব্দ। এমন কেন হইতেছে, ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া মনে শান্তি পাইলাম না। তখন তাড়াতাড়ি বেশ-ভূষা ঠিক করিয়া লইয়া নীচে বসিবার ঘরে নামিয়া আসিলাম। ভাবিলাম, এইবার ঐ উৎপাতজনক শব্দটা যাইবে। আশ্চর্য্য! তবুও শব্দটা আমাকে ছাড়িল না। সিঁড়ির উপর, উপরে, নীচে সর্ব্বত্রই ঐ ভয়াবহ শব্দ! খেতে বসিয়াছি, আরও পাঁচ জনে আমার কাছে বসিয়া

খাইতেছেন, তখনও ঐ শব্দ! আর আমার এত কাছে যেন কোন ভূত আমার গায়ে গায়ে বসিয়া ঐ শব্দটা করিতেছে। উহা আর কাহারও কানে পৌছিল না বটে, কিন্তু উহাতে বড়ই জ্বালাতন হইয়া উঠিলাম। সুখের বিষয়, ঐ ঘরটিতে আমাকে শুইতে হয় নাই।

খাওয়া-দাওয়ার পরে শীঘ্রই সকলে চলিয়া গেলেন; কারণ, অনেককে দূরে যাইতে হইবে। আমিও বাড়ী গেলাম। আমি বাহিরে আসিয়া নৈশ সমীরণে একটু শান্তি পাইলাম। বাহিরে আসিলে ঐ উৎপাতজনক শব্দ-টাও আর থাকিল না।

এই ঘটনার পর ঐ বাড়ীতে আমি আর একবার গিয়াছিলাম। তখন আর একটা ঘরে ঐ ভগিনী দুইটির সঙ্গে আমার গল্পস্বল্প হইয়াছিল। আমি গল্প-প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে ঐ শব্দটার কথা বলিলে, তাঁহারা হাসিয়া বলি-লেন—"হ্যাঁ, ঠিকই, শব্দ হয় বটে! আমরা বরাবরই ঐ শব্দ শুনিতেছি, আমাদের ভয় হয় না, উহাতে কোন দিন কাহারও ক্ষতি হয় নাই। উহা সকল সময় হয় না। কখন কখন হয় তো ২।৪ মাস হইল না, আবার কখন কখন ২৪ ঘণ্টাই হইতে লাগিল। যখন হইতে থাকে, তখন বিরাম নাই, পিছনে লেগেই থাকে। কেন যে এমন হয়, জানি না, তবে এইটুকু জানি যে, ইহাতে কাহারও অনিষ্ট হয় না।"

আমি ভাবিলাম—ভগিনী দুইটি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে। স্বীকার করিয়া লইলাম যে, উহাতে কাহারও অনিষ্ট ঘটে নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি ঐরূপ ভয় দেখাইয়াছিল, সে মারা গেলেও তার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভয়টা যায় নাই, ভয়টা সূক্ষ্ম-জগতে রহিয়াই গিয়াছে, আর কিসের দরুণই বা এই ভয়!

মানুষের পায়ের শব্দ

লেড বিটার সাহেব বলিতেছেন—"অনেক দিন হইল, আমি নিজেই মানুষের পায়ের শব্দের মত শব্দ শুনিয়াছিলাম। এটা খুব গুরুতর কাণ্ড

না হইলেও, যাহারা ভূতের তত্ত্ব, সূক্ষ্ম-জগতের খোঁজ-খবর লইয়া থাকে, তাহাদের কাছে এ রকম ঘটনাও খুব আলোচনার বিষয়। লণ্ডন সহরের একটা সহরতলীতে তখন আমি ছিলাম। আমার বাসস্থানের নিকট হইতেই একটা রাস্তা বাহির করা হইতেছিল। একটা খোলা বড় জায়গা দিয়া রাস্তাটা যাইবে ; তৈয়ারী করা তখনও শেষ হয় নাই ; দুই ধারে বাড়ী-ঘর-দোর তখনও হয় নাই। কেবল দুই পাশের পাথর বসান হইয়াছে মাত্র। দুই ধারে বেড়া দিয়া ঘেরাও হইয়াছে। যদি রাস্তার উপর দিয়া যাইতে হয়, তবে ঐ বসান পাথরগুলির উপর দিয়া চলিবার দরকার ; কেন না, যেখানে পাথর বসান হয় নি, সেখানটা খুব অপরিষ্কার, বর্ষাকালে চলিবার কোনই উপায় নাই, ভয়ানক কাদা হয়। রাস্তাটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। এই রাস্তাটি দিয়া গেলে খুব শীঘ্র রেল-ষ্টেশনে যাওয়া যায় বলিয়া, দিনের বেলায় অনেকেই উহার উপর দিয়া যাইত। রাত্রিতে তখনও আলোর বন্দোবস্ত হয় নাই। রাত্রিতে রাস্তাটার উপর অন্ধকার। অন্ধকার হইলেও আমি উহার উপর দিয়া যাইতাম। অন্ধকারে পাথরের উপর দিয়া যাওয়া আমার পক্ষে তত কষ্টকর বলিয়া মনে হইত না। অল্পদিনের মধ্যেই শুনা গেল—রাস্তাটিতে ভূতের উপদ্রব হইতেছে। কে কবে ভূত দেখিয়াছে, জানিতে পারা গেল না, অথচ ভূতের কথাটা ছড়াইয়া পড়িল। ভূতের ভয়ে একাকী কেহ ঐ রাস্তায় যায় না, হয় তো অনেকে সাথীর আশায় দাঁড়াইয়া আছে ; এমনটি অনেক সময় আমি নিজেও দেখিয়াছি।

এক দিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে প্রায় ৯টার সময় আমি একাকী ঐ রাস্তায় যাইতেছিলাম। খুব একটু দ্রুতই চলিতে লাগিলাম। তখন চারিদিকে পাতলা কুয়াসা, কিন্তু তাহা হইলেও বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সামনে, পিছনে, দুই পাশের খোলা জায়গায়—সব দিকেই বেশ নজর চলিতেছিল। অর্দ্ধেক পথ গিয়াছি, এমন সময় সম্মুখে বা পিছনে কেহ কোথাও নাই, অথচ খুব বেগে একটা দৌড়িয়া আসার শব্দ আমার কানে আসিল। প্রাণরক্ষার জন্য যেমন বিশ্রী দৌড়ান আবশ্যক হয়, এ দৌড়ানটাও সেই

রকম। মনে হইল, পাথরের উপর দিয়াই দৌড়টা আসিতেছে ; কেন না, নরম মাটীর উপর দিয়া দৌড়াইলে অমন উচ্চ শব্দ পাওয়া যায় না। বাপ্‌রে! সে কি দৌড় ! যে শুনিয়াছে, সে-ই সে দৌড়ের ভঙ্গীটা বুঝিয়াছে, কথা বলিয়া সেটা বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। দৌড়টাতে মনে হয় যেন কেহ খুব ভয় পাইয়া পলাইতেছে। ভাবিলাম—ভয় পাইয়া তো এক জন আসিতেছে, কিন্তু কি দেখিয়া ভয় পাইল ? কিন্তু কই, কোন লোকই তো চোখে পড়িল না ! শব্দটাই, সেই বিশ্রী হুটোপুটির শব্দটাই শুনা যাইতে লাগিল। শুধু শুনা যাওয়া নহে, মনে হইল, দৌড়িয়া আমার দিকেই যেন কে আসিতেছে। আমি দাঁড়াইলাম। দৌড়টা যেন আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। আমার পায়ের মধ্য দিয়া যেন দৌড়টা হুটোপুটি করিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু কিছুই আমার চোখে পড়িল না, কোন মূর্ত্তিই আমি দেখিতে পাইলাম না। এই অদ্ভুত কাণ্ডে আমার গা শিহরিয়া উঠিল। খুব আশ্চর্য্যও হইলাম। স্পষ্ট দৌড়ের শব্দ, স্পষ্ট পায়ের শব্দ, শুধু স্পষ্ট নহে, খুব বড় বড় শব্দ শুনা গেল ; চারিদিক্ নীরব, নিস্তব্ধ, অথচ ঐ শব্দ ! ভাবিলাম, এটা মনের ভুল হইতেই পারে না। শব্দটা আমার গায়ের উপর দিয়া, আমার পায়ের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। সেটা কোন বদ্‌মায়েস লোকের কাণ্ড নহে, তাহাও খুব ভাল করিয়াই বুঝিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি, আলো ফুটফুট করিতেছে, তখন একটা কুকুর লুকিয়ে থাকিতে পারে না, মানুষ কি করিয়া লুকাইয়া ঐরূপ করিবে ? যে আসিবে, তাহাকেই আমার চোখে পড়িতে হইবে। অথচ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আশ্চর্য্য ! আমি বিস্মিত হইয়া খানিকটা সময় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর আবার চলিতে লাগিলাম। যাইবার সময় চারিদিকে খুব ভাল করিয়া চাহিতে চাহিতে গেলাম। আর কোন ব্যাপার ঘটিল না। ঐ কাণ্ডটার কথা আমি অনেক সময়ই ভাবিয়াছি, কিন্তু বহুদিন উহার কোন কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

এখন আমি পরা-বিদ্যার আলোচনা করি। এখন একটা কারণ

বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু যে সময় ঐ ভূতের কাণ্ডটা ঘটিয়াছিল, তখন আমি পরাবিদ্যার দলে মিশি নাই, তখন কিছু বুঝিতেও পারি নাই। উহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও, আমি কতক কতক অনুমান করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি ঐ অনুমান অনেকটা ঠিক, ঠিকই করিয়াছিলাম। ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন ভাল করিয়া কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না, তখন মনে করিলাম—দূর ছাই, ভূতুড়ে ব্যাপারের আবার ভাবিব কি? পরা-বিদ্যার কল্যাণে এখন দেখিতেছি, ঐটির কারণ বুঝিয়া লওয়া খুবই সহজ। নিশ্চয়ই অনেক দিন আগে ঐ স্থানে কোন লোক ভয় পাইয়াছিল—সে ভয়টা একটা বিশ্রী রকমের। ভয় পাইয়া লোকালয়ের দিকে এইরূপ ছুটাপুটি করিয়া আসিয়াছিল। ঐ বিশ্রী ভয়টার একটা ছাপ ঐ স্থানে রহিয়া গিয়াছে। ছাপটা ঐ স্থানের সূক্ষ্ম বায়ুমণ্ডলকে আশ্রয় করিয়া আছে। আর ফনোগ্রাফের শব্দের মত থাকিয়া থাকিয়া এমন ভাবে শব্দ করিয়া ফুটিয়া উঠে যে, সকলেই তাহা শুনিতে পায়।

পরাবিদ্যার আলোচনা করিয়া সূক্ষ্ম-জগতের অনেক কথা আমরা জানিতে পারিলেও সকল তথ্য আজও পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। এখানে শব্দটাও শুনিতে পাইলাম, অথচ যে পলাইয়া আসিয়াছিল, তাহার কোন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না কেন, শব্দ ফুটিল, মূর্ত্তি ফুটিল না কেন, এ সব কথা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আবার স্থানবিশেষে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিও দেখা দেয়। এখানে দেখা গেল না কেন, তাহা বুঝা যায় না। তবে আমাদের এইটুকু মনে আইসে যে, হয় তো মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিবার মত শক্তি ছাপটার সঙ্গে ছিল না, তাই অতটা স্থূল হইয়া উঠিতে পারিল না। শব্দ করা আর মূর্ত্তি দেখান, দুইটি একসঙ্গে করিয়া তুলিতে বিলক্ষণ শক্তির আবশ্যক। ছাপটাতে নিশ্চয়ই ততটা শক্তি ছিল না বলিয়াই মনে হয়। কোন স্থলে শব্দটাকে ফুটাইয়া তোলা সহজ, আবার কোন স্থলে বা মূর্ত্তি প্রকাশ করাই সহজ হইয়া উঠে। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব এখনও আমরা জানি না। ভূতুড়ে কাণ্ডের মধ্যে শব্দটাই খুব বেশী শু-

যায়, মূর্ত্তি হইয়া দেখা দিল, এমনটা প্রায়ই ঘটে না। বাতাসের মধ্যে নিরন্তরই স্পন্দন হইতেছে। মন্থর স্পন্দনগুলি শুনিবার বিষয় হইয়া উঠে, আর তীব্র স্পন্দনগুলি দেখিবার বিষয় হইয়া থাকে। যখন ভূতুড়ে কাণ্ডের মধ্যে শব্দই বেশী, তখন মনে হয়, মন্থর স্পন্দনগুলির ছাপই সহজে রহিয়া যায়। পরাবিদ্যার আরও উন্নতি হইলে, আমাদের মনে হয়, সকল তথ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

দারুণ দুর্ঘটনার ছাপ

"সূক্ষ্ম-জগতের আভাস" নামক পুস্তকের ২য় খণ্ডে ১০০ পৃষ্ঠায় ডাক্তার নী আর একটা অদ্ভুত গল্প বলিয়াছেন। সেটাও এই গল্পেরই মত। গল্পটি তিনি "নর্থ ষ্টেন্‌লী" নামক স্থানের পুরোহিত রেভারেণ্ড জোসেফ জেফার্শনের কাছে শুনিয়াছিলেন। পুরোহিত ইয়র্কশায়ার হইতে ১১ মাইল দূরে ঐ ব্যাপারটি ঘটিতে দেখিয়াছিলেন; তিনি একটি জায়গায় যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে ভয়ানক চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইলেন। চীৎকার একবার আধবার নয়। অনবরত হইতেছিল। রাত্রিকাল, লোকজন কেহ কোথাও নাই, অথচ চীৎকার শব্দ আসিতেছে! আশ্চর্য্য ব্যাপার! তাঁহার খুবই ভয় হইল। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, ঐ স্থানে না কি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল। যে লোকটা খুন হয়, সেই-ই না কি ঐ রকম ভাবে চীৎকারও করিয়াছিল। এই চীৎকারটা ঠিক সেই চীৎকারেরই মত। এই ব্যাপারের খুব একটা তীব্র ছাপ ঐ অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলে রহিয়া গিয়াছিল। তীব্র বলিতেছি এই কারণে যে, চীৎকার শব্দটা যেমন ফুটিয়া উঠিত, আবার কখন কখনও দৃশ্যটাও অনেকের চোখে পড়িত। পুরোহিত খোঁজ-খবর লওয়ায় জানিতে পারেন, একটা লোক না কি দেখিয়াছিল যে, সেই খুন হওয়া লোকটার দেহটা সেইখানে পড়িয়া রহিয়াছে। বহু বৎসর আগে ঐ ব্যাপারটি ঘটে, অথচ সেই ছবি তাহার কতকাল পরে ঐ স্থানে মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠে। দারুণ ঘটনার ছাপটা এমন করিয়াই থাকিয়া যায়।

"পিউরিট্যান" ব্যাপারের ছাপ

"পিউরিট্যান" সম্প্রদায় এক সময়ে যেরূপ পাশব কাণ্ডকারখানা করিয়াছিল, জগতে সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত "ওয়ার্টন এরি" নামক স্থানে ঐরূপ ভূতুড়ে ছাপ আছে বলিয়া শুনা যায়। ঐ স্থানটা "বিভার্লী" নামক স্থানের কাছে। ইংলণ্ডে যে সময় খুব বিদ্রোহ হইয়াছিল, তখন এক দল সরকারী সৈন্য "ওয়ার্টন এরি" দিয়া গমন করে। ঐ অঞ্চলে সৈন্যগণ বিশ্রী পশুর মত আচরণ করিতে করিতে যায়। ধর্মধ্বজী পিউরিট্যান সৈনিকেরাই না কি ঐরূপ অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়াছিল। "এরি"তে তখন এক জন ভদ্রলোক সপরিবারে সংসার পাতাইয়া বাস করিতেছিলেন। ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন না, এমন সময় দুরাত্মারা বাড়ীর মধ্যে যাইয়া তাঁহার স্ত্রীর কোল হইতে ছোট সন্তানটিকে ছিনাইয়া লইয়া একটা দেয়ালের গায়ে খুব জোরে আছাড় মারিল। হতভাগা শিশুর নরম মাথাটা তখনই চূর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর শিশুর জননীকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিল। ঘোর অসভ্য ভিন্ন এরূপ কাণ্ড আর কাহারা করিতে পারে? এ রকম ভয়ানক কাণ্ডের ছাপ সূক্ষ্ম-জগতে না থাকিয়া যায় না। এ সব ব্যাপারের এমন ছাপ পড়ে যে, তাহা সহজে মুছে না। পিউরিট্যান সৈনিকদের এই পবিত্র কাজের ফল এখনও সেখানে দেখা যায়। এখনও একটা মাথাশূন্য প্রেতিনী ছেলে কোলে করিয়া ঐ অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে ঐরূপ প্রেতিনীর ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 'লীডস্ মার্করী' নামক সংবাদপত্রের [illegible] মাসের সংখ্যায় ঐ প্রেতিনীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে যে "উইকলার হলের" গল্পটা বলিয়াছি, সেটাও এইরূপ একটা ব্যাপার হইতে পারে। আবার এইরূপ না হইয়া খুনী লোকটা ভূত হইয়া আসিতেও পারে। অথবা শুধু চিন্তামূর্ত্তি হওয়াও অসম্ভব নয়। চিন্তামূর্ত্তির কথা বলিতেছি এই জন্য যে, যেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটে, সেখানে মানুষে অনেক সময় ভূত দেখিয়া থাকে, সেটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভূত নয়।

খুনী লোকটা ঐ হত্যার ভাবনা অনবরত ভাবিত বলিয়া তাহার সেই তীব্র ভাবনাই মূর্ত্তি ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। খুনী বাঁচিয়াই থাকুক আর মরিয়াই যাউক, তার চিন্তা কখনই থামে না। চিন্তার হাত হইতে এড়াইবার উপায় নাই। সেই চিন্তাই ঐরূপ মূর্ত্তি ধরে। কিন্তু মরা দুরাত্মার চিন্তাটাই বেশী বেশী দেখা যায়। যে মাসের যে তারিখে ঐ ভয়ানক হত্যা হইয়াছিল, সেই মাসের সেই তারিখটা আসিলে খুনী লোকটার পাপের কথাটি আরও পরিস্ফুটভাবে মনে পড়িয়া যায়। তাই সেই দিনের সেই তীব্র চিন্তা স্থূল হইয়া সাধারণ মানুষেরও সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এই জন্যই কোন কোন ঘটনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে ভূত-প্রেত দেখা যায় বলিয়া একটা কথা আছে। আবার পাপী ব্যক্তি যদি নিরন্তর তাহার পাপ-কার্য্যের চিন্তা করিয়া থাকে, তবে সে চিন্তা মূর্ত্তি ধরিয়া সকল সময়ই সকলের চোখে পড়িতে পারে। ওয়ার্টন এরির হত্যাকাণ্ড ব্যাপারে যে প্রেতিনী-মূর্ত্তি দেখা যায়, সেটা পাষণ্ডদের চিন্তামূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয় না। যাহাদের প্রাণে সামান্য একটুও মনুষ্যত্ব আছে, অন্যায় কাজ করিবার পরে তাহাদের একটা অনুতাপ আসিয়া পড়ে। তাই তাহারা নিজের নিজের পাপের চিন্তা করিতে থাকে। কিন্তু ঐ সকল পাষণ্ডদের প্রাণে কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব ছিল না, অনুতাপ আসিতে পারে, উহাদের প্রাণ এতটুকু উন্নতও নহে, উহারা রক্তপিপাসু বর্ব্বরজাতী জানোয়ার-বিশেষ। উহারা মনুষ্য নামের কলঙ্ক। তাই উহাদের দ্বারা চিন্তামূর্ত্তি গড়িয়া উঠা সম্ভবপর নহে।

"প্রকৃত ভূতের গল্প" পুস্তকের ১৯২ পৃষ্ঠায় আর একটা ভূতুড়ে ছাপের কথা আছে। সে ক্ষেত্রে মূর্ত্তি দেখা দিল, অথচ কোন রকম শব্দ হইল না, এইরূপ ব্যাপারের বর্ণনা আছে। যে ব্যক্তি ঐ কাণ্ড দেখিয়াছিল, তাহার নিজের কথাগুলি এই :—

কটা রঙ্গের ঘোড়া

"এ রাস্তাটার দিন নাই, রাত নাই, দুপুর নাই, সন্ধ্যা নাই, আমি সব সময়ই আসা-যাওয়া করি। কুড়ি বৎসর ধরিয়াই এই রাস্তায় চলা ফেরা

করিতেছি, কোন দিন কিছু দেখিয়া ডরাই নাই। কিন্তু গত সোমবার সন্ধ্যাকালে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম। ব্যাপারটা ঠিক সন্ধ্যাকালে দেখা গেল। 'ফ্যান' নামে একটা মাদী ঘোড়ায় চড়িয়া আমি যাইতেছিলাম। রাস্তাটি চৌমহনী। দেখিলাম, আর একটি লোক একটা কটা রঙ্গের ঘোড়া চড়িয়া আমার খুব কাছে বাঁ দিকে আসিতেছে। আমি লাগামটা ঝাঁকি দিয়া তাহার আগে যাইব ভাবিলাম। লোকটি আমার কাছে আসিয়া পড়িল। আমি তাহাকে অভিবাদন করিলাম। অভিবাদনের কোনই উত্তর নাই! ভাবিলাম, উত্তর দিল না, তবে কি লোকটা ঘুমাইতে ঘুমাইতে যাইতেছে? এই ভাবিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু উঁচু হইয়া চাহিলাম। আশ্চর্য্য! লোকও নাই ঘোড়াও নাই! নিজের চোখকে অবিশ্বাস করিতে পারি না; স্পষ্ট মানুষ দেখিলাম, ঘোড়া দেখিলাম, কাছে পর্য্যন্ত আসিতে দেখিলাম, তবে কি এ সবই মিথ্যা? এত ভুল কি হইতে পারে? আমি তখন 'ফ্যান্'কে ফিরাইলাম। ফিরাইয়া রাস্তার সব দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলাম, কোন দিকেই কাহা-কেও দেখিতে পাইলাম না। প্রায় তিনশত গজ দূর পর্য্যন্ত রাস্তাও আলোকিত ছিল। আলো থাকিলে কি হইবে, কোন দিকেই তাহাকে দেখিলাম না। তাহার পর নিকটে একটা মাঠের দিকে গেলাম। ভাবিলাম, এই দিকেই বোধ হয় লোকটি যাইয়া থাকিবে। তন্ন তন্ন করিয়া সে দিকেও খুঁজিলাম। কোথাও কেহ নাই! তখন মনে হইল, বোধ হয় এটা ভূত। যেমন ভূতের কথাটা মনে হইল, অমনই গা শিহরিয়া উঠিল। সে একটু ভয়ও হইল। তখন আর একটুও দেরী না করিয়া 'ফ্যান্'কে মহাবেগে ছুটাইয়া দিয়া পলাইলাম।

ব্যাপারটার মধ্যে আরও আশ্চর্য্য কাণ্ড আছে। সেটা বলা হয় নাই। গোলাবাড়ীতে যাইয়া আমার কাজ-কর্ম্ম করা হইয়া গেলে সেখানকার বৃদ্ধ কৃষক ও তাহার স্ত্রীকে ঐ অদ্ভুত গল্পটি বলিলাম। বৃদ্ধ বলিল—"আপনি তো অনেক দিন এই রাস্তায় আসা-যাওয়া করিতেছেন, এ কাণ্ডটা

ইহার আগে আর কখন দেখেন নি ?' আমি বলিলাম—'কি দেখার কথা বলিতেছ ?' বৃদ্ধ বলিল—'কেন, কটা রঙ্গের ঘোড়ায় চড়া, রঙ্গিন পোষাক-পরা ভূতটার কথা বলিতেছি !' আমি বলিলাম—"ইহার আগে বাস্তবিকই তাহাকে আর কখন দেখি নাই ; কেবল আজই সন্ধ্যাকালে দেখিলাম।" বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—'৪০ বৎসর আগে ঐ কল-ওয়ালার কি ঘটনা ঘটে, তাহা কি আপনি শুনেন নাই ?' আমি বলিলাম—'না, এক বর্ণও শুনি নি।' বৃদ্ধ বলিল—'প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ কল-ওয়ালা বাজার হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিল। পথে যে জায়গাটায় আপনি উহাকে দেখিলেন, ঠিক ঐ স্থানে এক জন দস্যু লুকাইয়া থাকে। কল-ওয়ালা যেমন আসিয়াছে, আর অমনি সেই দস্যু উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। আপনি ঐ ভূতের গায়ে যে রঙ্গের পোষাক দেখিলেন, সে সময় সকল কল-ওয়ালারাই ঐ রঙ্গের পোষাক ব্যবহার করিত। আর তাহার একটা কটা রঙ্গের ঘোড়াও ছিল। ঐ দুর্ঘটনার অল্পদিন পরেই আমি এই জোতটি লইয়াছি। আমি ঐ স্থানে অনেকবার গিয়াছি, কিন্তু নিজে কখন কিছু দেখি নাই। আপনি যেরূপ ব্যাপার বলিলেন, ঐরূপ আরও অনেক অনেক লোকের কাছে শুনিয়াছি। তাহারাও আপনার মত ঐ কটা রঙ্গের ঘোড়া, আর ঐ লোক-টাকে ঠিক ঐ স্থানে ঐ রকম ভাবে সেই ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে'।"

গল্পটি তো ঐরূপ। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ঐ ক্ষেত্রে ভূত-মূর্ত্তিটা কোন রকম শব্দ করিল না, আর হত্যাকাণ্ডের একটা চিত্রও ফুটিয়া উঠিল না। মাত্র কলওয়ালার মূর্ত্তিটা শান্তভাবে নীরবে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া হাজির হইল। আর ঐরকম আসাও সে সর্ব্বদা আসিত না। কালে-ভদ্রে কোন সময় কাহারও হয় তো চোখে পড়িত। ঐ ক্ষেত্রে ভূতটাই স্থূল-শরীর ধারণ করিয়া আসিল কি যিনি দেখিলেন, তাঁহার মনে ঐ রকম একটা ছাপ আসিয়া পড়িল, তাহা বেশ বুঝা না গেলেও আমরা কয়েকটা বিষয় অনুমান করিয়া লইতে পারি। হত্যার সময় যে মারে আর

যে মরে, এই দুই জনের মধ্যে একটা ধ্বস্তা-ধ্বস্তি হয়, তাহা ছাড়া প্রহারেরও একটা শব্দ হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রহারের শব্দ বা ধস্তা-ধ্বস্তির শব্দ, কোন শব্দই ফুটিতে শুনিলাম না। তাই মনে হয়, কল-ওয়ালার চিন্তার কোন-রূপ ছাপ সে স্থানের উপর পড়ে নাই। কল-ওয়ালার চিন্তার ছাপ যদি পড়িত, তবে নিশ্চয়ই আক্রমণের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিত। সে নিশ্চিন্ত-মনে, নিরুদ্বেগে, স্বাভাবিকভাবে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছিল। সেখানে যে একটা দুর্ব্বৃত্ত লুকাইয়া আছে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। তাই আক্রমণের কথা, ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে, সে সব কথা সে কিছুই ভাবে নাই। আগে হইতে কেহই এমন ভাবনা ভাবে না। কিন্তু খুনীর মন আলোড়িত-বিলোড়িত হইয়াছিল। সে জানিত যে, সে খুন করিবে। সে ভীষণ সঙ্কল্প মনের মধ্যে পুষিয়া বসিয়াছিল। তাই উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের সঙ্গে সে কলওয়ালার গতি-বিধি দেখিতেছিল ও ভাবিতেছিল। তাহার ঘোড়ায় চড়িয়া আসার মূর্ত্তিটা খুনীর মনের মধ্যে খুব গভীরভাবে বসিয়া গিয়াছিল। তাই মনে হয়, খুনীর সেই চিন্তাটাই ঐ অঞ্চলে ছাপ রাখিয়া দিয়াছে। সেই ছাপেরই ঐরূপ ভাবে মাঝে মাঝে অভিনয় হইয়া থাকে।

দুই কারণে ঐ মূর্ত্তি চোখে পড়িতে পারে। খুনী যদি তীব্র ভাবে ভাবিয়া থাকে, তবে সেই চিন্তার ঐরূপ ছাপ ঐ অঞ্চলে পড়িতে পারে; আবার যে দেখে, লোকটি যদি সহজ-বিকারি-প্রকৃতির হয়, তবে ঐরূপ দেখিয়া বসা অসম্ভব নহে। মনের আবেগ-উদ্বেগ, শোক-হর্ষ প্রভৃতি যাহাদের সহজেই জাগিয়া উঠে, সেই সব চটুল-প্রকৃতি ব্যক্তিরা সূক্ষ্ম-জগতের ঐ সব কাণ্ড অতি শীঘ্রই দেখিয়া ফেলে। যিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মনের ভাব যদি পরেও ঐ রকমটিই থাকিত, তবে হয় তো তিনি আবার দেখিতে পাইতেন। তিনি পরে প্রায় ১০ বৎসর কাল ঐ পথে যাওয়া-আসা করিয়াছেন, অথচ কল-ওয়ালার সেই মূর্ত্তিটাকে আর একবারও দেখিতে পান নাই। না দেখিতে পাইবার দুইটি কারণ থাকিতে পারে; হয় তো মূর্ত্তি

তাঁহার সম্মুখে আসিয়া স্থূল-দেহ ধরিয়া আর দাঁড়ায় নাই; অথবা হয় তো তাঁহার মনের অবস্থাটা সূক্ষ্ম-জগতের ব্যাপার বুঝিবার মত আর ছিল না।

খুন হইয়া মানুষ ভূত হইয়া বেড়াইতেছে, এমন বিস্তর গল্প শুনা যায়; কিন্তু সেগুলি প্রকৃত ভূত নহে। হত্যা-কাণ্ডে নিহত ব্যক্তিই যদি অপরাধী হয়, যদি তাহারই কলহের ফলে ঐ হত্যাকাণ্ডটা ঘটিয়া থাকে, তবে হত্যার স্থলে ভূত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান তাহার পক্ষে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যদি সে নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে সে কখনই ঐ স্থানে প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা ব্যতীত আইসে না। তাই মনে হয়, ঐ সকল গল্পের ভূতগুলা সূক্ষ্ম-জগতের ছাপ অথবা খুনী দুর্ব্বৃত্তের ভীষণ চিন্তারই মূর্ত্তিমাত্র।

আমরা সূক্ষ্ম-জগতের যে সকল ছাপের কথা বলিলাম, সে সকল ছাপও সময়ে লোপ পায়, ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। দুনিয়ায় যাহাই ঘটিয়া থাকে, তাহারই একটা ছাপ কিন্তু সূক্ষ্ম-জগতের উচ্চ স্তরে স্থায়িভাবে থাকিয়া যায়। যাঁহারা সিদ্ধ, দিব্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন, তাঁহারা তাহা দেখিতে পান। সেই সকল ছাপ অন্য প্রকার ভাবে গঠিত। তাহারা সূক্ষ্ম-জগতের নিম্নস্তরের ছাপের মত ভূতুড়ে কাণ্ড করিয়া লোকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে না। সে সকল ছাপে কাহারও আবেগ-উদ্বেগের গন্ধ নাই, তাহাতে কোন মানুষের সংস্রব-সম্পর্কও নাই। সূক্ষ্ম-জগতের নিম্নস্তরের ছাপগুলিই কাল-বশে বিলীন হয়, উচ্চ-স্তরের ছাপগুলি অল্পদিনে লোপ পায় না। আমাদের পার্থিব জীবনের তুলনায় ঐ সব ছাপ বহুকাল থাকে। আজও টাইবর্ণের মশানের নিকট দিয়া যাইবার সময় লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। এই স্থানেই সেই মশান ছিল, ইহা না জানিলেও সেখানে আসিলে ভয় জাগিয়া উঠে। এমনই চমৎকার ব্যাপার!

আরও বিস্তর ছোট ছোট গল্প আছে। সেগুলি আমরা বলা

আবশ্যক মনে করিলাম না। কারণ, তাহাতে পরলোকের সংবাদ খুব বেশী নাই। পরাবিদ্যার প্রথম সিরিজের বইগুলি পড়িলে ভুবর্লোকের অনেক তথ্য বিশদভাবে জানা যায়। আমরা এই প্রবন্ধে ভুবর্লোকের সংবাদ তত বিশদরূপে দিব না। আমরা পরলোকের সংবাদ অন্য দিক দিয়া আলোচনা করিতেছি ও করিব। পার্থিব ঘটনার মধ্যে পরলোকের তথ্য কতটা পাওয়া যাইতে পারে আর পরবিদ্যার ঘোষণা কতদূর সত্য, আমরা মাত্র সেইটুকুই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ভূত দেখা

পরলোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা পাঠকগণকে একটু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি। বিস্তর ভূত দিন দিন আমাদের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইতেছে। এখানকার লোকগুলিও দিন দিন যেন একটু সূক্ষ্ম-দর্শী হইয়া উঠিতেছে। আগে যেমন সংসার লইয়া ঘোর ব্যতিব্যস্ত থাকিত, আত্মা, পরকাল এ সব ভাবনা মোটেই ভাবিত না, এখন আর তেমনটি নাই। এই অস্থায়ী দুনিয়ার ভাবনাটি যেন খানিকটা কমিয়া আসিয়াছে। মানুষের মতিগতি যেন অনেকটা সূক্ষ্ম-জগতের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। তাই মনে হয়, আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে হয় তো অনেকে সৌভাগ্যবশতঃ কবে কোন্ দিন ভূত দেখিয়া বসিবেন। ভূত দেখাটা দুর্ভাগ্য নহে। ওটা প্রকৃতই সৌভাগ্য। কেন না, যাহারা ভূত দেখিতে পায়, পরলোক সম্বন্ধে, সূক্ষ্মজগৎ সম্বন্ধে তাহাদের আর কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। তাহা ছাড়া আর একটা উপকারও হয়। ভূতেরা প্রায়ই মানুষের কাছে সাহায্য লইতে আইসে। কাহাকেও সাহায্য করা খুব বড় একটা ধর্ম্ম। পরের উপকার করার অপেক্ষা বেশী লাভ আর হইতে পারে না। যে উপকার করে, সে নিজেই ধর্ম্মের পথে, উন্নতির পথে, মুক্তির পথে বিস্তর উঠিয়া যায়। ভূতের উপকার করিতে পারিলেও আমাদের সেই লাভ। তাহাদের উপকার করিলে আমাদেরই আত্মোন্নতি হইয়া থাকে।

ভূতের সঙ্গে দেখা হওয়াটা সৌভাগ্যের বিষয়, তাহা বলিয়াছি। যাহাদের অদৃষ্টে এই সৌভাগ্য ঘটে, ভূতের সম্মুখে পড়িলে তাহাদের কিরূপ ভাবে চলা উচিত, সে বিষয়ে কিছু উপদেশ দিব। আমাদের

মনে হয়, ভূতেরা শুধু শুধু মানুষের কাছে আসিয়া দেখা দেয় না। প্রাণের বড় দুঃখ জানাইতে তাহারা আইসে; কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, তাহারা আসিলেই সাধারণ মানুষগুলা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া তাহাদের কোন কথাই শুনে না। ইহাতে তাহাদের মনে বড়ই আক্ষেপ হয়। স্থূল-দেহ ধরিয়া দেখা দেওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তাহারা সহজে স্থূল-দেহ ধরিতে পারে না। স্থূল হইয়া উঠিতে বিস্তর চেষ্টা করিতে হয়। তাই বিশেষ কারণ না থাকিলে, প্রাণে বিশেষ দুঃখ না ঘটিলে, উহারা অতটা চেষ্টা করিতে, অতটা কষ্ট স্বীকার করিতে চাহে না। আবার খুব চেষ্টা করিয়া স্থূল-দেহ গড়িয়া তুলিতে পারিলেও তাহা বেশীক্ষণ থাকে না; কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মিলাইয়া যায়। দেহটা যে সামান্য সময়টুকু থাকে, তাহাদের কাছে উহা বড়ই মূল্যবান সময়। উহাদের প্রাণে কতই যাতনা, কত কথাই উহাদের বলিবার ইচ্ছা! কিন্তু স্থূল-মূর্ত্তি শীঘ্র শীঘ্র মিলাইয়া যাওয়ায় তাহার অর্দ্ধেক কথাও বলা হয় না। স্থূল-মূর্ত্তি হইয়া দেখা দিলে সেই সময়টুকুর প্রতি সেকেণ্ডটা পর্য্যন্ত উহাদের কাছে মহামূল্য। কিন্তু সাধারণ মানুষেরা ঐ মূল্যবান্ সময়টা নষ্ট করিয়া দেয়। ভূত আসিবামাত্র সাধারণ মানুষেরা চীৎকার করিয়া উঠে, নয় অজ্ঞান হইয়া পড়ে, নয় ভোঁদৌড় দিয়া পলাইয়া যায়। উহাদের কিছুই বলা হয় না। আমরা যদি ভূত হইয়া প্রাণের বেদনা জানাইতে আসি, আর অন্য লোক যদি ঐরূপ ভাবে হাউ মাউ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে বা পলায়, তবে আমাদের মনে কিরূপ কষ্ট হয়!

ভূতের কথা যাউক, ইহজগতে যদি কোন জীবিত মানুষই মহাবিপদে পড়িয়া আমাদের কাছে উপকার পাইবার আশা করিয়া আইসে, তবে অন্ততঃ তাহার প্রাণের কষ্টের কথাগুলি আমাদের শুনাও উচিত। আর মরণের পর দুঃখে পড়িয়া কেহ যাতনা জানাইতে আসিলে আমরা না শুনিব কেন? সে স্থলে অভদ্র হইয়া উঠিব কেন? স্থূল-শরীর দ্বারা সহজেই অনি- করা যায়; যে স্থূল শরীরধারী জীবিত মানুষকে আমরা ভয় করি না, সে

মরিয়া ভূত হইয়া আসিলে তাহাকে ভয় করিব কেন? ভূতেরা আমাদের চেয়ে শক্তিসামর্থ্যে বরং হীন। তাহাদের স্থূলশরীর নাই, আমাদের বেশ একটা সুস্থ সবল স্থূলদেহ আছে। মারামারি করিতে হইলে আমাদেরই জিতিবার কথা। তবে আমরা ভয় করিব কেন? ভূত আগে জীবিতকালে আমাদের যেমন আত্মীয় বা বন্ধু ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। তাহা দ্বারা কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে ভয় কেন?

যাঁহারা ভূত খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহাদের ব্যবহারও ভাল নহে

ভূত আসিলে ভয় করিও না। সাহস করিয়া তাহার কথাগুলি শুনিও। ভয় করিতে হইবে না বলিয়া কি ভূত আছে বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে না? অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অবশ্য ভূত মানিতে হইবে। ভূত নিশ্চয়ই আছে। ভূতের কথাটা বিকৃত-মস্তিষ্কের প্রলাপ নহে, পাগলের কথা নহে। খাঁটী সত্য। বিলাতের অনুসন্ধান-সমিতি ভূতের বিস্তর তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, বিস্তর কথা চেষ্টা করিয়া করিয়া জানিয়াছেন। সূক্ষ্ম-জগতের খোঁজ-খবর যাঁহারা লইয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ সমিতির কাছে খুবই ঋণী। কেন না, ঐ সমিতি অনেক সংবাদই দিয়াছেন ও দিতেছেন। আগে অনেকে সূক্ষ্ম-জগতের কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এখন তাহারাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, "উহার মধ্যে সত্য ব্যাপার আছে বলিয়াই বোধ হইতেছে।" অনুসন্ধান-সমিতির পরিশ্রম-ফলেই আজ সূক্ষ্ম-জগতের দিকে সাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আসিয়া পড়িয়াছে।

এই অনুসন্ধান-সমিতির চোখে এমন অনেক তথ্য আসিয়া পড়ে, যাহা অতি সহজেই ভূতের কাণ্ড বলিয়া বুঝা যায়। সমিতি কিন্তু সেগুলি ভূতের কাণ্ড বলিয়া স্বীকার করিতে যেন ভয় পান। বেশ সহজেই সেগুলি লোককে বুঝাইয়া দেওয়া যায়। অথচ সমিতি অনেক সময় বুঝাইয়া দিতে পারেন না। এই সব দেখিয়া আমাদের অনেক সময় হাসি পায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়া বুঝান খুবই ভাল। বুঝাইবার এই ধারাটা বড়ই

চমৎকার। কিন্তু কিছুরই বাড়াবাড়িটা ভাল নহে। ভূতের কথাটাও যদি আমরা বাড়াবাড়ি করিয়া বিজ্ঞানের পথ দিয়া বুঝিতে যাই, তবে তাহা কুসংস্কারের মত হইয়া উঠিবে। যে ঘটনাগুলি অতি সহজেই বুঝা যায়, সমিতির পণ্ডিতগুলা তাহা মাথা ঘামাইয়া, ছাই-ভস্ম কল্পনা করিয়া, দূর অর্থ, বাঁকা অর্থ করিয়া, কত রকম জল্পনা-কল্পনা অনুমান করিয়া তবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই দুর্গতি দেখিয়া আমাদের কষ্ট হয়। এই ব্যাপারের দুই একটা উদাহরণ দিতেছি। মিস্ গুড্ রিচ্ ফ্রী নাম্নী মহিলার "প্রেত-অনুসন্ধান" পুস্তকে নিম্নলিখিত গল্প আছে। গল্পগুলি এই:—

একটা হারান আংটীর কথা

এক জন ভদ্রলোকের একটি মূল্যবান্ আংটী হারাইয়া যায়। ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখিলেন যে, সেটা তাঁহার বিছানার অমুক স্থানে আছে। আংটী হারানোর কথা তিনি জানিতেন না। ঘুম থেকে উঠিয়া তাড়াতাড়ি সেটি যথাস্থানে আছে কি না দেখিতে গেলেন, যেখানে উহা থাকিত, সেখানে নাই। উহা হারাইয়া গিয়াছে ভাবিয়া বড়ই ব্যাকুল হইলেন। তাহার পর স্বপ্নে যেখানে থাকার কথা দেখিয়াছিলেন, বিছানার সেই জায়গাটা খুঁজিতেই আংটী পাওয়া গেল। আমরা বলিব, এ ব্যাপারটা বুঝিয়া উঠা খুবই সহজ। ঘুমের সময় ভদ্রলোকটির দিব্য-দৃষ্টি অল্প একটু ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই আংটীর ব্যাপার জানিতে পারিলেন। কিন্তু সমিতির কর্ত্তারা ইহা বুঝিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ঐ ভদ্রলোকটি হয় তো আংটী আগে দেখিয়াছিলেন অথচ দেখার জ্ঞানটা তখন ফুটিয়া উঠে নাই, পরে ঘুমাইলে আত্মার সঙ্গে ঐ জ্ঞানটা ফুটিয়া উঠিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রকম কষ্ট-কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? আবার আর একটা শোন:—

অদ্ভুত রকমের কাগজের কথা

"এক জন বন্ধুর সঙ্গে আমি বাড়ী খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম। ১২টি বাড়ী দেখিবার পর আর একটা বাড়ীর উপর-তলায় গিয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, ঘরের মধ্যে থালা-বাসন রাখিবার একটা তাক ঝুলান রহিয়াছে। আর দেখিলাম, ছাদ হইতে মেঝে পর্য্যন্ত একটা দরওয়াজা আটকান আছে। হঠাৎই আমার বোধ হইল, যেন দরওয়াজার ও-পিঠের সবই আমি দেখিতে পাইতেছি। তখন আমার বন্ধুটিকে বলিলাম, এই দরজা খোলা হইলে তুমি দেখিতে পাইবে যে, উহার মধ্যেকার দেওয়ালের গায়ে নীলবর্ণের কাগজ দিয়ে মোড়া। দরজা খোলা হইলে দেখা গেল, আমার কথাই ঠিক। হঠাৎই যে আমার দিব্য-দৃষ্টি খুলিয়া গেল, এ কথা বলা যায় না। ইহার পূর্ব্বেও আমি ঐ অঞ্চলে অনেকগুলি বাড়ী আর একবার দেখিয়া বেড়াইয়াছিলাম। এ বাড়ীটা দেখার কথা আমার আদৌ মনে নাই। হইতে পারে, আমি দেখিয়াছিলাম, সেই জ্ঞানটা এখন ফুটিয়া উঠিল।"

সন্দিগ্ধচিত্ত লোকেরাও এখন আমাদের কথা মানিয়া লইতেছে

যাঁহারা আগে বিজ্ঞানের পথে যুক্তি খুঁজিয়া বেড়াইতেন, অথচ মনের গোল মিটিত না, এখন তাঁহারাও আমাদের কথা বিশ্বাস করিয়া লইতেছেন। একটা জিনিস দেখিলাম, অথচ দেখিলাম বলিয়া মনে থাকিল না, ইহা নিতান্তই অদ্ভুত ও অসম্ভব কল্পনা। এই অসম্ভব কল্পনা করিয়া উপরের ঘটনার মত অলৌকিক ব্যাপার বুঝিতে চেষ্টা করার অপেক্ষা আমাদের কথা ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করাই ভাল। আমরা বলি, সময়ে সময়ে মানুষের দিব্য-দৃষ্টি খুলিয়া যায়; তাই সে অনেক বিষয় জানিতে-শুনিতে পারে। এই কথাটি খুব সহজ আর খুব সত্য। এই দিব্য-দৃষ্টির শক্তিটা মানুষমাত্রেরই আছে, সকলেরই এটা জন্মগত স্বত্ব, সকলেই এ শক্তির অধিকারী, সকলেই সাধনা করিয়া ইহা ফুটাইয়া তুলিতে পারে।

সমিতির পণ্ডিতগুলা অলৌকিক ব্যাপারের আর একটা হেতুও দেখাইবার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টাও অদ্ভুত। তাঁহারা বলেন, মানুষের

ভিতরে যে আত্মাটা আছে, সেই আত্মাটাই মাঝে মাঝে ঐ রকম ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন কিছু দেখিয়া বসা, কোন কিছু জানিয়া ফেলা না কি তাহারই কাজ। ডাক্তার আল্‌ফ্রেড রসেল্ ওয়ালেচ "অলৌকিক ঘটনা ও বর্ত্তমান যুগের প্রেততত্ত্ব" নামক পুস্তকে উহাদের ঐ কথাগুলির খুব তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় তাঁহার এই কথাগুলি আছে :—পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষের মধ্যে একটা সব-জান্তা জীবাত্মা আছে, তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডারটা না কি খুব বড় (কেমন করিয়া বড় হইল, তাহা কেহ জানে না)। সেই আত্মা যতই পাপ করুক, যতই মিথ্যা কথা বলুক, তাহার সব জানা-শুনার ক্ষমতাটা না কি নষ্ট হয় না। সেই আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সব অলৌকিক ব্যাপার ঘটাইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, এইটিই খাঁটি মত, বিজ্ঞান-সম্মত কথা। ভূত-প্রেতের কথা উড়াইয়া দিয়া সব-জান্তা জীবাত্মার কথাটিকে বিজ্ঞান-সম্মত কথা বলাও যা, বিনা প্রমাণে একটা কথা মানিয়া লওয়াও তাই। কোন্‌টা বিজ্ঞান-সম্মত, আর কোন্‌টা নহে, তাহা গবেষণা করিয়া বুঝিবার আবশ্যক; আবোল্-তাবোল্ বলিলে চলিবে না।

একটা হঠাৎ অসুখের দোহাই দেওয়া

ওয়ালেচ্ তাঁহার পুস্তকে আর একটি চমৎকার গল্প বলিয়াছেন। ঘটনাটি যে অদ্ভুত, তাহা নহে। সমিতির পণ্ডিত সেটার একটা অদ্ভুত মীমাংসা করিয়াছেন বলিয়াই অদ্ভুত বলিতেছি। একটা ঘরে ভূতের উপদ্রব হইত। তিনটা কুকুর ঐ ঘরে ঘুমাইয়া ছিল। হঠাৎ রাত্রিতে ভয় পাইয়া কুকুরগুলি ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই ভয়ের চীৎকার বিস্তর লোকের কাণে গেল। ভয়ে তাহারাও জড়সড় হইয়া পড়িল, গায়ের রোমগুলি খাড়া হইয়া উঠিল। একটা ভয়ানক বড় কুকুর ভয়ে বিছানার নীচে পলাইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এই কাণ্ড! সমিতির পণ্ডিতটি এই কথাগুলির মীমাংসাটা চক্ষুর নিমেষে

করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, "চীৎকার করিবার কথাটি আদৌ মিথ্যা; যাহারা শব্দ শুনিয়াছিল, তাহাদের মাথা খারাপ হইয়া উঠিয়াছিল, ঐরূপ শুনা তাহাদের মাথার বিকৃতি। কুকুরগুলা একসঙ্গে ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল, তাহা হইতে পারে, হয় তো হঠাৎই কুকুরগুলি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল।" বাহবা ব্যাখ্যা!

পরা-বিদ্যা-সম্প্রদায়টি ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কী নাম্নী অসাধারণ শক্তিসম্পন্না মহিলা গড়িয়াছিলেন। অনুসন্ধান-সমিতি নিতান্ত অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহার কুৎসা রটনা করিয়াছেন। সমিতি যে সকল ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, তাহার অনেকগুলিই গাঁজাখুরী রকমের। সমিতি খুব আড়ম্বরপূর্ণ লম্বা লম্বা কথার ব্যবহারে মহাপটু। এ সব দোষ ও ত্রুটি সমিতির থাকিলেও আমরা বলিতে চাই যে উঁহাদের দ্বারা জগতের উপকারও অনেকটা হইয়াছে। আমরা সেই উপকারটুকুর জন্য উঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ। চলিতে জানিলে অনুসন্ধানসমিতি জগতের আরও বিস্তর উপকার করিতে পারিতেন।

ভূতের কাছে ইঁহারা যেমনভাবে চলেন, সেইরূপ চলাটা হয় তো বিজ্ঞান-সম্মত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ভূতেরা তাহাতে তৃপ্তি পায় না। তাহারা সেইরূপ ব্যবহার চায় না। সমিতি ভূতের সঙ্গে যেমন চলিতে বলেন, আমরা সাধারণকে সেইরূপ চলিবার উপদেশ দিতে পারি না। আমরা ভূতকে এরূপ একটা ভয়ের জিনিস মনে করিতে বলি না। তাহারাও মানুষ, আমাদেরই আত্মীয়-বন্ধু, আমরা তাহাদের অনেক উপকার করিতে পারি, তাহারা কষ্টে পড়িয়াই আমাদের কাছে আইসে—এইরূপ ভাবাটাই ভাল। আমরা ভূতের সম্বন্ধে এইরূপ ভাবনাই ভাবি।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতে পার—ভূত দেখা গেলে তবে কি করিতে হইবে? আমরা বলি—ভূতটা যদি ভূত না হইয়া জীবিত মানুষ হইত, তবে তাহার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিতে, ভূতের সঙ্গেও

সেইরূপ ভদ্রতা রক্ষা করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে হইবে; কেবল মনে রাখিতে হইবে, উহার সময় বড় কম, অনেকক্ষণ থাকিতে পারিবে না, তাই খুব মন দিয়া অল্প সময়ের মধ্যে উহার কথাগুলি শুনিয়া লইতে হইবে। কি উপকার ও চায়, শুনিয়া লইবে! ভূত আসিলে ভয় না করিয়া বেশ মিষ্ট হাসি হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে—"আমার কাছে তুমি কি উপকার চাও? আমি আনন্দের সঙ্গে তোমার সেই উপকার করিব।" তুমি এইরূপ বলিলে হয় তো সে তোমার কাছে তখনই তাহার প্রাণের কথাগুলি বলিবে। "হয় তো" বলিতেছি, কেন না, মানুষের মত একটা গলার স্বর গড়িয়া তোলা উহাদের সকল সময়ে শক্তিতে কুলায় না। তখন—তখনই যদি কথা বলিয়া উঠিতে না পারে, তবে অন্য প্রকারে তোমাকে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিবে। ভূতটা যদি কথা না বলিতেও পারে, আবার অন্য রকমেও ইচ্ছা জানাইতে অসমর্থ হয়, দেখা দিয়াই যদি মিলাইয়া যায়, তবে মনে করিও না যে, সে চলিয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব সে তোমার কাছেই অদৃশ্যভাবে আছে। সে কাছে আছে ভাবিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিবে। তাহাকে বলিবে—'যদি ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করা তোমার শক্তিতে কুলায়, তবে তাহাই কর।' যদি ভূতটা শব্দ করিয়া বসে, তবে কয়টি ঠক্ ঠক্ শব্দে কি কথা বুঝিতে হইবে, একটা স্থির করিয়া তাহাকে জানাইবে। আর সেই সঙ্কেত দ্বারা তাহার সঙ্গে কথা বলাবলি করিবে। প্রেত-বৈঠকে এই উপায়েই সাধারণতঃ ভূতের সঙ্গে কথা বলাবলি হয়। ভূতটা যদি ঠক্ ঠক্ শব্দ না করিতে পারে, তবে তাহাকে বলিও—'আমি ঘুমাইয়া পড়িলে ভুবর্লোকে তো যাইয়া উঠিবই, তখন তুমি অতি সহজেই আমাকে তোমার কথা বলিতে পারিবে, তখনই বলিও।' আর তাহাকে বেশ সাহস-ভরসা দিয়া বলিবে—"তুমি ভয় পেও না, অস্থির হইও না।" বেশ শান্তভাবে মিষ্ট কথায় তাহার প্রাণে শান্তি আনিবার চেষ্টা করিবে; আর সে যেন বুঝিতে পারে যে, তুমি তাহার উপকার করিতে প্রস্তুতই আছ।

ভূতের সঙ্গে দেখা হইলে সাধারণতঃ মানুষ ভয় পায়। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না হইলে হঠাৎ সাহস আইসে না। সাহসী হইয়া উঠিতে হইলে মরণ ব্যাপারটা কি, তাহা বেশ করিয়া প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া লইতে হইবে। আর মনে রাখিতে হইবে যে, মরণের পর মানুষটার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। মরণের পূর্ব্বেও যেমন থাকে, মরণের পরেও সেইরূপ। যে মরিয়া গেল, তাহাকে যদি আমরা ভালবাসিয়া থাকি, তবে মরণের পর তাহাকে দেখিলে ভয় হইবে কেন? যদি মনে হয়, ও আমাদেরই আশায় আসিয়াছে, তবে উহার জন্য দুঃখই হইবে, উহাকে দেখিয়া ভয় হইবে কেন? বিশেষ যেখানে ভালবাসা থাকে, সেখানে ভয় থাকিতে পারে না। আর একটি প্রয়োজনীয় কথা এই, ছেটে ছোট ছেলে-পুলেদিগকেও ঐরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। তাহারাও যেন ভূতগুলিকে ভয়ের পাত্র না ভাবিয়া ভালবাসার পাত্র, সহানুভূতির পাত্র, সৌহৃদ্যের পাত্র মনে করে। নির্ব্বোধ ধাইগুলা অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত জুজুর গল্প করিয়া, মিথ্যা মিথ্যা ভূতের অত্যাচারের গল্প করিয়া, ছোট ছোট ছেলে-পুলেগুলিকে ভয় দেখাইয়া থাকে। বাল্যকালে যদি ঐরূপ একটা ভয় মনের মধ্যে জন্মিয়া যায়, তবে বড় হইলে আর সে ভয় দূর করিয়া উঠা যায় না। বাল্যকালে যদি ছেলেপুলেরা বুঝিয়া রাখে যে, মরণ ব্যাপারটা খুব ভয়ের ব্যাপার নহে, যদি তাহারা জানিয়া রাখে যে, তাহাদের যে সকল সাথী বা আত্মীয় মারা গিয়াছে, তাহারা খুব বেশী দূরে যায় নাই, একটা ভাল স্থানে অথচ কাছেই আছে, সেখানে যাইতে হইলে এই স্থূল-শরীরটা লইয়া যাওয়া যায় না, এটাকে রাখিয়া যাইতে হয়, যদি তাহারা জানিতে পারে যে, তাহারা আসিয়া আবার দেখাও দিতে পারে, আর যে তাহাদিগকে দেখিতে পায়, সে খুব ভাগ্যবান্, আর যদি ছেলেপুলেরা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের সেই মরা সাথী বা আত্মীয়েরা আসিয়া আবার তাহাদের উপকারও করিতে পারে, তবে তাহাদের মনে অনর্থক কতকগুলি ভয় ও কুসংস্কারের আবর্জ্জনা আসিয়া জন্মিবে না। তাহা হইলে তাহারা ভূত দেখিলে বরং স্ফূর্ত্তিই বোধ করিবে।

ভূতগুলিকে যদি আমরা ভয়ের চোখে না দেখিয়া সহানুভূতির পাত্র মনে করি, আর আমাদের ছেলেপুলেগুলিকে যদি সেইরূপ মনে করিতে শিক্ষা দিই, তাহা হইলে অদূর-ভবিষ্যতে আমাদের অবস্থা চমৎকারই হইয়া উঠিবে। তখন জীবিত মানুষ আর মরামানুষ একসঙ্গে বিচরণ করিবে; জীবিতেরা মরা মানুষগুলার উপকারে ব্যস্ত থাকিবে, মরা মানুষগুলিও আবার জীবিত মানুষগুলার উপকার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবে; ভয় বলিয়া, ভ্রম বলিয়া কিছুই থাকিবে না; ঋষিদের মত সকল সময়েই জীবিত মানুষরা সূক্ষ্মজগতের জীবের সঙ্গে কথা বলাবলি করিবে। মানুষ মরে না, মরণের পরও বাঁচিয়া থাকে, এই মহান্ সত্যটা আজও লোকে ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে না, তখন প্রাণে প্রাণে সেটা খাঁটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকিবে। তখন বাঁচিয়া থাকিব বলিয়া আর একটা বিশেষ আগ্রহ জন্মিবে না; স্থূলদেহ থাকা আর না থাকা তাহার কাছে এক রকমই বোধ হইবে, তখন কেবল সেবা-ধর্ম্মে মানুষ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আত্মোন্নতির নিমিত্তই ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। যে অবস্থার কথা বলিলাম, এটা যে একটা কল্পনা, তাহা নহে। যাঁহারা পরা-বিদ্যার আলোচনা করেন, পরা-বিদ্যার উপদেশমত চলিয়া নিজের নিজের জীবনকে যোগীর জীবনের মত গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা এখনই এই স্থূল-শরীরে ঐ অবস্থাটা বুঝিতে পারিতেছেন। যদি তুমি তোমার জীবন ঐরূপ ভাবে গড়িয়া তোল, তুমিও ঐ অবস্থা নিজেই দেখিতে পাইবে। পরা-বিদ্যার উপদেশ বেশ করিয়া শুন ও বুঝিয়া লও, তাহা হইলে তুমিও আমাদের মত সব জানিতে ও বুঝিতে পারিবে। পবিত্রতা, পরোপকার, আর প্রেম এই তিনটিই স্বর্গীয় গুণ। চরিত্রে এই তিনটি গুণ যতই ফুটাইয়া তোলা যায়, ততই যোগীর জীবন গড়িয়া উঠে। আমরা ঐ তিনটি গুণকেই ধরিয়া করিয়া চলি। তোমরাও আমাদের মত চল। তাহা হইলে আত্মার অ-মরত্ব তোমরাও বুঝিতে পারিবে।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

ভূত-নামান

বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আজকাল বৈঠক করিয়া ভূত আনা হয়। ঐ বৈঠককে ভূতের বৈঠক বলা যায়। এক দল লোক আছে, ভূত আনা, ভূতের কাছে সংবাদ লওয়া প্রভৃতি কাজে তাঁহাদের ভারি স্ফূর্ত্তি—ভারি আগ্রহ। উহাদিগকে প্রেতব্যবসায়ী বলা যাউক। মরণের পরও মানুষ বাঁচিয়া থাকে, আমরা আগে যে সকল গল্প বলিয়াছি, এ কথার প্রমাণ তাহাতে পাওয়া যায়। আবার ভূতের বৈঠকে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহাতেও বেশ বুঝা যায় যে, মরিয়া গেলে সবই ফুরাইয়া যায় না; বেশ বুঝা যায়. বেশ প্রমাণ হয় যে, মরিয়া গেলেও মানুষ সূক্ষ্মজগতে বাঁচিয়া থাকে। পরাবিদ্যাবিদ্‌গণ অলৌকিক ঘটনাগুলি দেখিয়া, বুঝিয়া, পরীক্ষা করিয়া, তুলনা করিয়া, ভূতের বা পরলোকের একটা স্থির সিদ্ধান্ত করেন। সেইরূপ ভূতের বৈঠকে যে সকল ঘটনা ঘটে, সেগুলিও যদি ভাল করিয়া পরীক্ষা ও তুলনা করিয়া দেখা যায়, তবে পরলোকের অনেক খাঁটী খাঁটী তথ্য জানিতে পারা যায়। একটা বাহিরের লোক খেয়াল করিয়া যদি এক দিন বৈঠকে বসে, তবে সে পরলোকের তথ্যটা তত সহজে বুঝিতে পারিবে না। যাহারা বৈঠক লইয়া থাকে, সেই প্রেত-ব্যবসায়ীরাই ভিন্ন ভিন্ন রকমের ঘটনাগুলির মধ্যে একটা তুলনা করিবার সুযোগ পায়। তাহারাই পরলোকের সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিয়া লইতে পারে; কিন্তু এমন কাণ্ডও অনেক ঘটে যে, তাহারাও তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। পরা-বিদ্যার কৃপায় আমরা জানিয়াছি, ভূত নানা শ্রেণীর আছে; নানা উদ্দেশ্যে আমাদের সম্মুখে আসিয়া হাজির হয়। পরাবিদ্যা-আলোচনার ফলে আমরা ভূতের বিষয়টা বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে

বুঝিয়া লইতে পারি। ভূতের বৈঠকে যে সকল দুর্বোধ্য ঘটনা ঘটে, তাহাও পরাবিদ্যায় জ্ঞান থাকিলে বেশ পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়।

প্রেত-ব্যবসায়ী বন্ধুরা যদি পরাবিদ্যার আলোচনা করেন, তবে বৈঠকের কোন ঘটনাই তাঁহাদের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন হয় না। তাঁহারা বৈঠকের অলৌকিক কাণ্ডগুলি দেখিয়া মনে করেন, এগুলি যুক্তির সহিত খাপ খায় না, এগুলি বুঝি বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী। এরূপ মনে করাই ভুল। এই ভুল ধারণা থাকার জন্যই তাঁহারা অনেক কথা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা এ ভুল ধারণাটি দূর করিবারও চেষ্টা করেন না। একটু চেষ্টা করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, বৈঠকের কোন কাণ্ডই সত্যের বিরোধী নহে, বিজ্ঞানের প্রতিকূলও নহে; পরন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে এক সুরেই বাঁধা। একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটিলেই প্রেতব্যবসায়ী বন্ধুরা মনের আবেগে চীৎকার করিয়া উঠেন—"কি অদ্ভুত! কি চমৎকার! কি সুন্দর!" তাঁহারা উহা দেখিয়া বিস্ময়ে ডুবিয়া যান, অবাক হইয়া থাকেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারেন, আশ্চর্য অদ্ভুত কিছুই নহে, সবই ষোল আনা স্বাভাবিক। আর স্বাভাবিক বলিয়াই অতি সুন্দর! যাহা বাস্তবিক, স্বাভাবিক তাহাই সুন্দর। আমরা জগতে খাঁটি সুন্দর কিছু দেখিতে পাই না; তাহার একমাত্র কারণ, আমাদেরই দোষ। আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতে চলিয়া চলিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছি। তাই খাঁটি সুন্দর কিছু আমাদের চোখে পড়ে না। আমরা সুন্দর দেখিতে পাই না বলিয়া যে সুন্দর নহে, তাহা নহে। আমরা নিজেরা মন্দ হইয়া গিয়াছি, তাই মন্দ দিক্‌টাই সম্মুখে পড়ে। কোন কিছু প্রকৃত সুন্দর দেখিয়া বসিলে, তখনই সন্দিগ্ধচিত্তে বলিতে থাকি—"তাই তো, এত সুন্দর কি হইতে পারে? ইহা নিতান্তই অস্বাভাবিক! এত সুন্দর যে, উহাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করা চলে না।" প্রকৃতভাবে বুঝিলে দেখা যায় যে, খুব সুন্দর বলিয়াই উহা সত্য ও স্বাভাবিক। বুঝিলে তখন মনে হইবে—"উহা এতই ভাল যে, সত্য না হইয়াই পারে না।"

সত্যস্বরূপ, আর তিনি ভালও। অতএব যাহা সত্য, তাহাই ভাল; যাহা ভাল, তাহাই সত্য।

পরা-বিদ্যার মতে বৈঠকি কাণ্ডের ব্যাখ্যা

প্রকৃতি বলিতে শুধু এই স্থূল-জগৎটা নহে। ইহা ছাড়া সূক্ষ্ম-জগৎ আছে। সূক্ষ্ম-জগতেরও আবার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অনেকগুলি স্তর আছে। এক এক স্তরের মধ্যেও আবার কতকগুলি করিয়া বিভাগ আছে। মানুষ মরিয়া যাইবার পর ঐ সূক্ষ্ম-জগতে যায়। তাহার পর যতই ভিন্ন ভিন্ন স্তর অতিক্রম করে, ততই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি লাভ করিয়া থাকে, ততই তাহার দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া যায়, ততই অসাধ্যসাধন করা তাহার পক্ষে খুবই সহজ হইয়া আইসে। এ সব কথা পরাবিদ্যা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে। যাঁহারা পরাবিদ্যার আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই জন্য বৈঠকি ভূতের কোন কাণ্ডই দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয় না। লেড্‌-বিটার সাহেব "দিব্যদৃষ্টি" নামক পুস্তকে সূক্ষ্ম-জগতের স্তরগুলির সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ইচ্ছা হইলে, পাঠক সে বইখানি পড়িয়া দেখিতে পারেন। মরণের পর সূক্ষ্ম-জগতে নূতন শক্তি লাভ করিলে মানুষ কত অদ্ভুত কাণ্ডই করিতে পারে। একখানি বই বন্ধ রহিয়াছে, অথচ তাহার মধ্যস্থ যে কোন পাতার যে কোন লেখাটাই পড়িয়া দিতে পারে; বাক্‌সের ভিতরে হয় তো একখানি পত্র আটকানো আছে, অথচ বাহির হইতে সে পত্রখানা পড়িয়া দেয়; খুব দূরে কি ঘটিতেছে, তাহা হয় তো এখান হইতেই দেখিয়া বলিয়া দিতে পারে; অথবা উপস্থিত বা অনুপস্থিত যে কোন লোকের মনের কথাও বলিয়া দিতে পারে। মরণের পর মানুষের এত শক্তি বাড়িয়া যায়। জীবিতকালেও মানুষ সাধনা করিয়া ঐ সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-শক্তির বিকাশ করিয়া লইতে পারে। ঐরূপ দৃষ্টি করিবার শক্তিটা সব মানুষের মধ্যেই খুব অদৃশ্যভাবে, সূক্ষ্মভাবে আছে। চেষ্টা-যত্ন করিয়া, সদাচার-সংযম প্রভৃতি দ্বারা উহাকে একটু

বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষ ভূতের মত ক্ষমতাই লাভ করিতে পারে! যাঁহারা সাধনা-বলে ঐরূপ দৃষ্টি-শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা বৈঠকি-কাণ্ডগুলিকে আর আশ্চর্য্য, অদ্ভুত বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা দেখেন, ঐ কাণ্ডগুলি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। উহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। যাঁহারা সূক্ষ্ম-জগতের খোঁজ-খবরই রাখেন না, তাঁহারা ভাবিয়াই স্থির করিতে পারেন না যে, ঐ সকল কাণ্ড কি করিয়া ঘটিতে পারে। অসভ্য বর্ব্বরেরা আমাদের ব্যবহৃত বিদ্যুতের আলো, টেলিফোন-যন্ত্র দেখিলে যেমন অবাক্ হইয়া থাকে, তাঁহারাও সেই রকম বৈঠকি-কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত-চোখে চাহিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদ্যুদালোক প্রভৃতির তথ্য জানেন বলিয়াই ঐগুলিকে যাদু-বিদ্যা বলিয়া মনে করেন না; পরন্তু ভাবেন যে, উহা নিতান্তই স্বাভাবিক। অসভ্যেরা টেলিফোন প্রভৃতিকে যে চোখে দেখিবে, শিক্ষিতেরা সে চোখে দেখিবে না। সূক্ষ্ম-জগতের বেলাও সেইরূপ। সিদ্ধ যোগীরা অলৌকিক ঘটনাগুলিকে এক চোখে দেখিবেন, আর সাধারণ লোকেরা অন্য চোখে দেখিবে।

পরা-বিদ্যার সাহায্যে আমরা বৈঠকি-কাণ্ডের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনিতে পারি; কোন্‌টা কিরূপ শ্রেণীর কাণ্ড, তাহা বুঝিতে পারি। বৈঠকি ভূতের কাণ্ডগুলিকে আমরা পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। বৈঠকি ভূতের যত কাণ্ডই দেখা যাউক, তাহা এই পাঁচটি ভাগের কোন না কোন ভাগে পড়িবেই। ভূতগুলির আত্ম-প্রকাশের শক্তি একরূপ নহে। কাহারও শক্তি বেশী, কাহারও কম। তাই এক এক জন এক এক রকমে আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের শক্তি অনুসারেই আমরা ভাগ স্থির করিলাম। সেইটিই শ্রেণী-বিভাগের সহজ উপায় বলিয়া আমাদের মনে হয়। বৈঠকি ভূতের ভাগগুলি এই:—

১। কোন কোন ভূত কাহারও ঘাড়ে চাপিয়া আইসে। তাহার মুখ দিয়া কথা বলে। তাহার হাত দিয়া লেখে বা আঁকে। তাহার

মুখেই বলে, আমি অমুক। কখন কখন এই শ্রেণীর ভূতেরাই "প্ল্যানচেট" নামক যন্ত্রের মধ্যেও আইসে।

২। কখন কখন এক শ্রেণীর ভূত কাহারও ঘাড়ে চাপিয়া, তাহার সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ফুটাইয়া দেয়; তখন সে ব্যক্তি কোন পুস্তকের কোন লেখা না দেখিয়াই পড়িয়া বসে, বা কোন বাক্সের মধ্যে কাহারও আটকানো পত্রের লেখা বাহির হইতে পড়িয়া দেয়, বা কাহারও মনের কথা বলিয়া বসে, বা কোন লোক কিংবা জিনিস খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে বলিয়া দেয় যে, অমুক স্থানে সে বা তাহা আছে।

৩। কোন কোন ভূত খানিকটা স্থূল হয়, কিন্তু দেখা দিবার মত অতটা স্থূল হইতে পারে না। ইহারাও ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করে, টেবিল উলট-পালট করিয়া রাখিয়া দেয়, কোন জিনিস শূন্য দিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, বা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া রাখে, শ্লেটের উপরে হয় তো কিছু লিখিয়া বা আঁকিয়া বসে। সে লেখাটা কোন জীবিত মানুষের হাত দিয়া লেখে না, সে নিজেই লেখে। ইহারা কখন কখন স্থূল হাতে হয় তো কাহারও গায়ে হাত দিয়া ছুঁইয়া বসে, কিংবা হয় তো একটা গলার স্বর শুনাইয়া দেয়। "মরা মানুষের স্পর্শ ও স্বর পাইবার জন্য কবিরা বড়ই আগ্রহ করিতেন।" তাঁহাদের আশা এই সকল ভূতের কাছে পূর্ণ হয়। ভূতের বৈঠকে যে সকল ছোট ছোট কাণ্ড ঘটে, তাহার অধিকাংশই এই শ্রেণীর ভূতের দ্বারা ঘটে। ইহারাই গান-বাজনার যন্ত্র বাজাইয়া থাকে। বাদ্য-যন্ত্রে চাবি দেওয়া, যন্ত্রটিকে শূন্যে লইয়া বেড়ান প্রভৃতি কাণ্ড ইহারাই করে। বৈঠকে খুব একটা ঠাণ্ডা হাওয়া গায় লাগে, সেটাও ইহাদের কাণ্ড। বোর্ডে নাম লিখিয়া দেওয়া, প্ল্যানচেটে আসিয়া কিছু লিখিয়া বসা প্রভৃতি ব্যাপার ইহারাই করে।

৪। আর এক শ্রেণী আছে, সে শ্রেণীর ভূতেরা কিছু উন্নত। খুব কত কিছু একটা লেখা বা কিছু একটা আঁকা ইহাদেরই কাণ্ড। ইহারা ইচ্ছা করিয়া কখন কখন অনেক রকম আলোকের সৃষ্টি করে, কখন বা

অনেকগুলি এক রকম জিনিস তৈয়ারী করিয়া সম্মুখে হাজির করে। দূরের জিনিস আনিয়া ফেলে, আটকানো বাক্সের জিনিস বাহিরে আনে, কখনও বা আগুনের সৃষ্টি করে—এইরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ইহারা করিয়া থাকে। সূক্ষ্ম-জগতের বিধি-ব্যবস্থা ইহারা বেশ একটু ভালরূপই জানে।

৫। কোন কোন ভূত স্থূল-শরীর ধরিয়া দেখা পর্য্যন্ত দেয়।

আমরা ঐ পাঁচটি শ্রেণীর কথাই পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যতদূর সাধ্য বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিব। প্রত্যেক শ্রেণীরই ঘটনা এই জগতে ঘটিয়াছে। সে সব তথ্য পুস্তকেও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা পরে বিশদ করিয়া বলিবার সময় সেই সব ব্যাপার উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব। লেড্‌বিটার সাহেব নিজেও বহুকাল প্রেত-তত্ত্বের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁহার অভিজ্ঞতার কথাও বলিব, কেন না, প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কথার উপরেও আমরা খুব বেশী আস্থা স্থাপন করিতে পারি। আমরা ইহার পরের অধ্যায়ে প্রথমেই লেড্‌বিটারের নিজের প্রত্যক্ষ একটা ঘটনা বলিব।

ভূতের বৈঠক

লেড্‌বিটার সাহেব নিজে প্রেতের খোঁজ লইয়া এইরূপ বলিয়াছেন:— "আমার মনে হয়, আমি সর্ব্বপ্রথমে মিঃ ডি, ডি, হোমের বৈঠকে প্রেত দেখিতে বসিয়াছিলাম। ঐ সভায় যে সকল তথ্য জানিলাম, সেগুলি শুনিয়া আমার মোটেই সত্য বলিয়া তখন বিশ্বাস হইল না। তথ্যগুলি কাগজে প্রচারিতও হইল। আমি আমার মা'কে এক দিন পড়িয়া শুনাইলাম, আর আমি যে তাহা বিশ্বাস করি নাই, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম। ভূতের ঐ তথ্যগুলি একটা প্রবন্ধের মত করিয়া কাগজে ছাপান হইয়াছিল। প্রবন্ধটির শেষে লেখা ছিল—যদি এই সব ব্যাপার কাহারও বিশ্বাস না হয়, তবে তিনি ২।৪ জন বন্ধুকে লইয়া যেন একটা গোল টেবিলের চারিধারে বসিয়া দেখেন; সত্য কি মিথ্যা, তাহা হইলে

বুঝিতে পারিবেন। বসিবার উপদেশ এইরূপ ছিল যে, যে ঘরে বসিতে হইবে, সে ঘরটি যেন অন্ধকার হয় বা খুব মৃদু আলো থাকে; নীরব নিস্পন্দ হইয়া টেবিলের উপরে হাতের পাতা উপুড়ভাবে খুব আলগোছে রাখিয়া বসিতে হইবে, হাত দুখানামাত্র ছোঁয়াইয়া রাখিতে হইবে, মোটেই যেন চাপ না পড়ে। আবার ইহার অপেক্ষাও সহজ আর একটা উপায়ের কথাও ঐ প্রবন্ধে ছিল। একটা সাধারণ শ্রেণীর রেশমী কাজ-করা সোনার টুপী চিত করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দুই তিন জনে টুপীটার কানা ছুঁইয়া থাকিতে হইবে। তাহা হইলে টেবিলটা বা টুপীটা খানিক পরেই নড়িয়া-চড়িয়া উঠিবে। তখন বেশ বুঝা যাইবে যে, বাহির হইতে অন্য একটা শক্তি আসিয়া ঐরূপ কাণ্ড করিতেছে।

মা প্রবন্ধটি শুনিয়া বলিলেন, 'টুপী রাখিয়া পরীক্ষা করাটা খুবই সহজ। সন্ধ্যাও হইয়া আসিতেছে; বেশ, আজই দেখা যাউক।' মা'র কথামত আমি একটা টেবিল বাছিয়া লইলাম। টেবিলটা গোল ও ছোট, ঠিক মাঝে মাত্র একটি পায়া। টেবিলটার উপর কচু-ফুল রাখা হইত, অন্য কাজে উহা বড় লাগিত না। টেবিল পাতিয়া আমি টুপীটা পাড়িয়া উহার উপরে রাখিলাম। তাহার পরে প্রবন্ধের উপদেশ মত আমরা টুপীর কানা আলগোছে ছুঁইয়া বসিলাম। আমি আর আমার মা ছাড়া সেই ঘরে আর একটি বালক ছিল। ছোট বালক। তাহার বয়স ১২ বৎসর। পরে জানা গিয়াছিল, সেই বালকটি না কি ভূতের বেশ ভাল বাহন বা "মিডিয়ম্"। যাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া ভূতেরা আইসে, তাহাদিগকে বাহন বা মিডিয়ম্ বলে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন "মিডিয়ম্" শব্দটি বা মিডিয়মের কাজ-কর্ম্ম কিছুই জানিতাম না, বুঝিতামও না। টুপী ছুঁইয়া বসিবার সময় আমরা কেহই ভাবি নাই যে, একটা কিছু ঘটিবে। কিন্তু আশ্চর্য্য! খানিক পরেই টুপীটা অর্দ্ধপাকে ঘুরিয়া পড়িল, আমি খুবই বিস্মিত হইলাম।

আমি ভাবিলাম, হয় তো মা টুপীটা নড়াইয়াছিলেন; মা ভাবিলেন,

হয় তো আমি নড়াইয়াছি; কিন্তু একটু পরেই আমাদের সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। টুপীটি একটু পরেই মহাবেগে ঘর ঘর শব্দ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। সে এমন ঘুর যে, তাহার উপর আমাদের হাত রাখাই কঠিন হইয়া উঠিল। পরামর্শ করিয়া তখন আমরা হাত উঁচু করিলাম। টুপীটাও হাতের সঙ্গে সঙ্গে বাধিয়া উঠিল; টেবিল হইতে কয়েক ইঞ্চি উঠিয়া শূন্যে হাতের সঙ্গে ঝুলিতে লাগিল। তাহার পর পড়িয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি খুবই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। আমি আবার ঐ মজা দেখিবার নিমিত্ত টুপীটা ধরিয়া বসিলাম। অবশ্য মা ও সেই বালকটিও ধরিয়াছিল। সেবার খানিকটা সময় টুপীটা নড়িল না। কয়েক মিনিট আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইল। পরে টুপীর মধ্যে ভূতটা সত্য সত্যই আসিয়া পড়িল; আগেকার মত টুপী এবারও আমাদের হাতের সঙ্গে বাধিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু এবারও শুধু টুপী নহে। টুপীর সঙ্গে সঙ্গে উহার গায়ে বাধিয়া টেবিলও উঠিতে লাগিল। টেবিল ও টুপী বেশ শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। চমৎকার কাণ্ড! পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি পরাভব মানিল। আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। নীচে চাহিয়া দেখিলাম, টেবিলটা মেঝে হইতে প্রায় ছয় ইঞ্চি উঠিয়াছে। টেবিলের নীচে আমি পা চালাইয়া দেখিলাম, কেহ দুষ্টামী করিয়া ঐরূপ করিয়াছে কি না। দেখিলাম, নীচে বা কাছে কাহারও পা নাই। প্রথমবারে যখন টুপীটা উঠিয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, ঐ ছেলেটা বোধ হয় বদ্‌মায়েসী করিয়া ঐরূপ করিয়াছে। যদিও বালকটিকে ঐরূপ করিতে দেখি নাই, তথাচ তাহার উপর যেন একটা কেমন সন্দেহ আসিতেছিল; কিন্তু এবার আর কোন সন্দেহই আসিল না। ঐরূপ টেবিলটাকে শূন্যে উঠাইয়া রাখা বড় সহজ নহে। বালক ঐরূপ করিতে গেলে নিশ্চয় ধরা পড়িত। প্রায় দুই মিনিট পরে টেবিলটা পড়িয়া গেল। তাহার একটু পরেই টুপীটাও পড়িয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিবার জন্য আমার কৌতুক বাড়িয়া গেল। আমি আবার টুপী ধরিয়া বসিলাম, শুধু আর একবার নহে। সেই রাত্রিতে কয়েক মিনিট পরে পরে অনেকবার

ভূতটাকে আনিবার চেষ্টা করিলাম। ২।১ বারের পরই বিশ্রী নড়িতে লাগিল। সে এত জোরে নড়া যে, টুপীটি টেবিলের উপর হইতে ছিট্‌কাইয়া তফাতে গিয়া পড়িল। ভূতটা হয় তো আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে আসিয়াছিল। আসিলে কি হয়? আমরা কথা বলিবার উপায়টা জানিতাম না। তাই তাহার সঙ্গে কথা বলিতে পারিলাম না। টেবিলটা বিশ্রী নড়িতেছে, একটা অদ্ভুত শক্তি উহার মধ্যে আসিয়াছে, ইহা দেখিয়াই আমরা খুব মজা বোধ করিতে লাগিলাম। একটা মরা মানুষ যে আসিয়াছে, সে কথা তখন আমি একটুও ভাবি নাই। আমি ভাবিলাম—বাঃ! একটা নূতন শক্তির আবিষ্কার হইল!

পরদিন এই ঘটনার গল্পটা কয়েক জন বন্ধুর কাছে বলিলাম। তাঁহাদের মধ্যে এক জন বলিলেন—"হ্যাঁ, এমন হইয়া থাকে, আমিও ২।১ বার বৈঠকে বসিয়া এই রকম ব্যাপার দেখিয়াছি।" সেই দিন সন্ধ্যাকালে আমি আবার ঐরূপ করিয়া ভূত আনিবার সঙ্কল্প করিলাম। সেই বন্ধুটিকে আমাদের সঙ্গে বসিবার অনুরোধ করায় তিনিও বসিতে রাজী হইলেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে লইয়া আমরা যথারীতি টেবিলে বসিলাম। টেবিল দুলিতে লাগিল। বন্ধু তখন সঙ্কেত দ্বারা নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। টেবিলও সঙ্কেত অনুযায়ী চমৎকার নড়িয়া নড়িয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল; যে ভূতটি আসিয়াছিল, সে জ্ঞানী বুদ্ধিমান্ ভূত নহে; তাই তাহার কাছে খুব ভাল ভাল সংবাদ বড় বেশী পাইলাম না। সে ভূতটা যেন একটু অসভ্য গোছের। গায়ের জোর দেখানই যেন তাহার ইচ্ছা। ভূতটা ঘরের মধ্যে ভারী ভারী জিনিসপত্রগুলি সব জোরে মেঝের উপর আছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, অনেকগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়াও গেল; কিন্তু মানুষগুলির গায়ে আঘাত লাগিল না। আমাদের দলে এক জন বন্ধু একটু নাস্তিক রকমের ছিল। সে বড় কিছু বিশ্বাস করিতে চাহিত না। ভূতটা তাহার পায়ের উপর একটা পিতলের অগ্নি-নিবারক দ্রব্য ফেলিয়া দিল।

আরও উপদ্রব

আমরা দ্বিতীয়বার যখন টেবিলে বসিয়াছিলাম, তখন সেই সোনার টুপীটা চূরমার হইয়া গিয়াছিল। সেটি ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা তাহার পর হইতে টেবিলের উপর শুধু হাত রাখিয়াই বসিতাম। বসিলে কয়েক সেকেণ্ড পরেই টেবিল এত নড়িত চড়িত যে, তাহার উপর প্রায়ই হাত রাখিতে পারিতাম না। তৃতীয়বার বসিলে টেবিলটা ভয়ানক জখম হইল। উহা দুলিয়া দুলিয়া একটু ক্ষান্ত হইত ; আবার দুলিত। এই কাণ্ড! যখন একটু স্থির হইত, তখন আমরা উহার উপর হাত রাখিয়া বসিতাম। আর সেই সময় উহার ভিতর হইতে কেমন এক রকম স্বন্ স্বন্ শব্দ হইত। টেবিল ধরিয়া বসিয়া আছি, একরূপ স্বন্ স্বন্ শব্দ হইতে লাগিল। তাহার পর মনে হইল, যেন কি একটা মেঝের উপর আসিয়া পড়িল। চাহিয়া দেখিলাম—সেটা একটা স্ক্রুপ্। ভাবিলাম, এটা ভূত কোথায় পাইল আর আনিলই বা কেন? আরও দুইবার ঐরূপ স্বন্ স্বন্ শব্দ টেবিলের তলা হইতে শুনা গেল, আরও দুইটা স্ক্রুপ আসিয়া মেঝেয় পড়িল। তখনও প্রকৃত ব্যাপারটা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

তাহার পরেই ভয়ানক কাণ্ড! ভীষণ একটা শব্দ হইল। টেবিলের তলা হইতে উপরের দিকে কে যেন হঠাৎ একটা বিশ্রী লাথি মারিয়া দিল। টেবিলটা উপরের দিকে লাফাইয়া উঠিল, আমরাও হুড়-মুড় করিয়া পড়িয়া গেলাম। শব্দটা আর ধাক্কাটা যেমন ভাবে হইল, তাহাতে বোধ হয়, ওটা যেন ভারি বুট-জুতা-পরা পায়ের লাথি! ধম্ ধম্ করিয়া পর পর তিন চারিবার লাথি আসিয়া টেবিলের গায়ে পড়িল। ফলে টেবিলের তক্তা পায়া হইতে ছিট্‌কাইয়া গেল। তখন শুধু পায়াই ঠক্ ঠক্ করিয়া দুলিতে লাগিল। সবগুলি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া মেঝেয় আসিয়া পড়িল; পড়িয়াও স্থির থাকিল না; মেঝেয় পড়িয়াও হুটাপুটি করিতে লাগিল। খুব একটা মসৃণ জায়গায় একটি টাকাকে টোকা মারিয়া যদি ঘুরাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা খানিকটা খুব ঘোরে, তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে

পড়িয়া যায়; টেবিলটাও মেঝের উপর ঐরূপ ভাবে কাঁপিতে লাগিল। তখন দুই জন খুব বলবান্ লোক উহার উপর যাইয়া চাপিয়া বসিল। তাহাদের গায়ে যত জোর আছে, তত জোর দিয়া কাঁপুনি থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পারিল না। টেবিল একভাবেই কাঁপিতে লাগিল। তাহার পর উহাতে এমন এক ঝাঁকি আসিয়া লাগিল যে, ঐ দুইটা লোক ছিটকাইয়া তফাতে গিয়া পড়িল। দুইটা লোককে ঠিক্‌রাইয়া ফেলিতে ভূতের যেন একটু কষ্টও হইল না।

টেবিল ভাঙ্গিয়া গেলে সেই তক্তাখানা মেঝের কার্পেটের সঙ্গে চাপিয়া ধরিলাম। আশ্চর্য্য! তখনও উহার নীচে হইতে সেই আগেকার মতই লাথির ধাক্কা আসিয়া লাগিতেছিল। কার্পেট ও শক্ত মেঝে এ দুইটা থাকা সত্ত্বেও লাথি। ঐ দুইটাতে লাথি মারার পক্ষে যেন কোনই বাধা হইতেছিল না। এই সব উপদ্রব থামিয়া গেলে, আমরা টেবিলটা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। তখন বুঝিলাম যে, পায়া হইতে টেবিলটাকে খুলিয়া ফেলাই ভূতটার যেন ইচ্ছা। তাই তিনটা স্ক্রুপ্‌ও খুলিয়া ফেলিয়াছিল। কেমন করিয়া খুলিয়া ফেলিল, আমরা বুঝিলাম না; কিন্তু স্ক্রুপ তুলিবার যন্ত্র দিয়া তুলিলে যেমন সুন্দরভাবে স্ক্রুপগুলি উঠিয়া যায়, এও সেইরূপ ভাবেই উঠিয়াছিল। আর একটা স্ক্রুপে মরিচা ধরিয়া গিয়াছিল, সেটাকে ভূতটা তুলিতে পারে নাই। তাই লাথি মারিয়া মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল।

ভূতের বৈঠকে এইরূপ কাণ্ড প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে ষ্ট্যাটেন্ দ্বীপে এইরূপ একটা কাণ্ড ঘটে। মিঃ রবার্ট ডেল্ আউয়েন্ তাঁহার "বিতর্কভূমি" নামক পুস্তকের ২৮৫ পৃষ্ঠায় ঘটনাটি বর্ণনা করিতে করিতে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"তাহার পর আলো নিবিয়া গেলে অন্ধকারে যেন ভূতের জোরটা আরও বাড়িয়া গেল। তখন ভয়ানক উপদ্রব হইতে লাগিল। ভূতের অত জোর ইহার আগে আমি আর কখনও দেখি নাই। আমার মনে

হইল, খুব বলিষ্ঠ লোকও ঐ রকম ভাবে টেবিলকে ধরিয়া ঝাঁকি দিতে পারে না। সে এমন জোরের ঝাঁকি যে, সে রকম ঝাঁকি গায়ে আসিয়া লাগিলে যে কোন লোকই মারা পড়িতে পারে।”

একটা অজ্ঞাত শক্তির প্রমাণ

“আমি বাড়ীতে বসিয়া বৈঠক করিয়া ঐ সব কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইলাম। যাঁহারা পাকা প্রেত-ব্যবসায়ী, তাঁহারা ঐগুলিকে তুচ্ছ মনে করিতে পারেন ; কেন না, তাঁহারা আরও কত কি দেখিতে পান, কিন্তু আমি তুচ্ছ ভাবিতে পারিলাম না। আমি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম। যদি ঐ সব কাণ্ড পরের বাড়ীতে হইত, কোন ব্যবসাদার লোকের কাছে ঘটিত, তাহা হইলে ভাবিতাম, হয় তো উহার মধ্যে জুয়াচুরি আছে। তাহা হইলে একটা সন্দেহও আসিত ; কিন্তু ঐ ব্যাপারগুলি আমার নিজের ঘরে, নিজের কাছে ঘটিল। তখন সন্দেহ থাকিতেই পারে না। তাই ভাবিলাম—এ বিষয়ের আরও তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এ প্রেত-ব্যাপার লইয়া বিস্তর পুস্তক আছে, সে খবর আমি জানিতাম না। ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া যে পরলোকের একটা প্রমাণ পাইব, তাহাও কখন ভাবি নাই। বাড়ীতে বসিয়া ঐ সব কাণ্ড দেখিবামাত্র তখন বুঝিলাম যে, সূক্ষ্মজগতে দেবতার মত প্রাণী আছে, তাহাদের বিশাল শক্তি। বিজ্ঞান সে শক্তির কথা আজও টের পায় নাই। ঐ শক্তি দেখিয়াই আমার মনে হইল, আচ্ছা, উহাকে মানুষের উপকারে কি আনা যায় না ? উহাকে আয়ত্ত করিবার কি কোন উপায় নাই ?

বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া আর বেশী কিছু জানিতে পারিলাম না। বৈঠকে বসিতে গেলেই মা বারণ করিতেন। তিনি বলিতেন, ‘উহাতে আর কাজ নাই, ভূতগুলা আসিয়া আমার জিনিসপত্র কেবল ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করে।’ তাই মা’র কথামত খুব বাড়াবাড়ি করিতাম না। যখন দেখিতাম, ভূতটা বড়ই গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল, তখন একটু ক্ষান্ত হইতাম ; তখন

বন্ধ করিয়া দিতাম। ভূতটা একটু শান্ত হইলে আবার আরম্ভ করিতাম। ভূত ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করে, কখনও বা মানুষের মত গলার স্বর বাহির করিয়া থাকে। আমার বৈঠকে এ সব ব্যাপার কখনও হয় নাই। আমার ভাগ্যে ও সব কিছু হইল না। আমার বাড়ীতে আসিয়া ভূতটা টেবিল নাড়াইত, কখন বা সেটাকে শূন্যে তুলিয়া ধরিত। সে এইরূপ ভদ্র ব্যবহার করিত। আর উৎপাত করিত না। এক দিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে বলা হইল—আচ্ছা, আমরা টেবিলে হাত দিব না, তুমি উহাকে শূন্যে তোল দেখি! যেমন বলা, অমনই টেবিলটা দুই হাত পরিমাণ উঁচু হইয়া উঠিল। আমরা সকলেই তফাতে দাঁড়াইয়া ঐ কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। উহা এক মিনিটেরও বেশী সময় শূন্যে ঝুলিয়া থাকিল। তাহার পর আস্তে আস্তে কার্পেট-মোড়া মেঝের উপরে নামিয়া পড়িল।

ভূতের দ্বারা আলোর সৃষ্টি

বাড়ীতে যে সময় বৈঠক করিয়া বসিতাম, তখন নানা রকম আলোক চক্ষুতে পড়িত। ভূতেরা যে ইচ্ছা করিয়া ঐ আলোক দেখাইত, তাহা নহে। বৈঠকে বসিলে নানারূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়, অলোক দেখাও সেইরূপ একটা। তিন রকমের আলোক চোখে পড়িত—(১) জোনাকী পোকার মত ছোট ছোট আলোকের টুক্‌রা আমাদের হাতের মধ্যে খেলা করিয়া বেড়াইত ; (২) কখন কখন খুব বড় রকম একটা আলোকময় দেহ দেখা দিত, কখন কখন সেটা আবার অর্দ্ধচন্দ্রের মত আকার ধরিয়া বসিত ; (৩) কখন বা বিদ্যুতের মত খুব উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি প্রকাশ পাইত। আমার বৈঠকের সময় এক দিন এইরূপ একটা আলোক আমার ঘরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। একটা টবে বড় একটা গাছ ছিল। আলোকটা উহার উপর দিয়া যাওয়ায় টব উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। আর দেখা গেল যে, ঐ গাছের পাতাগুলি ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে। ঠিক যেন বিদ্যুতের তেজে ঝল্‌সানর মত! প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর আলোক

বিদ্যুতের আলোর মত। দ্বিতীয় আলোকটা দীপালোকের মত। আলোক চোখে পড়িত, কখন কখন কালো মূর্ত্তিও দেখা যাইত, তথাপি এমন কথা বলিতে পারি না যে, বৈঠকে ভূত স্থূল-মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে দেখা দিয়াছে। ঐ সব ব্যাপার রাত্রির বৈঠকেই দেখা যাইত। দিনের বেলায়ও বৈঠক করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতেও ২।১টা অদ্ভুত ঘটনা দেখা গিয়াছে। যে ঘরে বৈঠক করিতাম, সে ঘরটি যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল। বৈঠকের কাজ-কর্ম্ম হইয়া গেলেও হয় তো এক ঘণ্টা পরে ঘরের দ্রব্য-সামগ্রীগুলি ক্যাঁচ-কুঁচ করিয়া একটা অদ্ভুত রকমের শব্দ করিতে লাগিল; কয়েক দিন দেখিলাম, টেবিলটা ২।৩ ফিট আপনা আপনি সরিয়া গেল। টেবিলের উপর ফুলের টব বসান রহিয়াছে, বৈঠকের কাজ তাহার অনেক আগেই মিটিয়া গিয়াছিল, তখনও টেবিল হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। এই কাণ্ড!

বৈঠকের ভূতগুলা সংবাদ দিতে বড় রাজী হয় না। তাহারা বড় স্ফূর্ত্তি করিয়া লম্ফ-ঝম্প করে—তাই সংযত হইয়া, ধৈর্য্য ধরিয়া, আস্তে আস্তে ভদ্রলোকের মত বসিয়া সংবাদ দেওয়া কাজটা আদৌ পছন্দ করে না। তাহা ছাড়া টেবিলে আসিয়া কথা বলা বা বানান করিয়া লেখা, এ সব কাজ তাহাদের পক্ষে বড়ই বিরক্তিকর। আমরা বানান করাইয়া সংবাদ লইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হই নাই। দেখিলাম, উহারা বড়ই চঞ্চল, ধৈর্য্য ধরিতে পারে না। সাধারণতঃ বৈঠকের ভূতেরা আসিয়া বিশ্রী জোরে, আর অনেকক্ষণ ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করে। কোন বাদ্য-যন্ত্র বাজাইলে উহারা বেশ তালে তালে নাচিতে থাকে। প্রেতের বৈঠকের জন্য একটা বেশ গান আছে; গানটির প্রথম সারিটা এই—"মিলিব কি আমরা তটিনী-তীরে।" যখনই ভূতটা আসিতে দেরী করে, তখনই আমরা ঐ গানটা গাহিয়া থাকি। গান শুনিবামাত্র ভূতেরা স্ফূর্ত্তির সঙ্গে আসিয়া হাজির হয়। বৈঠকে আমি যে সকল ভূত দেখিয়াছি, তাহার অনেকগুলিই ভয়ানক পাজী। উহাদের কাছে

সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই মিথ্যা ও অসঙ্গত। উহারা অনিষ্ট করিতে খুব মজবুত। একবার আমি উহাদিগের প্রদত্ত সংবাদ মিথ্যা, এই কথা বলিবামাত্র টেবিলটা লাফাইয়া উঠিয়া আমার দিকে বোঁ বোঁ করিয়া আসিতে লাগিল। আমি যদি টেবিলটাকে ধরিয়া না ফেলিতাম, তবে উহাতে নিশ্চয়ই গুরুতর আঘাতই পাইতাম। আমি শূন্য-পথে টেবিলটা ধরিয়া ফেলিলেও উহা আমার হাত ছাড়িয়া আমার মুখের উপর পড়িবার জন্য ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতে লাগিল। তখন আমার বন্ধুরা সকলে মিলিয়া উহাকে ধরিয়া তফাৎ করিল। তাই রক্ষা পাইলাম। বাঘ-ভালুকে যেমন আক্রমণ করে, সেই ভূতুড়ে টেবিলটাও আমাকে সেইরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল ; কিন্তু শীঘ্রই উহার এত জোর, অত রাগ, যেন নিভিয়া গেল। যেমন টেবিল, আবার তেমনিটিই হইল !

ব্যবসায়ী "মিডিয়ম্"দের ব্যবহার

বাড়ীর বৈঠকে ঐ সকল কাণ্ড দেখিয়া প্রেততত্ত্বটা ভাল করিয়া জানিয়া শুনিয়া লইবার নিমিত্ত আমার প্রাণে খুব বলবতী একটা ইচ্ছা জন্মিল। অনুসন্ধানে জানিলাম, প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর পুস্তক ও সংবাদপত্র আছে। শুনিলাম, সেগুলি পড়িলে, আর মিডিয়মদের সঙ্গে মিশামিশি করিলে অনেক কথা, অনেক ব্যাপার, অনেক তথ্য জানা যায়। আমি তখন খুব বড় বড় বৈঠকে যাইতে লাগিলাম। সে সব স্থানে অনেক ভাল ভাল ব্যাপার অবগত হইলাম ; কিন্তু দেখিলাম, যে বৈঠকে খুব কম লোক জমে, সেখানেই খুব বেশী, আর খুব সুন্দর সুন্দর তথ্য জানা যায়। তাই দেখিয়া আমি ছোট ছোট ও বে-সরকারী বৈঠকে যাইতে লাগিলাম। শুধু তাহাই নহে, আমি বাড়ীতে বৈঠক করিয়া মিডিয়ম্‌দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে লাগিলাম। আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে কোনরূপ জুয়াচুরী ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই ভাবে আমি ঐ পথের অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে

যে, বৈঠকে বাস্তবিক মৃতব্যক্তি আসিয়া থাকে—সব সময় না আসিলেও অনেক সময় আইসে। প্রেততত্ত্ব আলোচনাকালে আমি সকল রকম "মিডিয়ম্"ই দেখিয়াছি। মিডিয়ম্দের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক দেখিয়াছিলাম। এক দল ভাল, এক দল মন্দ, আর এক দল ভালও নহে, মন্দও নহে, যেন উদাসীন। যাহারা ভাল, তাহারা বেশ আগ্রহের সঙ্গে যত্নপূর্ব্বক অলৌকিক কাণ্ডগুলি অপরকে বুঝাইয়া দেয়। আর এক দল আছে, তাহারা ঘোর মূর্খ ও অশিক্ষিত। হয় তো মনটা তাহাদের ভাল, কিন্তু মূর্খ বলিয়া অপরের উপকার করিতে পারে না, বুঝাইয়া দিতেও সমর্থ হয় না। আর এক দলের সঙ্গে আমার বনিবনাও হইল না। তাহারা আমাকে ধর্ম্মধ্বজী, তোষামোদকারী ও অবিশ্বাসী বলিয়া বুঝিয়া লইল। কোন্ দলের কাছে আমি তথ্য জানিতে পারিব, তাহা শীঘ্র বুঝিয়া লইয়াছিলাম। অন্যের কাছে না যাইয়া, আমি কেবল তাহাদের কাছে যাইতে লাগিলাম। বহু বৎসর তাদের সঙ্গে চলা-ফেরা করিয়া বিস্তর তথ্য জানিলাম। যাহা জানিলাম, তাহা খুবই অদ্ভুত ; বলিলে হয় তো সাধারণে বিশ্বাসই করে না ; যাহারা প্রেত-তত্ত্ব জানে, কেবল তাহারাই তাহা বিশ্বাস করিতে পারে। আর তাহা এত বেশী যে, সবগুলি বলিলে একখানা প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া উঠে। পূর্ব্বে প্রেততত্ত্বের যে কয়টা শ্রেণীর কথা বলিয়াছি, সেই শ্রেণী কয়টার ব্যাখ্যা করিতে যে কয়টা তথ্যের আবশ্যক হইবে, মাত্র সেই কয়টিই পরে প্রসঙ্গক্রমে বলিব। ইহার পরের অধ্যায়ে আমরা প্রেত-তত্ত্বের শ্রেণীবিষয়ে আলোচনা করিব।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

জীবিত মানুষের ঘাড়ে ভূত

ভূতেরা সব মানুষের ঘাড়ে চাপিয়া বসে না। কারণ, সকল মানুষ তাহাদের চক্ষুতেও তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যাহারা তরল-প্রকৃতি, তাহারাই না কি ভূতের উপযুক্ত মক্কেল। তাহাদিগকে আমরা "বাহন" বা "মিডিয়ম্" বলিয়া থাকি। যখন ভূতের ইচ্ছা হয়, কোন জীবিত মানুষের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিবে, তখন সে ঐরূপ একটা বাহনের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসে। স্থূল-মূর্ত্তি ধরিয়া মানুষের সঙ্গে কথা বলা ব্যাপার খুব সহজ নহে, তাহাতে অনেক শক্তির প্রয়োজন; ঘাড়ে চাপিয়া কথা-বার্ত্তা বলাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়। স্থূল-মূর্ত্তি ধরিব ভাবিলেই ধরা যায় না। তাহারও নিয়মাদি শিখিতে হয়। আর সে নিয়মাদিও খুব দুঃসাধ্য। ভূত বাহনের দেহটাকে নিজের দেহ করিয়া বহন করে। ভূত যতক্ষণ বাহনের দেহ অধিকার করিয়া থাকে, ততক্ষণ বাহনের নিজের বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই প্রকাশ পায় না। নিজের দেহটা ও নিজের মস্তিষ্কটা সবই সে ভূতকে উৎসর্গ করিয়া দেয়। মিডিয়মরাই এইরূপ ভাবে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে, অন্যে পারে না। মিডিয়মদের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। এই যে ভূতকে নিজের দেহ ছাড়িয়া দেওয়ার কথা বলিলাম, সেটা সম্পূর্ণ বা আংশিক দুই-ই হইতে পারে। বাহনের জ্ঞানের লোপ ঘটে নাই, অথচ তাহার হাতখানিতে নিজের অধিকার নাই, ভূতে হাতখানিকে দখল করিয়া উহা দ্বারা আপন কথা লিখিয়া দিতেছে, এমন দেখা যায়। আবার দেখা যায়, বাহনের জ্ঞান ঠিকই আছে, অথচ ভূতে তাহার গলাটা অধিকার করিয়া উহা দ্বারা আপন কথা ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। এইগুলি

হইল ভূতের আংশিক অধিকারের কথা। আবার ভূতেরা বাহনের সমস্ত দেহটাও অনেক সময় দখল করিয়া বসে। খুব গাঢ় নিদ্রার সময় আমাদের যেমন জ্ঞান-চৈতন্য কিছুই থাকে না, চৈতন্য সম্পূর্ণভাবে দেহটাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ ঐ সময় বাহনের চৈতন্য দেহটাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তখন সেই ভূত আসিয়া ঐ অসাড় দেহটাকে দখল করিয়া বসে। তখন সেই অবস্থায় ভূতেরা যে সব কথা বলে বা যে সব কাণ্ড করে, পরে বাহনের তাহার কিছুই মনে পড়ে না। বাহন সে সব কিছুই জানে না। দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে দুই একটা ঘটনা বলিতে পারিলেও সাধারণতঃ জ্ঞানলাভের পর কিছুই মনে থাকে না।

ভূতেধরা লোকের কথাবার্ত্তা

অনেক মিডিয়ম্ ভূতাবিষ্ট হইয়া কথা বলে। অনেক লোকের অনেক প্রশ্নের উত্তর ঐরূপভাবে দিয়া থাকে। তাহারা ইচ্ছা করিলেই ভূতাবিষ্ট হইতে পারে। এই রকম মিডিয়ম্ বিস্তর আছে। ভূত আনাটা উহাদের একরূপ ব্যবসা বলিলেও চলে। আবার এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা ভূত আনা, মিডিয়মের মুখে ভূতের কথাবার্ত্তা শুনা ব্যাপারটাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। অন্যান্য লোক যেমন রবিবারে গির্জ্জায় যাইয়া পুরোহিতের ধর্ম্মোপদেশ শুনে, ইহারা সেইরূপ রবিবারে সন্ধ্যায় কোন বৈঠকে যাইয়া মিডিয়মের মুখে প্রেতের কথাবার্ত্তা শুনিয়া থাকে। পুরোহিতের ধর্ম্মোপদেশগুলি, আর প্রেতের কথাগুলি সাধারণতঃ একই প্রকৃতির। উহাতে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বা বিশেষ রকমের একটা নূতন তথ্য কিছুই পাওয়া যায় না। সেই একই রকমের একঘেয়ে ভাবের বুলি। প্রেতের কথাগুলির মধ্যে একটা অনিশ্চয়ের ভাব দেখা যায়; কিন্তু তাহা হইলেও কথাগুলি খুব উদার। উদার বটে, কিন্তু একঘেয়ে সেই ছোট কালের দ্বিতীয় ভাগের বুলি—"মিথ্যা কথা বলিও না," "... হইলে সুখী হইবে, অসৎ সঙ্গে অনেক দোষ" ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐ

উপদেশগুলি একঘেয়ে রকমের শত শতবার শুনা যায়। তাহার কারণ, কথাগুলি খুব খাঁটী, খুব সত্য। ঐ সকল উপদেশ লোকে বাল্যকালে কোন পুস্তকে বা কপিবুকের মাথার উপরে লেখা দেখিলেও প্রাণে তাহাদের একটা ছাপ পড়ে নাই, উপদেশগুলির অনুসারে চরিত্র গড়িয়া তুলিবারও কেহ কোন দিন চেষ্টা করে নাই; কিন্তু যখন কোন ভূত কাহারও ঘাড়ে চাপিয়া ঐরূপ উপদেশ দেয়, বা বৈঠকের টেবিল নাড়াইয়া, শব্দ করিয়া সঙ্কেত দ্বারা ঐ রকম কথা প্রকাশ করে, তখন সকলেরই ঐ কথাগুলির উপর রুচি হয়। সকলেই তখন উপদেশ অনুযায়ী চলিতে ইচ্ছা করে। এ হিসাবে প্রেতের উপদেশ নিরর্থক নহে। খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক করিতে না পারিলে দেহের পুষ্টি হয় না। সেইরূপ সদুপদেশ গ্রহণ করিতে না পারিলেও জ্ঞানের পুষ্টি হয় না। ঐ সকল উপদেশ ঐরূপভাবে ভূতের মুখে শুনিয়া অনেকে গ্রহণ করিতে পারে—তাহাতে তাহাদের চরিত্রের উন্মেষ ও পুষ্টিসাধনও ঘটিয়া থাকে।

মিডিয়মের মুখে ভূতের কথা সাধারণতঃ খুব অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় না; কেন না, জুয়াচুরিও অনেক ঘটে। যাহাদের আভিনায়িক বিদ্যা অল্প একটুও আছে, নাটুকে লোকগুলির মত যাহারা একটু অভিনয় করিতে পারে, ইহা-উহা সাজিয়া দুই চারিটি কথা-বার্ত্তা বলিতে পারে, তাহারা মিডিয়ম্ হইলে অতি সহজেই ভূতেধরা লোকের ভঙ্গী নকল করিয়া ভূতের একটা মাঝারি রকমের বক্তৃতা শুনাইয়া দিতে সমর্থ হয়। এইরূপে সাধারণ লোকের চোখে তাহারা ধূলি দিয়া থাকে। তাই বলিয়া সবগুলিই জুয়াচুরি নহে। কোন কোন স্থলে চমৎকার ব্যাপার দেখা যায়। মিডিয়ম্ যে ভাষা আদৌ জানে না, হয় তো সেই ভাষা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল; গলার স্বরও হয় তো সম্পূর্ণ অন্যরূপ; কথা বলিবার ভঙ্গীটাও হয় তো একেবারেই পৃথক্ রকমের; আবার যে সকল তথ্য বাহির হইল, তাহা হয় তো সেই মিডিয়ম্ আদৌ জানে না। এই সব হইল সত্য সত্যই ভূতের ব্যাপার। আবার অনেক

স্থলে দেখা যায়, মিডিয়মের মুখে যে সকল কথা বাহির হইল, তাহাতে রাশি রাশি ব্যাকরণ ভুল, রাশি রাশি ইতর ভাষা, রাশি রাশি কথার অপব্যবহার, বিশ্রী ভুল উচ্চারণ! মিডিয়ম্ অশিক্ষিত, তাই ঐ দুর্গতি! এখানে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভূত-প্রেত আদৌ আইসে নাই, বাহনই অভিনয় করিতেছে। যাহা হউক, সকল মিডিয়ম্ই যে অভিনয় করে, তাহা নহে। মিডিয়ম্গুলির কথা আলোচনা করিবার সময় আমাদিগকে কয়েকটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। মিডিয়ম্ নিজে যেরূপ লোক, তাহার কাছে সেইরূপ শ্রেণীর ভূতই আসিয়া থাকে। মিডিয়ম্ যদি মূর্খ হয়, তবে তাহার নিকটে মূর্খ ভূতই আইসে; মিডিয়ম্ যদি পণ্ডিত হয়, তবে তাহার ঘাড়ে পণ্ডিত ভূতই চাপিয়া বসে। তাহা ছাড়া আর একটা ব্যাপার ঘটে। ভূতের নিকট হইতে মিডিয়মরা যে সব সংবাদ পায়, সেগুলি তাহারা সাধারণতঃ নিজের নিজের স্বাভাবিক ভাষায় খুব অতি-রঞ্জিত করিয়া ব্যক্ত করে।

ভূতের লিখিয়া দেওয়া

ভূত কখন কখন এক জনের দেহ অধিকার করিয়া দিব্য সুন্দরভাবে নির্ভুল করিয়া কোন কিছু লিখিয়া দেয়। যে ব্যক্তি ভূত হইয়া লিখিতেছে, সে জীবিতকালে যেমন লিখিত, এ লেখাও অবিকল সেই ছাঁদের। আবার কখন কখন ছাঁদ বদলাইয়া যায়। মিডিয়মের হাতের আর ভূতের নিজের ছাঁদ মিলিয়া মিশিয়া একটা নূতন ভঙ্গীর লেখা হইতে থাকে, এই রকম নূতন ভঙ্গীটাই বেশী বেশী দেখা যায়। এই নূতন ভঙ্গীর লেখাটা বড়ই বিশ্রী, পড়িয়া উঠা যায় না, কতকগুলি হিজি-বিজি আঁচড় বলিলেও চলে। এই সব লেখার মধ্যে ভাষার কায়দা দেখিয়া বা বিশেষ প্রমাণ দ্বারা ভূতকে আসল ভূত বলিয়া জানা যায়। আবার কখন কখন এইরূপ লেখার মধ্যেও অতি অদ্ভুত রকমের জুয়াচুরি ঘটিয়া থাকে। হয় তো আদৌ ভূত আইসে নাই, মিডিয়মেরই

কাণ্ড ! লেডবিটার বলেন—"আমি দেখিয়াছি, এক জন মিডিয়ম্ কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেকটা লেখা লিখিয়া ফেলিল ; কিন্তু লেখাগুলি এতই পিছন দিকে হেলিয়া পড়া যে, দর্পণের সাহায্য ব্যতীত তাহা পড়া যায় না। আবার অন্য রকমও দেখিয়াছি। মিসেস্ জেঙ্কিন্‌সের সঙ্গে এক দিন বৈঠকে বসিয়াছিলাম। তাঁহার কোলে এক বৎসরের একটি শিশু ছিল। সেই শিশুর ক্ষুদ্র হস্তে একটা পেন্সিল দেওয়া হইল। আশ্চর্য্য ! শিশু দৃঢ় মুষ্টিতে খুব দ্রুতভাবে ভূতের বক্তব্য লিখিয়া গেল। এক বৎসরের শিশু কেমন করিয়া ঐরূপ লেখা লিখিল, তাহার আলোচনা আমরা করিব না। লেখা যে শিশুর মস্তিষ্কপ্রসূত নহে, তাহা নিশ্চয়ই ; আর শিশুর মাও যে লেখেন নাই, তাহাও ঠিক ; কেন না, শিশু যখন লিখিল, তখন তাহার মা তফাতে বসিয়া শিশুকে ধরিয়া ছিলেন। এই জেঙ্কিন্সের কুমারীকালে নাম ছিল—কেট্ ফক্‌স। এই নামেই ইনি বেশী পরিচিতা। ইনিই বালিকা-বয়সে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ঠক্ ঠক্ শব্দ দ্বারা ভূতেরা অনেক কথার জবাব দিতে পারে। আর এই তথ্য হইতেই বর্ত্তমান প্রেততত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে।"

মিডিয়ম না হইলেও কখন কখন পরীতে পায়

মিডিয়ম্ না হইলেও অনেককে অনেক সময় পরীতে ধরে। পরী আসিয়া হাতে চাপিয়া বসিল ; বসিয়া বিস্তর গূঢ় সংবাদ লিখিয়া দিল ; এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। আর এই লেখার উপর খুব বেশী লোকের অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। বিস্তর বড় ঘরের সম্ভ্রান্ত মহিলারা বলেন যে, "থিওসফি" দ্বারা আমরা নূতন শিক্ষা কিছুই পাই না ; আমাদের পরীর প্রসাদে ও সব উপদেশ আমরা বহুকাল হইতেই জ্ঞাত আছি। লেড্‌বিটার এই শ্রেণীর পরীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিয়াছিলেন যে, ইঁহারা পরী নহেন। ইঁহারা খুব জ্ঞানী লোকের প্রেতাত্মা। ইঁহারা ভূবর্লোকের অনেকটা খোঁজ-খবর জানেন ; আর ইঁহাদের বিশ্বাস যে,

পৃথিবীর লোকদিগকে ভুবর্লোকের তথ্য জানাইয়া দিতে পারিলে পৃথিবীর ও মানবজাতির বিশেষ উপকার করিয়া দেওয়া হয়। এই দৃঢ় বিশ্বাস-বশতঃ না কি ইঁহারা নরমপ্রকৃতি মহিলাদিগকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ধরিয়া বসেন; আর তাহাদিগের প্রাণে একটা ধারণা জন্মাইয়া দেন যে, তাহারাই মানবের উদ্ধারকর্ত্রী। তাহাদিগকে না কি মানবের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে আর তাহাদের নাম না কি উত্তরকালে মানব-জাতির হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকিবে।

বিস্তর সাধুর প্রেতাত্মা মৃত্যুর পরে পরোপকারে ঐরূপে ব্রতী হইয়া থাকেন। মৃত্যুর পর তাঁহারা জীবন-মরণের অনেক তথ্য জ্ঞাত হইয়া পরোপকারের জন্য ঐরূপ উৎসুক হন। মরণের পর তাঁহাদের মনে হয়, তাঁহারা জীবিতকালে যদি ঐ সব তথ্য জানিতে পারিতেন, তবে তাঁহাদের চরিত্র, কার্য্যকলাপ ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিত। তাঁহাদের মনে হয় —আর এরূপ মনে হওয়াও খুব ঠিক্—যে, পৃথিবীবাসীদিগকে পরলোকের এই সব তথ্য জানাইয়া দিতে পারিলে খুব বড় রকমের একটা পরিবর্ত্তন পৃথিবীতে দেখা দিবে। তাঁহাদের কিন্তু মনে হয় না যে, ঐ সকল তত্ত্ব পৃথিবীবাসীদিগের পক্ষে নূতন নহে, বহু বহুবার উহা এখানে ঘোষিত হইয়াছে, অনেক সাধনসিদ্ধ ব্যক্তি ঐ সকল কথা সাধারণকে জানাইয়া গিয়াছেন। উহা একরূপ চর্ব্বিতচর্ব্বণ বলিলেও চলে। একাল-সেকাল কেহই ঐ সকল কথায় কর্ণপাত করে নাই। পুনরায় উহার ঘোষণা করিলেও কেহ শুনিবে না। "যখন মহাত্মা মোজেস ও ঐরূপ আরও বিস্তর ঈশ্বরদর্শী মহাত্মা বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন নাই, তখন মরা মানুষ ফিরিয়া আসিয়াও যদি সশরীরে দেখা দিয়া পরলোকের তথ্য বলিতে আরম্ভ করে, বোধ হয়, তাহা হইলেও তাহার কথা কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিবে না।"

যে সকল মহিলা থিওসফি পড়িতে চান না, তাঁহাদের পোষা পারিবারিক ভূতের কাছেই সব শুনিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি থিওসফি

পুস্তকাদি কিছু কিছু পড়েন, আর একটু নিরপেক্ষভাবে ভাবিয়া দেখেন, তবে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবেন। তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, থিওসফিতে তাঁহাদের শিখিবার অনেক তথ্যই আছে। অহঙ্কার তাঁহাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা সবজান্তা—এই বিশ্বাস, এই অহঙ্কার তাঁহারা ছাড়িতে পারেন না। আর তাঁহারাই পৃথিবী-বাসীদের উদ্ধারকর্ত্রী, এই সুখ-স্বপ্নটাও তাঁহাদের কাছে বড়ই মনোমোহন রকমের। তাঁহাদের প্রিয় ভুতের নিকট হইতে তাঁহারা যেটুকু জানিতে পারেন, তাহা থিওসফির তথ্যের সঙ্গে একেবারেই মিলে না। কখন কখন একটু আধটু মিলে মাত্র। থিওসফির তথ্য খুব বড়, খুব বিপুল। উহাদের জ্ঞান তাহার তুলনায় ছিটে-ফোঁটা বলিলেও চলে। তাহা ছাড়া, তাঁহাদের পারিবারিক ভূতেরা যে তথ্য বলেন, তাহা এলোমেলো, —বিশৃঙ্খল, আর থিওসফি-প্রচারিত তথ্য সত্যের অনুগামী।

কখন কখন দেখা যায় যে, উহাদের পারিবারিক ভূতটি প্রাচ্যদেশ-বাসী কোন সাধুর প্রেতাত্মা। সুতরাং তাঁহার ঘোষিত তথ্যে থিওসফির গন্ধ থাকা খুবই স্বাভাবিক। থিওসফি ব্যাপারটা নূতন নহে; ইহা খুব প্রাচীন জিনিস। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহার মূল তথ্য বরাবরই প্রচারিত আছে, কেবল স্থানে স্থানে খৃষ্টানধর্ম্মের ভ্রম-কুহেলিকায় ইহা আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। তাই খৃষ্টধর্ম্মের সংকীর্ণ ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে দৃষ্টি করিলেও বড় রকমের জিনিস চক্ষুতে পড়ে, আর তাহাতে থিওসফির সংস্রব দেখা যায়। পাঁচরকম বড় বড় তথ্যের মধ্যে আমরা থিওসফির যে পরিচয় পাই, তাহা খুব সামান্য। ব্লাভাট্স্কি বা অন্যান্য মহাজন-প্রচারিত থিওসফির ন্যায় তাহা পূর্ণাবয়ব নহে।

প্লান্‌চেট নামক যন্ত্রে কেহ যদি হাত দিয়া বসে, তবে কখন কখন ভূত সেই হাতে আসিয়া বেশ লিখিয়া দেয়, নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়া যায়। এই রকম ভাবে লিখিয়া দেওয়াটাই যেন ভূতের পক্ষে সহজ বলিয়া বোধ হয়। প্লান্‌চেট যন্ত্রটা বোধ হয় অনেকে দেখিয়াছেন, একখানি ক্ষুদ্র তক্তা

পায়ার উপর সহজভাবে বসানো। প্লান্‌চেটে ভূত কেমন করিয়া আইসে, সকল সময় আইসে কি না, আমরা উপস্থিত সে বিষয়ের আলোচনা করিব না। তবে এমন দেখা গিয়াছে যে, প্লানচেটে যে সকল কথা যে ভাবে বাহির হইতেছে, তাহা যে ধরিয়াছে, সে হয় তো আদৌ জানে না। কখন কখন মনে হয়, যে ব্যক্তি প্লান্‌চেট ধরিয়াছে, সে যেন নিজেই তক্তা-খানি নড়াইয়া নড়াইয়া লিখিতেছে; আবার কখন কখন মনে হয় যে, তক্তাখানি নিজেই যেন অন্য বাহিরের শক্তিতে বিশ্রী বেগে ঘুরিতেছে। আমরা একটা টুপীর নীচে টেবিল নড়িবার কথা বলিয়াছি। সে নড়াটা এই শেষোক্ত নড়ার মত।

ভূত কখন কখন চিত্র করিয়া দেয়

হাতে ভর করিয়া ভূতে যেমন লিখিয়া দেয়, সেইরূপ কখন কখন কাহারও হাতে আসিয়া চিত্র পর্য্যন্তও আঁকিয়া বসে। চিত্র আঁকা আর লেখা একই প্রথায় ঘটে। তবে চিত্র আঁকা ব্যাপারটা খুব কম দেখা যায়; কারণ, লেখার মত উহা সকলেই জানে না। যে সকল ব্যক্তি চঞ্চলচিত্ত, সহজেই যাহাদিগকে ভূত ধরিতে পারে, ভূত কখন কখন তাহাদের হাতের উপর বসিয়া অতি শীঘ্র কাহারও একটা মূর্ত্তি বা কোন একটা স্থানের চিত্র অতি সুন্দরভাবে আঁকিয়া দেয়। কতকগুলি প্রেত-ব্যবসায়ী আছে, তাহারা শুধুই মৃত ব্যক্তির ফটো আঁকিয়া দিয়া থাকে; উহাতে তাহাদের বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন হয়। আমি এরূপ একটা ছবি আঁকিতে-পারা প্রেত-ব্যবসায়ীকে চিনি। তাহার ছবিগুলিতে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। কিন্তু জীবিত মানুষের অঙ্কিত ছবির মত ভূত অবশ্য আঁকা ছবি তত সুন্দর হয় না। আবার ছবিতত্ত্ব অন্য রকমও আছে। দিব্যদৃষ্টি ব্যক্তিরাও অনেক সময় ফটো আঁকিয়া দেয়। এরূপ স্থলে ভূতাবেশ বলা চলে না, তাই আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহি না।

ভূতাবিষ্ট লোক অথবা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যখন কোন মরা মানুষের ফটো আঁকিতে আরম্ভ করে, তখন সেই মরা মানুষের

প্রেতাত্মাকে যে তাহাদের সম্মুখে বসিয়া থাকিতেই হইবে, তাহা নহে। তবে সে সময় তাহাদের সম্মুখে তাহার আসিয়া হাজির হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব বলা যায় না, কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি বৈঠকে বসিয়া তাহার কোন এক জন মৃত বন্ধুর কথা ভাবিতে থাকে, তখন জীবিত বন্ধুর তীব্র চিন্তার ফলে মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্ম-দেহটার ভাবান্তর ঘটে। কখন মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা স্থূল-মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দেয়। সেই সময় সকলেই তাহাকে দেখিতে পায়। তখন তাহার ফটো লওয়া খুবই সহজ-সাধ্য হইয়া উঠে।

ব্যবসায়ীর প্রতারণা

লেডবিটার কতকগুলি প্রতারকের কথা বলিয়াছেন। ভূত না আসিলেও অনেক প্রতারক ব্যবসায়ী না কি ভূত আসার ভাণ করিয়া অনেক সময় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তির প্রেতাত্মাকে আনিতে হইবে, সেই ব্যক্তি জীবিতকালে কথা বলিবার সময় মুখের যেরূপ ভঙ্গীটা করিত, যেরূপ ভঙ্গীতে কথা বলিত, ব্যবসাদার মিডিয়ম অবিকল সেইরূপ ভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া বসে।

মিডিয়মরা মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার অনুকরণ করিয়া কথাবার্ত্তা বলে। শুধু তাহাই নহে, কথাবার্ত্তা বলিবার সময় তাহাদের মুখে সময় সময় খুব বেশী রকম ভাবান্তর হইয়া যায়। যে ব্যক্তি মিডিয়মের কাছে বসিয়া মৃত বান্ধবের কথা শুনিতে আইসে, তাহার প্রাণে খুব একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মে যে, মৃত বান্ধবের প্রেতাত্মা মিডিয়মের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসুক। তাই সে মিডিয়মের মুখখানিকে নিজের চিন্তার ও বাসনার বেগে বান্ধবের মুখের মতই দেখিয়া ফেলে। সব সময় না হইলেও অনেক সময় এই রকম একটা দৃষ্টিভ্রম ঘটে। এটা মিডিয়মের মুখের যথার্থ পরিবর্ত্তন নহে—এটা ভ্রমমাত্র। এই অবস্থায় মিডিয়মের ফটো লইলে প্রেতাত্মার ফটো উঠিবে না, মিডিয়মের নিজের মুখের ফটোই উঠিবে।

আবার কখন কখন মিডিয়মের ঘাড়ে প্রেতাত্মা এরূপভাবে চাপিয়া বসে যে, সত্য সত্যই তাহার মুখের ভঙ্গী লোপ পায়, আর সেখানে প্রেতাত্মার

মুখশ্রীই ফুটিয়া উঠে। অদ্ভুত ব্যাপার! এ অবস্থায় ফটো তুলিলে মিডিয়মের মুখ না উঠিয়া ভূতের মুখখানিই জ্বলন্তভাবে ফুটিয়া উঠিবে। আসল ভূতের মুখশ্রী ফুটিয়া উঠা ব্যাপারটা দুই রকম হইতে দেখা যায়। কখন কখন দেখা যায়, ভূতের মুখের কোন একটা অংশ মিডিয়মের মুখে যথাবৎ-ভাবে ফুটিয়া উঠিল। মুখের যে অংশটা ভূতের মুখের সঙ্গে মিল খায়, সেটা ঠিক থাকে আর যে অংশটা মিল খায় না, সেটার উপর পাতলা পাতলা রকমের জমাট মূর্ত্তি দেখা দেয়, তাহাতে সমস্ত মুখখানি যেন ভূতের মুখের মত হইয়া দাঁড়ায়। মুখের যে অংশটার উপর ঐরূপ ভৌতিক জমাট আসিয়া ঘটে, অংশটা মিডিয়মের স্বাভাবিক মুখখানির অপেক্ষা কেমন যেন একটু অস্বাভাবিকরূপ বড় দেখায়। এই হইল মুখ-শ্রী ফুটিবার একরকম ব্যাপার। আবার অন্য রকমও দেখা যায়। ভূতের মুখখানি হয় তো মিডিয়মের মুখখানি অপেক্ষা ছোট। বড় মুখখানির উপর ছোট মুখখানি ফুটান খুবই শক্ত কথা। এরূপ ক্ষেত্রে মিডিয়মের স্থূল মুখখানি বাস্তবিকই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভূতের সেই ছোট মুখখানির মতই হইয়া উঠে। যাহারা এই সকল গুহ্যতত্ত্ব বহু দিন ধরিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া আলোচনা না করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এ ব্যাপার বুঝিয়া উঠা একেবারেই অসম্ভব। তাহারা মনে করিবে, মিডিয়মের একখানা এত বড় মুখ ভূতের প্রভাবে কেমন করিয়া ছোট হইবে?—হইতেই পারে না। তাহারা বলিবে—এ অসম্ভব। আমাদের স্থূল-শরীরের অবস্থা খুবই অস্থায়ী, খুবই পরিবর্ত্তনশীল; আবশ্যক হইলে অবস্থাবিশেষে সহজেই ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এ তত্ত্ব আমাদের মধ্যেও অনেকে জানেন না।

অতি সহজেই স্থূল-শরীরের পরিবর্ত্তন হয়

আমাদের স্থূল-দেহের পরিবর্ত্তন অতি সহজেই হয়। এ বিষয়ের বিস্তর উদাহরণ আছে। সুখের বিষয়, এরূপ ব্যাপার খুব বেশী বেশী ঘটে না। ম্যাডাম্ ব্লাভাট্‌স্কি "আইশিশ্ আন্‌ভেল্ড" নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডের ও... পৃষ্ঠায় অনেকগুলি এই রকম ঘটনার কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাই

পড়িলে দেখা যায়, মা গর্ভাবস্থায় যদি উৎকট ভাবনা ভাবেন, তবে গর্ভস্থ শিশুর স্থূল-শরীর অতি বিশ্রী রকমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কর্ণেলিয়স্ জেম্মা বলেন, এমন একটা ছেলে জন্মিয়াছিল যে, জন্মের পর দেখা গেল, তাহার কপাল কাটা, হু হু করিয়া রক্ত পড়িতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ঐ শিশুর পিতা রাগান্ধ হইয়া শিশুর মাতাকে কাটিবে বলিয়া ভয় দেখাইবার সময় রমণীর কপালের কাছে না কি সে একখানি উন্মুক্ত তরবারি লইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলেই মাতার ভয় হয়। আর সেই ভয়েই গর্ভস্থ শিশুর ললাট সত্য সত্যই আহত হইয়া সেখান হইতে রক্তস্রাব হয়। আশ্চর্য্য কাণ্ড! ভন্ হেল্ মণ্টেগুর "ডি ইন্‌জেকৃটিস্ মেটিরিয়া লিবস্" নামক পুস্তকে দেখা যায় যে, মেকৃলিন্ সহরের এক জন দর্জ্জির স্ত্রী গর্ভাবস্থায় এক দিন দেখিলেন যে, ঝগড়াঝাটি করিতে করিতে এক জন সৈনিকের একখানা হাত কাটা গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া রমণী বড়ই ব্যথিত ও অভিভূত হইলেন। তাঁহার মানসিক উৎকণ্ঠার ফলে তাঁহার গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে দেখা গেল, শিশুর একখানিমাত্র হাত, অপরখানি ছিন্ন, খুব রক্তস্রাব হইতেছে! এন্‌টোয়ার্প্ সহরের এক বণিকের স্ত্রী গর্ভাবস্থায় এক জন সৈনিকের একখানা হাত কাটা যাইতে দেখেন। ফলে, প্রসবের পর দেখা গেল, তাঁহার প্রসূত মেয়েটির একখানি হাত ছিন্ন, শোণিত-ধারা ছুটিতেছে। আল্‌ভার ডিউক আদেশ দিয়া ১৩ জন ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করেন। এই দারুণ ঘটনা একটি স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। ফলে, প্রসবের পর দেখা গেল, শিশুর সর্ব্বাবয়ব নিখুঁত, কেবল মস্তকটি নাই, ছিন্ন স্কন্ধ হইতে রুধির-ধারা ছুটিতেছে।

স্থূলদেহের যত কিছু ত্রুটি, সবই মায়ের মানসিক অবস্থার ফল। স্থূল পরমাণুপুঞ্জের উপর মনের কতই প্রভাব! দেহের দোষ-ঘাট ঐ প্রভাবেরই পরিচয়। মায়ের চিন্তায় যেমন ভ্রূণের দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটে, ঠিক সেইরূপ ভাবে চিন্তাপ্রভাবে অনেক সিদ্ধপুরুষ বা ক্যাথারিন্ ইমারিকের মত রমণীরা আপন আপন দেহের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন। "প্রকৃতির

নৈশ ভাগ" গ্রন্থের ৩৮৪ পৃষ্ঠায় আমরা আর একটা ভয়ানক ব্যাপারের বিবরণ জানিতে পাই। সেখানেও দেখা যায়, বলবতী উৎকণ্ঠায় স্থূলদেহের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

"মস্কো নগর হইতে ডাক্তার কার্ণারের নামে একখানা পত্র আইসে। সেই পত্রে একটা ভয়ানক ঘটনার কথা ছিল। ফরাসীরা রুসিয়া দেশ আক্রমণ করিলে রুসিয়ার এক জন কসাক সৈন্য এক জন ফরাসীকে তাড়াইয়া একটা কাণা গলির মধ্যে লইয়া যায়। পলায়ন করিবার পথ ছিল না। সেখানে দুই জনে ভয়ঙ্কর লড়াই আরম্ভ হয়। ফলে, ফরাসী গুরুতররূপে আহত হইয়া পড়ে। একটি লোক ঐ গলির মধ্যে বাসা ভাড়া করিয়াছিল। সে লড়াই দেখিয়া এত ভয় পাইয়াছিল যে, দেখা গেল, ফরাসীর গায়ে যেখানে যেখানে অস্ত্রাঘাত হইয়াছিল, তাহার নিজের গায়েও ঠিক সেইখানে সেইখানে আপনা-আপনি বিদীর্ণ হইয়াছে।"

ভূতেরা কেমন করিয়া স্থূল-শরীর ধারণ করে, সেই বিষয়ের প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ের পুনরায় আলোচনা করিব। কেবল এইটুকু বলিয়া রাখি যে, ভূত আসিয়া চাপিয়া বসিলে মিডিয়মের দেহের পরিবর্ত্তন ঠিক ভূতের দেহের মত হইয়া পড়িতে পারে। সেটা খুবই স্বাভাবিক, আর কখন কখন সেরূপ ঘটিয়াও থাকে। এরূপ ঘটনা খুব সচরাচরই ঘটে না। মিডিয়মের দেহটাকে ঠিক নিজের মত করিয়া তোলা কাজটা ভূতের পক্ষে একটা শক্ত ব্যাপার। তাই বোধ হয়, তাহারা এতটা করে না। সাধারণভাবে দেখা দেওয়া, কথা বলা প্রভৃতি অনেকটা সহজ পথেই তাহারা বেশী সময় আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। পরিষ্কার দিনের বেলায়ও মিডিয়মের ঘাড়ে ভূত আসিয়া বসে দেখা যায়। কিন্তু মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেওয়া ব্যাপারটা মিটমিটে আলোর মধ্যে না হইলে হয় না। ইহার গূঢ় কারণ আছে। পরে আমরা সে বিষয় বুঝাইয়া বলিব।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ভূতের বৈঠকে দিব্যদৃষ্টির বিষয়

বিলাতের অঞ্চলে বৈঠক করিয়া ভূত আনা হয়। এরূপ বৈঠক করিয়া বসা সেখানে একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। ঐ সকল বৈঠকে বিস্তর অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। ভূত আসিয়া কত অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেয়। আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া থাকি। কিন্তু অবাক্ হইবার কারণ কিছুই নাই; কেন না, মানুষ মরিয়া গেলে ভুবর্লোকে যাইয়া উঠে, তখন সকলেরই প্রায় ঐরূপ শক্তিলাভ হইয়া থাকে; সকলেই অতি সহজে ঐ সব অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারে। লেড্‌বিটার সাহেব "দিব্যদৃষ্টি" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ঐ সকল অদ্ভুত শক্তির কথা অনেক লিখিয়াছেন। মরণের পর মানুষের শক্তি যে কত বাড়িয়া যায়, তাহা সেই বইখানি পড়িলেই পাঠক জানিতে পারিবেন। একখানি পুস্তক বন্ধ আছে, অথচ প্রেতাত্মা তাহার ভিতরের লেখাটা পড়িয়া গেল; একখানি পত্র খামের মধ্যে পূরা আছে, খামখানি শীল-মোহর করিয়া আঁটা, অথচ সে পত্রের লেখা প্রেতাত্মা পড়িয়া দিল; বাক্‌স তালাবদ্ধ, অথচ প্রেতাত্মা বলিয়া দিল যে, বাক্‌সের মধ্যে এই এই দ্রব্য আছে। এইরূপ তাহাদের অদ্ভুত শক্তি! প্রেতাত্মা এক জনের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসে, বসিয়া তাহার মুখে ঐ সকল কথা প্রকাশ করিতে থাকে; অর্থাৎ সেই লোকটাই বলিয়া দেয় যে, বাক্‌সের মধ্যে অমুক অমুক জিনিস আছে, পত্রে অমুক অমুক কথা লেখা আছে। মিডিয়ম তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে থাকিয়া ঐ প্রভাবে বলিতে থাকে। আবার কখন কখন প্রেতাত্মা আসিয়া মুখে কিছু না বলিয়া, মিডিয়মের হাতে

নির্ভর করিয়া শ্লেটে কিছু লিখিয়া দেয়, কোন কোন সময় বা প্রেতাত্মা আপন গলার সুরে কথা বলিয়াও থাকে।

পৃথিবীতে কখন্ কি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাও প্রেতাত্মা জানিতে পারে। জানিবার শক্তিটা আবার সকলের একরূপ নহে। ডাক্তার 'লী'-প্রণীত—"সূক্ষ্ম-জগতের আভাস" নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৪৬ পৃষ্ঠায় এই মর্ম্মের একটা গল্প আছে। গল্পটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কতকগুলি হারানো কাগজের ব্যাপার

ল্যাঙ্কাশায়ারের বোলটন্ সহরের একটা ব্যবসায়-বাণিজ্যের আফিস হইতে এক জন কেরাণীর মারফত্ অনেকগুলি টাকা ব্যাঙ্কে পাঠান হইয়াছিল। কোন কারণে ঐ টাকাটা জমা পড়ে নাই। কেরাণী দেখিল, —তাহার উপরে চুরির সন্দেহটা আসিয়া পড়িতেছে। কেরাণী ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করিল; ব্যাঙ্ক্ টাকা পাইবার কথা স্বীকার করিল না। তখন কেরাণী দোষ-মুক্ত হইবার আশায় চুরি ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এক দিন সে এক জন মিডিয়মের কাছে গেল; কেন না, মিডিয়মেরা প্রেতের সাহায্যে অনেক রহস্য প্রকাশ করিতে পারে। মিডিয়ম কেরাণীকে সাহায্য করিবে বলিয়া ভরসা দিল। তাহার নিকট হইতে ব্যাপারটা সব শুনিয়া লইল, মিডিয়ম্ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া বসিল। বসিয়া একটু পরেই বলিতে লাগিল—"হ্যাঁ, আমি দেখ্ছি, তুমি ব্যাঙ্কে গেলে—তাহার পরে দেখছি,—তুমি ব্যাঙ্কের অমুক অমুক স্থানে গেলে—তাহার পরে দেখ্ছি, তুমি কতকগুলি কাগজ একটি কেরাণীর হাতে দিলে—তাহার পর সেই ব্যক্তি অমুক স্থানে সেগুলিকে আর কতকগুলি কাগজের নীচে রাখিয়া দিল—আমি দেখ্ছি, কাগজগুলি এখনও ঠিক সেইখানেই রহিয়াছে।"

কেরাণী মিডিয়মের কাছে ঐরূপ শুনিয়া ব্যাঙ্কে গেল। গিয়া কেশিয়ারকে বলিল—"মহাশয়, অমুক স্থানে দেখুন তো আমার প্রে-

কাগজপত্র আছে কি না।" কেশিয়ার দেখিলেন, বস্তুতই কাগজগুলি সেখানে রহিয়াছে। কেশিয়ারের তখন মনে হইল যে, খুব ব্যস্ততা-বশতঃ তিনি কাগজগুলি সেখানে রাখিয়াছিলেন। এই সংবাদটা খবরের কাগজে উঠিয়া গেল। লী সাহেবের এক জন আত্মীয় কাগজে ঐরূপ ব্যাপার পড়িয়া ঘটনাটি সত্য কি মিথ্যা জানিবার জন্য উপরি-উক্ত আফিসে পত্র লিখিয়াছিলেন। আফিস হইতে উত্তর পাইলেন—ঘটনাটি বস্তুতই সত্য। লী সাহেব ঐ ভদ্রলোককে এই ব্যাপার সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিলে, তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর উত্তরে লিখিয়াছিলেন—"ব্যাপারটা খাঁটি সত্য। আফিসের পত্রখানা এখনও আমার বাড়ীতে আছে।"

ঐ কাহিনীটি পড়িয়া ঠিক বুঝা যায় না,—উহা মিডিয়মের দিব্য-দৃষ্টির উন্মেষ, কি কোন প্রেতাত্মার সংবাদ দেওয়া। প্রেতাত্মা আসিয়া বলিয়া দিয়াছিল, এইটিই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়; কেন না, মিডিয়ম সে সময়ের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল। প্রেতাত্মা অতি সহজেই কেরাণীর মন হইতে কেশিয়ারকে টাকা দেওয়া তথ্যটি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল; তাহার পর অদ্ভুত শক্তিতে আপনাকে ঘটনার সাক্ষিরূপে মিশাইয়া ফেলিল; তাহার পর যেমন-যেমনটি ঘটিয়াছিল, সেইরূপ অবিকল বলিয়া দিল। নিম্নে আমরা আর একটি গল্প বলিব। সেটিও খুব সত্য ঘটনা। তাহাতেও দেখা যায়,—মিডিয়ম্ মনের কথা ঠিক ঠিক বলিয়া দেয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে লংম্যান্ নামক এক ব্যক্তি "প্রেত-তত্ত্ব" নামক একটি প্রবন্ধ প্রচার করেন। ঐ প্রবন্ধের মধ্যে গল্পটা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "লিন্‌সডে-অধিপতির পরীক্ষা" নামক পুস্তকে ২১৫ পৃষ্ঠায় উহার বিবরণ আছে।

একখানা হারানো উইলের ব্যাপার

লংম্যানের কথা এই :—

"আমার এক জন বন্ধু তাঁহার ঠাকুর-মার উইল জানিবার নিমিত্ত খুব বেশী ব্যস্ত হন। ঠাকুরমা ৪০ বৎসর হইল মারা গিয়াছেন, অথচ এই

দীর্ঘকালের মধ্যে মৃত্যুর সার্টিফিকেট্ তাঁহার হস্তগত হইল না। আমরা এক দিন প্রেত-বৈঠকে বসিলাম। টেবিলে টক্ টক্ শব্দ করিয়া ভূত আসিল; বন্ধু তখন মনে মনে প্রশ্ন করিলেন। জানা গেল যে, উইল-খানি উইলিয়ম্ ওয়াল্টার নামক এক ব্যক্তির হাতের লেখা। তিনি 'হোয়াইট্ চ্যাপেল্' নামক স্থানে বাস করেন। যে ষ্ট্রীটে ও যে নম্বর বাড়ীতে তিনি থাকেন, তাহাও প্রেত বলিয়া দিল। আমরা তাহার পর 'হোয়াইট চ্যাপেলে' গিয়া, সে ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পাইলাম। পরে তাঁহার সহায়তায় উইলের একটি নকলও পাইলাম। সে ভদ্রলোকটিকে আদৌ চিনিতাম না আর তিনিও তথায় সর্ব্বদা থাকিতেন না। কারণ, তাঁহার অবস্থা নেহাৎ মন্দ ছিল না;—অন্যত্রও বাড়ী-ঘর ছিল। আমাদের বৈঠকে যিনি মিডিয়ম্ ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনিও সেই ভদ্রলোকটিকে চিনিতেন না। আর চিনিলেই বা কি? কারণ, আমার বন্ধু মনে মনে প্রশ্ন করিয়াছিলেন; অথচ তাহার উত্তর মিডিয়মের মুখে ব্যক্ত হইতে লাগিল।"

তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে কত কি বলিতে পারে

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বিলাতে ভূতের বৈঠক বসে। এক জন মিডিয়ম্ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েন। তাঁহার তখন দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়। তখন তিনি বৈঠকের সভ্যবৃন্দ সম্বন্ধে বিস্তর সংবাদ দিতে থাকেন। দিব্যদৃষ্টির এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বৈঠকের সভ্য-সংখ্যা যদি বেশী না হয়, তবে মিডিয়ম সকলেরই কথা ২।১টা করিয়া বলেন; আর যদি বেশী হয়, তবে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি সভ্যের কথা বলিতে বলা হয়। মিডিয়ম্ তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতে থাকেন।

লেড্‌বিটার বলেন,—এই দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে একটি পরিবারের গুপ্ত কথা অনেকটা যথাযথভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। পূর্ব্বে তাহা কেহ জানিত না। মিডিয়মের মুখে প্রকাশ হইলে, লোকে শুনিয়া অবাক্। কিন্তু আবার এমন সকল কথাও বাহির হয়, যাহাকে সত্য

বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কথাগুলি বড়ই অনিশ্চিত —উড়ো-উড়ো রকমের। নিম্নে ঐ উড়ো রকমের একটা মিডিয়ম্-ব্যাপার দেওয়া হইল ঃ—

মিডিয়ম্। ঐ যে কোণে এক জন মহিলা দাঁড়াইয়া আছেন, উঁহার পিছনে এক জন পক্ব-কেশ বৃদ্ধ ভদ্রলোক রহিয়াছেন।

এক জন সভ্যা। উনি আমার পিতা।

মিডিয়ম্। হাঁ; উনি হাস্‌ছেন, মাথা নাড়্‌ছেন, ওঁর ভারী ফুর্ত্তি দেখ্‌ছি। আমি ওঁর সাদা দাড়িগুলির পর্য্যন্ত নড়া-চড়া দেখতে পাচ্ছি। ভারী স্ফুর্ত্তি।"

সভ্যা। আশ্চর্য্য! কিন্তু মরণের পূর্ব্বে বাবার দাড়ি ছিল না। হয় তো সূক্ষ্ম-জগতে যাইয়া তাঁহার দাড়ি হইয়াছে। অথবা হয় তো উনি আমার বাবা নহেন, হয় তো উনি আমার "জিম্" কাকা; তাঁহার দাড়ি ছিল।

মিডিয়ম্। আঃ! ঐ যে উনি আবার মাথা নাড়িতেছেন আর হাসিতেছেন। মরণের পর উনি যে খুব সুখী হইয়াছেন, সেই কথা বলিতে আসিয়াছেন।

সভ্যা। ঠিক! ঠিক! তাহা হইলে উনি নিশ্চয়ই আমার "জিম্" কাকা। কাকা বেচারীই তবে আসিয়াছেন! ৩০ বৎসর হইল, তিনি সমুদ্রে ডুবিয়াছিলেন। তখন আমার বালিকা-বয়স। তাঁহারও নবীন বয়স। ২৫ বৎসরের বেশী নয়—আহা, সেই তরুণ বয়সেই ডুবিয়া মারা গেলেন।

মিডিয়ম্। হাঁ—হাঁ—ঠিক—ঠিক! উঁহাকে আমি এখন আরও ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি। তুমি ঠিকই বলিয়াছ, সাদা ওটা দাড়ি নহে, ওটা কোটের নীচের সাদা জামা; মাঝি-মাল্লারা ঐ রকম জামা পরিয়া থাকে—ওটা সাদা জামা।

সকল সভ্য তখন একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"কি চমৎকার! বা বা! মরণের পরও এমন ভাবে মানুষ আইসেন!"

লেড্ বিটার সাহেব বলেন যে, ঐরূপ কথা মিডিয়মের মুখে ২০।২৫ বার শুনিয়াছেন। তিনি বলেন—এরূপ ভাবের কথা শুনিলে, মিডিয়মের শক্তির উপর খুব ভালরূপ একটা বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা জন্মে না। কিন্তু এমন দেখা যায় যে, মিডিয়ম্ এখন এলো-মেলো রকম কথা বলিতেছে, আবার সে-ই অন্য সময় হয় তো ঠিক ঠিক কথা বলিয়া বসে। উপরে যে মিডিয়মের কথা উদ্ধৃত হইল, উহারই মুখ দিয়া হয় তো এমন সব ব্যাপার বাহির হইতে পারে, যাহা জানা বা অনুমান করা উহার পক্ষে ঘোর অসম্ভব।

মিডিয়মের আর একটা পরীক্ষা

লণ্ডন সহরের একটা সামান্য সহরতলীতে লেড্ বিটার সাহেব একটা মিডিয়ম্ দেখিয়াছিলেন। লেড্ বিটারের কথাগুলি এই :—

"দেখিলাম, মিডিয়ম্ এক জন পাড়াগেঁয়ে রকমের স্ত্রীলোক; আমি আর কখন তাঁহাকে দেখি নাই; তাঁহাকে শিক্ষিতা বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বৈঠকের প্রতি সভ্যকেই একই কথা বলিতে লাগিলেন। সকলেরই পিছনে না কি প্রেতাত্মা, আর প্রেতাত্মার গায়ে ঢিলে পোষাক ও মুখে মৃদুহাসি। আমিও বৈঠকের সভ্য ছিলাম। আমার বেলায় একটু অন্যরূপ বলিলেন—আমার কাছে না কি এক জন কৃষ্ণকায় বিদেশী লোকের প্রেতাত্মা ছিল, তাহার মাথার চারিদিকে কি একটা সাদা রেখা যাচ্ছিল। তাঁহার কথাগুলি আমার একটু সত্য বলিয়াই বোধ হইল।

মিডিয়ম্ তখন বলিতে লাগিলেন যে, প্রত্যেক সভ্যের কাছেই পক্ককেশ, ঢিলে পোষাক-পরা, সৌম্যমূর্ত্তি প্রেত দাঁড়াইয়া আছে। তখন আমার মনে হইল—মিডিয়ম চিন্তা-মূর্ত্তি দেখিতে পান কি না, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এই মনে করিয়া, আমার কাছে যে স্ত্রীলোকটি সভ্য হইয়া বসিয়াছিলেন, আমি খুব একাগ্রতার সঙ্গে চিন্তা করিতে লাগিলাম, যেন তাঁহার কাছে দুইটি গোল-গাল বালক দাঁড়াইয়া আছে। ভাবিলাম—মিডিয়ম্ ঐ সভ্যার কথা বলিবার সময় কি বলেন দেখা যাউক।

সকলের কথা বলিতে বলিতে যখন ঐ স্ত্রীলোকটির কথা বলিতে আসিলেন, তখন মিডিয়ম্ অবিকল আমার চিন্তা-প্রসূত সেই বালক দুইটির কথা বলিয়া দিলেন। মিডিয়ম্ বলিলেন—ছেলে দুইটি তোমার। সভ্যা বলিলেন—আমার ছেলে অত ছোট নহে, তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। মিডিয়ম্ বলিলেন—তবে তোমার নাতি হইতে পারে। সভ্যা বলিলেন—তাঁহার নাতি নাই। তখন রহস্যের উদ্ভেদ হইল না, কেহই তখন বুঝিতে পারিলেন না যে, বালক দুইটি কাহার? আমি এই ঘটনা হইতে দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম। প্রথম সিদ্ধান্ত এই করিলাম যে, মিডিয়ম্ বাস্তবিকই দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্না; কিংবা কোন প্রেত তাঁহার ঘাড়ে বসিয়াও ঐরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই, মিডিয়মই হউন আর প্রেতাত্মাই হউন, কোন্‌টা স্থূলীভূত চিন্তা-মূর্ত্তি আর কোন্‌টা ভুবর্লোকবিহারী সূক্ষ্ম-শরীরী জীবাত্মা, ইহা বুঝিয়া উঠিবার যথেষ্ট ক্ষমতা উঁহার নাই।"

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

প্রেতের আংশিক মূর্ত্তি-পরিগ্রহ

ভূত আনিবার যে সকল বৈঠক হয়, তাহাতে অনেক রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভূতের মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেওয়া-টাই অদ্ভুত। ভূতেরা সূক্ষ্ম-জগতে সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করিতে থাকে। স্থূল-জগতে কাজ করিতে হইলে, তাহাদিগকে নিজের নিজের সূক্ষ্মদেহের উপর স্থূল-জগতের স্থূল পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণ করিয়া, একটা বহিরাবরণ নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়। এইরূপ ব্যাপারকে মূর্ত্তিধারণ করা বলে। এই মূর্ত্তিধরা তিন প্রকারে ঘটিতে পারে। লেডবিটার সাহেবের "ভুবর্লোক" নামক একখানি পুস্তিকায় ভূতের এই মূর্ত্তিপরিগ্রহ বিষয়ে অনেক ব্যাপার লিপিবদ্ধ আছে। আমরা সেই পুস্তিকার ১৮ পৃষ্ঠা হইতে একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে সংযুক্ত করিলাম। স্থলটি এই:—

প্রেত-বৈঠকে যাঁহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ভূতের মূর্ত্তি তিন প্রকারে প্রকাশ হয়;—(১) স্পর্শ দ্বারা বুঝা যায়, অথচ দেখা যায় না; (২) দেখা যায়, অথচ স্পর্শ করা যায় না; (৩) দেখাও যায়, আবার স্পর্শ করাও যায়—এই তিন ভাবে ভূত আইসে। প্রথম রকমের আসাটাই খুব বেশী ঘটে। প্রায়ই শুনা যায়, ভূতকে কেহ দেখিতে পাইল না অথচ বৈঠকের কোন সভ্যের মুখে কে যেন আসিয়া হাত বুলাইয়া দিয়া গেল, কিংবা কোন ক্ষুদ্র একটা জিনিস এখান হইতে ওখানে সরিয়া গেল, কিংবা কোথাও কিছু নাই, অথচ একটা মানুষের গলার স্বর শুনা গেল। এই সব ব্যাপার প্রথমোক্ত প্রকারে আসিবার ফল। এই প্রকারে আসিবার সময় ভূতেরা যে স্থূল জড়াংশ গ্রহণ করে, তাহা আলোক প্রতিফলিত করিতে বা আলোকের বাধা জন্মাইতে পারে না; কেবল

স্থলবিশেষে বায়ু-মণ্ডলে স্পন্দন উদ্ভূত করিতে পারে। আমরা সেই স্পন্দনকে শব্দ বলিয়া শুনিয়া লই। আলোকের অবরোধ ঘটানো বা আলোক প্রতি-ফলিত করা এ সব ব্যাপার না পারিলেও ঐ শ্রেণীর জড়াংশে কতকটা নীলাভ রকমের মূর্ত্তি প্রকট হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তি সাধারণতঃ দেখা না গেলেও ছবি তোলার কলে প্রকটিত হয়। তাই আমরা অনেক সময় শুনিতে পাই যে, অমুক ব্যক্তির ফটো তুলিবার সময় তাঁহার মৃত আত্মীয়ের প্রেত-আত্মা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফটো তোলাইয়াছে।

সুস্পষ্ট মূর্ত্তিতে দেখা দিতে হইলে, ভূতের অনেকটা শক্তির প্রয়োজন। ততটা শক্তি না থাকিলে, উহারা ধুঁয়ার মত অস্পষ্ট মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়। এইরূপ ভাবে দেখা দেওয়াটা আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে ধরিয়া লইতে পারি। এরূপ ভাবে আসিলে, ভূতেরা বৈঠকের সভ্যদিগকে প্রায়ই বলিয়া থাকে—আমাদিগকে স্পর্শ করিও না। স্পষ্ট মূর্ত্তি ধরা খুবই শক্তির কাজ। ভূতেরা সময় সময় সেরূপ শক্তিও প্রকাশ করে। কিন্তু সেরূপ ঘটনা খুব অল্পই দেখা যায়। ভূত যখন স্পষ্ট মূর্ত্তিতে আইসে, তখন তাহাকে দেখাও যায়, আবার স্পর্শও করা যায়।

স্পষ্ট মূর্ত্তিতে দেখা দেওয়া ব্যাপারটা অনেকটা প্রথম প্রকারেরই মত। প্রথম শ্রেণীর বেলায় ভূতকে দেখা না গেলেও তাহাকে রীতিমত স্থূলীভূত হইতে হয়; নচেৎ সে কি করিয়া ঘরের জিনিসপত্র সরাইবে, কি করিয়া একটা ভারী দ্রব্য উচ্চে তুলিবে, আর কি করিয়াই বা ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে পারিবে? আমরা ভূত দেখিতে পাই না, অথচ ভূতের কাজ দেখি। এইরূপ ব্যাপারই খুব বেশী। কিন্তু কখন কখন ভূতকে কাজ করিতেও দেখা যায়। সেরূপ ঘটনা বড়ই বিরল। স্যার উইলিয়ম ক্রুক্স, এফ, আর, এস তাঁহার সুবিখ্যাত "প্রেত-তত্ত্বের গবেষণা" নামক পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় ঐরূপ দেখা দেওয়ার একটা গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গল্পটি এই :—

একখানি দীপ্তিশালী হাত

কুমারী যাক্‌স্ এক জন মিডিয়ম্। আমি তাহার কাছে বসিয়াছিলাম। বৈঠকে আমরা ছাড়া আমার স্ত্রী ও আর এক জন সম্ভ্রান্ত মহিলাও ছিলেন। মহিলাটি আমার আত্মীয়া। আমি একখানি হাতে কুমারীর অর্থাৎ মিডি-য়মের দুইখানি হাত ধরিয়া বসিয়াছিলাম। তাহার পায়ের তলা দু'খানিও আমার পায়ের উপরে ছিল। আমাদের সম্মুখের টেবিলের উপর কাগজ, আমার অপর হস্তে একটা পেন্সিল—এই অবস্থায় আমরা আছি। এমন সময় একখানি ঝক্‌ঝকে হাত ঘরের ছাদের দিক হইতে আমাদের কাছে নামিয়া আসিল। কয়েক সেকেণ্ড হাতখানি আমার কাছে শূন্যে থাকিয়াই, আমার হাত হইতে পেন্সিলটা লইয়া ফেলিল; তাহার পর সেই কাগজ-খানির উপরে তর-তর করিয়া খানিকটা লিখিয়া পেন্সিলটা ফেলিয়া দিল। তাহার পর হাতখানি আমাদের মাথার উপর দিয়া উঠিয়া গেল। শেষে বেশ বে-মালুম মিলাইয়া গেল।

ভূতেরা অনেক সময় ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করে কিংবা কোন একটা জিনিস নড়াইয়া চড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। এরূপ ঘটনা খুব বেশী দেখা যায়। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, ভূতকে দেখা যাইতেছে না, অথচ খুব একটা ভারী জিনিস শূন্যে উঠিয়া গেল বা শূন্যে উঠিয়া ঝুলিয়া থাকিল। খুব বিরল হইলেও এমনটি দেখা গিয়াছে। আমরা ক্রুকস সাহেবের যে পুস্তকের কথা বলিলাম, সেই পুস্তকের ৮৯ পৃষ্ঠায় এইরূপ একটা ব্যাপারের উল্লেখ আছে। এইরূপ লেখা আছে :—

"পাঁচটি বিভিন্ন স্থলে দেখা গিয়াছে যে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের একখানি ভারী টেবিল মেঝে হইতে শূন্যে উঠিয়া পড়িল। কখন বা কয়েক ইঞ্চি উঠিয়াছে, কখন বা এক হাত পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এইরূপ ব্যাপার! আর ঐ সকল স্থলে কাহারও বজ্জাতি করিবার সম্ভাবনাও ছিল না। বেশ দেখা গিয়াছে, ঐগুলি খাঁটি ভূতেরই কাণ্ড। আবার এক দিন দেখা গেল,

একটা খুব ভারী টেবিল পরিষ্কার আলোকিত ঘরে উপরের দিকে উঠিয়া পড়িল। তখন আমি মিডিয়মের হাত-পা আটকাইয়া ধরিয়াছিলাম। আবার আর এক দিন দেখা গেল, টেবিল উপরের দিকে উঠিয়াছে; তখন কেহই টেবিল ছুঁইয়া ছিল না; আর আমি পূর্ব্ব হইতে এমন সাবধান ছিলাম যে, কাহারও দুষ্টামী করিবারও সম্ভাবনা না থাকে। এগুলি খাঁটী ভৌতিক ব্যাপার।"

লেড্‌বিটারের জীবনেও এইরূপ ব্যাপার আর একবার ঘটিয়াছিল। ভূতে তাঁহাকে টানিয়া ছাদের কাছে তুলিয়াছিল। সে কাহিনী ইহার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "সূক্ষ্ম-জগতের দ্বারদেশে পদ-সঞ্চার" নামক গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় মিঃ রবার্ট ডেল্ আউয়েন্ ঐরূপ ভাবের একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভারী জিনিস শূন্যে লম্বিত থাকিল।

"কাউন্ট্ ডি অরচেস্ নামক এক জন ফরাসী ভদ্রলোক প্যারিস সহরের নিকট বাস করিতেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে দুই প্রহরকালে তাঁহার ভোজনাগারের টেবিলে বসিয়া আমরা ৭ জন খাইতেছিলাম। টেবিলের উপর ফল ও মদ্য ছিল। দেখা গেল, টেবিলটি শূন্যে উঠিয়া পড়িল, আবার আস্তে আস্তে নামিল। টেবিল উঠিবার সময় আমরা ৭ জনই উহার চারিদিকে দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন টেবিলটি কেহই ছোঁয় নাই। আমরা সকলে উহা দেখিলাম। ইংরাজ সেনাপতি কিডের পুত্র ও ইঁহার স্ত্রী ১৮৫৯ খৃঃ এপ্রিল মাসে প্যারিস্ সহরে ২৮নং 'রু ডি লা মার্ম ডেস্ ম্যাথুয়া রিন্‌স' ঠিকানায় সন্ধ্যার সময় জনৈক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিড্-পত্নী একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল, যেন চেয়ারখানি নড়িতেছে; বোধ হইতে লাগিল, যেন কোন লোক চেয়ারখানির নীচে হইতে ধরিয়া উপরের দিকে তুলিতেছে। তাহার পর চেয়ারখানি সত্য সত্যই ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। উঠিয়া প্রায় ৩০ সেকেণ্ডকাল শূন্যে ঝুলিয়া থাকিল। রমণীর

পদদ্বয় মাটী হইতে ৪।৫ ফিট উচ্চে রহিল। অদ্ভুত ব্যাপার! তাহার পর চেয়ারখানি আবার ধীরে ধীরে আসিয়া মাটীতে নামিল। এমন বে-মালুম ভাবে উঠিল ও নামিল যে, রমণী কোনরূপেই ঝাঁকি বা ঠেলা বুঝিতে পারি না। চেয়ারখানি যখন শূন্যে উঠে, তখন কেহই উহা ছুঁইয়া ছিল না। কোন লোকও উহার কাছে ছিল না। কেবল রমণীর স্বামী পাছে পত্নীর কোন রূপ আঘাত লাগে ভাবিয়া, চেয়ারের কাছে গিয়া চেয়ার স্পর্শ করিয়াছিলেন। ঘরখানি সুন্দর আলোকে আলোকিত ছিল; কেন না, ফরাসীদের বৈঠক খানা রীতিমতভাবে সজ্জিত থাকে। আমরা সেখানে ৮।৯ জন ছিলাম, সকলেই ঐ ব্যাপারটা ভাল করিয়াই দেখিলাম। কিড্ ও তাঁহার পত্নী যখন ঐ গল্পটি বলিলেন, আমি তখন লিখিয়া লইলাম। তাঁহারা বলিলেন —মহাশয়, এই গল্পটা খাঁটি সত্য। আপনি আমাদের নাম দিয়া পত্রে ইহা প্রকাশ করিতে পারেন;—তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।”

চেয়ার শুদ্ধ উপরে ঐরূপ ভাবে উঠিয়া যাওয়া ব্যাপার একটা-আধটা হয় নাই। ঐরূপ ব্যাপার অনেকবার ঘটিয়াছে। কিন্তু ৫ ফিটের বেশী উপরে উঠিতে বড় একটা দেখা যায় নাই। ক্রুক্‌স সাহেবও ঐরূপ ব্যাপার কয়েকটা দেখিয়াছেন। তাঁহার “গবেষণা” পুস্তকের ৮৯ পৃষ্ঠায় উহার বিবরণ আছে। সেই বিবরণ এই:—

“এক দিন দেখিলাম, একখানি চেয়ারে এক জন রমণী বসিয়া আছেন, অথচ চেয়ারখানি মাটী হইতে কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠিয়া পড়িল। আর এক দিনও ঐরূপ ভাবে উঠিল। সে দিন রমণী চেয়ারের উপরে পা তুলিয়া হাঁটু পাতিয়া বসিলেন, পাছে লোকের ধারণা হয় যে, রমণীই ঐরূপটিই করিতেছেন, এই জন্য চেয়ারের উপর পা তুলিয়া বসিলেন। তখন চেয়ারের চারিখানি পা-ই সকলের চোখে দিব্য পড়িল। চেয়ার ৩ ইঞ্চি উঠিয়া ১০ সেকেণ্ডকাল শূন্যে থাকিল। তাহার পর আস্তে আস্তে নামিল। আর একবার দুইটি বালক সমেত চেয়ার উপরে উঠিয়া গেল দেখিলাম। অর্থ

জানু পাতিয়া বসিয়া দেখিলাম, চেয়ারের পায়ার দিকে খুব লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কেহই চেয়ার ছোঁয় নাই। মানুষের চাতুরী বা কৌশল সেখানেও ঘটে নাই,—একেবারে খাঁটি ভূতের কাণ্ড!

মিঃ হোমের বাড়ীতে যে ব্যাপারটা দেখিয়াছি, সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। আমি তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনবার চেয়ারশুদ্ধ উপরে উঠিতে দেখিয়াছি। একবার উঠিবার সময় তিনি আরাম-চেয়ারে বসিয়াছিলেন, আর একবার চেয়ারের উপরে জানু পাতিয়া বসিয়াছিলেন। আর একবার চেয়ারের উপরে দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রত্যেকবারই খুব ভাল করিয়া দেখিয়াছি।

মিঃ হোম অনেকবার চেয়ারশুদ্ধ শূন্যে উঠিয়াছিলেন। অন্ততঃ একশতবার উঠিবার কথা লিপিবদ্ধ আছে। বিস্তর ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়াছেন। ইহার মধ্যে তিন জনের নাম খুবই বিখ্যাত—আর্ল্ অব ডন র‍্যাভেন্, লর্ড লিণ্ডসে ও ক্যাপটেন্ সি, উইন্। ইঁহারা হোমের শূন্যে উঠিবার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ সব বিবরণ যদি বিশ্বাস করা না যায়, তবে মানুষের কোন কথাই বিশ্বাস করা চলে না। কেন না, ধর্ম্মশাস্ত্রই বল, আর ইতিহাসই বল, এত প্রমাণ-প্রয়োগ আর কুত্রাপি নাই। এরূপ দৃঢ় প্রমাণ কোন স্থানেই দেখা যায় না।"

হোমের কাণ্ডকারখানা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের এক জনের মুখে ঐ ব্যাপার কর্ণেল্ অল্‌কট্‌ও শুনিতে পান। তিনি "পরলোকের লোক" নামক পুস্তকে হোমের শূন্যে উঠিবার কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিও কয়েকটা অতি অদ্ভুত রকমের ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন।

লেড্‌বিটার্ নিজেও ঐরূপ তিনটি ঘটনা দেখিয়াছেন। খুব ভারী চেয়ারে মিডিয়ম্ বসিয়া আছে, তাঁহারাও চারিদিকে বসিয়া আছেন, মাঝে টেবিল, এমন অবস্থায় চেয়ার শুদ্ধ মিডিয়ম সকলের মাথার উপর দিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার পর চেয়ারখানি টেবিলের ঠিক মাঝখানে আসিয়া নামিল। লেডবিটার বলেন—"দুইবারের ঘটনায় আমি নিজে মিডিয়মের

একখানা হাত ধরিয়াছিলাম, আর এক জন বিশ্বাসী বন্ধু আর একখানি হাত ধরিয়াছিলেন। চেয়ারশুদ্ধ মিডিয়ম যখন শূন্যে বিচরণ করিতেছিল, তখন ঐ ভাবে আমরা তাহার হাত ধরিয়াই ছিলাম। এরূপ ব্যাপার যদিও অন্ধকার ঘরে হইতেছিল, তথাচ উহা যে কোন লোকের দ্বারা হইতেছে না, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ঐরূপ ব্যাপার কোন লোকের দ্বারা হইতেছে কি না, তাহাও আমাদের অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হয় নাই; কেন না, ঐরূপ বিশাল দৈহিক বলের কাজ করিতে পারে, এরূপ কোন বীরভদ্রও তখন সে ঘরে ছিল না। মিডিয়মকে বুকে করিয়া যখন সেই বিশাল চেয়ারখানি টেবিলের উপর নামিল, তখন আলো জালিবার সঙ্কেতসূচক শব্দ হইল। আলো জালা হইলে দেখিলাম, চেয়ার টেবিলের উপর নামিয়াছে। মনে হয়, আমাদিগকে দৈহিক বলের পরিচয় দিয়া ভূতেরা যেন একটু গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে।"

ভূতে লেডবিটারকে টানিয়া ছাদের কাছে তুলিয়াছিল

লেড্‌বিটার এইরূপ বলিয়াছেন—ভূতে আমাকেও এক দিন অস্বাভাবিকভাবে টানিয়া শূন্যে তুলিয়াছিল। তখন আমি একটি ভূতের বৈঠকে ছিলাম। ঘটনাটা আজ অনেক দিনের। তখন আমি খুব বেশী বেশী ভূতের বৈঠকে যাইতাম। যে বৈঠকে এই ঘটনা হয়, তাহার অনেক সভ্যকে আমি চিনিতাম না। মাঝে টেবিল রাখিয়া আমরা বসিয়া আছি। আমার সম্মুখে টেবিলের অপর ধারে কয়েক জন মহিলা আছেন। ঘরটি ঘোর অন্ধকার। হঠাৎ মহিলারা বলিয়া উঠিলেন, ভূতে তাঁহাদের গায়ে হাত বুলাইতেছে। আমার বড় বিশ্বাস হইল না। ভূতের স্পর্শ পাইয়া তাঁহারা কিন্তু আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অধীর। তাঁহাদের উল্লাস-বেগ একটু প্রশমিত হইলে, আমি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"ভূত মহাশয়! দয়া করিয়া আমাকে স্পর্শ করিবেন কি?" যেমন বলা, অমনই ভূত আসিয়া খপ্‌ করিয়া বজ্র-মুষ্টিতে আমার হাত

চাপিয়া ধরিয়া উৰ্দ্ধদিকে টানিতে লাগিল। যে সে টান্ নহে, আমাকে টানের বেগে উঠিতে হইল। আমি বাধ্য হইয়া দাঁড়াইলাম। তখনও টান—সেই বিষম টান। তখন চেয়ারের উপর দাঁড়াইলাম। তখনও টানিতে লাগিল। হাত ছিনাইয়া লইবার সাধ্য হইল না। বিশ্রী বেগে টানিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাকে শূন্যে তুলিয়া ফেলিল; শূন্যে উঠিলাম, তথাচ টানের বিরাম নাই, ক্রমে উপরে উঠিতেই লাগিলাম। আঙ্গুলের গ্রন্থিগুলি শেষে সিমেণ্ট করা ঠাণ্ডা মসৃণ ছাদের গায়ে যাইয়া ঠেকিল। ঘরের ছাদও খুব উঁচু। ছাদের ভিতর হইতে যেন আর একখানি হাত আসিয়া আমার গায়ে বুলাইতে লাগিল। তাহার পর আমাকে আস্তে আস্তে নামাইতে লাগিল। একটু পরেই আমার পা আসিয়া চেয়ারে ঠেকিল। ভূত তখন আমার সঙ্গে একটু জোরে কর-মর্দ্দন করিয়া, আমার হাতখানি ছাড়িয়া দিল। আমি চেয়ার হইতে নামিলাম। মনে মনে বেশ বুঝিলাম যে, একখানি শক্তিশালী হাত আমাকে ধরিয়াছিল।

এই ব্যাপারটি আমার মুখে শুনিয়া নাস্তিকের দল বলিয়া উঠিল—"ও কিছু নয়।" উহাদের ধারণা—ছাদের গায়ে হয় ত লুকানো দরজা ছিল; সেই পথ দিয়া কেহ কৌশল করিয়া আমাকে ঐরূপভাবে টানিয়া তুলিয়া থাকিবে কিংবা মিডিয়ম্ নিজে হয় ত অন্ধকার ঘরে টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া ঐরূপভাবে আমাকে টানিয়া তুলিয়াছিল। এ দুইটি কথাই অসার। ছাদটা বেশ পালিস করা, সুধা-ধবলিত, একটা চেরা-ফাটা পর্য্যন্ত কোথাও নাই। আমি চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া আলোর সাহায্যে বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে ছাদটা যদিও দূরে থাকে, অথচ ফাটা-ফোটা চেরা-ফাঁড়া থাকিলে অবশ্যই চোখে পড়িত। সেরূপ কিছু ছিল না। তাহা ছাড়া আমি যে ভূতকে এরূপভাবে অনুরোধ করিব, তাহাও পূর্ব্বে কেহ জানিত না। তবে আমাকে ছাদের ভিতর দিয়া টানিয়া তুলিবার বন্দোবস্তই বা পূর্ব্ব হইতে

কিরূপে থাকিবে? মিডিয়ম্ নিজে আমাকে তুলিয়াছিল—এ কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত; কেন না, মিডিয়ম্ এক জন খর্ব্বাকৃতি কৃশ লোক, আর আমার ওজন ১৩ ষ্টোনেরও অধিক (দুই মণ ১১ সেরেরও বেশী)। যদি কোন নাস্তিক একপদবিশিষ্ট একখানি গোল-টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া এক হাত দিয়া নিজের অপেক্ষা খুব একটি ভারী বস্তু টানিয়া মাথার উপর তুলিয়া এক হাতের সাহায্যে সেটাকে শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে, তবে তখন বুঝিতে পারিবে যে, সেরূপ কার্য্যটা ঘোর অসম্ভব কি না।

শূন্যে গুরুভার জিনিসের অবস্থান

স্থূল জিনিস শূন্যে উঠিবার কথায় মনে হয়, এগুলি ভূতের স্থূলীভূত হইবার পরিচায়ক। ভূত স্থূলমূর্ত্তি ধরিয়া কোন-কিছু টানিয়া তুলিলে—উপরের ব্যাপারগুলিতে তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু ভূতের সংস্রব নাই, অথচ স্থূল জিনিস উপরে উঠিতেছে, এরূপ ব্যাপারও ঘটে। এ রকম ব্যাপার প্রাচ্যদেশেই দেখা যায়। যাঁহারা এরূপ ঘটনা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা যোগ-বিদ্যা ও বিজ্ঞান আরও ভালরূপ জানেন। তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ-শক্তি ও বিকর্ষণ-শক্তি দুইটিই আয়ত্ত করিয়াছেন। লেড্‌বিটার বলেন, তিনি এরূপ শক্তি-সম্পন্ন মানুষ দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, যাঁহারা যাদুবিদ্যা দেখাইয়া থাকেন, তাঁহারা এই বিকর্ষণ-শক্তি অবগত আছেন। আকর্ষণ-শক্তির সঙ্গে বিকর্ষণ-শক্তির ভাবকেন্দ্র ঠিক করিয়া দিতে পারিলেই কোন কিছুকে শূন্যে রাখিয়া দেওয়া যায়। উপরের ব্যাপারগুলিতে নিশ্চয়ই এইরূপ শক্তির প্রয়োগ হয় নাই।

মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি বস্তুতঃ চৌম্বক শক্তির মত একটা শক্তি। চৌম্বক-শক্তির যেমন মোড় ফিরান যায়, আকর্ষণকে বিকর্ষণে পরিণত করা যায়, সেইরূপ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিরও পরিবর্ত্তন ঘটান ও উহাকে বিপরীতমুখী করান চলে। আকর্ষণী শক্তিকে অপসারিকা শক্তিতে পরিণত করিবার

কৌশল আছে। যিনি ঐ কৌশল অবগত আছেন, তিনি ইচ্ছামাত্র ঐরূপ করিতে পারেন। অনেক যোগি-সন্ন্যাসী ইচ্ছা না করিয়াও ধ্যান-নিরত অবস্থায় শূন্যে উঠিয়া যায়। শুনা যায়, সাধ্বী "টেরেসা" ও সাধু "কুপার টিনোর জোসেফ" ধ্যানাবস্থায় শূন্যে উঠিতেন। লেডবিটার বলেন, ভূতের বৈঠকে যাঁহারা উঠেন, তাঁহারা ওরূপভাবে উঠেন না; তাঁহাদিগকে ভূতেই টানিয়া তুলে।

ভূতেরা স্থূল হইয়া যেমন মানুষকে শূন্যে তুলে, তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজও করে। তাহারা বৈঠকে আসিয়া বাদ্যযন্ত্রে দম দেয়, সভ্যদিগের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র শূন্যে লইয়া বেড়ায়, অনেক সময় সুস্বরে বাজায়, কখন কখন জল বা সুগন্ধি দ্রব্য ছিটাইয়া দেয়, কখন কখন নানাবিধ ফুল, ফল, এমন কি, চিনির ডেলা পর্য্যন্ত আনিয়া ফেলে। লেড্‌বিটার দেখিয়াছিলেন, একটা ভূত কৌশলপূর্ব্বক কয়েক জন বন্ধুর মুখের ভিতর চিনির ডেলা ঢুকাইয়া দিয়াছিল।

ভূতেরা শ্লেটেও লিখিয়া দেয়। এরূপ ঘটনা সচরাচরই ঘটে। ভূত স্থূলীভূত হইয়া, ক্ষুদ্র একটা পেন্‌সিল গ্রহণ করিয়া অতি তাড়াতাড়ি লিখিয়া দেয়।

শ্লেটে লিখিবার ব্যাপার

প্রায় ২০ বৎসর হইল, লণ্ডন সহরে এক জন বিখ্যাত মিডিয়ম ভূতকে দিয়া শ্লেটে লিখান কাজটা তিনি খুব ভাল করিয়া করিতে পারিতেন। ঘোর নাস্তিকও তাঁহার কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইত। গ্রীষ্মকাল, রৌদ্র ঝক্-ঝক্ করিতেছে, বেশ ফুটফুটে দিন। বেলা ১১টার সময় এক দিন এক জন নাস্তিককে তাঁহার কাছে লইয়া যাওয়া হইল। যাইবার সময় পথিপার্শ্বস্থ দোকান হইতে দুইখানি শ্লেট ও সাধারণ শ্রেণীর দুইটি পেন্‌সিল কিনিয়া লওয়া হইল। দুইখানি শ্লেটের মাঝে পেন্‌সিল ২।৩ টুকরা করিয়া রাখিয়া, শ্লেটখানিকে একত্র করিয়া কটা রঙ্গের কাগজে

মোড়া হইল। তাহার পর খুব শক্ত করিয়া সেই মোড়াটাকে বাঁধা গেল। তাহার পর খুব ভাল গালা কিনিয়া নাস্তিককে বলা হইল, তোমার এই শ্লেটের মোড়কের বাঁধনের উপর যত ইচ্ছা এই গালা দিয়া শীল কর; আর মোড়কটা নিজের হাতে রাখ—খবরদার—কাহাকেও দিও না।

এইরূপে প্রস্তুত হইয়া, আমরা সেই মিডিয়মের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর বৈঠকে বসিলাম। বসিবার সময় নাস্তিককে বলিয়া দিলাম,—তুমি শ্লেটের মোড়কের উপর বইস, তাহা হইলে সে সয়তানী করিতে পারিবে না। মিডিয়মের নিজের দুইখানি শ্লেট ছিল, সে দুইখানি টেবিলের উপরেই থাকিত, যে কেহ ইচ্ছা হইলে পরীক্ষা করিয়াও দেখিতে পারিত; তাহাতে মিডিয়মের কোন আপত্তি ছিল না। সে শ্লেট লইয়া মিডিয়ম বৈঠকের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ঐ শ্লেট সম্বন্ধে নাস্তিকের কত অদ্ভুত ধারণাই ছিল। তাহার ধারণা—ঐ শ্লেটে আগে হইতে লেখা থাকিত—তাহার পর মদ দিয়া ধুইয়া ফেলা হইত। তাহার ফলে লেখাটা কিছু সময়ের জন্য অদৃশ্য হইয়া থাকিয়া, পরে আবার ফুটিয়া উঠিত। আবার এরূপও তাহার ধারণা যে, মিডিয়ম হস্ত-কৌশলে নিজেই ঐরূপ লিখিয়া ভূতের লেখা বলিয়া পরিচয় দেন। নাস্তিক যখন ঐরূপ ধারণা করিতেছিল, তখন মিডিয়ম তাঁহার কার্য্য করিতেছিলেন। নাস্তিককে তখন না ঘাঁটানোই ভাল মনে হইয়াছিল।

মিডিয়মের কাছে একটা কাঠের টেবিল ছিল। টেবিলটা খুব সাদা সিদে রকমের। তাহাতে একটাও ড্রয়ার বা কোনরূপ কল-কব্জা খাটান নাই; টেবিলটা ছোট, একখানা পালিশ করা কাঠের, একখানা কাপড় পর্য্যন্তও তাহার উপর পাতা নাই। মিডিয়ম নিম্নদিক হইতে একখানা শ্লেট টেবিলের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া থাকেন। তাহার পর সভ্যবৃন্দকে প্রশ্ন করিতে বলা হয়। তখনই সেই প্রশ্নের উত্তর শ্লেটে লেখা হয়। বলা বাহুল্য—সে উত্তর ভূতে লিখিয়া দেয়। লেখা হইলে, মিডিয়ম প্রশ্নকর্ত্তাকে বলেন যে, ভূতে এই উত্তর লিখিয়া দিয়াছে। মিডিয়মের কার্য্যপ্রণালী

এবম্প্রকার। এ ক্ষেত্রে নাস্তিক আসিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, প্রশ্নের উত্তর সংস্কৃত ভাষায় বা চীনদেশীয় ভাষায় বা চিরোকী ভাষায় লেখা হউক। ভূত যদি জানায় যে, ঐ ঐ ভাষা সে জানে না, তবে নাস্তিক প্রশ্নকর্ত্তার উল্লাস দেখে কে! সে মনে করে, মিডিয়ম বড়ই জব্দ হইয়াছে। কখন কখন ভূত ঐ ঐ ভাষা জানা প্রেতকে আনিয়া ঐ ঐ ভাষায় উত্তর লিখিয়া দেয়; তখন নাস্তিক থতমত খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়ে। তথাচ গোঁ-রোগ ছাড়ে না; তখনও বলিতে থাকে—কি করিয়া সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় উত্তর লিখিল, বুঝিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু এটা যে খাঁটি জুয়াচুরি ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বৈঠকে পূর্ণমাত্রায় কাজ চলিতে লাগিল। তখন এক জন জিজ্ঞাসা করিল, ভূত আসিয়া আমাদের হাতের শ্লেটে কিছু লিখিয়া দিতে পারে কি? বলা হইল—হ্যাঁ, পারে। ভূতেরা কিন্তু এ রকমটা সব সময় পারিত না—সব সময় তাহাদের এতটা শক্তি দেখা যায় না। যেই উত্তর হইল—হাঁ, পারে, অমনই এক জন আমাদের নাস্তিকের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার শ্লেটের মোড়কটা আন, আর ভাল করিয়া দেখ, শীলমোহর ঠিক আছে কি না। তাহার পর নাস্তিককে বলা হইল যে, তুমি নিজে মোড়কটা টেবিলের উপর ধরিয়া রাখ। নাস্তিক তাহাই করিল। মিডিয়ম আলগোছে মোড়কটার একটি প্রান্ত ছুঁইয়া থাকিল। তাহার পর নাস্তিককে বলা হইল,—তুমি ভূতকে মনে মনে একটা প্রশ্ন কর, তাহার একবর্ণও কাহাকে জানাইবার আবশ্যক নাই। নাস্তিক তাহাই করিল। যেমন মনে মনে প্রশ্ন করা, অমনই তাহার উত্তর সেই মোড়ক করা শ্লেটের গায়ে লেখা হইতে লাগিল। শীলমোহর করা মোড়ক নাস্তিকের হাতেই আছে, অথচ তাহার মধ্যে খস্ খস্ করিয়া লেখার শব্দ হইতেছে! আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া নাস্তিক থতমত খাইয়া কেমন একরূপ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে লেখা শেষ হইল। তাহার পরই তিনটি শব্দ হইল, তাহার সঙ্কেত এই যে, লেখা শেষ হইয়াছে। মিডিয়ম্

মোড়ক হইতে হাত উঠাইলেন। তাহার পর নাস্তিককে বলিলেন—ভাল করিয়া দেখুন, শীলমোহর ভাঙ্গিয়া যায় নাই ত? ঠিক্ ঠিক্ আছে ত?

পার্শেলের মোড়ক ঠিকই ছিল। তখন নাস্তিক ছুরি দিয়া দড়ি কাটিয়া মোড়ক খুলিল। খুলিয়া দেখিল যে, শ্লেট দুইখানির ভিতর দিকে তাহার প্রশ্নের উত্তর অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। নাস্তিক অবাক্; তাহার মুখে কথা সরিল না। বিস্মিত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে নাস্তিক গৃহে গেল। ৭ দিন ধরিয়া ভাবিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাহার পর নাস্তিক আপনার গোঁ-রোগের পরিচয় দিয়া বলিল—মিডিয়ম খুব জুয়াচুরিটাই খেলিয়াছে, কিন্তু কিরূপ করিয়া যে ঠকাইল, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; মিডিয়ম্ যেমন করিয়াই হউক, আমাদের মাথা খারাপ করিয়া দিয়াছিল; তাই, "যাহা নয়, তাহাই দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে।" নাস্তিককে বুঝাইয়া উঠা খুবই শক্ত ব্যাপার। যে অবুঝ, তাহাকে বুঝাইবে কে? আমাদের ঐ নাস্তিক প্রায়ই মিডিয়মের কাছে ঠকিয়া আসার কথাটা বলিত। বলিত,—"খুব বুদ্ধি-কৌশল বটে, কিন্তু ভূত-প্রেত সর্ব্বৈব মিথ্যা!" এই ব্যাপারটি নাস্তিক সর্ব্বদাই মনে তোলপাড় করিত, তাই সর্ব্বদাই তাহার মুখে ঐ কথা শুনা যাইত। ইহাতে মনে হয়, নাস্তিক্য-বুদ্ধি তাহার অন্তর হইতে কতকটা অপসারিত হইয়াছিল। সে স্বীকার না করিলেও সে কতকটা উপকৃত হইয়াছিল।

ভূতের নিকট হইতে শ্লেটে লেখার ভিতর দিয়া যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহা খুব জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। আমার মনে হয়, ভূতের জ্ঞানবুদ্ধি উত্তরের মধ্যে যত আসুক না আসুক, প্রশ্নকর্ত্তার বিদ্যা-বুদ্ধির প্রভাবই উহাতে অধিক থাকে। প্রশ্নকর্ত্তার মনোভাবই প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়ে। লেড্ বিটার বলেন,—আমি কতকগুলি লোককে খুব শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহারা বাঁচিয়া ছিলেন কি না—এই প্রশ্ন এক দিন

করিয়া বসিলাম। উত্তর পাইলাম—হাঁ, বাঁচিয়া আছেন। শুধু তাহাই নহে, আমি তাঁহাদের উপর যেমন শ্রদ্ধান্বিত, ভূতও তাঁহাদের কথা বলিতে বসিয়া সেইরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল। অথচ ঐ ভূতই অন্য সময়ে অন্য প্রশ্ন-কর্ত্তার কাছে বলিয়াছিল যে, তাঁহারা জীবিত নাই। মাত্র এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার এই অস্বীকার। আবার এখন আমার কাছে স্বীকার! ইহাতে কি বুঝিতে হইবে? এমন হইতে পারে, এই দুই সময়ের দুইটি ভূত পৃথক্; অথচ এক জন অপরের নাম করিয়া পরিচয় দিয়াছে। ভূত দুইটি পৃথক্ই হউক্, আর একই হউক্, ইহার মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। দুইবারই প্রশ্ন-কর্ত্তার নিজের নিজের মনের ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছিল। তবে আমি এ কথা অস্বীকার করি না যে, আমরা অনেক সময় অপ্রত্যাশিত উত্তরও পাইয়া বসি—সে উত্তরের চিন্তাও কখন করি নাই, আর উত্তরের মধ্যে এমন সকল সংবাদও পাওয়া যায়, যাহা আমরা কিছুমাত্র জানি না।

ভূত-প্রেতের নিকট হইতে সংবাদ লইতে হইলে, শ্লেটে লিখাইয়া আনার প্রথাটাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। আর এটা দিনে দুপুরেও হইতে পারে। কেন সহজ, আর দিনের বেলায় আলোকের মধ্যেও কেন হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন নহে। ভূত কখন আলোকে আসিতে পারে না, ইহাই প্রকৃত কথা। তবে শ্লেটে লিখিতে আইসে কিরূপে? দুইখানা শ্লেট সংযুক্ত করিলে, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই অন্ধকার হয়, অথবা একখানি শ্লেট টেবিলের নীচে তক্তার সঙ্গে চাপিয়া ধরিলেও অন্ধকার হয়। সেই অন্ধকারে ভূত আসিয়া লিখিতে পারে। তাহাতে তাহার আসার বাধা ঘটে না। অন্ধকারে ভূতযোনি স্থূলীভূত হইয়া থাকে। সে সময়ে বাহিরের স্পন্দন কতকটা প্রতিহত করিতে পারে।

আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভূত যে স্থূলশরীর ধারণ করে, সেটা একটা নকল শরীরমাত্র—খানিকটা সময়ের জন্য কতকগুলি অনুকূল জড়াংশ আবদ্ধ হয় মাত্র। আসল শরীরের মত উহা দৃঢ় নহে। আসল

শরীর যেমন বাহিরের আলোকস্পন্দন সহ্য করিতে পারে, ভূতের নকল শরীর তাহা পারে না। আলোকের তীব্র স্পন্দনে সে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়; তাই খুব সাবধান হইয়া ভূতকে তাহার নকল স্থূল-শরীরটা রক্ষা করিতে হয়। তাহা ছাড়া শরীর গড়িয়া লইবার সময় মিডিয়মের স্থূল-শরীর হইতে স্থূল পরমাণু লইয়াই সে শরীর গড়া হয়। মিডিয়মের নিরন্তর আকর্ষণেও সে শরীর স্থায়ী হইতে পারে না। তবে আলোকের তীব্র স্পন্দনেও কোন কোন সময় ভূতের শরীর নষ্ট হয় না। স্থলবিশেষে সেরূপ শরীরও দেখা যায়।

তীব্র আলোকের স্পন্দনে ভূতের শরীর নষ্ট হইলেও, মৃদু আলোকে খানিকটা সময় উহা তিষ্ঠিতে পারে। তাহাতে উহার বিশেষ ক্ষতি হয় না। গ্যাসের আলোক খুব মৃদু করিয়া দিলে, তাহাতে ঐ শরীর থাকিতে পারে। রঙ-মাখান কাঠের এক রকম ঝক্‌ঝকে শ্লেট আছে, অন্ধকারে ঐ শ্লেট চক্‌চক্ করে; সে চাকচিক্যের মধ্যে ভূতের শরীর তিষ্ঠিতে পারে। ভূতেরা ভুবর্লোকে থাকে। ভুবর্লোকবিহারীরা একরূপ আলোক সৃষ্টি করিতে পারে; অবশ্য সে আলোক খুব মৃদু ও স্নিগ্ধ। ঐরূপ আলোকের মধ্যে অবস্থান করিয়াও কখন কখন ভূতেরা আসিয়া লিখিতে থাকে। সেইরূপ ভাবের একটা বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। মিঃ লিভারমোর কট্‌ফক্‌স্ নাম্নী রমণীর সঙ্গে ১৮৬১ খৃঃ ১৮ই আগষ্ট তারিখে একটি ভূতের বৈঠকে বসিয়া ঐরূপ ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। বিবরণটি এই :—

ভূত এক ঘণ্টা ধরিয়া লিখিল

এক ফুট ব্যাস পরিমাণের একটা আলোক-বৃত্ত আসিয়া কার্ডগুলির উপর পড়িল। ব্যাপার কিরূপ হয়, খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, আলোকের মধ্যে একখানা ভূতের হাত, হাতে আমারই পেন্‌সিলটা! হাতখানি বাঁ-দিক্ হইতে ডানদিকে পুনঃ

পুনঃ যাইতেছে, আর দিব্য লেখা হইতেছে। প্রথমে দেখা গেল, হাতখানি বেশ সুগঠিত—ক্রমে উহা কাল ও ছোট হইয়া আসিল। কিন্তু তখনও পেন্‌সিলটা ধরিয়া আছে, তখনও লেখা চলিতেছে। এইরূপ ব্যাপার প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া হইল। ভূতে যে লিখিয়া দিতে পারে, ইহার অপেক্ষা ভাল প্রমাণ আমি আর কখন পাই নাই। এ ব্যাপার খুব খাঁটি; কেন না, কেহ ঠকাইতে না পারে, সে বিষয়ে আমরা ভালরূপ সতর্ক ছিলাম। আমি মিডিয়মের দুইখানি হাতই বরাবর ধরিয়া বসিয়াছিলাম। কার্ডগুলি আমার কাছে এখনও আছে, উহাদের দুই পিঠেই ভূতের লেখা। যে বিষয়গুলি লেখা, তাহা খুব জ্ঞানগর্ভ, পবিত্র-ভাব-ব্যঞ্জক ও আধ্যাত্মিক। ("বিতণ্ডাভূমি"—৩০১ পৃষ্ঠা)

ঐ গল্পটি খুব সত্য হইলেও বুঝিয়া উঠা শক্ত যে, হাতখানি অতক্ষণ ধরিয়া কি করিয়া থাকিল। হাতখানির আকার বরাবর সমান ছিল না বটে, কিন্তু তাহা হইলেও পেন্‌সিল ধরিয়া একটা দৃশ্য বস্তু বরাবর লিখিতেছিল।

ত্রিংশ অধ্যায়

ভূতে ছবি আঁকিতেও পারে

লেডবিটার সাহেব আরও লিখিয়াছেন :—

ভূতে খুব সুন্দর ছবি আঁকিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় যেমন দেখা গেল, একখানা হাত আসিয়া লিখিল, ঐ রকমভাবে ছবিও আঁকিয়া দেয়। আমি দেখিয়াছি, ঘোর অন্ধকারে একখানা ছবি আঁকা হইল। সম্ভবতঃ সেটা ভূতেরই লেখা। 'সম্ভবতঃ' বলিতেছি, কারণ, অন্যরূপেও ওরূপ ছবি আঁকা যাইতে পারে। কিন্তু সেটা খুবই কঠিন প্রণালী। তাই মনে হয়, সেরূপ প্রণালীতে আর কেহ আঁকিতে যায় নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, সেটা নিশ্চয়ই ভূতের কাণ্ড। এক শ্রেণীর মিডিয়ম্ আছেন, যাঁহারা ভূতের সাহায্যে ছবি তুলিতে খুবই সিদ্ধহস্ত। ভূতের কাণ্ডকারখানার মধ্যে ছবি আঁকা ব্যাপারটা খুবই তৃপ্তি-প্রদ। আমি এরূপ ব্যাপার দুইবার দেখিয়াছি, দুইবারই একটা একটা স্থানের দৃশ্য আঁকা হইল দেখিয়াছি। আমি যে ছবি দেখিয়াছি, তাহা লম্বে ৮ ইঞ্চি, প্রস্থে ৫ ইঞ্চি ; ১৫ হইতে ২০ মিনিটের মধ্যে অন্ধকার ঘরে একখানা নির্দ্দিষ্ট কাগজের উপর ছবি আঁকা হইয়া গেল। ছবিখানি অতি সুন্দর—রঙ খুব স্বাভাবিক আর বেশ পরস্পর সমঞ্জস। আলো আনিয়া দেখিবার সময় দেখা গেল, কোন রঙ তখনও কাঁচা (ভিজে) রহিয়াছে। আমি যে কাগজ সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, ঠিক সেই কাগজের উপরেই ছবি আঁকা হইয়াছিল। কোন প্রকার প্রতারণা হয় নাই। অন্ধকার করিয়া যখন আলো সরানো হয়, তখন আমি একখানা কাগজের কোণ হইতে একটু ছিঁড়িয়া রাখিলাম। ভাবিলাম, দেখা যাউক, ঠিক আমার নির্দ্দিষ্ট কাগজেই ছবিটা আঁকা হয় কি না।

ছবি আঁকা হইলে যখন আলোক আনিয়া দেখা গেল, তখন দেখিলাম, ঠিক সেই ছেঁড়া কাগজেই আঁকা হইয়াছে। ছেঁড়া অংশটা জুড়িয়া দেখিলাম, ঠিক ঠিক মিলিয়া গেল।

দুইবার আঁকা দেখিয়াছি। দুইবারই স্থানবিশেষের দৃশ্য। কিন্তু সে দুইট স্থানের একটিও আমি চিনি না। মিডিয়মের ঘরে অনেক স্থানের দৃশ্য ছিল। তাহার মধ্যে অনেকগুলি আমার চেনা জায়গা। শুনিলাম, সেগুলিও না কি এইরূপ ভাবে অন্ধকারে ভূতের দ্বারা আঁকা হইয়াছিল। আমি যে দুইবার আঁকা দেখিয়াছি, সে দুইবারই ভূতকে গঁদ-মিশ্রিত রঙের বাক্স ও রং-দানী এবং তুলি দেওয়া হইয়াছিল। বৈঠকের পরে পরীক্ষা করিয়া জানা গেল যে, বাস্তবিকই ভূত সেগুলির ব্যবহার করিয়াছিল। আমি আর এক জন মিডিয়মের কাছেও ছবি আঁকা ব্যবহার দেখিয়াছি। সে ক্ষেত্রে দেখিলাম, ছবি খুব বড় রঙিন খড়ি দ্বারা আঁকা, এখানে আরও অল্পসময়ে আঁকা হইয়াছিল। কিন্তু শেষোক্ত ছবি আগেকার মত নিখুঁত নহে। উহাতে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। শেষোক্ত ঘটনায় ভূতকে একটা রমণীর মুখ আঁকিতে বলা হইয়াছিল; আঁকা হইলে দেখা গেল, ছবি দেখিয়া রমণীকে চিনিতে পারা যায়, সাদৃশ্য খুব আছে বটে, কিন্তু বেশ নিখুঁত নহে। আমি যে কয়বার দেখিয়াছি, সে কয়বারই মিডিয়মের চালাকী ছিল না। মিডিয়মের দুইখানি হাতই আমি ধরিয়া বসিয়া ছিলাম। আর ঘরের মাঝে অন্ধকারও খুব নিবিড় ছিল না, মিডিয়ম নড়িলে চড়িলেই ধরা পড়িত।

ভূতের বাদ্যযন্ত্র বাজান

জীবিতকালে যদি কোন ব্যক্তি কোন যন্ত্র বাজাইবার নিপুণতা লাভ করিয়া থাকে, তবে মরণের পরও তাহার সে নিপুণতা থাকিয়া যায়। মৃত্যুর পর আমি ভূতকে বেহালা ও বাঁশী বাজাইতে শুনিয়াছি। ঘরে তখন খুব অন্ধকার ছিল না, তাই বুঝিলাম যে, সে বাজনাটা ভূতেরই, আর

কাহারও নহে। "কন্‌সার্টিনা" নামক যন্ত্রের এক দিক আমি ধরিয়া রাখিয়াছি আর ভূত যন্ত্রটা বাজাইতেছে, এরূপ হইয়াছে। এরূপ ব্যাপার আরও অনেক দিন ঘটিয়াছে। আমার সাক্ষাতে পিয়ানো নামক যন্ত্র বাজাইয়াছে। পিয়ানো বাজাইবার সময় তাহার ডালা খুলিতে হয়। ভূতে যখন বাজায়, তখন উহা খোলাই থাকুক আর আঁটাই থাকুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। ভূত সকল অবস্থাতেই বাজাইতে পারে। কখন কখন ভূতে ডালা খুলিয়া ফেলে। তখন দেখা যায়, মানুষ বাজাইবার সময় ঘাটগুলি যেমন চাপিয়া নীচু করিয়া ফেলে, ভূতের বাজানোর সময় ঘাটগুলি সেইরূপ নীচু হইতে থাকে। ভূত ডালা খুলিয়া বাজাইতেছে, এমন সময় যদি আমরা ডালাটা বন্ধ করিয়া দিই, তবুও পূর্ব্ববৎই বাজনা হইতে থাকে। আবার এমনও দুইবার দেখিয়াছি, ঘাটগুলি নীচু হইতেছে না অথচ বীণার বাদ্যের মত ঝঙ্কার বাহির হইতেছে।

একটা লোক জীবিতকালে বেশ যন্ত্র বাজাইতে পারিত। মরণের পরও তাহার সে শক্তি রহিয়া গেল। সার উইলিয়ম ক্রুক্স তাঁহার পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠায় ঐ ব্যক্তির বিবরণ লিখিয়াছেন। লোকটা যে তাহার যন্ত্র যথার্থই ব্যবহার করিত, তাহা নহে, যন্ত্রটি থাকিলে নিজের শক্তির পরিচয় দিত। গল্পটি এই :—

ভূতে টেলিগ্রাফ্ করিয়াছিল

"এক দিন আমি মিঃ হোমের সঙ্গে বৈঠক করিয়া বসিয়া আছি। আমাদের মাঝে টেবিল রহিয়াছে। টেবিলের উপর ছোট একটা কলের যন্ত্র; যন্ত্রটিতে টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা শব্দ তোলা যায়। যন্ত্রটি আপনা আপনি টেবিলের উপর অনুপ্রস্থভাবে আমার দিকে সরিয়া আসিল। ঘরে দিব্য আলো ছিল। যন্ত্রটিতে আমি হাত রাখিলাম, কে যেন আমার হাতের উপর টিপ্ দিয়া দিয়া টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা সঙ্কেত-শব্দ তুলিতে লাগিল। শুধু শব্দ নহে, তাহাতে একটা সংবাদ গঠিত হইল। যন্ত্রটির একটা দিকে

আমার হাত ছিল; অপর দিক্‌টা টেবিলের উপর সংলগ্ন। যন্ত্রটি মিঃ হোমের নিকট হইতে খানিকটা দূরেই ছিল।

"যন্ত্রে স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দ হইতেছিল, আর সেটি সম্পূর্ণভাবে ভূতের আয়ত্ত বলিয়া বোধ হইল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম—যন্ত্রস্থ প্রেত আমার হাত দিয়া 'খসী' সঙ্কেতের টেলিগ্রাফ করিতে পারে কি? সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ঐ সঙ্কেত জানিতেন না। আমি ঐরূপ প্রশ্ন করিবামাত্র আমার কথামত 'মর্স' সঙ্কেত হইতে লাগিল। ভূত খুব দ্রুতভাবে টেলিগ্রাফ করিতে লাগিল, তাই আমি সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, মাঝে মাঝে দুই একটি কথা ধরিতে পারিয়াছিলাম। মূল কথা, মোটের উপর সংবাদটা ব্যর্থ হইয়া গেল, তবে এইটুকু বুঝিলাম যে, ভূত খুব ভালরূপ মর্স টেলিগ্রাফ জানে।"

ভূতে ঠিক মানুষের মত গলার স্বর করে

ভূতে বাঁশী বাজায়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেরূপ ক্ষেত্রে মুখ ও হাত দুইটিরই স্থূলীভূত হইবার প্রয়োজন। কেন না, বাঁশী বাজাইতে হইলে মুখ দিয়া ফুঁ দিতেও হয়, আবার আঙ্গুল দিয়া বাঁশীর ছিদ্রগুলি সময় সময় চাপিতে ও সময় সময় খুলিতে হয়। বৈঠকে ভূত সচরাচরই স্থূল-মূর্ত্তি ধরিয়া মানুষের মত স্পষ্ট গলার স্বর বাহির করিয়া থাকে। হাতের স্থূলমূর্ত্তি ধরা অপেক্ষা গলার স্বর বাহির করা অবশ্যই আরও কঠিন ব্যাপার। তথাচ বৈঠকে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শব্দ বাহির করিবার উপযোগী গলা গড়িয়া তোলা সাধারণতঃ কঠিন হইয়া উঠে। তাই ভূতের স্বর প্রায়ই বিকৃত রকমের ও বাঁশীর সুরের মত। লেড্‌-বিটারের ধারণা, মরণের পর কোন মানুষ ভূত হইয়া কথা বলিতে গেলে প্রথম প্রথম তাহার কথা খুব মৃদু ফুস্‌-ফুস্‌ শব্দের মত শুনাইবে; কেন না, সে তখনও স্পষ্ট শব্দ বাহির করিবার মত স্থূল কণ্ঠ গড়িয়া তুলিতে অনভ্যস্ত। কিন্তু বৈঠকের ভূতেরা বারে বারে বৈঠকে আসিয়া কথা

বলিতে চেষ্টা করায় স্থূল কণ্ঠ গড়িয়া তুলিতে খুব মজবুত হইয়া উঠে।
তাই তাহাদের স্বর খুব স্বাভাবিক ও স্পষ্ট হইয়া থাকে।

গত ২৫ বৎসর যাবৎ "রাজা জন্" নামধারী একটি ভূত বিখ্যা
মিডিয়মের বৈঠকে হাজির হইত। বৈঠকবিহারী ব্যক্তিমাত্রেই সে কথা
জানেন। সেই ভূতের গলার স্বর যেমন উচ্চ, তেমনই স্পষ্ট। বৈঠ
তাহার চেনা কোন সভ্য উপস্থিত হইলেই সে তাহাকে খুব ফুর্তির সঙ্গে
অভিবাদন করিত। লেড্‌বিটার বলেন—এক দিন তিনি এক জন
মিডিয়মের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে গমের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গৃহ-
ভবনে যাইতেছিলেন। ঠিক সেই সময় একটা ভূত আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গ
সঙ্গে তাঁহাদের কথায় যোগ দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিল। ভূত এ
স্বাভাবিক স্বরে কথা বলিতে লাগিল যে, তাহাকে ভূত বলিয়াই বু
গেল না, ঠিক যেন এক জন তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ভূত কথা বলে শুনিয়া অনেকে ধারণা করেন যে, ভূত কখন কথা
বলিতে পারে না, মিডিয়মই এমন কৌশলে কথা বলে যে, কথা শুনি
মনে হয়, দূর হইতে শব্দ আসিতেছে। কিন্তু এ ধারণা সত্য বলি
লওয়া চলে না; জীবিতকালে এক ব্যক্তির গলার স্বর যেমনটি ছিল, মরণের
পর সে যদি ভূত হইয়া অবিকল সেই স্বরে কথা বলে, তবে আমরা ভূতের
স্বর বলিয়া মনে না করিব কেন? তাহা ছাড়া ঐ ধারণা যে অসার, তাহা
একটা প্রমাণ আছে। প্রমাণটি এই—লেডবিটারের বাড়ীতে এক দি
বৈঠক বসে। বৈঠকে আদৌ স্ত্রীলোক ছিল না, তাঁহারই বিশ্বস্ত কয়ে
জন পুরুষ বন্ধু ছিলেন; মিডিয়ম্‌ও পুরুষ। মিডিয়ম্ তন্দ্রাচ্ছন্ন হই
একেবারে অসাড়ভাবে পড়িয়া রহিল। এমন সময় চারি জন ভূত
আসিয়া একসঙ্গে গান গাহিতে লাগিল। গানের ভিতর চারি জনে
গলার স্বর স্পষ্টভাবে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বুঝা যাইতে লাগিল। আশ্চর্য
বিষয়, সেই চারিটির মধ্যে দুইটি গলা স্ত্রীলোকের আর খুবই সুমি
এ ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত ধারণার সার্থকতা কোথায়?

আমরা এ প্রবন্ধে আর একটা বিষয়েরও আলোচনা করিব। ভূত আসিয়া ফটোগ্রাফ তোলাইয়া দেয়; তাহার আলোচনাও কর্ত্তব্য। আমরা স্থূল-পদার্থেরই ফটো বা আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া থাকি। জীবিত আত্মীয়-স্বজনের ফটোর সঙ্গে সঙ্গে যখন মৃত আত্মীয়ের ফটো উঠিয়া পড়ে, তখন নিশ্চিত বুঝিতে হইবে যে, সে সময় মৃত আত্মীয়ের প্রেতাত্মা স্থূলমূর্ত্তি ধরিয়াছিল। স্থূলমূর্ত্তি ধরিলে সেটা সূক্ষ্ম জড় পরমাণুর সমাবেশেই গঠিত হয়, আর সে মূর্ত্তি কতকটা আলোক প্রতিফলিত করিতেও পারে। চিত্র তুলিবার "ক্যামেরা" নামক যন্ত্র অতীব সহজবিকারী। সূর্য্য-কিরণের কয়েকটা রঙ্ মাত্র আমাদের চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে। কিরণের আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবস্থা আছে, যাহা আমাদের চক্ষুর অগোচর। ক্যামেরা সেগুলি খুব ভালরূপ ধরিতে পারে। প্রেতাত্মার সূক্ষ্ম দেহের সূক্ষ্ম প্রতিবিম্ব ক্যামেরা অনায়াসেই গ্রহণ করে। তাই মানুষের স্থূলদৃষ্টির বিষয়ীভূত না হইলেও প্রেতাত্মা ফটো তোলাইতে সমর্থ হয়। মূলতঃ সেটা প্রেতাত্মার স্থূলীভূত অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাঁহারা ভালরূপ ফটো তুলিতে জানেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কৌশল পূর্ব্বক ভূতের ফটোর মত ফটো তুলিতে পারেন বটে; কিন্তু তাই বলিয়া যে প্রেতের ফটো নাই, সবগুলিই যে চালাকী, তাহা নহে। লেড্‌বিটার সাহেব মিঃ ডব্‌লিউ টী ষ্টেডের কাছে অনেকগুলি খাঁটি ভূতের ফটো দেখিয়াছিলেন। তিনি আর এক জন সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তির কাছেও অনেকগুলি দেখিতে পান।

একটা ভূতের ফটো

লেড্‌বিটার সাহেবের কাছে এক জন সেনাপতি এইরূপ গল্প করেন:—"আমার তিনটি কন্যা মারা যায়। খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা মারা পড়িল। একটা বড় সহরে—সহরটা আমার বাড়ী হইতে

শত শত মাইল দূরে—এক জন ভাল ফটোগ্রাফার আছে বলিয়া এক দিন একটা বিজ্ঞাপন দেখিলাম। শুনিলাম, সে না কি মৃত ব্যক্তির ফটো তুলিতে পারে। আমি মেয়ে তিনটির জন্য শোকে কাতর, তাই কাল-বিলম্ব না করিয়া তাহার কাছে যাইয়া উঠিলাম। যাইয়া বলিলাম, 'তুলুন।' মেয়ে তিনটির উল্লেখও করিলাম। ভাবিলাম—এ ব্যক্তি আমার নিজের ফটো ভিন্ন আর কিছুই তুলিতে পারিবে না। সে ফটোগ্রাফার আমার একেবারেই অপরিচিত। ফটো তোলা হইলে দেখিলাম, আমারই ফটোর কাছে আমার সেই তিনটি মরা মেয়ের মুখ উঠিয়াছে। মুখ তিনটি একটু ঝাপ্‌সা—একটু অস্পষ্ট। তাহা হইলেও আমি বেশ চিনিতে পারিলাম। তাহাদের জীবিতকালের ফটোও ছিল; এ ফটোর সঙ্গে জীবিতকালের ফটো মিলাইলে দেখা যায়, ঠিক একই চেহারা।

ছোট তক্তা দ্বারা "প্লানচেট্" নামক একরূপ যন্ত্র করা হয়। ঐ যন্ত্রে সম্ভবতঃ ভূত আইসে। লেড্‌বিটার বলেন—ভূতের আংশিক স্থূলমূর্ত্তি উহাতে আইসে। উহাতে কয়েকটি অঙ্গুলিমাত্র স্পর্শ করিয়া থাকিতে হয়, তাহার পর যন্ত্রটি বেশ সুস্পষ্টরূপে নড়িতে থাকে। যাঁহারা ঐ ভাবে বসিয়াছেন, তাঁহারা ভালই জানেন যে, সে নড়াটা তাঁহাদের দ্বারা ঘটে না, সেটা খাঁটি ভূতেরই কাণ্ড। যাঁহারা ধরেন, তাঁহারাই তাঁহাদের মধ্যে এক জন মিডিয়ম্ হইয়া থাকেন। তাঁহার শরীর হইতে সূক্ষ্ম জড় পরমাণু গ্রহণ করিয়াই ভূত-যোনি আংশিক স্থূলীভূত হয়, প্লানচেট যন্ত্রটিকে নড়াইয়া থাকে, অথচ মিডিয়ম্ এতটা কাণ্ডের কিছুই জানে না।

একত্রিংশ অধ্যায়

নানাবিধ ভূতুড়ে কাণ্ড

ভূতের বৈঠকে ভূত আসিয়া সাদা কাগজের উপর লিখিয়া দিয়া যায় এবং ছবি আঁকিয়া দেয়, এ কথা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু ভূতে না লিখিলেও বা না আঁকিলেও ঐ সব ব্যাপার অন্য উপায়েও হইতে পারে। সেই উপায়টি কি, আমরা এক্ষণে তাহা বিশেষ করিয়া বলিব। সে উপায়টিকে বৈঠকী ভাষায় "দানাদার-করণ" বলা হয়। এই দানাদার-করণ-প্রণালীতে ছবি লেখা হইলে সে ছবি বা লেখা ভূতের লেখা বা আকার অপেক্ষা খুব ভাল ও খুব শীঘ্র শীঘ্র হয়। কিন্তু একটি কথা, মিডিয়মের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা যদি খুব বেশী না থাকে, তবে এই দানাদার-করণ-প্রণালী অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই প্রণালীর ব্যাপার এইরূপ :—

এই প্রণালীতে যদি কেহ কিছু লিখিতে বা আঁকিতে চায়, তবে তাহাকে একখানা সাদা কাগজ লইয়া লিখিবার বা আঁকিবার বিষয়টি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া মনে মনে তাহার একটা সুস্পষ্ট চিত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহার পর চিন্তা-শক্তির প্রভাবে সেই কাল্পনিক চিত্রটিকে বাস্তবে পরিণত করিয়া কাগজখানির উপর সেটাকে নিক্ষেপ করিতে হইবে। আর তখনই লেখা বা চিত্র সাধারণের চক্ষুতে ফুটিয়া উঠিবে। কল্পনা দানা বাঁধিয়া স্থূল হয়, এই জন্যই বোধ হয় প্রণালীটির নাম—"দানাদার-করণ" দেওয়া হইয়াছে। মরণের আগেই হউক, আর পরেই হউক, এরূপ কাজ করাটা যে খুব শক্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধারণের পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব বলিলেও চলে। অনেকে জীবিত অবস্থাতেই এরূপ

সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, আবার মরণের পরও অনেককে এরূপ শক্তি-লাভ করিতে দেখা যায়।

লেড্‌বিটার বলেন—"আমি এরূপ প্রণালীতে বেশ আস্তে আস্তে লেখা হইতেছে, তাহাও দেখিয়াছি। দেখিলাম, বেশ একটি কথার পর একটি কথা, তাহার পর আর একটি কথা, এইরূপভাবে লেখাটা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। একটির পর একটি হইল বটে, কিন্তু হাতের লেখার অপেক্ষা খুব দ্রুতই হইল। আবার ঐ প্রণালীতে ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহাও দেখিয়াছি। একখানা ছবির উপর যদি একটা কাগজ চাপা থাকে আর সেই চাপা কাগজখানি আস্তে আস্তে সরাইয়া লওয়া হয়, তবে তাহার নীচে ছবিখানি যেমন আস্তে আস্তে বাহির হইতে থাকে, ইহাও ঠিক সেইরূপভাবে আস্তে আস্তে ছবিখানি ফুটিয়া উঠিল। এক প্রান্ত হইতে ফুটিতে ফুটিতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠিল। চমৎকার ব্যাপার!"

এই প্রণালীতে যাহারা ছবি আঁকে বা লেখে, লিখিবার বা আঁকিবার কালে রঙ প্রভৃতি কখন কখন তাহাদের আবশ্যক হয়। দানাদার-করা প্রণালীতে যখন মিডিয়ম্ লিখিতে বসে, তখন তাহার কাছে কালী বা রঙিন খড়ি দেওয়ার প্রয়োজন হয়; সেইরূপ, ছবি ফুটাইবার সময়ও রং দিবার আবশ্যক হয়। রঙ গুলিয়া দিলেও হয়, আবার গুঁড়া রঙ দিলেও চলে। মিডিয়মের যতটা কালী বা রঙের আবশ্যক, ঠিক ততটা দ্রব্য সে চিন্তা-শক্তি-প্রভাবে অণুপরমাণুতে বিশ্লিষ্ট করিয়া কাগজের উপর লইয়া ফেলে। আবার যে মিডিয়ম্ আরও শক্তিশালী, তাহার কালী বা রঙের প্রয়োজন হয় না। সে চিন্তাপ্রভাবে ব্যোমপদার্থ হইতে ঐ দ্রব্যের পরমাণু আকর্ষণ করিয়া কাগজের উপর লইয়া ফেলে। সে ক্ষমতা বড়ই বিস্ময়কর; ইচ্ছা করিলে যে-সে ইহার অনুকরণ করিতে পারে না।

এখন আমরা "ভূতের আলোক" সম্বন্ধে অলোচনা করিব। অনেক সময় বৈঠকে নানাবিধ আলোক দেখা যায়। এইগুলি খাঁটি ভূতেরই

কাণ্ড। স্যর্ উইলিয়ম ক্রুক্‌স তাঁহার পুস্তকের ৯১ পৃষ্ঠায় ঐ ভূতুড়ে আলোকের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ক্রুক্‌স বলেন :—

ভূতে নানাপ্রকার আলোক দেখায়

এক দিন বৈঠকে বসিয়া দেখিলাম, একটা আলোকময় দ্রব্য ঘরের ভিতর ফুটিয়া উঠিল, তাহার উপর এখানে-সেখানে সেটা চলা-ফেরা করিতে লাগিল। মুরগীর ডিম যত বড় হয়, আলোকময় পদার্থটা ঠিক তত বড়। প্রথমে এতটা উচ্চে দেখা গেল যে, এক জন লোক ডিঙ্গী মারিয়া সে স্থানটি নাগাইল পায় না, তাহার পর সেটা মেঝের উপর আসিল। আমরা ১০ মিনিটকাল ধরিয়া সেটাকে দেখিলাম। তাহার পর মিলাইয়া গেল। যাইবার সময় টেবিলের উপর তিনবার শব্দ করিয়া গেল। শব্দটা ঠিক যেন একটা শক্ত জিনিস দিয়া আঘাত করিবার মত। যে সময় আমরা এই আলোকটা দেখিতেছিলাম, তখন মিডিয়ম্ অজ্ঞান অচেতনের মত একখানি আরাম-চেয়ারে পড়িয়া ছিল।

আমরা বৈঠকে এক সময়ে অনেকে বসিয়া আছি, দেখিলাম, ছোট ছোট আলোক-বিন্দু আগুনের ফুল্‌কীর মত ছুটিয়া ছুটিয়া আসিল; আসিয়াই আমাদের কাছে কাছে বেড়াইতে লাগিল, তাহার পর আমাদের মাথার উপর আসিয়া হাজির। ঐ ফুল্‌কীগুলির তেজে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠাকে সঙ্কেত করিয়া আমি অনেক প্রশ্নের উত্তরও প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি যদি অমুক হও, তবে এতবার জ্বলিয়া উঠ, এই প্রশ্নের যদি এই উত্তর হয়, তবে এতবার জ্বলিয়া উঠ, এইরূপ করিয়া অনেক প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিয়াছি। এমন অনেকবার দেখিয়াছি যে, আলোকের ফুল্‌কীগুলি টেবিলের উপর হইতে ঘরের ছাদে গিয়া উঠিল, আবার ছাদ হইতে টেবিলের উপর আসিয়া পড়িল, পড়িবার সময় এমন শব্দ হইল, যাহা সকলেই বেশ শুনিতে পায়। ঐ আলোক শূন্যে অতি মৃদু জ্বলিতেছে, আবার মাঝে মাঝে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে

আমি অক্ষরের সঙ্কেত করিয়া লইয়াছিলাম। সঙ্কেত স্থির হইলে, মৃদু মৃদু জ্বলা আর প্রদীপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি লিখিয়া যাইতে লাগিলাম। শেষে তাহাতে বেশ একটি পরিস্ফুট সংবাদ গঠিত হইল। এক দিন দেখিলাম, উপরে একখানি ছবির কাছে আলোকময় একখানা মেঘের মত কি যেন একটা রহিয়াছে। আর এক দিন কে যেন আমার হাতে একটা ঝক্‌ঝকে নিরেট জিনিস দিল। যে হাতখানি ঐ জিনিসটা ধরিয়া আনিল, সেটা সে ঘরের কাহারও হাত নহে। যে ঘরে আমরা বৈঠক করিয়া বসিয়াছিলাম, সেই ঘরের এক পাশে একটি টেবিল ছিল। সেই টেবিলের উপর একটি জ্যোতিষিক যন্ত্র ছিল। দেখা গেল, ঘরে আলো রহিয়াছে, তথাচ আর একটা উজ্জ্বল আলোক-রাশি ঘনীভূত অবস্থায় ঐ যন্ত্রটির উপরে শূন্যে ঝুলিয়া আছে। খানিক পরেই উহা হইতে কড়াং করিয়া একটা প্রেক খুলিয়া আসিল। আসিয়াই এক জন রমণীর গায়ে পড়িল। আবার কখন কখন এমন দেখিয়াছি যে, ঐরূপ আলোক-রাশি ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া পরিশেষে একখানি হাত হইয়া পড়িল। শুধু হওয়া নহে, ঐ হাত ছোট ছোট দ্রব্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

লেড্‌বিটার পরলোক-তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম প্রথম নিজের বাড়ীতেই বৈঠক করিয়া প্রমাণ-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন। তখন তাঁহার বৈঠকে কোন নামজাদা মিডিয়ম্ আসিতেন না। সেই প্রথম অবস্থায়ও তিনি ত্রিবিধ "ভূতের আলো" দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার পরও তিনি ঐ রকম আলোক অনেকবার দেখিয়াছেন। ঐ সকল আলোকের মধ্যে কখন কখন তিনি এত উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইতেন যে, সেগুলিকে বিদ্যুতের আলোক বলিয়া ভ্রম হইত, একটা আলোতেই ঘর দেদীপ্যমান। আবার এক দিন একটা আলো এত ঝক্‌-ঝক্ করিয়াছিল যে, সে দিন তাঁহার চোখ ঝলসিয়া গেল, চোখে ঝাপ্‌সা লাগিয়া শেষে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, চাকৃচিক্যে অভিভূত

হইয়া গেলেন। অন্ধীভূত করিয়া ফেলে, এমন ঝক্‌ঝকে আলো ভূতের বৈঠকে প্রায়ই দেখা যায় না। তাহার কারণও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কারণ এই যে, তীব্র আলোকে ভূতেরা স্থূল-দেহ ধরিয়া কার্য্য করিতে পারে না, আলোকের তীব্র স্পন্দনে উহাদের নকল দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে।

যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর মিডিয়ম্, যাঁহারা অতীন্দ্রিয়শক্তির প্রয়োগ ও আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা যায়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই কোন একটা স্থূল দ্রব্যকে অণুপরমাণুতে বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিতে পারেন, আবার সূক্ষ্মতম পরমাণুপুঞ্জ হইতে একটা স্থূল দ্রব্যের সংগঠন করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়েন। এ শক্তির কথা আমরা পূর্ব্বে "দানাদার-করণ" প্রণালী প্রসঙ্গে একটু বলিয়াছি। এই প্রণালী যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একটা স্থূল জিনিসকে বিশ্লিষ্ট করিয়া এমন সূক্ষ্ম অবস্থায় লইয়া যান যে, তাহার কোন প্রকার অনুভূতিই থাকে না; সেই সূক্ষ্মাবস্থাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে আণবিক অবস্থা বা ব্যোম অবস্থাও বলা চলে। দ্রুত পরিস্পন্দের বলেই ঐ অবস্থাটা ঘটান যায়; কেন না, যে দ্রব্যটিকে সূক্ষ্ম করিতে হইবে, তাহার পরমাণুর মধ্যে পরস্পর একটা সংশ্লেষ—একটা আকর্ষণ থাকে, দ্রুত পরিস্পন্দ ঐ সংশ্লেষ বা আকর্ষণ বিনষ্ট করিয়া দেয়। পরিস্পন্দে বেগ যত বেশী হইবে, অণু-পরমাণু ততই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে। কোন দ্রব্য এইরূপে সূক্ষ্মাকারে পরিণত হইলে উহা অতি দ্রুতভাবে দেশ-দেশান্তরে পরিচালিত হইতে পারে। আবার যেমন ঐ স্পন্দন অপসৃত হইবে, অমনই পরমাণুভূত ঐ দ্রব্যটি আবার পূর্ব্বের মত স্থূল আকারে আকারিত হইয়া পড়িবে।

আকারটা কি করিয়া থাকিতে পারে?

মিডিয়মের ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে একটা স্থূল পদার্থ হাওয়ায় পরিণত হইয়া পড়ে, আবার হাওয়ার অবস্থা ছাড়িয়া যখন স্থূল অবস্থায় আইসে,

তখন দ্রব্যটির পূর্ব্ব আকার কেমন করিয়া থাকিতে পারে, এই প্রশ্ন অনেকেই করেন। তাই আমরা লেড্‌বিটার সাহেবের "ভুবর্লোক" নামক গ্রন্থ হইতে আর একটা স্থল উদ্ধৃত করিয়া এই প্রশ্নটির উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। লেড্‌বিটার এইরূপ বলিয়াছেন :—

"আপাততঃ সাধারণের মনে আইসে যে, একটা জিনিস সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণত হইবার পর যখন আবার তাহাকে স্থূল অবস্থায় আনা হয়, তখন তাহার পূর্ব্ব আকার থাকিতে পারে না—থাকা নিতান্তই অসম্ভব। তাঁহারা বলেন,—একটা ধাতু-গঠিত চাবি-কাঠিকে সূক্ষ্ম করিতে গেলে প্রথমে তাহাকে গলাইলাম, তাহার পর সেই দ্রবীভূত অবস্থা হইতে তাহাকে আরও সূক্ষ্ম করিলাম, তখন তাহা বাষ্পাকারে পরিণত হইল। তাপপ্রয়োগ দ্বারা চাবি-কাঠিকে ধর এইরূপ করা গেল। আবার তাপ আকর্ষণ করিয়া লইলেই ঐ বাষ্প জমিয়া তরলাবস্থায় আসিবে; তাহার পর আরও তাপ আকর্ষণ করিলে উহা কঠিন অবস্থায় আসিবে। কঠিন অবস্থায় আসিলে দেখা যাইবে—চাবি-কাঠি আর চারি-কাঠির আকারে গঠিত নাই, তখন উহা এক ডেলা ধাতুমাত্র; সুতরাং মিডিয়মরা কোন জিনিসকে সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত করিয়া আবার স্থূল অবস্থায় উহাকে আনিবার পরে পূর্ব্ব আকারটি কি করিয়া বজায় রাখিবেন? উঁহাদের চাবির উদাহরণটা খুব সুন্দর, উঁহাদের তর্কও আপাত-দৃষ্টিতে বেশ সু-সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, চাবির দৃষ্টান্তটা মিডিয়মদের বেলায় ঠিক খাটে না। চাবির বেলায় দেখা যায়, ধাতুর পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে একটা বিশ্লেষ আনিবার ফলে চাবি-কাঠিটির আকারের পরিবর্ত্তন ঘটিল বটে, কিন্তু ধাতুর হিসাবে কোন পরিবর্ত্তনই হইল না। ধাতু যেমন, তেমনই রহিল। নিসর্গের বায়ুমণ্ডলে ধাতু-পরমাণুর মহান্ সমুদ্র বিরাজ করিতেছে, চাবি-কাঠিকে বাষ্প করিয়া ফেলিলে উহার পরমাণুগুলি সেই বিরাট্ পরমাণু-সমুদ্রে যাইয়া মিশিয়া পড়ে। তাহাতে ধাতুর পরমাণুর বস্তুতঃ কোন পরিবর্ত্তনই

হয় না, কেবল অস্থায়ী স্থূল-মূর্ত্তিটিই পরিবর্ত্তিত হয়। মানুষের বেলায়ও ঐরূপ। মানুষের মরণের পর আত্মার নিজস্বগুলি অর্থাৎ তাঁহার চিন্তা, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার বাসনা, তাঁহার ধারণা, তাঁহার মানসিক উৎকর্ষ—এগুলির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে না। এগুলি অতি সূক্ষ্মাবস্থায় জাগতিক চিন্তা, বাসনা প্রভৃতির বিরাট্ সাগরে সুন্দরভাবে মিশিয়া থাকে। পরিবর্ত্তন হয় শুধু দেহটার। মরণান্তে যখন দেহটাকে ভস্মীভূত করা হয়, তখন মাত্র অস্থায়ী দেহের স্থূল-মূর্ত্তিটাই পরিবর্ত্তিত হয়। আসল মানুষটা অর্থাৎ জীবনীশক্তি, তার গুণ-দোষ, এ সবগুলি যেমন তেমনই থাকে। ইহাদের আদৌ পরিবর্ত্তন হয় না।

"তাই বলিতেছিলাম, সাধারণে বলেন, যখন চাবির স্থূল অবয়বটা নষ্ট হইয়া একডেলা ধাতু হইয়া পড়ে, তখন মিডিয়ম্‌রা কেমন করিয়া আকার বজায় রাখেন ? মনে রাখিতে হইবে, মিডিয়ম্ যখন ইচ্ছা করেন—আমি এই চাবিটিকে সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণত করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইব, তখন উহার পরমাণুগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলিলেও যাহাতে উহার পুনর্যোজনার সময়ে পূর্ব্বাকৃতির বিপর্য্যয় না ঘটে, সে বিষয়ে তিনি খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। এমন ভাবে এমন অবস্থায় পরমাণুগুলিকে চালিত করিয়া লইয়া যান, যাহাতে চাবিটির পূর্ব্ব-আকার প্রকটিত করা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হয় না। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরমাণুগুলিকে একটা নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীতে পরিচালন করেন। সেই ভঙ্গীটাই শেষে একটা ছাঁচের কাজ করে। পরিশেষে বিকর্ষণঘটন-পটীয়সী শক্তি টানিয়া লইবামাত্র পরমাণুগুলি ঐ ভঙ্গীর ছাঁচে পড়িয়া ঘনীভূত হইয়া পূর্ব্বাকারে চাবি হইয়া দাঁড়ায়। অতএব শক্তিশালী মিডিয়মদের কাছে কোন স্থূল দ্রব্যের আকার ঠিকই ফুটিয়া উঠে ; একটুও নষ্ট হয় না।

"অনেক সময় বৈঠকে দেখা যায়, মিডিয়ম্ ভূতের সাহায্যে অনেক দূরবর্ত্তী স্থানের দ্রব্য নিমেষের মধ্যে আনিয়া হাজির করে। স্থূল দ্রব্য যখন সূক্ষ্ম অবস্থায় অর্থাৎ হাওয়ায় পরিণত হয়, তখন তাহা ঘরের

দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাইতে ও আসিতে পারে। বাক্স বন্ধ থাকিলেও ভিতরের স্থূল দ্রব্য এই উপায়ে বাহির করিয়া আনা যায়। চালুনীর ভিতর দিয়া জল, কিম্বা তরল পদার্থের ভিতর দিয়া বাষ্প যেমন অনায়াসেই যাইতে পারে, কোনরূপ বাধা জন্মে না, সেইরূপ বিশ্লিষ্ট আকারে, পরমাণুভূত অবস্থায় যাবতীয় কঠিন পদার্থই অন্য কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া যাওয়া আসা করিতে পারে।

"পরিস্পন্দের বলে যেমন কঠিন পদার্থকে ব্যোম পদার্থে পরিণত করা যায়, সেইরূপ পরিস্পন্দের বিপরীত প্রণালীতে পরমাণু-ভূত অবস্থা হইতে স্থূল দ্রব্য গঠিত করা বা ফোটাইয়া তোলাও চলে। প্রথমটি বিশ্লেষ-প্রণালী, দ্বিতীয়টি সংশ্লেষ-প্রণালী। তীব্র ইচ্ছাশক্তি প্রথমটির বেলায় পরমাণুগুলির পরস্পরের আকর্ষণী শক্তিকে বশীভূত করে; দ্বিতীয়টির বেলায় স্থূলীভূত পদার্থটিকে বিশ্লিষ্ট হইতে দেয় না, উহার পরমাণু-পুঞ্জকে নিবিড়ীভূত রাখিতে :চায়। দুইটি ব্যাপারেই দীর্ঘকালস্থায়ী তীব্র ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োজন।"

ঐ শক্তির প্রভাবে খুব দূরদেশের দ্রব্য আনা যায়

ভূতেরা নিজেদের অদ্ভুত শক্তি দেখাইতে ভালবাসে। তাহারা কখন কখন বৈঠকে আসিয়া এক ঘরের জিনিস অন্য ঘরে লইয়া গিয়া বা খুব দূরদেশ হইতে দর্শকদের প্রার্থিত দ্রব্য আনিয়া দিয়া আপনাদের অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করতঃ আনন্দ অনুভব করে। স্যর উইলিয়ম ক্রুক্স তাঁহার পুস্তকের ৯৭ পৃষ্ঠায় এই ব্যাপারের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এক দিন কুমারী কেটের সঙ্গে বৈঠকে বসিয়াছিলেন; সে দিন একটা প্রেত লাইব্রেরীঘর হইতে একটা ঘণ্টা আনিয়া ফেলিল। অথচ ঐ ঘর তালা-বদ্ধ ছিল; তালার চাবি-কাঠিও ক্রুক্সের নিজের পকেটে ছিল। অদ্ভুত কাণ্ড।

লেড্‌বিটার নিজেও এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অনেক দেখিয়াছেন।

তিনি এইরূপ বলেন :—"ভূতে খুব দূরদেশ হইতে ফুল আনিয়া দিল, ফল আনিয়া ফেলিল, এরূপ ঘটনা খুব সচরাচরই ঘটে। এক দিন আমি ইংলণ্ডের এক বৈঠকে বসিয়া ভূতকে বলিলাম, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ফুল আনিয়া দাও। যেমন বলা, অমনই গরম দেশের কতকগুলি বেশ টাট্‌কা ফুল ও ফল আমার কাছে আনিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা হইতে এগুলি আনিলে? উত্তরে ভূতটি বলিল—'মহাশয়, আমরা কাহারও জিনিস চুরি করি না, গরম দেশে এ সব দ্রব্য যেখানে-সেখানে প্রচুর জন্মিয়াছে, সেখান হইতে লইয়া আসিলাম।' আর এক দিন ঐরূপ-ভাবে একটা ভূঁইচাঁপা ফুলের গাছ ও একটা 'ফার্ণ' গাছ আনিয়া ফেলিল। গাছ দুটি খুব তাজা, তখনকারই তোলা, শিকড়ে কাঁচা মাটী পর্য্যন্ত লাগিয়াছিল। আমি ঐ দুইটি গাছ বাগানে লাগাইয়াছিলাম। বেশ লাগিয়া গেল, আর স্বাভাবিকভাবে দিব্য বাড়িতে লাগিল।"

"ছায়ারাজ্য" নামক গ্রন্থে ম্যাডাম্ ডি এসপ্যারান্স বৈঠকে গাছ আনিয়া ফেলার খুব ভাল ভাল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ২৬১ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নে একটা বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার বৈঠকে যে প্রেতিনীটি খুব বেশী বেশী আসিত, তাহার নাম—"যোলান্দী।" ঐ পুস্তকের একটা বিবরণ এইরূপ :—

"যোলান্দী একটা ঘর অতিক্রম করিয়া মিঃ রিমার্স্ যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই "রিমার্স্" নামক ভদ্রলোকটি সমগ্র ইউরোপের মধ্যে এক জন খুব সুবিখ্যাত প্রেততত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি। কিছু অদ্ভুত শক্তি দেখাইবার নিমিত্ত যোলান্দী তাঁহাকে নিকটের একটা ঘরে যাইতে ইসারা করিল। আমরা পূর্ব্বেও যোলান্দীর অনেক কাণ্ড-কারখানা দেখিয়াছি। সে চোখের সাম্‌নে ফুল তৈয়ারী করিতে পারিত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাহাকে জল ও বালি দিতে হইত। তাই পূর্ব্ব হইতেই আমরা জল ও বালির যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলাম। রিমার্স্‌কে সঙ্গে করিয়া যোলান্দী বৈঠকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াই বালি ও জল চাহিয়া বসিল।

আমরা চাহিবামাত্র ঐ দ্রব্য দিলাম। তাহার পর একটা বড় কাচের বোতল চাহিল। তাহাও দিলাম। তখন ষোলান্দী রিমার্স্‌কে বলিল— 'তুমি মেঝেয় হাঁটু পাড়িয়া বসো, আর এই বোতলটির মধ্যে বালি দিয়া অর্দ্ধেকটা পূরিয়া ফেল।' রিমার্স্ তাহাই করিলেন। তখন ষোলান্দী বলিল—'এখন উহার মধ্যে জল ঢালিয়া দাও।" রিমার্স্ জল ঢালিয়া দিলেন। তখন বলিল—'এখন বোতলটি বেশ করিয়া ঝাঁকড়াও।' রিমার্স্ বেশ করিয়া ঝাঁকড়াইয়া ষোলান্দীর হাতে দিলেন।

"ষোলান্দী বোতলটি লইয়া বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার পর উহা মেঝের উপরে রাখিয়া একটা পাতলা কাপড় দিয়া ঢাকা দিল; বোতলে জল ও বালি পোরা হইলে, আর যে বাকী জল বালি সে ঘরে ছিল, তাহা মিঃ আর্মষ্টং সে ঘর হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন। ঐ ঘরে কাপড় চাপা দেওয়া শুধু ঐ বোতলটাই থাকিল। সেই ঢাকা দেওয়া কাপড়খানি খুবই পাতলা। তাহার ভিতর দিয়া বোতলের আকার, মাথা, আর সবই দেখা যাইতেছিল।

"ষোলান্দী সঙ্কেত করিল। আমরা বুঝিলাম, এখন আমাদিগকে কৌতূহলের বেগ একটু কমাইতে হইবে, মনের বেগ একটু সংবত করিতে হইবে,—এই উদ্দেশ্যে ষোলান্দী আমাদিগকে গান করিতে বলিতেছে।

"আমরা গান করিতেছিলাম, হঠাৎ চাহিয়া দেখি, বোতলটার মুখ হইতে সেই পাতলা কাপড়খানি একটু উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কুড়ি জন সে ঘরে ছিলাম। সকলেই ঐটি লক্ষ্য করিলাম।

"ষোলান্দী নিকটের একটা নির্জ্জন ঘর হইতে বারে বারে আসিয়া বোতলটি দেখিয়া যাইতেছিল। বোতলটি আমাদের ঘরেই ছিল। কাপড়খানি একটু উঁচু হইয়া উঠিলে ষোলান্দী তাহার নির্জ্জন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পর খুব ব্যগ্রভাবে বোতলটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর খুব নরম হাতে কাপড়খানি একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া কি যেন দেখিতে লাগিল। এত নরম হাতে, এত সন্তর্পণে ঢাকার

কাপড়খানি ধরিয়াছিল, যেন উহার নীচে খুবই একটা কোমল জিনিস আছে, পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, তাই এত সাবধানতা। তাহার পর যোলান্দী খুব আস্তে আস্তে কাপড়খানি তুলিয়া লইল। আশ্চর্য্য! আমরা তখন বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, বোতলের ভিতর হইতে সুন্দর একটি গাছ উঠিয়াছে। গাছটিকে দেখিয়া 'লরেল্' গাছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যোলান্দী বোতলটি হাতে করিয়া তুলিল। স্বচ্ছ কাচের বোতল। বাহির হইতেই ভিতরের জল, বালি, গাছের শিকড় সবই সুন্দরভাবে দেখা যাইতেছিল। দেখা গেল, শিকড়গুলি ঐ বালির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে।

"যোলান্দীর মুখে যেন গর্ব্ব ও আনন্দের ভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সে দুই হাত দিয়া বোতলটি ধরিয়া ঘরের অপরাংশে মিঃ অক্‌স্‌লীর কাছে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দিল। সে বৈঠকে সে দিন তিনিও এক জন দর্শক ছিলেন। তিনি খুব বিখ্যাত দার্শনিক লেখক। প্রেততত্ত্ব ও মিশরদেশীয় 'পিরামিড' সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া জগতে যশস্বী হইয়াছিলেন।

"যোলান্দী তাঁহাকে ঐ গাছশুদ্ধ বোতলটি দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। এমনভাবে চলিয়া গেল, যেন সেদিনকার মত তাহার আর অন্য কাজ নাই। অক্‌স্‌লী গাছটি লইয়া বেশ করিয়া দেখিলেন, তাহার পর কাছে আর টেবিল না থাকায় বোতলটি নিজের কাছেই মেঝের উপরে রাখিলেন। তখন এই বোতলের মধ্যে কেমন করিয়া গাছ জন্মাইল, এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা, অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। গাছটি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল—এটা এক জাতীয় 'লরেল্'—ইহার পাতা খুব বড় বড় ও খুব চক্‌চকে হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার ফুল হয় না; মোটের উপর আমাদের মধ্যে কেহই গাছটিকে ভাল করিয়া কোন্ জাতীয়, তাহা স্থির করিতে পারিল না। আবার সঙ্কেতসূচক শব্দ হইল। আবার আমরা বুঝিলাম, বাগ্‌-বিতণ্ডা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে আর কিছু সময় অন্যমনস্ক হইতে হইবে।

তাই আবার আমরা গান-বাজনা আরম্ভ করিয়া দিলাম। গান শেষ হইলে আবার সঙ্কেত-শব্দ। বুঝিলাম—এবার গাছটি দেখিতে হইবে। গাছটির দিকে চাহিয়াই আমরা অবাক্! দেখি—মাথায় প্রকাণ্ড একটা ফুল। ফুলটির ব্যাস পাঁচ ইঞ্চি। অক্‌সলীর পায়ের কাছে গাছটি থাকিতেই ফুলটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"ফুলটির রঙ ঠিক করিয়া বলা কঠিন, না দেখিলে বুঝাইয়ও না; আমি ঐরূপ রঙ্ তাহার পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই; কমলালেবুর মত বলা যাইতে পারে।

"ফুলটিতে প্রায় দেড় শত দল, এক একটা দল আবার তারার মত; বোঁটাটা বেশ একটু লম্বা রকমের। ফুলের গাছটি ২২ ইঞ্চি উচ্চ, ডাঁটাটা বেশ একটু শক্ত রকমের কাঠও হইয়াছে, উহা বোতলের গলা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, গাছটিতে ২৯টি পাতা, পাতাগুলি প্রায় ২॥০ ইঞ্চি করিয়া চওড়া ও ৭॥০ ইঞ্চি করিয়া লম্বা; আবার কোন কোন পাতা অতটা চওড়াও লম্বা নহে। প্রত্যেক পাতাটাই পালিশ করা ও চক্‌চকে—দেখিতে অনেকটা লরেল্ গাছের পাতার মত। আমরাও প্রথমে উহাকে লরেল্ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম। শিকড়গুলি খুব সরু সরু—বালির মধ্যে যেন স্বাভাবিক ভাবেই জড়ান রহিয়াছে।

"বোতলে থাকা অবস্থাতেই আমরা গাছটির ফটো তুলিয়া লইলাম। বোতল হইতে উহাকে বাহির করাও তত সহজ ছিল না; কারণ, বোতলের গলা এত সরু যে, তাহার মধ্য দিয়া উহার অতটা শিকড় আসিতে পারে না। গাছের ডাঁটাটাতেই বোতলের মুখের ছিদ্র একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আমরা শুনিলাম—এরূপ গাছ ভারতে জন্মে; ইহার নাম 'ইক্‌সোরা ক্রোকেটা।'

"ভারতের গাছ কি করিয়া সেখানে আসিল? গাছটি কি মূ... বোতলের মধ্যে জন্মিল? গাছটিকে কি কেহ সূক্ষ্মাবস্থায় আনিয়া বোতলের ঘরে আবার স্থূলীভূত করিয়া দিল?

"আমরা পরস্পর ঐ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই ...সাত ত পারিলাম না। কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যাই মনে হইবে যে...ছটি দেখিয়া মনে হইল, উহা নেহাত চারা নহে, কয়েক মধ্যে সন্ধি এক জন পাকা মালীও তাহাই বলিল।

করিয়াছিল ...দখিলাম, গাছটিতে পূর্ব্বে আর পাতা হইয়াছিল কি না। পরমাণুগুলি...আগে আরও পাতা হইয়াছিল, সেগুলি ঝরিয়া গিয়াছে, স্থূলীভূত ...কিছু কিছু এখনও আছে। শিকড়গুলি বালির সঙ্গে ভাবে ... উহা বোতলের মধ্যেই জন্মিয়াছে। সমস্ত শিকড়ই বেশ নিখুঁত, ...ও ছেঁড়া-ফাটা নহে, ঠিক যেন ঐখানেই জন্মে, কোন স্থান ...তে যে উপড়াইয়া আনা হইয়াছে, এমনটি বোধ হইল না। বাহির ...তে যে কেহ গাছটিকে গুঁজিয়া বোতলের মধ্যে দিয়াছে, তাহাও মনে ...না, কেন না, অত শিকড় ও ডাঁটা অত সরু মুখ দিয়া যাইতে পারে গাছটিকে বাহির করিবার সময় বোতলটিকে ভাঙ্গিতে হইয়াছিল।"

মিঃ অক্স্লী পরে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি এই- ...বলিয়াছিলেন—"আমি পরদিন গাছটির ফটো লই। তাহার পর ...ছটি আনিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে মালীর হেপাজতে রাখিলাম। তিন মাস পরে ...শুকাইতে লাগিল। পাতাগুলি তুলিয়া রাখিলাম, যে চাহিল, তাহা- ...ই দিলাম, কেবল ফুলটি আর মাথার তিনটি পাতা কাহাকেও দিলাম ...মালী উহা গাছ হইতে তুলিয়া রাখিয়া দিল। এখনও কাচের পাত্রে ...রাখিয়া দিয়াছি। উহা এখনও ঠিক আছে, ভূতের মত মিলাইয়া ...বার কোন চিহ্নই তো দেখিতেছি না। এই 'ইক্সোরা ক্রোকেটা' ...ক ফুলগাছটি ফুটাইয়া তোলার পূর্ব্বে বোলান্দী আর এক দিন আমাকে ...টা গোলাপফুল দেয়; ফুলটির বোঁটা খুব ছোট, এক ইঞ্চির বেশী লম্বা ...। আমি গোলাপটি বুকে পরিলাম। কেমন একটু বেশী বেশী চক্- ...ক রকমের দেখিয়া ফুলটি বুক হইতে খুলিলাম। খুলিয়া দেখি, একটা ...দুইটা হইয়া রহিয়াছে! মনে মনে বিস্মিত হইয়া, গোলাপ দুইটিকে

আবার বুকে পরিলাম। তাহার পর বৈঠকের অন্তে আবার ফুলি... দেখিলাম যে, উহার বোঁটাটা সাত ইঞ্চি লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, ... স্থানে এবার তিনটা গোলাপ হইয়াছে, তাহা ছাড়া আর এ...টী কোরক রহিয়াছে। আবার কতকগুলি কাঁটাও আছে। আ... বিস্ময়-বিমূ... হইয়া পড়িলাম। ফুলগুলি বাড়ী লইয়া আসিলাম। খুব ... করিয়া রাখি... দিলাম, শেষে শুকাইয়া গেল, দলগুলি ও ডাঁটাটা আস্তে আস্তে শুষ্ক হই... গেল। ইহাতে মনে হয়, এই ফুল অলীক নহে, বাস্তবিক ...টি জিনিস।

মিঃ অক্‌স্‌লী নানাপ্রকার গাছ-পালা সংগ্রহ করিয়া একটা উদ্ভিদ... আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন। যে গছেটির কথা উপরে বলা হ... ঐটি তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সাধারণ চে... অকৃতকার্য্য হওয়ায় শেষে ভূতের বৈঠকে বসিয়া ভূতের সাহায্যে আনা... লইলেন। ইহার পূর্ব্বে যোলান্দী ঐ গাছ দিবে বলিয়া অক্‌স্‌লীর ক... প্রতিশ্রুত হয়। এখন সেই প্রতিজ্ঞা সে পালন করিল। তাই বৈঠকে... লোক থাকিতে সে গাছটি লইয়া অক্‌স্‌লীকে দিল। যোলান্দী গাছটি... বৈঠকে আনিয়া দিল—এই ব্যাপারটির মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করি... আছে। বিষয়টি এই—ঐ ফুলগাছটি হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয় না... ফার্ণ গাছ বা ভুঁইচাঁপা গাছ যেমন ধপাস্‌ করিয়া আসিয়া টেবিলের উ... পড়িয়াছিল, ইহা সেরূপভাবে আইসে নাই। দেখা গেল, একটা আ... নীচে বোতলের মধ্যে দিব্য ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে যেন গাছটি গজি... অবশ্য বর্দ্ধিত হইবার ধারাটা নেহাত অস্বাভাবিক; কেন না, কে... গাছই অত শীঘ্র অত বড় হইতে পারে না। যোলান্দী অক্‌স্‌লীকে গা... লইয়া দিবার পরেও উহার বৃদ্ধি থামে নাই, তখনও উহা বাড়িতে... কারণ, দেওয়ার পরে ফুলটি হইয়াছিল।

আমরা সাদা চোখে দেখিলাম যে, বোতলের মধ্যে দিব্য আস্তে আ... গাছটি বাড়িল। কিন্তু এ দেখাটা দেখা নহে। এ বৃদ্ধিটাও বস্তুতঃ... রণ শ্রেণীর বৃদ্ধি নহে। কেন না, বিশেষ পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, ...

সাতটি বৎসরের কমে ঐরূপ একটি গাছ তৈয়ার হইতে পারে না। গাছটি সাত বছরের গাছ। তবে পাইলাম কিরূপে? আমাদিগকে ধারণা করিতে হইবে যে, গাছটির টুকরা টুকরা অংশ সূক্ষ্মাকারে আসিয়া বোতলের মধ্যে সঞ্চিত ও সজ্জিত হইয়াছিল। নিশ্চয়ই যোলান্দী এই ব্যাপারটি করিয়াছিল। একটা সমগ্র গাছকে সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত করিয়া, তাহার পরমাণুগুলিকে অতি শীঘ্র অন্যত্র পরিচালিত করিয়া, আবার পূর্ব্বাবস্থায় স্থূলীভূত করিয়া তোলা যখন অসম্ভব নহে, তখন এক একটা খণ্ডকে ঐ ভাবে আনিয়া স্থূলীভূত করাই বা অসম্ভব হইবে কেন? কিন্তু খণ্ড খণ্ড করিয়া আনা অপেক্ষা সমগ্র গাছটা আনাই সহজ কাজ, তাহাতে বারে বারে শক্তি প্রেরিত হয় না। সহজ হইলেও সে কাজটা খুব শক্তি-সাপেক্ষ। যোলান্দীর আরও সূক্ষ্মদেহী অনুচর থাকারই সম্ভাবনা। তাহারা হয় তো ঐ গাছটিকে ঐরূপভাবে আনিয়া দিতেছিল; হয় ত তীব্রশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমগ্র গাছটিকে আনিয়া ফেলা তাহাদের সাধ্য হইতেছিল না, তাই ঐরূপ টুকরা টুকরা করিয়া আনিয়াছিল। আর আনিবার অন্ত হয় তো তাহাদিগকে বারে বারে আনা-গোনা করিতে হইতেছিল। গাছটির বর্দ্ধিত হইবার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, অনুচরেরা প্রথমে গাছটির শিকড়গুলিকে আনিয়া বোতলের বালির মধ্যে বিন্যস্ত করিল, জন্মস্থানে শিকড়গুলি যেমন যেমন ভাবে বিস্তৃত ছিল, বোতলের বালির মধ্যেও ঠিক তেমনই ভাবে বিন্যস্ত করিল। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে তাহারা গাছটির অপর অংশগুলি আনিয়া সংযুক্ত করিল। সর্ব্বশেষে ফুলটি আনিয়া ফেলিল। ব্যাপারটা যেন রঙ্গালয়ের অভিনয়ের মত অতীব সুন্দরভাবে চোখের উপর দিয়া হইয়া গেল।

ভারতবর্ষের যাদুকরেরা এই রকম কাণ্ড অনেক দেখায়। তাহারা সকলের সাক্ষাতে একটা আমের আঁটি বপন করে। তখনই গাছ হয়, সে গাছ তখনই বড় হয়, তাহাতে তখনই মুকুল হয়, তখনই আম হয়, আবার তখনই সে আম পাকে। চমৎকার কাণ্ড! এ রকম বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে

অস্বাভাবিক ;—হইতেই পারে না। আমাদের মনে হয়, সে কাণ্ডটাও যোলান্দীর এই ফুলগাছেরই মত। যাদুকর হয় ত স্থূল দ্রব্যকে সূক্ষ্মাকারে পরিণত করিয়া পুনরায় তাহাকে স্থূলীভূত করিবার কৌশল জানে। আর সেই কৌশলেই হয় তো অন্যস্থান হইতে সত্যকার গাছ ও আম লইয়া আনিয়া ফেলে। অসম্ভব কিছুই নহে। বোতলের মধ্যে ফুলগাছটাকে গুঁজিয়া দেওয়া খুব শক্ত হইলেও পরমাণুতে পরিণত করিলে উহাকে বোতলের মধ্যে আনিয়া ফেলা নিতান্তই সহজ। যোলান্দীর অনুচরেরা তাহাই করিয়াছিল। তাহারা গাছের শিকড়ের একটি একটি পরমাণু অতি সাবধানে বোতলের ভিজে বালির মধ্যে সাজাইয়াছিল। এরূপভাবে পরমাণু বিন্যাস করা খুবই কঠিন কার্য্য সন্দেহ নাই। ইহাতে খুবই হুঁসিয়ার হইবারও প্রয়োজন। তাই কাজটি সুসঙ্গতভাবে হইয়া গেলে যোলান্দীর মুখে খুব একটা গর্ব্বের ভাব দেখা দিয়াছিল। সুতরাং তাহার গর্ব্ব দেখিয়া আমাদের বিস্মিত হইবার কোন কারণই নাই। এরূপ শক্ত কাজে কৃতকার্য্য হইলে কে না গর্ব্ব করে?

মিঃ অকস্‌লী হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, গাছটা অস্থায়ী দৃশ্য, প্রেতের কৌশলে স্থূলীভূত হইয়াছে, পরক্ষণেই ভূতের দেহের মত মিলাইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার পর দেখিলেন, তাহা নহে, উহা সত্য সত্যই একটা গাছ, অদ্ভুত প্রাণালীতে আনিয়া হাজির করা হইয়াছে। তাই তিনি বাগানে রাখিয়া দিলেন। গাছটিও বেশ তিন মাস থাকিল আর স্বাভাবিক গাছেরই মত শুকাইয়া মরিয়া গেল। গরম দেশের গাছ ভয়ানক শীতের দেশে গিয়া পড়িয়াছিল, তাই শীঘ্রই মারা গেল; নচেৎ আরও অনেক দিন বাঁচিত সন্দেহ নাই। অকস্‌লী গাছটির যে ফটো লইয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ চিত্র তাঁহার পুস্তকে বিবরণের সঙ্গে প্রকাশ করিতে ভুলেন নাই। অকস্‌লী যে গোলাপের কথা বলিয়াছেন, তাহাও অস্থায়ী স্থূলীভূত দৃশ্য নহে। তাহাও আসল গোলাপ, ঐ ফুলগাছেরই মত সূক্ষ্মাকারে আনীত ও প্রকটিত। যে গোলাপ গাছ হইতে ছেঁড়া যায়, তাহা কখনই বাড়ে না।

কিন্তু অক্‌স্‌লী বলিয়াছেন, বুকে গুঁজা থাকার পরও বাড়িয়াছে, সুতরাং তাহা তখনও সূক্ষ্মাকারে আনীত, সংযোজিত ও প্রকটিত হইতেছিল।

অক্‌স্‌লীর পুস্তকের ৩২৬ পৃষ্ঠায় আর একটা গল্প আছে। সেটাও ঐ যোলান্দীরই কাণ্ড। সে গল্পটা আগেকার অপেক্ষাও অদ্ভুত, কিন্তু উপাখ্যান অংশটা প্রায় একইরূপ। অদ্ভুত এই জন্য যে, সেটাতে যোলান্দী গাছটাকে ধার করিয়া আনিয়া দেখাইয়াছিল। এই ধার করিয়া আনাটাই একটা নূতন ব্যাপার। শুধু আনা নহে, যোলান্দীকে আবার গাছটা ফিরাইয়াও দিতে হইয়াছিল। ব্যাপারটা এইরূপ :—

"মিঃ অক্‌স্‌লীর সাহায্যে যোলান্দী একটা ফুলের টবে খানিকটা বালি ও পাঁকমাটী মিশাইয়া রাখিল। তাহার পর 'ইক্‌সোরা ক্রোকেটা' উৎপাদনের সময় যেমন একটা কাপড় দিয়া বোতলটা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ এবারও টব্‌টা খুব পাতলা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিল।

"দেখা গেল, সাদা ঢাকা দেওয়া কাপড়খানি ধীরে ধীরে উঁচু হইয়া উঠিতেছে, উপরে যতই উঠিতে লাগিল, কাপড়খানিও ততই ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যোলান্দী কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। সেই পাতলা জালের মত আবরণটা যতই উপরে উঠিতেছিল, যোলান্দীও হাত দিয়া তাহা সরাইয়া দিল। শেষে সেটা তাহার নিজের অপেক্ষাও খুব উঁচু হইয়া উঠিল। তখন যোলান্দী বেশ সাবধানতার সঙ্গে কাপড়খানি উঠাইয়া লইল; দেখা গেল, লম্বা গাছ পুষ্পগুচ্ছের ভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে, আর সেই বড় পুষ্পগুলি হইতে খুব তীব্র সুগন্ধ বাহির হইতেছে।

তখনই গাছ ও ফুলের বিবরণ লিখিয়া লইলাম। গাছটি শিকড় হইতে মাথা পর্য্যন্ত সাত ফিট্ লম্বা, আমার অপেক্ষা প্রায় দেড় ফুট্ উঁচু। গাছটির মাথায় এগারটা বড় বড় ফুল, সেই ফুলের ভারে গাছট বাঁকিয়া পড়িয়াছে, তবুও আমার অপেক্ষা উঁচু। ফুলগুলি খুব সুন্দর, উহাদের ব্যাস ৮ ইঞ্চি। পাঁচটি একেবারে প্রস্ফুটিত, তিনটি স্ফুটোন্মুখ, আর তিনটির কোরক অবস্থা। সবগুলিই নিখুঁত ও শিশির-সিক্ত। ফুলগুলি বেশ

মনোরম। কিন্তু উহাদের তীব্র গন্ধে আমি কেমন একরূপ অসুস্থ বোধ করিতেছিলাম।

"যোলান্দী এই ফুল প্রকটিত করিয়া বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিয়া শেষে আমাদিগকে বলিল—'যদি তোমরা ইহার ফটো লইতে চাও, তবে এখনই লও, কারণ, আমি এটাকে আবার এখনই লইয়া যাইব।' সে ইহার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন মিঃ বট্লারফ্ গাছটির ও যোলান্দীর দুইবার ফটো তুলিয়া লইলেন।"

এই গাছটির নাম—"লিলিয়ম্ অরেটম্।" এটি জাপানের ফুল। এই ফুলের বর্ণ ঠিক্ স্বর্ণের মত। ১৮৯০ খৃঃ ২৮শে জুন তারিখের বৈঠকে এই জাপানী ফুলের আবির্ভাব-ব্যাপার ঘটিয়াছিল। উপরে যে ফটোর কথা বলা হইল, তাহার অনুরূপ চিত্র ও বিবরণের সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই চিত্র দেখিলেই বুঝা যায় যে, ঐ পুষ্প বড়ই মনোরম।

যোলান্দী নিজেও স্থূলমূর্ত্তিধারিণী প্রেতিনী। এই যোলান্দী ঐ ফুলটি বার করিয়া আনিয়াছিল; আর যাহার ফুল, তাহাকে যথাসময়ে দিতে না পারিয়া খুব অস্থির হইয়া পড়িল। জাপান হইতে ফুলটিকে আনিয়া বৈঠকে ফুটাইয়া তুলিতে তাহার যথেষ্ট শক্তির ক্ষয় হইয়াছিল; তাই যথাসময়ে ফিরাইতে পারিল না। শক্তিতে আর কুলাইল না। যথাসময়ে ফুলগাছটি ফিরাইতে পারিল না বলিয়া যোলান্দী বিষণ্ণ হইয়া বৈঠকের বন্ধুবর্গকে বলিল—'আপনারা এই গাছটি সাবধানে রাখিবেন।' তাঁহারাও প্রাণপণ যত্নে ঐটিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে দেখা গেল—গাছটি বিবর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এক দেশের গাছ অন্য দেশে গিয়া উঠিয়াছে; সুতরাং বিবর্ণ হওয়াটা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তাহার পর সাত দিনের অন্তে যোলান্দী গাছটাকে সূক্ষ্মাকারে লইয়া গিয়া যাঁহার গাছ তাঁহাকে দিল। বায়ুমণ্ডল অনুকূল না থাকায় যোলান্দী সাত দিনের মধ্যে গাছটিকে লইতে পারে নাই। পাঠকের নিশ্চয়ই জানিতে ইচ্ছা হয়, গাছটির হঠাৎ তিরোভাব দেখিয়া উহার মালিক না জানি কতই বিস্মিত হইয়াছিলেন। চোর

ধরিবার জন্য না জানি তিনি কত চেষ্টাই করিয়াছিলেন। আবার উহার আকস্মিক আবির্ভাবেও না জানি তাঁহার কত বিস্ময়ই হইয়াছিল!

বায়ুমণ্ডলের অনুকূলতা-প্রতিকূলতার একটা কথা বলা হইয়াছে। বায়ুমণ্ডল নিরন্তরই স্পন্দিত হইতেছে; বৈদ্যুতিক প্রবাহ সেখানে নিরন্তরই ছুটিতেছে। ঐ স্পন্দন ও বিদ্যুৎপ্রবাহের যখন আলোড়ন-বিলোড়ন বেশী বেশী হয়, তখন স্থূল দ্রব্যকে সূক্ষ্ম করা বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে একটা স্থূল দ্রব্যকে আকারিত করিয়া তোলা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করা যায় না। তীব্র আলোক-স্পন্দনে যেমন ভূতেরা স্থূল শরীর ধরিতে পারে না, স্পন্দনে সেই দেহ ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ বায়ুমণ্ডলের তাড়িতের তীব্র স্পন্দনেও ঐরূপটা ঘটে। তাই যোলান্দী গাছটিকে হাওয়ায় পরিণত করিয়া লইয়া যাইতে পারিল না—কেন না, উহার পরমাণুগুলিকে যে ভাবে লইয়া গেলে পুনরায় গাছের আকারে আকারিত করা যায়, তীব্র বৈদ্যুতিক স্পন্দনে সে ভাবটা—পরমাণুর সে বিন্যাসটা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল।

পরমাণুতে পরিণত করিয়া আবার তাহাকে স্থূল আকারে আনিয়া একটা স্থূল জিনিসকে লইয়া যাওয়া-আসা করা অপেক্ষা চতুর্থ পরিমাপের দিক্ দিয়া উহাকে স্থানান্তর করা কার্য্যটাই আমাদের খুব সহজ বলিয়া বোধ হয়। যোলান্দীর কার্য্যপ্রাণালীতে মনে হয়, সে ঐ পন্থা অবলম্বন করে নাই; তাহা হইলে জিনিস অত আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হইত না। কিন্তু স্থূল জিনিসের আবির্ভাব-তিরোভাব-ব্যাপারে খুব বেশী সময় চতুর্থ পরিমাপের কাণ্ডটাই মনে আইসে। কোন একটা কিছু করিবার পক্ষে নানাবিধ উপায় থাকিতে পারে। কোন্ উপায়টি যে অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা মাত্র লিখিত বিবরণ পড়িয়া ঠিক্ করিয়া উঠা কঠিন।

স্থূল দ্রব্যকে সূক্ষ্মাকারে আনা যায়, আবার চতুর্থ পরিমাপের দিক্ দিয়াও অন্যের অলক্ষিতভাবে আনিয়া ফেলা চলে। এ ভাবের আর একটি বিবরণও দেখিতে পাওয়া যায়। এ রকম ব্যাপার লোহের অঙ্গুরী লইয়া

ঘটিয়াছিল। লেড্‌বিটারও তিনবার এরূপ ঘটনা দেখিয়াছেন। একটী নিরেট লোহার আংটী, এত ছোট যে, কোনরূপেই তাহার মধ্য দিয়া হাত যাইতে পারে না, অথচ তাহার ভিতর দিয়া হাত চলিয়া গেল। তাহার পর এমন আঁটিয়া গেল যে, সেটাকে খুলিয়া ফেলা মানুষের অসাধ্য, না ভাঙ্গিয়া কিছুতেই খোলা যায় না, এমন অবস্থা। কিন্তু ভূতের সাহায্যে দিব্য সুন্দরভাবে খুলিয়া গেল। লেড্‌বিটার এইরূপ বলেন—"আমি মিডিয়মের হাত ধরিয়া আছি অথচ একখানা চেয়ারের পিঠের দিক্‌টা আমার হাতের উপর আসিয়া শূন্যে ঝুলিয়া থাকিল, এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে। এক দিন খুব একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলাম। আমার সম্মুখে একখানা চেয়ার আসিয়া ঝুলিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর চেয়ারখানা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া বে-মালুম মিলাইয়া গেল, মিলাইতে না মিলাইতেই আবার আমার পিছনে ফুটিয়া উঠিল, মনে হইল, স্থূল চেয়ারখানি সূক্ষ্মাবস্থায় আমার শরীরের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। কি অদ্ভুত ব্যাপার!"

একটি স্থূল জিনিস কখনও কখনও ঠিক্ দুইটা হইয়া পড়ে, বৈঠকে এরূপ কাণ্ডও দেখা যায়, কিন্তু এরূপ ব্যাপার খুব বিরল। একটি স্থূল জিনিসকে দুইটি করিবার সময় প্রকৃত জিনিসটির আকার তীব্রভাবে চিন্তা করা হয়। তাহাতে মানস-স্তরে একটা সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি গঠিত হইয়া পড়ে, তাহার পর সেই মূর্ত্তির সঙ্গে স্থূল-জগতের জড়পরমাণুর সমাবেশ করা হয়। এরূপ করিবার সময় আসল জিনিসটির অন্তর-বাহির সকল দিক্‌টাই যুগপৎ চিন্তা করিতে হইবে। সেরূপ করাটা খুব সহজ নহে। কারণ, যে ঐরূপ করিতে চেষ্টা করে, তাহার খুব বেশী চিন্তার একাগ্রতা আবশ্যক হয়। যাঁহারা ব্যোম-সমুদ্র হইতে স্থূল জড়পরমাণু আকর্ষণ করিয়া লইতে অসমর্থ, তাঁহারা যে জিনিসটির প্রতিমূর্ত্তি গড়িতে চান, সেই জিনিসটি হইতেই ঐ পরমাণু টানিয়া লয়েন। এরূপ ক্ষেত্রে কাজে কাজেই তখন জিনিসটির ওজন কমিয়া যায়।

একটা আগুনের কাণ্ড

ভূতের বৈঠকে অন্য একরূপ অদ্ভুত ব্যাপারও ঘটে। কিন্তু সেরূপ কাণ্ড খুব বেশী ঘটে না। ব্যাপারটা এই যে, ভূতে জ্বলন্ত আগুন হাতে আনিয়া দেয়, অথচ তাহাতে হাত পুড়ে না। লণ্ডনের এক বৈঠকে এক দিন দেখা গেল, একটা ভূত মূর্ত্তি ধরিয়া হাজির। তাহার পর সে একটা জ্বলন্ত অগ্নি-কুণ্ডের মধ্যে একখানি হাত প্রবেশ করাইয়া একখানা লাল গন্‌গনে জ্বলন্ত আগুনের ডেলা লইয়া আসিল। আগুনের ডেলাটা ছোট নহে, টেনিশ বলের মত অত বড়। তাহার পর লেড্‌বিটারকে বলিল,—"ধর ধর, তোমার হাতে একটু লও।" জ্বলন্ত আগুন লইতে সকলেই ভাবনা-চিন্তা করে, লেড্‌বিটার ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু ভূতটা জিদ করায়, তাড়াতাড়ি করায় যা কপালে থাকে, লইয়া ফেলি, হাত না পুড়িতেও পারে, আর নেহাৎ গরম লাগিলে ফেলিয়া দিলেই হইবে—এই ভাবিয়া তিনি হাত পাতিলেন। ভূতও সেই টক্‌টকে আগুনের ডেলাটা তাঁহার হাতে দিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, আগুনটাকে কিছুমাত্র গরম বলিয়া বোধ হইল না। লেড্‌বিটার ভাবিতেছেন, এ কি প্রকার ঠাণ্ডা আগুন। ঠিক তখন ভূতটা এক খণ্ড কাগজ উহার উপর দিল, আর কাগজের টুক্‌রাটা দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। লেড্‌বিটার প্রায় দেড় মিনিটকাল আগুনের ডেলাটা হাতে ধরিয়া ছিলেন, তাহার পর তেজ কমিয়া আসিল। তখন দ্রুত ঐটিকে কুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে বলিল। লেড্‌বিটারও তাহাই করিলেন। পরে তিনি হাতের দিকে চাহিয়া দেখেন, হাতে একটু দাগও হয় নাই, একটুও পোড়া গন্ধ হয় নাই, কেবল সামান্য একটু ছাই লাগিয়া আছে মাত্র।

এ ব্যাপারটিতে আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? লেড্‌বিটার বলিয়াছেন—"ঐ কাণ্ডের কিছুই আমি সে সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বৈঠকের ভূতেরাও কিছু বুঝাইয়া দিল না। তাহার পরে বহু দিন ধরিয়া গুপ্তবিদ্যার আলোচনার ফলে বুঝিয়াছি যে, ব্যোম পদার্থের সূক্ষ্মতম স্তরটি

এরূপভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেওয়া যায় যে, তাহার ভিতর দিয়া আগুনের তাপ আসিতে পারে না। আমার বিশ্বাস, ভূতটা ব্যোম পদার্থের ঐরূপ একটা পরিবর্ত্তিত পর্দ্দা দিয়া আমার হাতটা ঢাকিয়া দিয়াছিল, কারণ, তাহার পক্ষে ঐরূপটি করা খুবই সহজ। ভূত কিরূপ করিয়া ঐ অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটাইল, জানি না, তবে ঘটনাটি খাঁটি সত্য।"

অলৌকিক ক্ষমতা বা সিদ্ধি যাঁহারা কিছু কিছু লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছামাত্র আগুন উৎপন্ন করিয়া ফেলিতে বা আগুনের দাহিকা-শক্তির বিলোপ ঘটাইতে পারেন। কোথাও কিছু নাই অথচ আগুন আপনা-আপনি জ্বলিয়া উঠিল। এরূপ ব্যাপার বেড্‌বিটার সাহেব নিজেও একবার দেখিয়াছেন। "পারিবারিক ভূতের কাণ্ড" নামক পুস্তকে মিঃ মরেল থিওবল্ড ঐরূপ ব্যাপারের অনেকগুলি বিবরণ দিয়াছেন। তিনি না কি ঐরূপ ব্যাপার বিস্তরই দেখিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীর মৃত আত্মীয়দিগের প্রেতাত্মা না কি অনেক কাজ-কর্ম্ম করিয়া থাকেন। প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া, আগুন জ্বালিয়া দেওয়া, এ সব কাজ না কি তাঁহাদের প্রাত্যহিক ব্যাপার। স্কটল্যাণ্ডে এক শ্রেণীর পরী আছে, তাহারাও না কি গৃহস্থের বাড়ীতে প্রদীপ জ্বালা প্রভৃতি কার্য্যগুলি করিয়া দেয়। তাহাদের বিশেষ বিবরণ আমরা জানি না বলিয়া কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

অগ্নি-উৎপাদন

লেড্‌বিটার বলিয়াছেন—"ইংলণ্ডের একটা বৈঠকে আমি ভূতের আগুন তৈয়ার করা দেখিয়াছি। বৈঠকে আমরা বসিয়া আছি, এমন সময় শব্দ হইল, তাহাতে বুঝিলাম, টেবিলের উপর বড় একখানি রেকাবী রাখিয়া তাহার উপর কতকগুলি সিগারেটের ভাঙ্গা বাক্স ও আগুন ধরিবার মত কিছু হালকা দ্রব্য আমাদিগকে রাখিতে হইবে। আমরা সেইরূপ রাখিলাম। তাহার পর সঙ্কেত অনুসারে আমরা ঘর হইতে আলো অপসৃত করিয়া গান করিতে লাগিলাম। ঘরে ঘোর অন্ধকার। অল্প

টেবিলের চারিদিকে হাত ধরাধরি করিয়া বসিয়া গান করিতে লাগিলাম ; অনুমান আধ ঘণ্টা হইবে (বরং কিছু কমই হইবে) কাটিয়া গেল। এমন সময় একটা অদ্ভুত রকমের গাঢ় লাল আগুন সেই স্তূপীকৃত ভাঙ্গা বাক্স-গুলির মধ্যে দেখা দিল। আগুনটা কখনও বাড়িতে লাগিল, কখনও কমিতে লাগিল, এইরূপ হইতে হইতে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমাদিগের মধ্যে কেহই উহা স্পর্শ করে নাই আর এরূপভাবে জ্বলিয়া উঠিল যে, কেহ দেশলাই জ্বালিয়া আগুন করিয়া দিল, এরূপ ধারণাও আসিতে পারে না।

লেড্‌বিটার বলেন—তাপ ব্যোম কম্পন ছাড়া আর কিছুই নহে। যেরূপ কম্পন বা স্পন্দনে আগুন হইতে পারে, ভূতেরা যদি সেই স্পন্দন ঘটায়, তবে আগুন আপনা-আপনি জ্বলিয়া উঠে, তাহাতে বিচিত্র কি ? আর উপরের ঘটনাতেও সম্ভবতঃ তাহাই হইয়াছিল। আবার অন্যরূপ ধারণাও করা যাইতে পারে। হয় তো চতুর্থ মাপের দিক্ দিয়া ভূতেরা আমাদের অলক্ষ্যভাবে কোন স্থান হইতে আগুনের একটা ফুলকি আনিয়া ঐ ভাঙ্গা বাক্সের মধ্যে ফুঁ দিয়া উহাকে জ্বালিয়া দিল। কিংবা এমনও হইতে পারে যে, ভূতেরা রাসায়নিক দ্রব্য আনিয়া রাসায়নিক প্রণালীতে আগুন করিয়া ফেলিল। পল্লীর দেবতা হইয়া পল্লীবাসীদিগকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে আগুন জ্বালিয়া গ্রাম ছারখার করিয়া দিলেন, এমন ভূরি ভূরি গল্প ভারতবর্ষে শুনা যায়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, যিনি সূক্ষ্মজগতের ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী, অগ্নি উৎপাদন করিয়া তোলা তাঁহার পক্ষে আদৌ কঠিন নহে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ভূত মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়

ভূত তিন রকমে স্থূল-মূর্ত্তি ধরে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মূর্ত্তি ধরিয়া কাজ করে, অথচ মূর্ত্তিটা দেখা যায় না, এই প্রকারের কথা আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছি। এখন অন্য দুই প্রকারের কথা বলিব। ভূত ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা মূর্ত্তিতে আইসে—এইটি দ্বিতীয় প্রকার। ভূত পরিস্ফুট মূর্ত্তিতে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলে—এইটি তৃতীয় প্রকার। ভূত যখন দ্বিতীয় প্রকারে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়, তখন তাহার সে দেহটা স্পর্শ করিলে কোন একটা স্থূল জিনিস স্পর্শ করিলাম বলিয়া বোধ হয় না। তাহা ছাড়া সে দেহটা খুব স্বচ্ছ—তাহাতে আলোকের অবরোধ ঘটে না। দেহটার ওদিকে যে জিনিস-পত্র আছে, তাহা এদিক্ হইতে দেখা যায়। স্বচ্ছ হইলেও, যখন পূর্ণ মূর্ত্তিটি ধরে, তখন তাহাকে জীবিত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। মূর্ত্তিটি একেবারে অবিকল। এইরূপ ঝাপ্‌সাভাবে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেওয়া প্রায়ই ঘটে। এরূপ ঘটনা খুব বেশী বেশী দেখা যায়। সাধারণতঃ ভূতেরা মূর্ত্তি ধরিয়া মানুষকে দেখা দিতে চাহে না। মানুষের কাছ হইতে তফাৎ থাকিবার চেষ্টা করে। তাহা হইলেও এক দিন একটা ভূত ঝাপ্‌সা মূর্ত্তি ধরিয়া বৈঠকে আসিয়া লেড্‌বিটারকে বলিয়াছিল—"তুমি আমার শরীরের ভিতর দিয়া তোমার হাত আস্তে আস্তে পরিচালন কর।" লেড্‌বিটার সেইরূপ করিলেন; কিন্তু তাঁহার হাতে কোনরূপ কিছু শক্ত পদার্থ ঠেকিল না, যেন শূন্যের মধ্য দিয়া হাত লইয়া গেলেন। হাতে কিছুই ধরিতে পারিলেন না দেখিয়া ভূতটা দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। লেড্‌বিটার

লিখিয়াছেন—"স্পষ্ট মূর্ত্তিতে ভূতটা আমার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, আমিও উহার গায়ের ভিতর হাত চালাইয়া দিলাম অথচ চোখ বুজিয়া অনুভব করিতে পারিলাম না যে, হাতখানি উহার দেহের বাহিরে রহিয়াছে কি ভিতরেই আছে। গাঢ় স্থূল-মূর্ত্তি ধরা অপেক্ষা এইরূপ ঝাপ্‌সা মূর্ত্তি ধরা ভূতের পক্ষে সহজ; স্থূলমূর্ত্তি ধরা বেশ একটু কঠিন। আমি উহার বেশ ভাল প্রমাণও দুই একবার পাইয়াছি। ভূত মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইলে দেখিলাম, তাহার সমস্ত অংশ নিরেট হয় নাই, খানিকটা মাত্র নিরেট করিতে পারিয়াছে, সমস্তটা ঐরূপ করিয়া ভূত আসিয়া অনেক সময় বজ্রমুষ্টিতে করমর্দ্দন করে; সে স্থলে সেই করতলটা নিরেট-ভাবে গঠিত হয়। কিন্তু করতলের উপরের অংশটা নিরেট থাকে না, সে সব অংশ ঝাপসা ও পাতলা পাতলা থাকে। তাই বলিতেছি, সমস্ত অংশটা নিরেট করিয়া তোলা মহাশক্ত ব্যাপার। অন্যান্য অংশটা নিরেট না হইলেও আমাদের চোখে তাহা নিরেট বলিয়া মনে হয়।" স্যর উইলিয়ম্ ক্রুক্স তাঁহার 'গবেষণা' নামক পুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠায় এই দ্বিতীয় প্রকারের দেখা দেওয়া বিষয়ের বিবরণ দিয়াছেন। বিবরণ এইরূপ :—

ছায়া-মূর্ত্তি

ক্রুক্স বলিতেছেন—"এক দিন সন্ধ্যাকালে আমার নিজের বাড়ীতে আমি বৈঠকে বসিয়াছি; মিঃ হোম্‌ও আমার কাছে আছেন; সন্ধ্যা বেশ ঘোর হইয়া আসিয়াছে। দেখিলাম, জানালার পর্দ্দা নড়িতেছে। পর্দ্দাটা মিঃ হোমের নিকট হইতে প্রায় ৮ ফিট্ দূরে ছিল। পর্দ্দার নড়া-চড়া দেখিয়া আমরা সকলেই সেই দিকে চাহিলাম; দেখিলাম—একটা কাল ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়াইয়া পর্দ্দাটা ধরিয়া নাড়িতেছে! মূর্ত্তিটা খুব নিবিড় নহে, অর্দ্ধ-স্বচ্ছ ভাবের, আর সেটা মানুষের অবয়ববিশিষ্ট। আমরা সকলে সেই দিকে চাহিলে অল্পসময়ের মধ্যেই মূর্ত্তিটা মিলাইয়া গেল,

পর্দ্দাটার নড়া-চড়াও বন্ধ হইল। ইহা অপেক্ষাও আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিতে দেখিয়াছি। তখনও মিঃ হোম্ আমাদের দলে মিডিয়ম্ ছিলেন। দেখিলাম—বৈঠকের ঘরের এক কোণ হইতে একটা ছায়া-মূর্ত্তি আসিল ; আসিয়া, একটা বাদ্য-যন্ত্র লইয়া বাজাইতে বাজাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমাদের সকলেই অনেকক্ষণ ধরিয়া ঐ মূর্ত্তিটিকে দেখিতে পাইল। আমাদের ঘরেই একটু দূরে এক জন মহিলা ছিলেন। সেই ছায়া-মূর্ত্তিটি তাঁহার কাছে যাইয়া হাজির। তাহার পর অস্ফুট স্বরে কি একটা-বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইল।"

যাঁহারা সিদ্ধপুরুষদিগের শিষ্য হইতে পারিয়াছেন, সূক্ষ্মজগৎ-সুলভ ক্ষমতা অনেকটা তাঁহাদের আয়ত্ত। তাঁহারা বিশেষ সময়ে বিশেষ কারণে স্থূলমূর্ত্তির আবির্ভাব ঘটাইয়া থাকেন। হাওয়া হইতে একটা স্থূলমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিবার সময় তাঁহারা ব্যোম-সমুদ্র হইতে আবশ্যকমত পরমাণু-পুঞ্জ আকর্ষণ করিয়া ঐরূপ মূর্ত্তির সৃষ্টি করেন। তাহাতে অন্য কোন দেহীর অনিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু বৈঠকে যে সকল স্থূলমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে, তাহাদের গঠন-প্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার, তাহাদের দেহ ব্যোম হইতে সংগৃহীত হয় না। মিডিয়মের দেহ হইতে তখন ভূতেরা স্থূল জড়াংশ আকর্ষণ করিয়া দেহ রচনা করে। কারণ, সেইটাই তাহাদের পক্ষে সহজ পথ। ভূতেরা মিডিয়মের দেহ হইতে জড়াংশ টানিয়া লইতেছে, আর জড়াংশগুলি ধূঁয়ার মত হইয়া মিডিয়মের দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে—এই অদ্ভুত কাণ্ডটাও অনেক সময় দেখা যায়। মিঃ ডব্লিউ ইংলিন্‌টন্ "উভয় জগতের সংযোগ" নামক একখানি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক লিখিয়াছেন। মিডিয়মের দেহ হইতে সকলের সমক্ষে জড়াংশ চলিয়া যাইবার বিবরণ ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। পরমাণু এত নিবিড়ভাবে বাহির হইয়াছিল যে, সেগুলিকে খুব গাঢ় ধূঁয়ার মত দেখাইয়াছিল ; আর তখন মিডিয়ম্ একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে তখন পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

ঐ ধুঁয়ার মত পরমাণুপুঞ্জ শীঘ্রই জমিয়া ঘনীভূত হইয়া, একটা মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়ায়। মূর্ত্তিটা অনেক সময় মিডিয়মের সেই দেহেরই অনুরূপ হইয়া উঠে; যেন তাহারই সূক্ষ্মমূর্ত্তি বলিয়া দেখায়। লেড্‌বিটার বলেন —"আমি এরূপ একটা ব্যাপার দেখিয়াছি। এক দিন আমি একটা বৈঠকে সুবিখ্যাত মিডিয়ম মিঃ সিসীল্ হস্‌কের সঙ্গে বসিয়া আছি, বসিয়া ভূতের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় দেখি, একটা তীব্র আলোক জ্বলিয়া উঠিল, এত আলো যে, ঘরের মধ্যস্থ সব জিনিসই পরিষ্কাররূপে দেখা যাইতে লাগিল। দেখা গেল, সে সময় মিডিয়ম্ একখানি চেয়ারে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছেন। তিনি কেমন একরূপ অস্বাভাবিকভাবে অভিভূত, নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছেন। কিন্তু ঠিক তাঁহার সম্মুখে একেবারে অবিকল তাঁহারই একটা মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; মূর্ত্তিটি সজীব, সচল! আর তাহার হাতের উপর ডিমের মত গড়নের কি একটা পদার্থ। সেই পদার্থটা হইতে ঐরূপ তীব্র আলোক বাহির হইতেছিল। মূর্ত্তিটি খানিকটা সময় ঐরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর আলোটা হঠাৎ নিভিয়া গেল। তাহার পর ভূতটা পরিচিত স্বরে কথা বলিতে লাগিল। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, সে মিডিয়মেরই দেহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেখা দিয়াছিল।"

ভূতেরা দেখা দিবার সময় যে অস্থায়ী দেহ গড়িয়া লয়, তাহা যে মিডিয়মেরই ব্যোম অংশ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্যোম অংশ যেমন গ্রহণ করে, স্থূল ও তরল পদার্থও উহারা সেইরূপভাবে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে। সে ব্যাপারটা কেমন করিয়া পারে, তাহা বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে খুব শক্ত হইলেও উহারা সত্যই তাহা পারে। স্থূল অংশ ভূতে মিডিয়মের শরীর হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, এরূপ ব্যাপার লেড্‌বিটার নিজেও দেখিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে মিডিয়মের দেহের ওজনও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া পড়ে। তাহা ছাড়া তখন মিডিয়মের স্থূল দেহটাও কেমন একরূপ বিশ্রী হইয়া যায়, স্থানে স্থানে থুবড়াইয়া পড়ে, কুঁচকাইয়া

যায়, এইরূপ কাণ্ড হয়। যখন ভূতেরা মিডিয়মের দেহ হইতে ঐরূপভাবে স্থূল, নিরেট, তরল পদার্থ আকর্ষণ করিয়া লয়, তখন মিডিয়ম্ যাহাতে লোকের চক্ষুতে না পড়ে, সেইরূপ চেষ্টা করে। এ অবস্থায় সকলে মিডিয়মকে না দেখে, সেই ভাল। কারণ, তখন তাহার চেহারা বড়ই বিশ্রী হইয়া পড়ে, সে চেহারা দেখিলেই সকলেরই মনে তাহার জীবন সম্বন্ধে একটা ঘোর আশঙ্কা আসিয়া পড়ে। সে একটা কিম্ভূত রকমের মূর্ত্তি! যাহারা সহজে আকুল বা ভীত হয়, এরূপ ব্যক্তি মিডিয়মের সে মূর্ত্তি দেখিলে বাস্তবিক চঞ্চল হইয়া পড়ে।

কর্ণেল অল্‌কট্ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ২৪৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ ব্যাপারের একটা বিবরণ লিখিয়াছেন। গ্রন্থের নাম "সূক্ষ্ম-জগৎ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তি।" একটা প্রেতিনী মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া অল্‌কটের কাছে হাজির হয়। বলিল—আমার নাম "হণ্টু।" অল্‌কট তাহাকে ওজন করিয়া দেখিলেন, সে কতটুকু ভারী। হণ্টুর চেহারা দেখিয়া মনে হইল, সে আমেরিকা-বাসিনী একটি বালিকা। ওজন করিলে দেখা গেল, তাহার ওজন ৮৮ পাউণ্ড। কর্ণেলের অনুরোধে সে তৎক্ষণাৎ নিজের দেহভার কমাইয়া ফেলিল; তখন দেখা গেল, ওজন ৫৮ পাউণ্ড; তাহার পর ওজন বাড়িয়া ৬৫ পাউণ্ড উঠিল। এতটা হ্রাসবৃদ্ধি সবই ১০ মিনিট কালের মধ্যেই ঘটিল। এই হ্রাস-বৃদ্ধির সময়ে তাহার পরিচ্ছদের কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। হণ্টুর মূর্ত্তি যখন এইরূপভাবে ওজনে বাড়িতেছিল, তখন মিডিয়মের দেহের ওজনও সেই অনুপাতে কমিতেছিল। ইহাতে মনে হয়, সে মিডিয়মের দেহ হইতে স্থূল জড়াংশ আকর্ষণ করিয়াছিল।

ঐ পুস্তকেরই ৪৮৭ পৃষ্ঠায় আর একটি কাহিনী আছে। কর্ণেল "কেটী ব্রিঙ্ক" নামে একটা স্থূলীভূত প্রেত-দেহেরও ওজন করিয়াছিলেন। এটাও প্রেতিনী; প্রথম ওজনে দেখা গেল, দেহটি ৭৭ পাউণ্ড। পরক্ষণেই সে, আবার তখনই ৫২ পাউণ্ড হইয়া পড়িল। অথচ এইরূপ ব্যাপারে দেহের বাহ্য পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র দেখা গেল না। এই ব্যাপারের সময় একটা

অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। যখন কেটী ব্রিঙ্কের ওজন চলিতেছিল, তখন কর্ণেল দেখিলেন যে, মিডিয়ম্ লোকটা অন্তর্দ্ধান হইয়াছে! কর্ণেল মিডিয়মকে তাহার চেয়ারে কার্পাস-সূত্রের শক্ত দড়ি দিয়া বেশ করিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। দড়ি না ছিঁড়িয়া মিডিয়মের যাইবার উপায় ছিল না। অথচ দেখিলেন—মিডিয়ম নাই! কর্ণেল যে শুধু বাঁধিয়াই রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে। বেশ সাবধান হইয়া সেই বাঁধনের উপর নিজের সীল-মোহরও করিয়াছিলেন। কোন প্রকার প্রতারণা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। একটা নির্জ্জন গৃহের মধ্যে মিডিয়ম্‌কে ঐরূপভাবে রাখা হইয়াছিল। কর্ণেল বৈঠকের কাজ চলিতে চলিতে একবার সেই নির্জ্জন কক্ষে মিডিয়ম্‌কে দেখিতে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন—চেয়ার শূন্য! মিডিয়ম্ নাই! তখন তিনি চেয়ারের উপরে ও চারিদিকে হাত চালনা করিয়া দেখিলেন, কিছুই হাতে ঠেকিল না। ফিরিয়া বৈঠকে আসিলেন। বৈঠকের অন্তে আবার ঘরে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন, মিডিয়ম্ পূর্ব্বাবস্থায় বন্ধনদশাগ্রস্ত হইয়া চেয়ারে পড়িয়া আছে। দেখা গেল, তাহার অর্দ্ধমূর্চ্ছার ভাব, একেবারে অভিভূত অবস্থা! কিন্তু বাঁধন ও শীল-মোহর সম্পূর্ণই ঠিক আছে! বাস্তবিকই বিস্ময়জনক ব্যাপার। বিস্ময়জনক হইলেও এরূপ ঘটনা অনেক ঘটে। (এম্ এ, আক্‌শাকো প্রণীত "ভূতের অন্তর্দ্ধান" নামক গ্রন্থ দেখ।)

ভূতে যে সময় মিডিয়মের দেহ হইতে জড়াংশ আকর্ষণ করিয়া লয়, তখন উহা মিডিয়ম্-দেহের পার্শ্বদেশ হইতে বহির্গত হয়। আবার কখন কখন সমগ্র দেহটার উপর হইতেই বাহির হইতে থাকে। ঠিক যেন আকর্ষণ করিয়া বা শোষণ করিয়া লইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ম্যাডাম্ ই, ডি, এস্‌পারান্স ঐ জড়াংশ-নির্গমনের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"তাহার পর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হইতে লাগিল। আরও অনেক বৈঠকে আমার কখন কখন ঐরূপ অনুভূতি ঘটিয়াছিল। অনেকের মুখে অনেকবার শুনিয়াছিলাম, অনুভূতিটা ঠিক যেন মাকড়সার জাল মুখের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার মত। কিন্তু আমার অন্যরূপ বোধ হইল

আমার মনে হইতে লাগিল, আমার শরীরের প্রতি লোমকূপ দিয়া খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূতা কে যেন টানিয়া বাহির করিতেছে।" (ছায়ারাজ্য ২২৯ পৃষ্ঠা।)

ম্যাডাম্ ডি এস্পারান্স

অনেক মিডিয়মই তাঁহাদের নিজের নিজের জীবন-চরিত নিজেরাই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু লেড্ বিটার বলেন, ম্যাডাম্ ডি এস্পারান্সের জীবনটাই সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়। বইখানি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনই সত্য ঘটনাপূর্ণ। তাহা ছাড়া গ্রন্থকর্ত্রী নিজে খুব চতুরা বলিয়া সকল ঘটনাই বেশ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছেন। সাধারণ মিডিয়মদিগের ঐরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেখা যায় না। সত্যের অনুসন্ধান করাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে কোন্ স্থানে সত্য নিহিত আছে, সেইটুকুই তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতেন।

কোন একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিলেই তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সেইটার আলোচনা করিয়া তাহা হইতে সত্য খুঁজিয়া বাহির করিতেন। এস্পারান্স যথেষ্ট সুখ্যাতির পাত্রী হইলেও তাঁহার একটা ত্রুটি ছিল। তিনি "থিওসফি" সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করেন নাই। ভূতের কাণ্ড-কারখানা তিনি খুব সাহসের সঙ্গে, খুব দৃঢ়তার সহিতই পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। বিস্তর ক্লেশ পাইয়া এক একটা বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু "থিওসফির" পুস্তকাবলী পড়া থাকিলে তাঁহার ঐ সব ব্যাপার বুঝিতে এত ক্লেশ হইত না। থিওসফি না পড়ায় তাঁহাকে নিরর্থক যাতনা ও উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুস্তকপাঠ করিলেই জানা যায় যে, তাঁহার বাল্যজীবনে এমন সকল ঘটনা ঘটিত, যাহা শুনিলে বাস্তবিকই প্রাণে ব্যথা লাগে। ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গোঁড়ামি বিদূরিত হইতে লাগিল, ক্রমে তাঁহার পারলৌকিক জ্ঞান বৃদ্ধি হইল। কিন্তু অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়া মিডিয়ম্ হইয়া উঠিতে তাঁহাকে যথেষ্ট মানসিক উৎকণ্ঠা, অনেক উদ্বেগ পোহাইতে হইয়াছিল। যখন তিনি পরিস্ফুট মিডিয়ম্ হইয়া

উঠিলেন, তখন তাঁহার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানৈশ্বর্য্য অতীব চমৎকার হইল। তাঁহার সম্বন্ধে এমন সব ব্যাপার ঘটিয়াছিল যে, তাহা শুনিলে সাধারণ শ্রেণীর লোকে তাহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না। তিনি যে সব অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্ভবপর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, লেড্‌বিটার সেরূপ ঘটনা নিজেও ঘটিতে দেখিয়াছেন। লেড্‌বিটার তাঁহার কোন বর্ণনাই অতীব অসম্ভব বলিয়া মনে করেন না।

মিডিয়মের দেহাংশ লইয়াই ভূতের স্থূল-শরীর গঠিত হয়। সুতরাং স্থূলীভূত প্রেতদেহের সঙ্গে মিডিয়মের দেহের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এস্‌-পারান্স এই সম্পর্কটা খুব প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন; তাই বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি উহার বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা সকলেই দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন। আমরা আমাদের দেহকেই সর্ব্বস্ব মনে করি। আমি বলিতে দেহকেই বুঝি। দেহের অতিরিক্ত যে একটা আত্মা আছে, তাহার যে ক্ষয়বৃদ্ধি নাই, সেটা আমরা আদৌ ভাবি না। তাই যখন শুনি যে, অমুক অমুক ঘটনায় দেহ এইরূপ বিশ্রী হইয়া যায়, তখনই আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ি। দেহের একটা কিছু ঘটিলেই আমরা অস্থির হই; বস্তুতঃ আত্মার তাহাতে কিছু আসে যায় না। ম্যাডাম্ এস্‌পারান্স তাঁহার পুস্তকের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় একটা ঘটনার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে বিষয়টি পড়িলেও দেখা যায়, যখন মিডিয়মের দেহ হইতে জড়াংশ লইয়া ভূতের শরীর গঠিত হইতে থাকে, তখন মিডিয়মের দেহটা অতি বিশ্রী ও আশঙ্কাজনক হইয়া পড়ে। দেহের সে অবস্থাটা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয় ও অ-স্বাস্থ্যকর। সে ঘটনাটি এইরূপ :—

অ্যানা না আমি

"বৈঠকে বসিয়া আছি। আমিই মিডিয়ম্। দেখিলাম, ঘরের এক কোণের দিক্ হইতে একটি রোগা ছোট বালিকামূর্ত্তি হাত বিস্তার করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তখন বৈঠকের একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বালিকাকে

জড়াইয়া ধরিয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন—'অ্যানা, আমার অ্যানা, আমার বাছা, আমার প্রাণের অ্যানা !'

"যখন এইরূপ ব্যাপার হইতেছিল, তখন আর একটি স্ত্রীলোকও ঐ বালিকাটির কাছে যাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন ; তাহার পর তিনিও অ্যানাকে ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ; তাহার পর তাহাকে সোহাগ করিলেন, আদর করিলেন। যখন এইরূপ কাণ্ড চলিতেছে, তখন সকলেই সেই দিকে চাহিয়া ঐ সব ব্যাপার দেখিতেছেন। সকলেই দেখিতেছেন যে, একটি রোগা বালিকার কাছে শোক-চিহ্ন-স্বরূপ কাল পোষাক-পরা দুইটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছেন। শুধু দাঁড়ানো নয়, তাঁহারা বালিকাটিকে ধরিয়া আছেন। আমার দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। আমার শরীরটা সে সময়ে যেন বাতাসে দুলিতেছিল, চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতেছিলাম। আমি আমার চেয়ারেই বসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু মনে হইতেছিল, যেন আমাকে অপর লোকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। মনে হইতেছিল, যেন আমার বুকের উপর আর কাহারা আসিয়া উদ্বেগভরে কাঁদিতেছে। যেন কি একটা ব্যাপার হইতেছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

"মনকে প্রবোধ দিলাম, আমার বুকের উপর কেহ আইসে নাই, আমারই বুকের ঐরূপ স্পন্দন হইতেছে। কিন্তু আমার গায়ে যে অপরের স্পর্শ অনুভব করিলাম, স্পষ্ট অনুভব, তাহার ব্যাখ্যা কি করিয়া করি? তখন মনে হইতে লাগিল—ঐ অ্যানাই আমি। চেয়ারের উপর এই মূর্ত্তিটিই আমি, না ঐ বালিকা-মূর্ত্তিটিই আমি, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। অ্যানা শোকাতুরা বৃদ্ধার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, আমি ভাবিতেছিলাম, আমিই কি ঐ গলা ধরিয়া রহিয়াছি? ঐ হাত দুখানাই আমার, না এই হাঁটুর উপরের হাত দুখানা আমার?

"অ্যানার মুখে বৃদ্ধা চুমো খাইতেছিলেন। বৃদ্ধা ও অ্যানার ভগিনী তাহার গায়ে চোখের জল ফেলিতেছিল। আমার মনে হইতে লাগিল,

উঁহারা আমারই মুখে চুমো খাইতেছে—আমারই গায়ে চোখের জল ফেলিতেছে। ভাবিলাম—এ কিরূপ ব্যাপার! অপরের সহিত এইরূপ অভিন্ন হইয়া পড়ায় কেমন একরূপ অশান্তি বোধ হইতে লাগিল। আমার হাত দুখানা নিস্পন্দ হইয়া ঝুলিতেছিল। ভাবিলাম, একখান হাত তুলিয়া বিস্তার করি। বিস্তার করিয়া কাহাকেও স্পর্শ করিয়া একবার বুঝিয়া লই যে, আমি সত্য সত্যই বাঁচিয়া আছি কি না; যাহা দেখিতেছি, তাহা প্রকৃত কি স্বপ্ন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব। ভাবিলাম, তাহা হইলে জানিতে পারিব, আমি অ্যানা হইয়া গিয়াছি, না আমি আমিই আছি।

"বৃদ্ধার হস্তের কম্পন, তাঁহার আদর-চুম্বন, অ্যানার ভগিনীর চোখের জল, সোহাগ-আদর—সবই আমি অনুভব করিলাম। আমার প্রাণে কেমন একরূপ উদ্বেগ-অশান্তি হইতে লাগিল। ভাবিলাম—এ ভাব কতক্ষণ থাকিয়া যাইবে! আমি এক ছিলাম, এখন অ্যানা আর আমি এই দুইটি হইয়া পড়িলাম। আমার এই দুইটি হইয়া থাকা কতক্ষণ থাকিবে? পরিণামই বা কি দাঁড়াইবে—আমি কি তবে অ্যানা হইয়া যাইব, না অ্যানাই আমি হইয়া যাইবে? কোন্‌টা দাঁড়াইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

"এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় 'জন্টি' নামক একটি ছোট ছেলে আমার গায়ে হাত দিল। তখন আমার অসাড় ভাবটা গেল, আমি তখন বুঝিলাম, আমি ঠিকই আছি। আমার প্রাণে যেন একটু সজীবতা আসিয়া পড়িল।

"জন্টি আমাকে স্পর্শ করায় আমি খুবই তৃপ্তি পাইলাম। তাহার স্পর্শেই আমার সন্দেহ দূর হইল, তন্দ্রার ভাবে যখন এইরূপ একটু শান্তি ভোগ করিতেছি, ঠিক তখনই অ্যানা অন্তর্দ্ধান হইয়া পড়িল। শোকাতুরা রমণী দুই জনও আপন আপন স্থানে গিয়া বসিলেন। তাঁহাদের চোখে জল, প্রাণ আলোড়িত; অথচ প্রাণাধিক আত্মীয়কে মরণের পর পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

"ঐ রাত্রে আরও অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা অনেক হইয়াছিল; কিন্তু আমি

বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য করি নাই। আর লক্ষ্য করিতে ইচ্ছাও হইল না। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিতে লাগিল, কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমার সমস্ত প্রাণটুকু বাহির হইয়া যাইতেছে। তাই আমি নির্জ্জনে যাইয়া বিশ্রামের অভিলাষিণী হইয়া পড়িলাম।"

উপরের কাহিনীতে দেখা গেল, মিডিয়ম্ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মিডিয়মেরা প্রায়ই এইরূপভাবে অবসন্ন হইয়া পড়েন। স্যার্ উইলিয়ম্ ক্রুক্‌শ তাঁহার "গবেষণা" নামক পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন :—"মিঃ হোম্ এক জন মিডিয়ম্। বৈঠকের পর অনেক দিনই তাঁহাকে একেবারে অবসন্ন ও মৃতকল্প দেখিয়াছি। সে অবস্থাটা বড়ই আশঙ্কাজনক ও যাতনা-প্রদ। অনেক দিন দেখিয়াছি, রক্তহীন মূর্ত্তিতে বাক্‌রোধ অবস্থায় মর-মর হইয়া ভদ্রলোক মেঝেয় পরিয়া আছেন। এই সব দেখিয়া মনে হয়, অধুনা মানুষের অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইলেও অপরদিকে জীবনী-শক্তির হ্রাস ঘটিয়াছে।"

লেড্ বিটার বলেন—"আমি সম্পূর্ণভাবে ক্রুক্‌শের ঐ কথাগুলি সত্য বলিয়া স্বীকার করি। আমি নিজেও বৈঠকের পরে অনেক মিডিয়মকে অবসন্ন হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি। এমন কি, তাহারা প্রকৃতিস্থ হইবার নিমিত্ত সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছে। বৈঠকে তাহাদের দেহ হইতে জড়াংশ লইয়া ভূতেরা স্থূলীভূত, অস্থায়ী দেহ রচনা করিয়া কার্য্য-কলাপ করায় তাহাদের জীবনীশক্তি এতই নষ্ট হইয়া যাইত যে, তাহাদিগকে দেখিলে মনে হইত, যেন তাহাদের শরীরে দারুণ অস্ত্রোপচার করায় তাহারা ঐ প্রকার কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যেন অস্ত্রকরা রোগী। আর ঐরূপ না দেখাইবেই বা কেন? তাহাদের শরীর হইতে যখন ৪০ পাউণ্ড স্থূল দ্রব্য বাহির হইয়া যাইত, তখন আর অস্ত্র করার বাকীই বা রহিল কোথায়? অবশ্য পরে আবার ঐ ৪০ পাউণ্ড ভূতেরা ফিরাইয়া দিত।

স্থূলীভূত ভূতের সঙ্গে মিডিয়মের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ ; এ বিষয় ম্যাডাম্ ডি, এস্পারান্স স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে "যোলান্দী" নাম্নী প্রেতিনীর কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটি এই :—

ভূতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা

"আমাদের মধ্যে বেশ একরূপ বন্ধুত্ব ছিল। তাহার উপর আমার কোন জোর ছিল না, ইচ্ছা করিলেই যে তাহাকে আনিতে পারিতাম, তাহা নহে। অথচ সে সর্ব্বদাই আসিত। আসা না আসাটা একেবারেই তাহার ইচ্ছাধীন ছিল। কিন্তু সে যখনই আসিয়া মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইত, তখনই আমার উপরেই তাহার মূর্ত্তির অস্তিত্বটা নির্ভর করিত। সে আমারই দেহের জড়াংশ লইয়া তাহার দেহ গড়িয়া তুলিত। আমার তখন জ্ঞানের কিছুমাত্র অপচয় ঘটিত না বটে, কিন্তু শরীরটা বিশ্রী দুর্ব্বল হইয়া পড়িত। তাই পরে বুঝিতে পারিলাম যে, আমার শরীর হইতে সে অনেকটা অংশ আকর্ষণ করিয়াছিল। আমার দেহের পরিবর্ত্তনটা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কেমন করিয়া আকর্ষণ করিতেছে, যদি নিবিষ্টভাবে ভাবিবার, বুঝিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে যোলান্দী দুর্ব্বল হইয়া পড়িত (ছায়ারাজ্য —২৭১ পৃষ্ঠা)"।

বৈঠকে যখন ভূতেরা মিডিয়মের দেহাংশ গ্রহণ করিয়া মূর্ত্তিমান্ হয় ও নানাবিধ কার্য্য করিতে থাকে, তখন মিডিয়ম্ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। কিন্তু সে সময়ে তাহার ভিতরে ভিতরে জ্ঞান থাকে, জ্ঞানের বিলোপ ঘটে না। সেই সময় যদি মিডিয়ম্ যুক্তিতর্কের শৃঙ্খলা রাখিয়া ভূতের কাণ্ড-কারখানা চিন্তা করিতে বসে, তাহা হইলে ভূতের সেই স্থূলীভূত অস্থায়ী দেহটা খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এমন কি, তাহা হইলে তাহারা আদৌ মূর্ত্তিই ধরিতে পারে না। কেন না, মূর্ত্তি ধরিতে হইলেই মস্তিষ্কের ভিতর হইতে এক প্রকার তেজোময় পদার্থ গ্রহণ করিতে হয়। মিডিয়ম্

যদি উদাসীনভাবে পড়িয়া থাকে, তবে তাহার মস্তিষ্কের ঐ পদার্থ লইয়া ভূতেরা বেশ দেহ গড়িয়া কাজ করিতে পারে। তাহাতে ভূতের শরীরও থাকে, মিডিয়মেরও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যদি মিডিয়ম্ চিন্তার শৃঙ্খলা রাখিতে যায়, তবে তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে থাকে অর্থাৎ ঐ তেজোময় পদার্থ আলোড়িত, বিলোড়িত ও রূপান্তরিত হইতে থাকে। তখন সেখান হইতে পরমাণু সংগ্রহ করিয়া দেহ রচনা করা ভূতের পক্ষে সহজ হয় না। আলোড়িত মস্তিষ্কের পরমাণু বহির্গত হওয়া সহজ কথা নয়। তাহাতে মিডিয়মের জীবননাশও ঘটিতে পারে। মিডিয়মের শরীরাংশ লইয়াই ভূতের স্থূলশরীর গঠিত হয়। আবার যতক্ষণ ভূতের শরীর হইতে ঐ অংশগুলি মিডিয়মের শরীরে ফিরিয়া না যায়, ততক্ষণ মিডিয়মের বিপদ কাটে নাই বুঝিতে হইবে। তাই ভূতের উপর হঠাৎ আক্রমণ করিলে বা উহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলে তাহাতে মিডিয়মেরই ক্ষতি করা হয়। তাহাতে ভূতের কিছু হউক না হউক, মিডিয়ম্ মারা পড়িতে পারে। তাই যদি কোন অবিশ্বাসী নাস্তিক "ভূতের মূর্ত্তি" দেখিয়া গোঁয়ারের মত তাহাকে ধরিতে যায়, তবে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করা উচিত। সেরূপ নির্ব্বোধকে পাগল মনে করিয়া তাহার জন্য শাস্তিবিধান করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ ভূত ধরিতে যায়, তাহাকে খুনী আসামী মনে করাই উচিত। ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে বৈঠকে লইয়া বসা উচিত নহে। ঐরূপ নির্ব্বোধ গোঁয়ারদের দ্বারা যে কি ভয়ানক অপকার হইতে পারে, তাহা ম্যাডাম্ ডি, এস্পারান্স নিজেই একবার টের পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুস্তকের ২৮৯ পৃষ্ঠায় সে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্যাপারটি এইরূপ হইয়াছিল।

একটা লজ্জাকর বলপ্রয়োগ

"বৈঠক কতকক্ষণ চলিয়াছিল, তাহা আমি জানি না; তবে এইটুকু জানি যে, আমি নির্জ্জন ঘরটিতে থাকিলাম, আর 'যোলান্দী' একটা

কলসী কাঁধে করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার পর বৈঠকে যে সব কাণ্ড হইয়াছিল, তাহা আমি পরে শুনিয়াছিলাম। 'যোলান্দী' গেলে পর আমার মনে হইতে লাগিল, কে যেন আমাকে মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া ধরিতেছে। তাহাতে আমার খুব ভয় ও যাতনা বোধ হইতেছিল। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন জীবন বলিয়া পদার্থটা আমার দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। ইহার কারণ তখন কিছুই জানিতে পারিলাম না, কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কিছুই শুনিতে পাইলাম না; কেবল খুব দূরাগত একটা ক্রন্দনধ্বনি যেন আমার কানের মধ্যে প্রতিধ্বনির মত আসিতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, আমার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া যাইতেছে। মনে হইতে লাগিল, আমি যেন খুব নীচে নামিয়া যাইতেছি। কোথায়, তাহা জানি না। আমি যেন বাঁচিবার জন্য কিছু ধরিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু যাহাই ধরিতে যাইতেছি, তাহাই যেন পিছলাইয়া পড়িতেছে। তাহার পর অজ্ঞান হইলাম। পরে জ্ঞান হইলে দেখিলাম, আমি ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছি। কে যেন আমাকে মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া মারিয়া ফেলিতেছিল,—ঐরূপ একটা অনুভূতি তখনও প্রাণের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে।

"আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ধীরে ধীরে আবার সেগুলিকে প্রকৃতিস্থ করিলাম। পরে আস্তে আস্তে আমার ঐরূপ হইবার কারণগুলি বুঝিতে পারিলাম। 'যোলান্দী' মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বৈঠকে উপস্থিত হইলে এক ব্যক্তি তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়াছিল, তাহার বিশ্বাস, আমিই 'যোলান্দী' সাজিয়া প্রতারণা করিতে গিয়াছিলাম।

"পরে আমি ঐরূপ কাণ্ডের কথা শুনিলাম। উহা আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। কেন না, আমি ঐ কাণ্ডের ফলে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, এমন কি, নড়িবার বা কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্তও আমার ছিল না। আমার মনে হইতে লাগিল, জীবনীশক্তির খুব সামান্য একটুমাত্রই আমার দেহে আছে, আর যেটুকু আছে, তাহাও

যাতনাময়। আগে আমার মুখ দিয়া রক্ত উঠিত; দক্ষিণ-ফ্রান্সে বাস করায় সে ব্যারামটা সারিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার ফলে সে ব্যারামটা আবার হঠাৎ দেখা দিল। বিশ্রী রক্তবমি হইতে লাগিল। আমি যাই আর কি! ইহার পর বহুদিন যাবৎ আমি রুগ্ন অবস্থায় শয্যাশায়িনী থাকিলাম। স্বাস্থ্যের জন্য স্থান-পরিবর্ত্তনের কথা হইল। কিন্তু আমাকে নড়াইবার উপায় নাই। কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া আমাকে ইংলণ্ডে আরও কিছুকাল থাকিতে হইল।

"ভূত মূর্ত্তি ধরিয়া আসিলে যদি কেহ তাহাকে ধরে, তবে মিডিয়মের ঐ প্রকার ভয়ানক অবস্থা দাঁড়ায়। তাই ভূতেরা যাহাতে মিডিয়মের কোন ক্ষতি না হইতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকে। বদ্‌মায়েসরা ভূতকে চাপিয়া ধরিলে তাহাতে যে শুধু মিডিয়মেরই ক্ষতি হয়, তাহা নহে; তাহাতে উহাদেরও যাতনা হয়। বৈঠকের লোকদের উপর বিশ্বাস করিয়া উহারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।" নিম্নলিখিত বিবরণটি লেড্‌বিটার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"আমার দুই জন বন্ধু অতীব বুদ্ধিমান্। এক জনের নাম—ডাক্তার এ, ডি, উইলসন; অপরের নাম—অধ্যাপক জেম্‌স্ মেপ্‌স্। দুই জনই নিউ-ইয়র্কবাসী ছিলেন। এখন তাঁহারা ইহজগতে নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভূতের ঝক্‌ঝকে হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। ভূত ধরিলে যে ফল হইবার কথা, তাহাই হইয়াছিল। ধরিবামাত্রই হাত মিলাইয়া গেল! অতঃপর ভূতেরা আমাকে জানাইয়াছিল যে, ঐরূপ কাণ্ডে তাহাদের যাতনা হইয়াছিল। এই সব ব্যাপার ঘটে বলিয়া ভূতেরা মানুষের মূর্ত্তি ধরিয়া জীবিত মানুষের খুব কাছে আসিতে চাহে না। যাহাকে খুব বিশ্বাস করে, কেবল তাহারই কাছে আইসে। আমি অনেক ভূতের স্থূলীভূত মূর্ত্তি দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদিগকে ধরিবার লোভ প্রাণে আসিলেও সে লোভ দমন করিয়াছি, তাই ভূতের তত্ত্ব সংগ্রহে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছি।"

ভূতকে চাপিয়া ধরিলে সে বাস্তবিকই যাতনা পায় কি না, তাহা আমরা জানি না। তবে স্থূলীভূত দেহটাকে আঘাত করিলে যে তাহার কষ্ট হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই জন্যই ভূতাবিষ্ট লোকের চতুর্দ্দিকে তরবারি-সঞ্চালন-প্রথা বোধ হয় চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে অন্য লোকের অত্যাচার করিবার সম্ভাবনা থাকে না। মধ্যযুগের যাদুকরেরাও বোধ হয় এই কারণেই সর্ব্বদা তরবারি ব্যবহার করিত।

কোন অস্ত্রেই ভূতের সূক্ষ্ম দেহের ক্ষতি হয় না। উহাকে পুনঃ পুনঃ তরবারি দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা কাটে না। ভূতের অনুভূতিই হয় না যে, তরবারি তাহার দেহের ভিতর দিয়া সঞ্চালিত হইয়া গেল। কিন্তু ভূত যখন স্থূলীভূত হইয়া দেখা দেয়, তখন তাহাকে তরবারির আঘাত করিলে তাহাতে তাহার যাতনার অনুভূতি হয়। জীবিত মানুষের দেহে অস্ত্রাঘাত করিলে যেমন বেদনার অনুভূতি হয়, তাহারও তখন সেইরূপ যাতনাই বোধ হইয়া থাকে। শুধু ভূত নহে, ভূতের উপর অত্যাচার করিলে মিডিয়মেরও খুব বেশী যাতনা হয়। তাহার প্রমাণ আমরা ম্যাডাম্ ডি, এস্পারান্সের ঘটনায় পাইয়াছি।

লেড্ বিটার বলেন—"মিঃ আউয়েনের উপরি-উক্ত কথাগুলি আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমি যখনই ভূত-প্রেতের তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছি, তখনই ঐ কথাগুলি মনে রাখিয়া কার্য্য করিয়াছি। প্রেত-তত্ত্বটা খাঁটি জুয়াচুরি, এই ধারণাটি অনেকের বদ্ধমূল। তাহারা প্রেত-তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই সংকল্প করে—প্রতারণা ধরিব। তাই নানারূপ কল-কৌশল করিতে যায়। আর এ কথাটিও সত্য যে, যতগুলি ভূতের কাণ্ড শুনা যায়, তাহার অনেকগুলি মিথ্যা ও প্রতারণা-মূলক, কেন না, অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ভূতেরা খুব বেশী ব্যস্ত নহে। মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিয়া বিশ্বাস করাইতে হইবে, তাহাদের এত গরজ নাই। তাই বলিতেছি, ভূতের সব কাহিনীই সত্য নহে।"

ডাক্তার আল্‌ফ্রেড আর ওয়ালেস্ এক সময় এই মন্তব্যটি

করিয়াছিলেন :—"ভূত সম্বন্ধে সকল বৈজ্ঞানিকেরই একরূপ কথা। তাঁহারা বলেন—'ভূতের তথ্য অনুসন্ধানকালে আমরা কতকগুলি সর্ত্তের কথা বলিব, সেইগুলি মানিয়া যদি ভূত দেখা দেয়, তবেই ভূতের ব্যাপার আমরা বিশ্বাস করিতে পারি ; আর আমাদের সর্ত্তের মধ্যে না আসিলে আমরা উহা মানিতে প্রস্তুত নহি। সে ক্ষেত্রে জুয়াচুরি বলিয়াই আমরা ধরিয়া লইব।' তাঁহারা উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন যে, প্রকৃতির অন্যান্য বিভাগের তত্ত্ব করিবার সময় সর্ত্ত জাহির করা প্রকৃতির হাতেই থাকে ; প্রকৃতিপ্রদত্ত সর্ত্তের অনুগমন না করিলে কোন পরীক্ষাই সফল হয় না। ধীরভাবে প্রকৃতির নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল সর্ত্ত জানিয়া লইতে হয়। শুধু তাহাই নহে। এক এক বিভাগের সর্ত্তও এক একরূপ। যখন স্থূল বিষয়ের বেলাতেই এইরূপ, তখন অতিশয় দুর্ব্বোধ্য অতীন্দ্রিয় শক্তির সর্ত্ত যে খুব পৃথক্-রকমের হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি ? মানিয়া লইলে ক্রমে সকল বিষয়ই পরিস্ফুট হইয়া আইসে। আবার মানিয়া না লইলে প্রকৃত তথ্যও উড়িয়া যায়। একটা উদাহরণ লইয়া বুঝা যাউক। কতকগুলি দ্রব্য এমন আছে, যাহাদের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইতে পারে না। এখন বিদ্যুৎ-তত্ত্ব জানিতে বসিয়া আমরা যদি প্রথমেই ঐ সকল দ্রব্যের ঐ গুণটি অস্বীকার করিয়া তোতা পাখীর মত 'মিথ্যা' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকি, তবে বৈদ্যুতিক শক্তির অস্তিত্ব ও অসাধারণ কার্য্যকারিতা প্রভৃতি কখনই মানবের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে না। ভূত-প্রেত সম্বন্ধে মানুষ যে কত অজ্ঞ, তাহা কর্ণেল্ অল্‌কট্ প্রণীত 'পরলোকের প্রত্যাগত ব্যক্তি' নামক গ্রন্থের ৩৬।৪০ পৃষ্ঠার বিবরণে আমরা জানিতে পারি।"

লেড্‌বিটার বলেন—"ভূতের তথ্য জানিতে হইলে বিশ্বাস করিয়া আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে ভূতের সঙ্গে একটা সদ্ভাব জন্মে—তাহার ফলে ভূত এমন অনেক কাণ্ড দেখায়, যেগুলিকে সত্য না বলিয়া থাকা যায় না। অবিশ্বাসী সাজিয়া তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে কোন ফলই ফলে না। কিছুই জানিবার উপায় হয় না। আমি নিজে বিশ্বাস করিয়াই প্রবৃত্ত

হই। সেইটিই আমার রীতি, তবে যখন অবিশ্বাসের কারণ কিছু ঘটে, তখন অবিশ্বাস করি, তাহাতে দোষ কি ?

অনেক বৈঠকে আমাকে প্রতারিত করিবারও চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু যখন বুঝিয়াছি যে, সেগুলি মিডিয়মের কাণ্ড, তখন মনে মনে বুঝিলেও ঝগড়া-ঝাটি করি নাই। বাগ্‌বিতণ্ডা করি নাই, লক্ষ্মীটির মত চুপ্-চাপ্ করিয়া গিয়াছি। আবার অনেক বৈঠকে এমন দেখিয়াছি যে, মিডিয়ম্ বাস্তবিক পক্ষে নির্দ্দোষ। শুধু অন্য ব্যক্তি আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়াছি—মিডিয়ম্ বাস্তবিকই তন্দ্রাচ্ছন্ন, তাহার দেহটার উপর একটা সাদা কাপড়ের মত পদার্থ রহিয়াছে। ভূতে সঙ্কেত দ্বারা জানাইল যে, ঐ দেখ, ভূত মূর্ত্তিমান হইয়া কাপড় গায়ে দিয়া বসিয়া আছে। ঐ ব্যাপার খাঁটি জুয়াচুরি। মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া দাঁড়ান কাজটি শক্তিসাপেক্ষ। সেই শক্তির যেখানে অভাব, সেইখানেই এইরূপ প্রতারণা ঘটে। এ ঘটনার পর যখন মিডিয়ম্ তন্দ্রা-মুক্ত হইয়া উঠিয়া বসে, তখন সে এই সব কাণ্ড শুনিয়া বিরক্ত হয়, তাহার তখনকার ভাব-ভঙ্গী দেখিলে বাস্তবিকই তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে হয়। অল্প শক্তি-সম্পন্ন ভূতেরাই এইরূপ কাণ্ড করে। অন্য সময় এই মিডিয়ম্‌ই হয় তো কত অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছে, এমনও দেখিয়াছি। বুঝিতে হইবে, ঐ সময় শক্তিশালী ভূতের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

ঠিক এইরূপ ব্যাপার হওয়ায় এক জন সুবিখ্যাত মিডিয়মের নিন্দা ঢাকে-ঢোলে খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রেও বাস্তবিক-পক্ষে মিডিয়ম্ নির্দ্দোষ। লেড্‌বিটার বলেন—একটা প্রতারণার ব্যাপার ঘটিলেই সব সময়ে মিডিয়মের নিন্দা করা চলে না। তিনি বলেন—"আমি নিজে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি। বৈঠকে আমরা আছি, এমন সময় মিডিয়ম্ আমাদিগকে একটু কাপড় দিল; কাপড়টুকু তাহার পকেটেই ছিল। দেখা গেল, সেটুকু 'ভূতের কাপড়' অর্থাৎ মিডিয়মের সত্যকার কাপড়ের পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণ করিয়া ভূত ঐ কাপড়টুকু স্থূলীভূত

করিয়া তুলিয়াছিল।" এরূপ ব্যাপার আরও অনেকবার ঘটিয়াছে। ম্যাডান্, ডি, এস্পারান্সও এইরূপ একটা কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা এইরূপ :—

ভূতের কাপড়

ক্রিশ্চিয়ানা নামক স্থানে আমরা অনেকগুলি বৈঠক করিয়াছিলাম। এক দিন একটি বৈঠকে এক জন লোক ভূতের দেহ হইতে একটা কাপড় টানিয়া লইলেন। তাহার পর দেখা গেল, আমার নিজের পোষাকের খানিকটা নাই—কে যেন কাটিয়া ছিঁড়িয়া লইয়াছে। আমার পোষাকটা কালো উলের ঘন বুনানি ছিল। সভ্য মহাশয় যে অংশটা ভূতের গা হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন, দেখা গেল, সেটা আমারই কাপড়ের ছেঁড়া অংশটার মত—কেবল কিছু বড়, আর রঙটা সাদা, বুনানিটা খুব পাতলা, যেন সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল!

ইংলণ্ডেও ঐরূপ একটা কাণ্ড ঘটিয়াছিল। যে প্রেতিনীটা মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছিল, তাহার নাম—"নিনীয়া।" নিনীয়ার গায়ে খুব কাপড়-চোপড় পরা ছিল। এক জন সভ্য তাহার কাছে একটু কাপড় চাহিলেন। নিনীয়া প্রথমে একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া শেষে দিতে সম্মত হইল এবং দিল। বৈঠকের অন্তে দেখা গেল যে, আমারই একটা নূতন পোষাক খানিকটা ছেঁড়া। পোষাকটি আমি সেই দিনই কেবল পরিয়াছি। নূতন পোষাকটি ছিঁড়িবে! তাই নিনীয়া প্রথমে কাপড় দিতে অনিচ্ছা করিতেছিল, বুঝা গেল। তখন ভাবিলাম, নিনীয়া না ভাবিয়া চিন্তিয়া এই অন্যায় কাজটি করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পরেও আবার এরূপ কাণ্ড ঘটিল। তখন বুঝিলাম—এটা আকস্মিক ঘটনা নহে, বৈঠকের ভূত আমারই পোষাকের জড়াংশ গ্রহণ করিয়া তাহার চক্‌চকে পোষাক প্রস্তুত করিয়া লয়।—"ছায়ারাজ্য", ৩৩৭ পৃষ্ঠা।

এই যে, ভূতের কাপড়ের কথা বলা হইতেছে, ইহা নানা প্রকারের

দেখা যায়। কোন কোন কাপড় খুব মোটা, আবার কোন কোনখানি চমৎকার সূক্ষ্ম, ভারতের শিল্পীরাও অত সূক্ষ্ম কাপড় বুনিতে পারে না। কখন কখন ভূত বা প্রেতিনী আসিয়া কোন এক জন সভ্যকে হয় তো বলিয়া বসে—"আমার পোষাকে আপনি হাত দিয়া দেখুন, কেমন নরম, কেমন সূক্ষ্ম।" আবার কখন কখন বলে—"আপনি ইহা হইতে একটু কাটিয়া লউন।" লেড্‌বিটারের কাছে ভূতের কাপড়ের কাটা অংশ অনেকগুলি ছিল। ভূত ইচ্ছা করিয়া ঐগুলি দিয়াছিল। অনেকগুলি খণ্ড আসল কাপড়ের মত অনেকদিন ঠিক ছিল; আবার অনেকগুলি খণ্ড এক ঘণ্টার মধ্যেই মিলাইয়া গেল, কোন কোনখানা আবার ১০ মিনিটের মধ্যেই লোপ পাইল। ভূতেরা সাধারণতঃ হাল্‌কা সাদা পোষাকই পরে; ঐটিই উহাদের রীতি। আবার সভ্য-সমাজ-প্রচলিত পোষাক পরিয়া হাজির হইতেও তাহাদের কখন কখন দেখা যায়। জীবিতকালে লোকটা যে পোষাক পরিত, কখন কখন সেরূপ পোষাক পরিয়াও আইসে।

ভূতের সুস্পষ্ট মূর্ত্তি

ভূত সুস্পষ্ট মূর্ত্তি ধরিয়া পরে বিলীন হইয়া গেল, এরূপ ভাবের একটা বিবরণ "ছায়ারাজ্য" নামক গ্রন্থের ২৫৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। যিনি নর্ম্মদা বৈঠকে যাওয়া-আসা করিয়া স্বয়ং ঐ কাণ্ড দেখিয়াছেন, এমন এক জন সভ্য উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্যাপারটা এইরূপ :—

"বৈঠকে আছি, এমন সময় দেখিলাম, সেই ঘরের মেঝের উপরে কি যেন সাদা রকমের খানিকটা জিনিস পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পর ঐ জিনিসটা নড়িয়া চড়িয়া বাড়িতে লাগিল, মনে হইল, যেন একটা সজীব কাপড়ের পুঁটুলি। বাড়িতে বাড়িতে সেটা ৩ ফিট লম্বা, ২॥ ফিট প্রস্থ আর ৫।৬ ইঞ্চি বেধ—এই পরিমাণ হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই সেটা উঁচু হইয়া উঠিতে লাগিল, যেন উহার মধ্যে একটা মানুষের মাথা আছে,

এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। আর সেই অস্পষ্ট সাদা জিনিসটাও যেন তখন কাপড়-চোপড় বলিয়া স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে দুই ফিট্ উঁচু হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, যেন উহার মধ্যে একটা বালক রহিয়াছে, যেন বালকটা কাপড়-চোপড়ের মধ্যে আবৃত থাকিয়া চারিদিকে হাত সঞ্চালন করিয়া কোন কিছু সরাইয়া ফিরাইয়া রাখিতেছে।

"কাপড়-ঢাকা জিনিসটা উঠিতে লাগিল, কখন একটু ছোট হয়, আবার পরক্ষণেই খুব বাড়িয়া উঠে। এইরূপভাবে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপ বাড়িতে বাড়িতে ৫ ফিট উঁচু হইল, তখন একটা মানুষের মূর্ত্তি দেখা গেল, মূর্ত্তিটা যেন জুতবরাত করিয়া কাপড়-চোপড় গায়ে দিতেছে, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল।

"তখনই সেই ঘন-নিবিষ্ট কাপড়-রাশির ভিতর হইতে মাথার দিকে উঁচু হইয়া দুইখানা হাত বাহির হইতে দেখা দিল। একটু পরেই সুন্দরী ষোলান্দীর লাবণ্যময়ী দেহ-লতা সম্মুখে প্রকট হইল। তাহার দেহটা প্রায় ৫ ফিট্ লম্বা; মাথায় পাগ্ড়ীর মত একটা পোষাক। সেই পাগ্ড়ীর নীচে হইতে দীর্ঘ কালো কালো চুলগুলি কাঁধের উপর দিয়া আসিয়া পিঠে পড়িয়াছে।

"তাহার গায়ের পোষাক অনেকটা পূর্ব্বাঞ্চলের মত। পোষাকের মধ্য দিয়া তাহার দেহের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। কাপড়-চোপড়ের বাড়্তি অংশটা সে কোমরে জড়াইয়া লইল, আবার একটু পরেই খানিকটা পোষাক মেঝেয় রাখিয়া দিল, যেন আবশ্যকমত লইবে, এইরূপ ভাব।

"১০।১৫ মিনিট ধরিয়া এইরূপ কাণ্ড করিল।

"তাহার পর যখন প্রেতিনীটা মিলাইয়া গেল, তখন নিম্ন-লিখিত প্রকার ঘটনা হইল। নিজেকে চেনা দিবার অভিপ্রায়ে ষোলান্দী সকলের সম্মুখে সরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে মুখের আবরণটি সরাইল। তাহার পর নব-বিবাহিত বৌটির মত মুখের উপর ঘোমটা দিল। তাহার পর ছোট

হইতে লাগিল। তাহার পর ক্রমেই তাহার আয়তন কমিয়া যাইতে লাগিল। শেষে আর তাহাকে যোলান্দী বলিয়া চেনা গেল না। তাহার পর আরও ছোট হইয়া পড়িল—তখন আর তাহাকে মানুষ বলিয়াই বোধ হইল না। তাহার পর ১০।১২ ইঞ্চি হইয়া গেল। তাহার পরেই খানিকটা কাপড়ের রাশি হইয়া পড়িল—মনে হইল, যোলান্দীর পরিত্যক্ত পোষাকটা পড়িয়া রহিয়াছে। পরক্ষণেই সে কাপড়ও ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

"৫ মিনিটের মধ্যেই যোলান্দীর এই অন্তর্দ্ধান ব্যাপারটা শেষ হইয়া গেল। আর দুই মিনিটের মধ্যেই কাপড়-চোপড় মিলাইয়া গেল। আর এক দিন এইরূপ কাণ্ড করিবার সময় যোলান্দীর অন্তর্দ্ধান হইলেও তাহার কাপড়গুলি রহিয়া গেল। সেগুলি স্তূপীকৃতভাবে মেঝেয় পড়িয়া রহিল। একটু পরেই আর একটা প্রেত একটা নির্জ্জন ঘর হইতে আসিয়া ঐ কাপড়গুলির দিকে চাহিয়া থাকিল—যেন কি ভাবিতেছে। যোলান্দীর এইরূপভাবে চলিয়া যাওয়াটা ভাল হয় নাই। মুহূর্ত্তমধ্যে এই লম্বা মূর্ত্তিটাও মিলাইয়া গেল। পরক্ষণেই একটা ছোট চঞ্চলা স্ফূর্ত্তির-প্রাণ বালিকামূর্ত্তি দেখা দিল। এ স্পেনদেশীয় সেই বালিকা—সেই 'নিনীয়া।' নিনীয়াও যোলান্দীর পরিত্যক্ত পোষাকটা দেখিতে লাগিল। নিনীয়ার গায়ে বেশ ভাল পোষাক ছিল, তথাচ সে আমোদচ্ছলে যোলান্দীর পোষাকটা কুড়াইয়া লইয়া পরিতে লাগিল।"

লেড্‌বিটার বলেন—"আমি নিজেও অনেকটা ঐ রকম কাণ্ড দেখিয়াছি। আমি ভূতটাকে আসিতে দেখিয়াছিলাম, সে বিশ্রী লম্বা। সে কাপড়-চোপড়ের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। আমি দেখিলাম—প্রথম মেঝের উপর একটা আলোকের মত পদার্থ দেখা গেল—সেটা বাড়িতে বাড়িতে একটা গাছের গুড়ির মত হইয়া উঠিল। তাহার পর সেটা আমাদের অপেক্ষাও উঁচু একটা থামের মত হইল। তাহার পর সেই থামটা ক্রমেই যেন মানুষের আকারে ফুটিয়া উঠিল। মানুষ হইয়াই আমার কাছে

আসিয়া বেশ সজোরে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করিল। তাহার পর আসল মানুষের মত খুব সুস্পষ্টভাবে আমার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল। ৫ মিনিট-কাল আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া, আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়া, কর-মর্দ্দন করিয়া বিদায় লইতে প্রস্তুত হইল। বিদায়সূচক অভিবাদন করিয়াই সে অবিলম্বে অস্পষ্ট হইয়া পড়িল, পরক্ষণেই আবার সেই থামের আকার। তাহার পরেই সেই থামটা পূর্ব্বেকার আলোকের মত হইয়া গেল। একটু পরেই আলোটা ২।১ বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল।"

আমি তিন জন ভূতের মূর্ত্তি একসঙ্গে দেখিয়াছি। এক জন আরব, এটা মিডিয়ম্ অপেক্ষা ৬ ইঞ্চি লম্বা। আর এক জন ইউরোপবাসী, এটি সাধারণ মাপের লোক। তৃতীয়টি একটি কৃষ্ণকায়া বালিকা। এটি আমেরিকাবাসিনী। যখন এই মূর্ত্তিগুলি দেখা দেয়, তখন মিডিয়ম্‌কে একটা তারের বাক্সে সুন্দররূপে আবদ্ধ করিয়া তালার চাবি-কাঠি আমি নিজে রাখিয়াছিলাম। আর অন্য একটা তালাও দেওয়া ছিল—সেটা অক্ষর খাটানো তালা, বাহিরে থেকে ভিন্ন খোলা যায় না। খানিকটা পরে খাঁচা খুলিয়া দিলাম। তখন ঐ তিন মূর্ত্তির দুই জনে সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন মিডিয়ম্‌কে দুইখানা হাত ধরিয়া বাহিরে আনিল। আমরা মিডিয়ম্ ও মূর্ত্তি দুইটির গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম। মূর্ত্তি দুইটি মিডিয়ম্ অপেক্ষাও শক্ত বলিয়া বোধ হইল। তাহারা মিডিয়ম্‌কে আর তারের খাঁচার মধ্যে লইয়া গেল না, আমাদের সকলেরই সম্মুখে একখানি সোফার উপরে শোয়াইয়া রাখিল। তাহার পরে আমাদিগকে বলিল যে, নিদ্রাভঙ্গের পর সে ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এইরূপ বলিয়াই মূর্ত্তি দুইটি অদৃশ্য হইয়া পড়িল। একটা মিটমিটে আলোর মধ্যে এই সব কাণ্ড হইয়া গেল। মিটমিটে, কেন না, সে সময় গ্যাসের আলো কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আলো মন্দীভূত হইলেও মিডিয়মের ও মূর্ত্তি দুইটির মুখশ্রী বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। তাহারা কে ও কি করিতেছে তাহা বেশ ভাল করিয়াই আমরা দেখিয়াছিলাম।

ভূত মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বদা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়ায় না। উপরে যেরূপ ঘরের এধার ওধার করিয়া বেড়াইবার কথা বলা হইল, সাধারণতঃ সেরূপটা দেখা যায় না। খুব বেশীর ভাগ তাহাদিগকে মিডিয়মের কাছেই অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। ভূতের স্থূলীভূত দেহের পরমাণুপুঞ্জ মিডিয়মেরই দেহ হইতে সংগৃহীত; তাই মিডিয়মের দেহের দিক্ হইতে নিরন্তরই একটা আকর্ষণ হইতে থাকে। এই কারণে তীব্র আকর্ষণের ফলে ভূতের দেহ অনেকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না, উহার পরমাণুগুলি তীব্রবেগে পুনরায় মিডিয়মের দেহেই চলিয়া যাইতে চাহে; যাইয়াও থাকে। ভূতের দেহ হইতে ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুগুলি যখন মিডিয়মের দেহে আসিতেছে, তখন যদি আসিতে না দেওয়া হয়, তবে তাহাতে মিডিয়মের ভয়ানক বিপদ ঘটে। এমন কি, তাহাতে সে মারা পড়িতেও পারে। সে যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা আমরা উপরে উদ্ধৃত ম্যাডাম্. ডি, এস্-পারান্সের গল্পেই বলিয়াছি। ম্যাডামের ব্যাপারে আমরা বুঝিয়াছি যে, তাঁহার দেহের সামান্য অংশটাই নির্জন ঘরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আর শরীরের খুব বেশী অংশটাই যোলান্দী নাম্নী প্রেতিনীর দেহ-গঠনে ব্যয়িত হইয়া আবদ্ধ ছিল: যোলান্দীকে যখন অন্যায় করিয়া আটকানো হইল, তখন ম্যাডামের শরীরস্থ সামান্য পরমাণুরাশি বাহির হইয়া যোলান্দীর দেহের দিকে আসিয়াছিল। এই কারণেই লোকে মনে করিয়াছিল যে, তিনি ঐ কাণ্ডের সময়ে নির্জন ঘরের বাহিরে আসিয়াছিলেন। এই কারণেই যাহারা প্রেততত্ত্বের ব্যাপার বিশেষরূপ জানে না, তাহাদিগকে বৈঠকে বসিতে দেওয়াই উচিত নহে।

বৈঠকে যে সব সভ্য বসেন, তাঁহাদের সকলের দেহ হইতেই ভূত কিছু কিছু জড়াংশ আকর্ষণ করিয়া লয়। এই নিমিত্ত যাহাকে তাহাকে বৈঠকে না লইয়া বেশ বিবেচনাপূর্ব্বক সভ্য মনোনীত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ভূতের স্থূলীভূত দেহে তখন সকলের দেহের জড়াংশ মিশ্রিত হইয়া পড়ে। সকলের দোষ-গুণই ঐ জড়াংশের সঙ্গে সঙ্গে ভূতের দেহে যাইয়া উঠে।

সভ্যদের মধ্যে কোন অসৎ লোক থাকিলে তাহার অসদ্‌গুণ ভূতের দেহে আকৃষ্ট হওয়ায় সেই গুণের কু-ফল তখন সভ্যদের উপরে আসিয়া ফলিতে থাকে। তখন সকলকেই অল্পবিস্তর জ্বালাতন হইতে হয়। মিডিয়মের উপরেই বেশী ফলে ; কেন না, মিডিয়ম্‌ই সকলের অপেক্ষা তরল-প্রকৃতি, আর ভূত তাহার শরীর হইতেই বেশী জড়াংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। আমরা ম্যাডাম্ ডি, এস্‌পারান্সের অমূল্য গ্রন্থের ৩০৭ পৃষ্ঠা হইতে আর একটা গল্প উদ্ধৃত করিতেছি। ম্যাডাম্ এইরূপ বলিয়াছেন :—

তামাকের কু-ফল

"ভূতের বৈঠকে যাইতে আরম্ভ করিয়াই বৈঠকান্তে আমার গা-টা কেমন বমি বমি করিত ; কখনও কখনও বমি করিয়াও ফেলিতাম। আমি মনে করিতাম, এটা বোধ হয়, বৈঠকে বসার স্বাভাবিক ফল। বোধ হয়, ইহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। বৈঠক যখন আমার নিজের বাড়ীতে করিতাম কিংবা যখন বৈঠকে বালকের দল থাকিত, তখন আমার ও-রূপ ভাবটা হইত না। আর যে বৈঠকে ভূতের ছবি তোলা হইত, সে বৈঠকের পর আমার অসুখটা খুবই বাড়িত, এমন কি, আমি ২।৩ দিন যাবৎ শয্যাগত থাকিতাম। তামাকের বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে শরীরের যেরূপ যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, আমার অসুখের সময়ও তাহাই দেখা যাইত। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, বৈঠকে যখন তামাকসেবী লোক না থাকে, তখন আমার ঐরূপ অসুখ করে না, তামাক-খোরের সঙ্গে বৈঠকে বসিলেই অসুখটা হইয়া পড়ে। আবার কোন সভ্য যদি পীড়াগ্রস্ত থাকিতেন, তবে সে বৈঠকের অন্তেও আমি অসুস্থ বোধ করিতাম। ম্যাডামের সঙ্গে বৈঠকে বসিলেও অসুস্থ হইতাম ; সে অসুখও তামাক-খোরের সঙ্গে বসিয়া অসুস্থ হইবার মত।

"বৈঠকে বসিয়া ঐরূপভাবে অসুস্থ হইলেও একপক্ষে আমার উপকার হইয়াছিল। আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, তামাক খাওয়া, মদ খাওয়া প্রভৃতি

কতকগুলি প্রথা মানবসমাজে বিশেষ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত না হইলেও উহা বৈঠকের পক্ষে ও মিডিয়মের স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারক।"

যে ভূত বহুদিন ধরিয়া বৈঠকে-যাওয়া আসা করে, সে অতীন্দ্রিয় শক্তি বিষয়ে খুবই অভিজ্ঞ হয়। অনেক সময়ে সে বৈঠকের সভ্যদিগকে অনেক অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া ফেলে। "জন্ কিং" নামক একটা ভূত অনেক দিন হইল, একটা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখাইয়াছিল। ইচ্ছা করিলে সে এখনও সেরূপ ঘটনা আবার দেখাইতে পারে। বৈঠকে একরূপ রঙ্ মাখান চক্‌চকে শ্লেট ব্যবহৃত হয়। ঐ ভূতটা অনেক সময় ঐরূপ একখানা শ্লেট লইয়া তাহার উপর নিজের একখানা হাত ফুটাইয়া তুলিত। বেশ একখানা সুন্দর মোটা-সোটা, বলিষ্ঠ, সু-গঠিত হাত। বেশ সুস্পষ্ট হাত। হাতখানি সকলেই যখন অবাক্ হইয়া দেখিতেছে, তখন উহা কমিতে কমিতে একটা দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর হাতের মত ছোট হইয়া পড়িত। ছোট হইলেও আগেকার বড় হাতখানির গঠনের সঙ্গে গঠনের মিল থাকিত। অদ্ভুত ব্যাপার! আবার একটু পরেই বড় হইতে থাকিত। ধীরে ধীরে বাড়িত। বাড়িতে বাড়িতে শ্লেটখানির মত অত বড় হইয়া পড়িত। আবার কমিত, কমিয়া কমিয়া স্বাভাবিক হইয়া আসিত। সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা ভেল্কীর মত বলিয়া বোধ হইত। সকলের চোখেই যখন এই ব্যাপারটা পড়িত, আর উপস্থিত কেহই যখন ভেল্কীবাজ নহেন, তখন উহা বস্তুতঃ ভেল্কী নহে। উহা নিশ্চয়ই ভূতেরই কাণ্ড। ভূত মূর্ত্তি ধরিয়াই ঐরূপ হাতের হ্রাস-বৃদ্ধি করিত। যে ভূত জড়াংশ নাড়া-চাড়া করিতে শিখিয়াছে, তাহার পক্ষে ঐরূপ কাণ্ড করা খুবই সহজ।

ভূতেরা কখনও কখনও মানুষের সঙ্গে তামাসা করে

ভূতেরা শুধু যে মানুষের মূর্ত্তি ধরিয়া থাকে, তাহা নহে। অন্য মূর্ত্তিও কখনও কখনও ধরিয়া আইসে। সেরূপ ব্যাপার লেড্‌বিটার একবার স্ব-চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন—"আমি ঐরূপ ব্যাপার দেখিয়াছি

আর তাহা আমার সুস্পষ্টভাবে আজও মনে আছে। জীবিতকালে যাঁহারা খুব রসিক থাকেন, মরণের পরও তাঁহাদের সে রসিকতার প্রবৃত্তিটা যায় না। এক দিন একটা বৈঠকে বসিয়া আমরা ভূতের কাণ্ড-কারখানা দেখিব বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি। আমাদের মাঝে এক জন নাস্তিক রকমের লোক ছিল। সে চীৎকার করিয়া গর্ব্বের সঙ্গে আমাদিগের কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে টীকা-টিপ্পনী করিতেছিল। বলিতেছিল—'ভূত-ফুত সব মিথ্যা কথা, সর্ব্বৈব জুয়াচুরি, আজ আমি আছি, ভূতের সাধ্য কি যে আমার সামনে আসে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকক্ষণ নাস্তিক ঐরূপভাবে বকিতে লাগিল। আমরা চুপ করিয়া থাকিলেও আমাদের মিডিয়ম্ বলিলেন—'মহাশয়! অত উদ্ধতভাবে কথা বলিবেন না, ভূতেরা অনেক সময় উদ্ধত মানুষকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া থাকে।' ঐ মিডিয়ম্ ধীরপ্রকৃতি, নিরীহ ভদ্রলোক, তাই ঐরূপ ভদ্রতার সঙ্গে নাস্তিককে সংযত হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু সংযত হওয়া দূরে থাকুক, নাস্তিক আরও উদ্ধতভাবে কথাবার্ত্তা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ আরম্ভ করিয়া দিল। বলিতে লাগিল—'ভূত যদি থাকে, তবে আমাকে ভয় দেখাক্, একবার আমার সামনে আসুক দেখি তো?' আমরা এতক্ষণ অন্ধকার ঘরে বসিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম। কিছুই ঘটিল না। বৈঠকের প্রথমে কেবল শুনিলাম যে, শক্তিসঞ্চয় হইলেই ভূত আসিয়া দেখা দিবে। সময় অনেক হইয়া গেল; আমরাও বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। তাহার পর আমার মনে হইতে লাগিল, এই নাস্তিক বেটাই যত নষ্টের মূল। এই পাপটার জন্যই আজিকার বৈঠকটা বৃথা হইয়া গেল। তাহার পর যে ঘটনা ঘটিল, তাহা দেখিয়া বুঝিলাম, আমার সে ধারণাটা ভুল।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইলে আমাদের বৈঠক-ঘরখানি কিরূপ, তাহার একটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ঘরখানি বেশ সুন্দর পরিপাটী; দোতলার উপর; একটা বাড়ীর পিছন অংশে

অবস্থিত। ঘরখানির সংলগ্ন আর একখানি বড় রকমের ঘর আছে। দুই ঘরের মাঝের দুয়ার কব্জা-খাটানো; সুতরাং সেই দুয়ারকে বেশ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পর্দ্দে পর্দ্দে রাখা যায়। সে দুয়ার একবারে ছাদ পর্য্যন্ত উঁচু। আমাদের ঘরের টেবিলটা বিশ্রী রকমের বড়; এত বড় যে, তাহার পাশের চেয়ারগুলির কোন কোনখানা দেওয়ালে, কোন কোনখানা বা সেই উঁচু দুয়ার পর্য্যন্ত যাইয়া ঠেকিয়াছে। টেবিলটাতেই বেশী স্থান জুড়িয়া থাকায় চেয়ারগুলিকে ঐরূপভাবে সাজান হইয়াছে। আমাদের ঘরখানির আর একটা কোণের দিকে একটা দ্বার ছিল—সেটা দিয়া সিঁড়িতে যাওয়া যাইত। সে দরজাটায় তালা বন্ধ ছিল, তালার চাবিটা ঘরের ভিতরের দিকেই তালার গায়ে লাগানো ছিল। তাহা ছাড়া আমাদের দিকে একটা হুড়কা দিয়া আবদ্ধ ছিল। আমরা বসিয়া আছি; ৪৫ মিনিট কাটিয়া গেল, ভূতের সাড়াশব্দ নাই। আমি নিজে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলাম।

হঠাৎ একটা বিশ্রী বড় রকমের পায়ের শব্দ কানে আসিল। মনে হইতে লাগিল, যেন একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস পাশের ঘরে দুম্‌দাম্ করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ব্যাপারটা কি, দেখিবার উদ্দেশ্যে যেমন আমরা মাথা উঁচু করিয়া চাহিয়াছি, অমনই বিকট শব্দে দরজা খুলিয়া গেল; দরজার গায়ে যে সব চেয়ারগুলি ঠেসান ছিল, সেগুলি ধাক্কা খাইয়া টেবিলের উপর পড়িল, টেবিলটা ভীষণ বেগে সম্মুখের চেয়ারের উপর পড়িল। সেই উন্মুক্ত দরজার ভিতর একটা বিশ্রী রকমের আলো ফুটিয়া উঠিল, সেই আলোর সাহায্যে দেখিলাম,—একটা প্রকাণ্ড হস্তী সটান আমাদের দিকে আসিতেছে, তাহার গায়ের ধাক্কায় চেয়ারগুলি এ দিক্ ও দিক্ ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে। অতটুকু ঘরের মধ্যে এত বড় একটা প্রকাণ্ড হাতী! ভয়ানক ব্যাপার! হাতীটা সত্যের হাতী কিংবা ওটা ভূত, তাহা ভাবিবার কাহারও সময় হইল না। হাতীটা আসিয়া কি করে না করে, তাহা দেখিবার কথাও কাহার মনে

আসিল না। হাতীটা যেন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে মনে হইল। যে লোকটা সিঁড়ির দরজার কাছে ছিল, সে তাড়াতাড়ি সেটা খুলিয়া ফেলিল। আমরাও ক্ষণবিলম্ব না করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উন্মত্তভাবে হুড়্ হুড়্ করিয়া সেই সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া পড়িলাম।

নামিয়া পড়িবামাত্র একটা বিশ্রী অট্টহাসি কানে আসিল। মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিলাম, ওটা হাতী নহে; ভূতের কাণ্ড। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার ফিরিয়া সেই ঘরে গেলেন; যাইয়া আলো জ্বালিলেন। দেখিলেন, ঘর শূন্য, পাশের ঘরও শূন্য, হাতীও নাই বা অপর কেহই নাই! ঐ দুই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবারও ঐ সিঁড়িটা ভিন্ন অন্য পথ ছিল না। আর আমরা ত সিঁড়ির কাছেই ছিলাম। কোন লোক যে ঐরূপ তামাসা করিয়া লুকাইয়া থাকিবে, এমন স্থানও ছিল না। ঘরে হাতীর চিহ্নও দেখা গেল না; কেবল দেখা গেল, চেয়ারগুলি ওলট্-পালট হইয়া পড়িয়াছে; আর সেই বড় কব্জা-খাটানো দরজার হুড়্কাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দুয়ারটাও খুলিয়া রহিয়াছে। তিনখানা চেয়ারও হাতীরূপী ভূতের বেগে আসিবার ফলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আমরা আবার বৈঠকে একত্র হইয়াছিলাম। একত্র হইয়া খুব হাসিলাম। সেই নাস্তিকটি আর আমাদের ঘরে আসিল না। সে চোঁচা দৌড় দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ভয়ে বাছাধনের আক্কেল-গুড়ুম্ হইয়াছিল। ঘরে কোট ও টুপী ফেলিয়া গিয়াছিল, সেগুলি লইতে আসিবারও সাহস হয় নাই। রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, এক জন ঐ জিনিসগুলি তাহাকে দিয়া আসিল। আমি তাহার পর সে লোকটাকে আর দেখি নাই। কিন্তু আমার কখন কখন জানিতে ইচ্ছা হয়, সেই গর্ব্বিত নাস্তিক এই ঘটনা দেখিয়া কি সিদ্ধান্ত করিয়াছে।”

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

প্রেত-তত্ত্বের সুফল-কুফল

প্রেত-ব্যবসায়ীরা "থিওসফিষ্ট" সম্প্রদায়কে বেশ একটা প্রীতির চক্ষুতে দেখেন না। উহারা কোন থিওসফিষ্টকে দেখিলেই বলিয়া থাকেন —"মহাশয়! কোন একটা অলৌকিক অদ্ভুত রকমের ঘটনা দেখিলেই আপনারা বলিয়া থাকেন যে, উহা কোন না কোন দেব, পরী বা ব্যোমচারী সয়তানের কার্য্য।" প্রেত-ব্যবসায়ীদিগের এরূপ ধারণা নিতান্তই ভুল। যিনি বাস্তবিক থিওসফিষ্ট অর্থাৎ যিনি বাস্তবিকই গুপ্তবিদ্যার কিছু না কিছু জানেন, তিনি কদাচ ওরূপ বলেন না। তিনি মাত্র এইটুকু বলেন যে, ভূত-প্রেত যেমন অলৌকিক কার্য্য দেখায়, কখন কখন দেব-যোনিরাও ঐরূপ কার্য্যের সংঘটন করিয়া থাকে। আর এ কথাটাও প্রকৃতপক্ষে সত্য। প্রেত-ব্যবসায়ী ও থিওসফিষ্ট এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অমূলক নিরর্থক মনোমালিন্য, অবিশ্বাস ও অসৌজন্য চলিয়া আসিতেছে। এরূপ দ্বেষা-দ্বেষি বাস্তবিকই দুঃখের কথা। এরূপ দেখা গিয়াছে, এক জন প্রেত-ব্যবসায়ী হয় তো এক জন থিওসফিষ্টকে যাহা মুখে আসিয়াছে, তাহাই বলিয়া গালাগালি করিতেছে; সে গালাগালির সীমা নাই, অবধি নাই; আবার হয় ত অন্য সময়ে এক জন থিওসফিষ্টও এক জন প্রেত-ব্যবসায়ীর উপর তীব্র ঘৃণার হলাহল বর্ষণ করিয়াছেন, অথচ প্রেত-ব্যবসায়ের মূল তত্ত্ব তিনি কিছুই জানেন না। এই উভয়ে যদি পরস্পরের মূল তত্ত্ব ভাল করিয়া অবগত হয়েন, তবে ইঁহাদের মধ্যে বিদ্বেষ থাকিতে পারে না, তখন উভয়েই উভয়কে সম্মান করিয়া চলেন। বাস্তবিকপক্ষে উভয়েই জগতের মহান্ হিতসাধনে বদ্ধপরিকর; বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে যেমন পরস্পরের মধ্যে একটা ঝগড়া-ঝাটি নাই, এই

পারলৌকিক অনুসন্ধানের বেলায়ও এইরূপ বিরোধের ভাব থাকা উচিত নহে। ঝগড়া-ঝাটি করা নিতান্তই নির্ব্বোধের কার্য্য।

থিওসফিষ্ট ও প্রেততত্ত্ববিৎ এ উভয়ের কার্য্যকলাপে সৌসাদৃশ্য আছে। উভয় দলই বলিয়া থাকেন যে, মানুষের আত্মা মরে না, নশ্বর দেহ নষ্ট হইয়া গেলেও তাহার প্রাণটা থাকিয়া যায় ও তখনও উন্নতির পথেই ধাবিত হইতে থাকে। এই বিশ্বাস উভয় সম্প্রদায়েরই মজ্জাগত ও কেন্দ্রীভূত। উভয় দলেরই বিশ্বাস যে, আমাদের ইহজীবনের কর্ম্মানুসারে পারলৌকিক জীবনের সুখ-দুঃখ নিরূপিত হইবে। ঈশ্বর আমাদিগের সাধারণ পিতা, আর আমরা সকল মানবেরই ভ্রাতৃসম্পর্কে সম্পৃক্ত; এ ধারণাও উভয় দলের মধ্যে প্রচলিত। উভয় সম্প্রদায়ই জানেন যে, পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য পারলৌকিক বিভূতির কাছে অতীব তুচ্ছ, ঘৃণ্য, নগণ্য। এ ক্ষেত্রে উঁহাদের মধ্যে কোন কোন তুচ্ছ বিষয়ে মতদ্বৈধ ঘটিলেও একটা বিদ্বেষভাব থাকা উচিত নহে। সংসারের অজ্ঞান ব্যক্তিবর্গকে প্রকৃত জ্ঞান দান করিবার নিমিত্ত উভয় সম্প্রদায়েরই পরস্পরকে ভাইয়ের মত সাহায্য করা উচিত। তাহা হইলেই প্রকৃত কাজ হইবে। আর সেইটাই কার্য্য-সাধিনী প্রণালী। এইরূপ ভাবে যদি আমরা কাজ করিয়া যাই, তবে কালক্রমে সকল পার্থক্যই বিদূরিত হইবে।

আমরা থিওসফিষ্ট বটে, কিন্তু আমাদেরও যুক্তিতর্কের একটা দার্শনিক শৃঙ্খলা আছে। "প্রেত-তত্ত্বজ্ঞ" ভায়ারা আমাদের দার্শনিক ভাবটা দেখিতে চান না, আর আমরাই বা গায়ে পড়িয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতে যাইব কেন? তাঁহাদিগকে শীঘ্রই বোধ হয় আমাদিগের মত জানিতে হইবে; তখন আমরা তাঁহাদিগকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিব। মরণের পর আমাদিগকে আবার এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এ বিষয়ে কোন কোন প্রেত-তত্ত্বজ্ঞ আমাদের সঙ্গে একমত; আবার কেহ কেহ ইহা স্বীকার বা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এই মতপার্থক্যে কি আইসে যায়? এই জন্মান্তর-বাদটা আমাদের কাছে খুবই আশাপ্রদ ও উপকার-জনক; কেন না,

ইহার সাহায্যে আমরা অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি। জন্মান্তর না মানিলে কোন কালেই কোন উপায়েই সে সব বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না। আমরা গায়ে পড়িয়া জোর করিয়া কাহাকেও কোন কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি না। আমাদের কার্য্যপ্রণালী সেরূপ নহে।

আমাদের ধারণা এই—মানুষ মরণের পর কিছু দিন সূক্ষ্ম-জগতে থাকে, তাহার পর আবার এই পৃথিবীতে জন্মে; আবার মরে, আবার জন্মে, এইরূপ বহুবার জন্ম-মৃত্যু দ্বারা তাহার জীবাত্মা ক্রমেই উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে থাকে। প্রতি জন্মেই তাহার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতে হইতে যায়। প্রেত-তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন—ঠিক সেরূপটা হয় না। তাঁহাদের মতে মানুষ উন্নতি করিতে করিতে ঊর্দ্ধদিকেই যাইতে থাকে, আর এ পৃথিবীতে আইসে না। মানুষ যে ক্রমেই উন্নতির পথে যাইতে থাকে, এ কথাটা আমরা দুই দলেই স্বীকার করি। অতএব যাহাতে এ জীবনের চরম উৎকর্ষ করিয়া পরলোকে আরও ভাল অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। যত্নশীল হইলে আমাদের মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। আমরা ক্রমেই উপরের দিকে যাইব, কি আবার ফিরিয়া আসিব, সে তুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া বাধাইবার প্রয়োজন কি? এখন আমরা সকলেই ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ; উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করাই এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। যখন সকলেই তুল্যরূপে উন্নত হইয়া উঠিব, তখন তর্ক-বিতর্ক করিয়া দেখা যাইবে যে, কোন্ সম্প্রদায়ের মত বা ধারণাটি সত্য আর কোন্‌টিই বা মিথ্যা, এখন সে বিচার করিতে যাওয়া নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন।

অজ্ঞ লোকে ভৌতিক কাণ্ড দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারে না। প্রেততত্ত্বজ্ঞদিগের বৈঠকে অনেক প্রকার ভৌতিক কাণ্ড-কারখানা দেখা যায়। আমরা কোন প্রেত-তত্ত্বজ্ঞের সঙ্গে ঝগড়া করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা জানি যে, ঐ সকল কাণ্ড সত্য সত্যই ঘটে, আর উহা দ্বারা সমাজের অনেক উপকারও হয়; কেন না, অনেক নাস্তিক ঐ ব্যাপার দেখিয়া

পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করে। বৈঠক নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলে, এটা কম উপকার নহে। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা অপরের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে চান না; তাঁহারা সব কাজই নিজে দেখিতে ও বুঝিতে চান। সেরূপ ধরণের লোকেরা ভৌতিক ব্যাপার দেখিলেও টের পান না; কেন না, দেখিবার মত চোখ, দেখিবার মত শক্তি তাঁহাদের কোথায়? এ সম্বন্ধে মিঃ ফুলার্টনের মন্তব্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

সূক্ষ্ম-জগতের বিষয় দেখা সহজ নয়; দেখিলেও দেখিলাম বলিয়া মনে হয় না। ঐ দেখার প্রণালী শিখিতে হয়। অনেক দিন ধরিয়া সাধনা করিলে তবে ঐরূপ দেখার শক্তি জন্মে। মানুষের প্রকৃতিগত অনেক ভ্রম-প্রমাদ আছে; অনেক যত্ন করিয়া সেগুলি পরিহার করিতে হইবে। কোন্‌টি প্রকৃত ব্যাপার, কোন্‌টি অপ্রকৃত, কোন্‌টি আসল, কোন্‌টি ভ্রম, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যখন স্থূল-জগতের অনেক বিষয়ও ঐরূপভাবে জানিবার আবশ্যক হয়, তখন দুর্ব্বোধ্য ঘোর জটিলতাপূর্ণ সূক্ষ্ম-জগতের কাণ্ড বুঝিতে যে খুবই বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাঁহারা বহুকাল ধরিয়া সূক্ষ্ম-জগতের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কথার অপেক্ষা, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত অধিকতর সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, তবে আমরা সেই অজ্ঞ ব্যক্তিকে একটা সৃষ্টিছাড়া জীব—একটা বর্জ্জিত বিধির স্থল বলিয়া মনে করিয়া লইব। ঐরূপ দাম্ভিক ব্যক্তির সংখ্যা কম নহে। তাহারা পৃথিবীর যাবতীয় লোক অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। উহাদের কি ভয়ানক অহঙ্কার! কি দারুণ ভ্রম! উহারা যদি সামান্য একটু মানব-প্রকৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তবে নিজেদের মূল্য বুঝিতে পারে, তখন ঐ অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। উহারা হয় তো কেহই কোন বিদ্যাতেই বিশেষজ্ঞ নহে, কেহই হয় তো উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিদ্ বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্ বা পদার্থবিদ্যাবিদ্ নহে, অথচ

সূক্ষ্ম-জগতের আলোচনায় পণ্ডিত সাজিয়া মনে করে যে, পৃথিবী-প্রথিত পণ্ডিতদের গবেষণার ফলের অপেক্ষাও উহাদের কথাই অধিকতর বিশ্বাস-যোগ্য।"—("থিওসফির প্রমাণাবলী", ৭ পৃষ্ঠা)।

যদি কোন ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের মীমাংসা মানিয়া না লইয়া নিজেই হাতে-কলমে কোন কিছু জানিতে চান, তবে তিনি প্রেততত্ত্বের বৈঠকে স্বয়ং ভৌতিক কাণ্ডকারখানা দেখুন। দেখিয়া দেখিয়া চোখ ফুটাইয়া লউন। এইরূপভাবে অনেক অবিশ্বাসীর চোখ ফুটিয়াছে। আমরা মনে করি, বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের কথা মানিয়া লওয়াই নিরাপদ উপায়; বৈঠকে যাওয়াটা তত নিরাপদ নহে, তাহাতে বিপদ্ অনেক আছে। আমরা যাহাকে তাহাকে বৈঠকে যাইবার উপদেশ দিই না।

ভূতের বৈঠকে যাওয়ার বিপদ

বৈঠক-বিহারীদের অনেক দোষ ঘটে। তাহারা খুব বেশী মাত্রায় বিশ্বাসী হইয়া উঠে। যুক্তি-তর্ক না করিয়াই ধাঁ করিয়া কোন কিছু বিশ্বাস করিয়া বসে। এত সহজে বিশ্বাসবান্ হওয়াটা বাস্তবিকপক্ষে একটা ভয়ানক দোষ। নাস্তিকের দল এটাকে হয় তো দোষ বলিয়াই মনে করিবে না, বা এরূপ হওয়াটা অসম্ভব মনে করিয়া তাহারা হয় তো আমাদের কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। কোন নাস্তিক যদি বৈঠকে রীতিমত যাওয়া-আসা করে, তবে আমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা, অচিরাৎ বুঝিতে পারিবে। তখন সে দেখিবে যে, তাহার বিশ্বাসের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে। ঘড়ীর পরিদোলকটা যেমন এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সরিয়া যায়, নাস্তিকের দশাও ঐরূপ ঘটে। তাহারও মনটা অবিশ্বাসের এক প্রান্ত হইতে বিশ্বাসের অপর প্রান্তে বে-মালুম সরিয়া যাইবে। তখন সে ভূতের কথাবার্ত্তাগুলিকে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইবে; ভূত টেবিল প্রভৃতি নড়াইয়া-চড়াইয়া যে সঙ্কেত করে, সেগুলিকে সে দেবতার কাজের মত পবিত্র বলিয়া মনে করিয়া লইবে।

বৈঠকে যাওয়ার আর একটা বিপদ আছে। সেটা এই যে, ভূত

অনেক সময় পিছনে লাগে। নিরন্তর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। সর্ব্বদাই যদি ভূত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে, তবে সে অবস্থাটা বড়ই অসুখের হইয়া উঠে। বৈঠকে সচরাচর বদ্‌মায়েস ভূত অনেক আইসে। নৈতিক জ্ঞানের লেশও তাহাদের নাই, ভয়ানক পাজী, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য; কেবল সেই সুযোগই খুঁজিয়া বেড়ায়। যে ভূতটা প্রধান হইয়া বৈঠকে কাজকর্ম্ম করে, সে ঐ সকল বদ্‌মায়েস ভূতের দলকে বাড়াবাড়ি করিতে দেয় না, সে উহাদের নিকট হইতে মিডিয়মকে রক্ষাও করে। কিন্তু বৈঠকের পরে যখন সভ্যেরা বাড়ী যায়, তখন ঐ বদমায়েসরা তাহাদের পিছনে লাগে। প্রধান ভূত সেটা নিবারণ করিতে পারে না। এ কথা শুনিয়া কোন নাস্তিক মনে করিতে পারে যে, আমি খুব দৃঢ়চিত্ত, ভয়শূন্য, আমার কাছে কোন ভূতের বাহাদুরী খাটিবে না। ভূত তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাড়ীতে আসিয়া হয় তো স্ত্রী বা কন্যাকে ধরিয়া বসিবে। সেটাই কি বাঞ্ছনীয়? নাস্তিক দৃঢ়চিত্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহার সকল আত্মীয়স্বজনই যে তাহার মত হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? এমন দেখা গিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি বহুবার বৈঠকে গিয়াও ভূতের হাতে পড়ে নাই, অথচ তাহার বাড়ীর লোকেরা ভূতের উপদ্রবে অস্থির। এখনও এরূপ কাণ্ড অনেক ঘটিতেছে। লেড্‌বিটার বলেন—"ভূতের নিরন্তর উপদ্রবে মানুষ পাগল হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ ঘটনা আমি অনেক দেখিয়াছি। আর বৈঠকে যাওয়াই তাহাদের ঐরূপ দুর্দ্দশার মূল। বৈঠক হইতেই ভূত তাহাদের পিছন ধরিয়াছিল।" যাহাদের মনের বল খুব বেশী, তাহারা উপদ্রবে ঠিক থাকিতে পারে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে না পড়িলে মনের বল আছে কি না আছে, তাহা কি করিয়া জানা যায়?

ভূতের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রয়োজন

যখন ভূত আসিয়া কাহাকেও ধরিয়া সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকে, জ্বালাতন করিয়া তুলে, তখন সেই ঘোর অশান্তির মধ্যে একটা

পরিত্রাণের উপায় আছে। কিছুতেই ভয় পাইব না, এইরূপ একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মনে মনে করিয়া তুলিতে হইবে। ভূতের শক্তির অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছা-শক্তি বেশী। ইচ্ছা-শক্তির কাছে ভূতের শক্তি পরাভূত হইয়া থাকে, এ তথ্যটুকু দৃঢ়তার সহিত বুঝিয়া রাখিতে হইবে। আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক মানুষেরই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে অর্থাৎ ইহলোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, সে স্বাধীনভাবে আপন ইচ্ছামত সঙ্গী নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে যদি তুমি ভূতের উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া থাক, তবে তোমার ঐ স্বাতন্ত্র্যের—ঐ স্বাধীনতার পরিচালনা কর, দেখিবে, সকল উপদ্রবের শান্তি হইয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে কুমারী ফ্রীয়ার তাঁহার "পারলৌকিক গবেষণাবলী" নামক পুস্তকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা তোমাদের প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সে উপদেশ এই ঃ—

"যদি তোমার মনে হয় যে, ভূত তোমার পিছনে লাগিয়াছে, প্লানচেটের মধ্য দিয়া যদি ভূতের সঙ্কেত বুঝিয়া থাক, টেবিলে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতেছে, যদি তাহা ভূতের ব্যাপার বলিয়া বুঝিয়া থাক, মাঝে মাঝে যদি অজ্ঞান হইয়া বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়, আর সেটাকে ভূতাবেশ বলিয়াই যদি তোমার মনে হয়, তবে ভূতের কথাটা মন হইতে একেবারে ভুলিয়া যাইবে। ঐরূপ ক্ষেত্রে একখানি বাইসাইকেল্ চাপিয়া বেড়াইতে যাইবে অথবা দুর্ব্বোধ্য হিব্রু ভাষা শিখিতে বসিবে, অথবা বেড়াইতে বাহির হইবে, অথবা বাগানের আগাছা সাফ করিতে বসিবে। মাথা ঠিক থাকিলে ঐরূপ একটা-না-একটা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। যদি ঠিক না থাকে, তবে সজ্জনের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার উপদেশমত চলিবে। আত্মসংযম থাকিলে ভূতে কিছুই করিতে পারে না। সংযমের অভাবই পাপ ও পীড়া।"

সূক্ষ্ম-জগতের আলোচনায় প্রতারণার সম্ভাবনা আছে

সূক্ষ্ম-জগতের আলোচনায় অনেক সময় প্রতারণা দেখা যায়। মিডিয়ম্ যে সব সময়ে প্রতারিত করে বা অন্য কোন লোক আসিয়া

অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে ঠকাইয়া বসে, তাহা নহে। ভূতযোনির মত অনেক সূক্ষ্ম ব্যোমচর ঐরূপ কাণ্ড করে। তাহাদের প্রতারণার মূলে হয় তো সদভিপ্রায় থাকে, তাহাদের উদ্দেশ্য হয় তো ভাল বৈ মন্দ নহে, তবুও সেটা প্রতারণা ত বটে! এরূপও দেখা যায় যে, একটা ভূত মানুষের কাছে আসিয়া নিজেকে অপর ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া কথাবার্ত্তা বলে। অবশ্য সদুদ্দেশ্যেই এরূপটা করে। মনে কর, একটা লোক মরিয়া ভুবর্লোকে যাইয়া উঠিল। যাইয়া তাহার পার্থিব আত্মীয়দের বড় একটা খোঁজ-খবর রাখিল না। আত্মীয়েরা শোকে মুহ্যমান হইয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিল। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কোন ভূত হয় তো আসিয়া বলে, আমি তোমাদের অমুক! এই পরিচয় দিয়া প্রবোধ দিতে থাকে। আবার এমনও হয়—যিনি মারা গিয়াছেন, তাঁহার জীবাত্মা হয় তো ভুবর্লোকেও নাই, সেখান হইতে হয় তো স্বর্লোকে চলিয়া গিয়াছেন; সুতরাং পার্থিব আত্মীয়দের কান্নাকাটি কিছুই জানিতে পারিতেছেন না! এ দিকে আত্মীয়েরা মনে করিতেছে, আমাদের অমুক বড়ই নির্দ্দয় হইয়া আমাদের মায়া কাটাইয়াছে। এই ভাবিয়া তাহারা আরও শোকাতুর হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রেও অনেক ভূত মৃত ব্যক্তি সাজিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দেয়। যে সকল ভূত এরূপ ব্যাপার করে, আমরা তাহাদিগের নিন্দা করিতে পারি না। তাহাদের এরূপ কার্য্য ভালও হইতে পারে, আবার মন্দও হইতে পারে। তাহাদের বিবেক যেরূপ বলে, তাহারা সেইরূপ করে। আমাদের সে বিষয়ে আলোচনা করিতে যাওয়া ঠিক নহে। আমরা কেবল বলিতে চাই যে, ঐরূপ ব্যাপার প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়া থাকে।

আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। মরণের সময় যেমন আমাদের স্থূলশরীরটা এখানে পড়িয়া থাকে, পরে ঠিক সেইরূপ একটা আতিবাহিক দেহ ভুবর্লোকে পড়িয়া থাকে আর তাহার ভিতর হইতে জীবাত্মা স্বর্লোকে চলিয়া যায়। কালক্রমে সেই পরিত্যক্ত

দেহটা নষ্ট হয় ("ভুবর্লোক" গ্রন্থের ৪৯—৫৩ পৃষ্ঠা দেখ)। ঐ পরিত্যক্ত দেহটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজেকে সেই দেহধারী আত্মীয় বলিয়া শোকবিধুর আত্মীয়ের কাছে দেখা দেওয়া আরও সহজ ব্যাপার। ভূতেরা এই সহজ পন্থাটাই বেশী সময় অনুসরণ করে।

মানবের জীবাত্মাই যে ঐরূপভাবে নিজেকে অপর বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রবোধ দিতে আইসে, তাহা নহে। পরী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ফূর্ত্তিবাজ ও সহৃদয় দেব-যোনিরাও অনেক সময় ঐরূপ কাণ্ড করে। নিম্নশ্রেণীর দেব-যোনিরা ক্রমোন্নতির হিসাবে বস্তুতঃ মানুষ অপেক্ষা নীচু। মানুষের কাছে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া তাহাদের আনন্দিত করিতে পারিলে তাহারা তাহাতে বেশ একটু আনন্দ অনুভব করে।

ঐ রকম দেব-যোনিরাই বৈঠকে আসিয়া আপনাদিগকে সেক্ষপীয়র, জুলিয়স্ শীজর, মেরী কুইন্ অব্ স্কটস্, জর্জ্জ ওয়াশীংটন প্রভৃতি ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেয়। আবার নিম্নশ্রেণীরাও ঐরূপ করে। এরূপ করিবার কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। ঐ নামগুলি জগদ্বিখ্যাত। উঁহাদের জীবাত্মা আসিয়াছেন শুনিলে বৈঠকের সভ্যেরা মহা আনন্দিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিবে। এই ভাবিয়া সম্মান উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে উহারা ঐরূপ কাণ্ড করিয়া থাকে। ময়ূরের পালক লইয়া দাঁড়কাক যেমন ময়ূর সাজিয়াছিল, উহাদের ব্যাপারও কতকটা সেইরূপ। উহারা হয় ত ভাবে—আর এরূপ ভাবাটা অসম্ভবও নহে—যে, মানুষ-গুলো বড় সহজেই যা তা একটা বিশ্বাস করিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রে আমরা যদি আপনাদিগকে খুব নামজাদা লোক বলিয়া পরিচয় দিই, তবে তাহারা তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসিবে। ঐ সকল দেব-যোনির ও ভূতের উদ্দেশ্য ভাল হইলেও কার্য্য-প্রণালীটা আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না।

ঐরূপ ঘটনা বিরল নহে। যখন-তখনই উহা দেখা যায়। নিউইয়র্ক শহরের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এড্মণ্ডস্ প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বহি

অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে ঠকাইয়া বসে, তাহা নহে। ভূতযোনির মত অনেক সূক্ষ্ম ব্যোমচর ঐরূপ কাণ্ড করে। তাহাদের প্রতারণার মূলে হয় তো সদভিপ্রায় থাকে, তাহাদের উদ্দেশ্য হয় তো ভাল বৈ মন্দ নহে, তবুও সেটা প্রতারণা ত বটে! এরূপও দেখা যায় যে, একটা ভূত মানুষের কাছে আসিয়া নিজেকে অপর ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া কথাবার্ত্তা বলে। অবশ্য সদুদ্দেশ্যেই এরূপটা করে। মনে কর, একটা লোক মরিয়া ভুবর্লোকে যাইয়া উঠিল। যাইয়া তাহার পার্থিব আত্মীয়দের বড় একটা খোঁজ-খবর রাখিল না। আত্মীয়েরা শোকে মুহ্যমান হইয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিল। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কোন ভূত হয় তো আসিয়া বলে, আমি তোমাদের অমুক! এই পরিচয় দিয়া প্রবোধ দিতে থাকে। আবার এমনও হয়—যিনি মারা গিয়াছেন, তাঁহার জীবাত্মা হয় তো ভুবর্লোকেও নাই, সেখান হইতে হয় তো স্বর্লোকে চলিয়া গিয়াছেন; সুতরাং পার্থিব আত্মীয়দের কান্নাকাটি কিছুই জানিতে পারিতেছেন না! এ দিকে আত্মীয়েরা মনে করিতেছে, আমাদের অমুক বড়ই নির্দ্দয় হইয়া আমাদের মায়া কাটাইয়াছে। এই ভাবিয়া তাহারা আরও শোকাতুর হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রেও অনেক ভূত মৃত ব্যক্তি সাজিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দেয়। যে সকল ভূত এরূপ ব্যাপার করে, আমরা তাহাদিগের নিন্দা করিতে পারি না। তাহাদের এরূপ কার্য্য ভালও হইতে পারে, আবার মন্দও হইতে পারে। তাহাদের বিবেক যেরূপ বলে, তাহারা সেইরূপ করে। আমাদের সে বিষয়ে আলোচনা করিতে যাওয়া ঠিক নহে। আমরা কেবল বলিতে চাই যে, ঐরূপ ব্যাপার প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়া থাকে।

আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। মরণের সময় যেমন আমাদের স্থূলশরীরটা এখানে পড়িয়া থাকে, পরে ঠিক সেইরূপ একটা আতিবাহিক দেহ ভুবর্লোকে পড়িয়া থাকে আর তাহার ভিতর হইতে জীবাত্মা স্বর্লোকে চলিয়া যায়। কালক্রমে সেই পরিত্যক্ত

দেহটা নষ্ট হয় (“ভুবর্লোক” গ্রন্থের ৪৯—৫৩ পৃষ্ঠা দেখ)। ঐ পরিত্যক্ত দেহটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজেকে সেই দেহধারী আত্মীয় বলিয়া শোকবিধুর আত্মীয়ের কাছে দেখা দেওয়া আরও সহজ ব্যাপার। ভূতেরা এই সহজ পন্থাটাই বেশী সময় অনুসরণ করে।

মানবের জীবাত্মাই যে ঐরূপভাবে নিজেকে অপর বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রবোধ দিতে আইসে, তাহা নহে। পরী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ফূর্ত্তিবাজ ও সহৃদয় দেব-যোনিরাও অনেক সময় ঐরূপ কাণ্ড করে। নিম্নশ্রেণীর দেব-যোনিরা ক্রমোন্নতির হিসাবে বস্তুতঃ মানুষ অপেক্ষা নীচু। মানুষের কাছে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া তাহাদের আনন্দিত করিতে পারিলে তাহারা তাহাতে বেশ একটু আনন্দ অনুভব করে। ঐ রকম দেব-যোনিরাই বৈঠকে আসিয়া আপনাদিগকে সেক্সপীয়র, জুলিয়স্ শীজর, মেরী কুইন্ অব্ স্কটস্, জর্জ্জ ওয়াশীংটন প্রভৃতি ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেয়। আবার নিম্নশ্রেণীরাও ঐরূপ করে। এরূপ করিবার কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। ঐ নামগুলি জগদ্বিখ্যাত। উঁহাদের জীবাত্মা আসিয়াছেন শুনিলে বৈঠকের সভ্যেরা মহা আনন্দিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিবে। এই ভাবিয়া সম্মান উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে উহারা ঐরূপ কাণ্ড করিয়া থাকে। ময়ূরের পালক লইয়া দাঁড়কাক যেমন ময়ূর সাজিয়াছিল, উহাদের ব্যাপারও কতকটা সেইরূপ। উহারা হয় ত ভাবে—আর এরূপ ভাবাটা অসম্ভবও নহে—যে, মানুষ-গুলো বড় সহজেই যা তা একটা বিশ্বাস করিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রে আমরা যদি আপনাদিগকে খুব নামজাদা লোক বলিয়া পরিচয় দিই, তবে তাহারা তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসিবে। ঐ সকল দেব-যোনির ও ভূতের উদ্দেশ্য ভাল হইলেও কার্য্য-প্রণালীটা আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না।

ঐরূপ ঘটনা বিরল নহে। যখন-তখনই উহা দেখা যায়। নিউইয়র্ক সহরের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এড্‌মণ্ডস্ প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বহি

লিখিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, বিস্তর দেব-যোনি ও ভূত আপনাদিগকে স্থইডেন্‌বার্গ, বেকন, ওয়াশীংটন, শার্লম্যান প্রভৃতি ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেক সংবাদ দিয়াছে। সেই সকল সংবাদ ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ সকল মহাত্মার যে বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি ছিল, ইহাদের কথাবার্ত্তায় সে বিদ্যাবুদ্ধির কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। যে সকল ভূত বেকন প্রভৃতি সাজিয়া সংবাদ দিয়াছে, তাহারা ঘোর অজ্ঞ; তাহাদের প্রদত্ত সংবাদও সেই একঘেয়ে রকমের, নূতনত্ব কিছুই নাই, সকল মিডিয়ম্‌ই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ঐরূপ একঘেয়ে কথা বলিতে থাকে; তাহা ছাড়া অনেকগুলি সংবাদ একেবারে মিথ্যা।

ঐরূপ কাণ্ডের একটা সুন্দর প্রমাণ অ্যালান কার্ডে প্রণীত "ভূতের কেতাব" নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকার সঙ্গে একটা নামের তালিকা দেওয়া আছে। তালিকাটি এই :—"সেণ্ট্‌ আগষ্টাইন্‌, সেণ্ট ভিন্সেণ্ট্‌ ডিপল্‌, সেণ্ট লুই, ট্রথের দেব-যোনি, সক্রেটীস্‌, প্লেটো, ফেনিলন্‌ ফ্রঙ্কলিন্‌, স্থইডেনবার্গ, ইত্যাদি ইত্যাদি।" তালিকাটির শেষে "ইত্যাদি, ইত্যাদি" আছে ঐ "ইত্যাদি" শব্দটি বড়ই রহস্যজনক। উহা পড়িলেই লোকে বিস্মিত হইয়া পড়ে আর ভাবিতে থাকে, ঐ সব নাম ছাড়া ঐরূপ বিখ্যাত নামের বিষয় ভূতের কি তবে সে সময় আরও মনে আসিয়াছিল ?

ঐরূপ বাড়াবাড়ি করিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতে আসায় উহাদের জুয়াচুরী অতি শীঘ্রই ধরা পড়ে; লোকে টের পাইয়া ফেলে। ওয়াশীংটন্‌, বেকন্‌ প্রভৃতির মত জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি না সাজিয়া ভূত যখন কোন সাধারণ ব্যক্তি সাজিয়া আইসে, তখন চিনিয়া উঠা একটু শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। যদি মিডিয়ম্‌ সত্যসত্যই সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তবেই সে ঐরূপ ছদ্মবেশী ভূতকে চিনিয়া উঠিতে পারে; নচেৎ পারে না। লেড্‌বিটার প্রণীত "ভুবর্লোক" নামক গ্রন্থের ১০৮ পৃষ্ঠা হইতে আমরা নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম :—

"বৈঠকে যে সব ভূত আইসে, তাহারা প্রায়ই আসল ভূত। আবার কখন কখন ছদ্মবেশী ভূতও দেখা দেয়। সাধারণ সভ্যের পক্ষে কোন্‌টা প্রকৃত ভূত আর কোন্‌টা ছদ্মবেশী, তাহা বুঝিয়া উঠা নিতান্ত অসম্ভব; কেন না, ভূতেরা সূক্ষ্ম-জগতে থাকায় সেখানকার শক্তি উহারা এত আয়ত্ত করিয়া ফেলে যে, তাহা দ্বারা মানুষকে অতি সহজেই প্রতারিত করিতে পারে। মানুষ সহস্র চেষ্টায়ও উহাদের কৌশল ভেদ করিতে পারে না।

"তোমার সহোদর মনে কর বহুদিন হইল মারা গিয়াছে। হঠাৎ একটা ভূত আসিয়া বৈঠকে তোমাকে বলিল—আমি তোমার ভাই এসেছি। তুমি শুনিয়া মনে করিলে, সত্যই আমার ভাই এত দিন পরে আসিয়াছে! কিন্তু সে যে তোমার ভাই, ইহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। হয় তো ঐ ভূতটা এমন সব গূঢ় কথা তোমাকে বলিল, যাহা তোমার ভাই-ই জানিত আর তুমি জান, তাহা ছাড়া আর এক প্রাণীও জানে না। ইহা দেখিয়াই কি তুমি মনে করিবে যে, তবে ঐ ভূত সত্যসত্যই তোমার ভাই। ঐরূপ ধারণা করাও তোমার অন্যায়। কারণ, যে কোন ভূতই তোমার অন্তঃকরণ দেখিতে পাইতেছে; তোমার মন হইতে জানিয়া কিংবা ভুবর্লোক-সুলভ জ্ঞানালোকের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া যে কোন ভূতই ঐ গূঢ় কথা বলিয়া দিতে পারে। আবার যদি এমন ঘটনা হয় যে, ভূত খুব বড় রকমের একটা গুপ্ত বিষয় বলিয়া দিল, যে বিষয়টি তুমিও জান না, ভূতের মুখে শুনিয়া পরে অনুসন্ধান দ্বারা জানিলে যে, উহা সত্য, তবে তাহাতেই কি মনে করিবে যে, ভূত তোমার ভাই? তাহাও মনে করিতে পার না। কেন না, প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক ব্যাপার সূক্ষ্ম-জগতে লিপিবদ্ধ আছে। ভূত উহা সেখানে দেখিয়াও তোমার কাছে ভাই সাজিয়া বাহাদুরী দেখাইবার জন্য বলিতে পারে। সকলেই যে ছদ্মবেশে আইসে, তাহা নহে। প্রকৃত আত্মীয়ের জীবাত্মাও অনেক আবশ্যক কথা বলিয়া যায়। আমাদের বক্তব্য এই যে, যেমন সত্যকার, তেমনই ছদ্মবেশী ভূতও আইসে, সাধারণ সভ্যেরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।"

আমরা জানি, প্রতারণা করা অসম্ভব নহে, হইয়াও থাকে। তথাচ, অনেক স্থলেই ভূতেরা অকপটে নিজেদের নাম প্রকাশ করে। প্রতারণা করিবার সময় আপনাদিগকে যে লোক বলিয়া পরিচয় দেয়, অনেক সময় সেই লোকের অবিকল মূর্ত্তিই ধরিয়া বসে।

মিডিয়মের অপকার সাধিত হয়

প্রেত-তত্ত্বের অনুষ্ঠানে আর একটি কুফল ঘটিয়া থাকে। বৈঠকের পরে মিডিয়মের শরীর যে কতদূর অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহা আমরা ইহার পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেহ এত অবসন্ন হয় যে, অনেক সময় প্রকৃতিস্থ হইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সুরা পর্য্যন্ত পান করিতে দেখা যায়। এইটিই যে একমাত্র কুফল, তাহা নহে। নৈতিক চরিত্রও হীন হইয়া পড়ে। অনেক বৈঠকে মিডিয়ম্ টাকা লয়; টাকা লইয়া সভ্যদিগকে ভৌতিক কাণ্ড দেখায়। এটা খুবই গর্হিত কার্য্য। মিডিয়ম্ বলিয়া দিল—লোকপিছু এত করিয়া দিলে আমার বৈঠকে সভ্য হইয়া বসিতে পারিবে। এইরূপভাবে টাকা লইয়া বৈঠকের ব্যবসায় করিতে করিতে মিডিয়ম্ দিন দিন লোভী হইয়া পড়ে। ইচ্ছা করিয়া লোভের বশীভূত হওয়া কোন মানবেরই কর্ত্তব্য নহে। ভৌতিক কাণ্ড যাহারা দেখিয়াছে, তাহারাই জানে যে, ভূতের দেওয়া সংবাদ অনেকগুলিই মিথ্যা হইয়া থাকে। মিডিয়মের শক্তি খুবই কম, ভূতের অনুগ্রহ ও খেয়ালের উপর তাহাকে অনেক সময় নির্ভর করিতে হয়। ক্ষেত্র যখন এইরূপ, তখন পরের কাছে টাকা লইয়া যদি তাহাকে খাঁটি সংবাদ মিডিয়ম্ দিতে না পারে, তবে তাহাকে বড়ই সঙ্কটে পড়িতে হয়। আবার ঠিক সংবাদ দিব, ভৌতিক কাণ্ড দেখাইব, বলিয়া মিডিয়ম্ টাকা লইয়া বৈঠক করিয়া বসিল, অথচ ভূত সেদিন আসিল না, এরূপ ঘটনাও হয়; এরূপ হইলে তাহাকে বিষম লজ্জায় পড়িতে হয়। যাঁহারা প্রেত-তত্ত্বের আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এ ব্যাপার অবগত আছেন।

কুমারী গুড্রিচ ফ্রীয়ার তাঁহার "সূক্ষ্ম-জগতের গবেষণাবলী" নামক পুস্তকে এ কথার সমর্থন করিয়া যে কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, পরলোকের কাণ্ডকারখানা আয়ত্ত করিতে যাওয়া মানুষের পক্ষে মহা গর্হিত কার্য্য। * * * ভগবানের আদেশে দেবদূত ও মানব সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। তাঁহারই আদেশে দেবদূতেরা কখন কখন পৃথিবীতে আসিয়া মানবের উপকার করে সত্য ; তাই বলিয়া তাহারা মানবের রঙ-তামাসা দেখাইবার ভৃত্য নহে। কখন কখন তাহারা মানবের ভবিষ্যৎ বলিয়া দেয় সত্য ; তাই বলিয়া মানুষ দোকান খুলিয়া বসিয়া একটি করিয়া 'গিনি' ফী লইয়া তাহাদিগকে ডাকিলেই যে তাহারা আসিবে, তাহা নহে। সাধনা-বলে আমরা খানিকটা সময়ের জন্য অতীন্দ্রিয়-শক্তি লাভ করিয়া অনেক কথা যে বলিয়া দিতে পারি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যখন-তখন যেখানে-সেখানে পারলৌকিক তত্ত্ব আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।"

তাই বলিতেছিলাম, মনে কর, এক জন মিডিয়ম্ আগে হইতে টাকা লইয়া বৈঠকে বসিয়াছে। ভূতের কাণ্ড-কারখানা দেখাইবে, এই কথা। কিন্তু ভূত আদৌ আসিল না, কোন কাণ্ডই হইল না। এ দিকে সভ্যেরা টাকা দিয়াছে, তাহারা ছাড়িবে কেন? তাহারা দেখিবার জন্য বসিয়া আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে মিডিয়ম্ কি করে? উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে মহা-জুয়াচুরীর আশ্রয় লয়। প্রতারণা করিয়া সভ্যদিগকে ঠকান মিডিয়মের পক্ষে খুবই সহজ। তখন সে তাহাই করিতে বসে। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, সভ্যেরাই মিডিয়ম্‌কে ফী দিয়া তাহাকে এইরূপ প্রতারণার পথে লইয়া যায়। সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে গেলে সভ্যেরাই আপনাদিগকে আপনারা এক হিসাবে প্রতারিত করে। ফী দিয়া, লোভ দেখাইয়া, কাহাকেও ঐরূপটি করিয়া তোলা আমাদের উচিত নহে।

অতত্রব মিডিয়ম্ জুয়াচুরী করিলে শুধু যে সেই নিন্দনীয়, তাহা নহে, যাহারা ফী দিয়া তাহাকে ঐ দশায় আনিয়াছে, তাহারাও সেই জন্য নিন্দার ভাজন সন্দেহ নাই।

প্রেত-তত্ত্বের ফলে জীবাত্মারও ক্ষতি হয়

প্রেত-তত্ত্বের আলোচনায় মৃত ব্যক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মরণের পর কোন কোন লোক জীবিত আত্মীয়দের কাছে মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া প্রাণের ভার কমাইতে আইসে। সেরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে আসিবার সুযোগ দেওয়া নিতান্তই কর্ত্তব্য; কিন্তু জীবাত্মার ঐরূপভাবে আসা খুবই বিরল। কদাচিৎ কখন এইরূপভাবে আইসে। আবশ্যক হইলে মৃত আত্মীয়েরা নিজেরাই আমাদিগকে খুঁজিয়া আমাদের কাছে আইসে। তাহারা যাহাতে আপনা হইতে আইসে, সেইটিই ভাল। চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে আনা আমাদের নিতান্তই অন্যায়। কেহ কেহ বলে, মৃত পুত্রকে মা যদি দেখিতে চাহেন, তবে কি সেটা স্বাভাবিক নহে? আমরাও তাহা হইলে বলিতে পারি, ঐ পুত্রটির পক্ষে কোন্‌টি মঙ্গলজনক? নিঃস্বার্থভাবে চিন্তা করা মায়ের পক্ষে আরও স্বাভাবিক হওয়া উচিত। নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সন্তানের কষ্ট উৎপাদন করা কখনই মায়ের কর্ত্তব্য নহে। মানুষ মরিতে মরিতেই জীবিত আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারে। তাহাতে তাহার বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু তাহাকে বেশী বেশী বার পৃথিবীতে আনিলে পৃথিবীর মায়া সে কাটাইয়া উঠিতে পারে না। তাহাতে সে স্বর্লোকে যাইতে পারে না; পৃথিবীর কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে অবস্থাটা তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর।

প্রেত-তত্ত্বের স্থান ও কার্য্য

প্রেত-তত্ত্বের অশেষবিধ কু-ফল থাকিলেও উহারও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। উহা অসংখ্য নর-নারীর মহা উপকারসাধনও করিয়া থাকে।

খৃষ্টধর্ম্মের "ক্যাথলিক" সম্প্রদায় ও "মুক্তিসেনা" সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর বিরোধ ও মতের ভয়ানক পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ তাহারা একই ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করে। তাহারা একই ধর্ম্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। উহাদের প্রত্যেকেরই স্থান ও কার্য্য আছে। সেইরূপ থিওসফি ও প্রেত-তত্ত্ব একই পারলৌকিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট; উহাদের প্রত্যেকেরই স্থান ও কার্য্য আছে। যাঁহারা আমাদের মত ও ধারণা জ্ঞাত আছেন, প্রেত-তত্ত্বের ব্যাপার তাঁহাদের ভাল লাগে না। প্রেত-তত্ত্বের সেই একঘেয়ে ব্যাপার—মিডিয়ম্ সব স্থানেই তন্দ্রাচ্ছন্ন। সেই একই রকমের একঘেয়ে ভূতের কাণ্ড—এ সব তাহার ভাল লাগে না। আবার যাহারা ঐ রকম ভূতের কাণ্ড দেখিয়া তৃপ্তি পায়, যাহারা ভূতের কথাগুলিকে ডাক্তার "ডী"র মত বেদ-বাণী বলিয়া মনে করে, তাহারা আমাদের গবেষণা-প্রণালীতে সুখ পায় না। তাহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রেত-তত্ত্বেই মিটিয়া থাকে।

প্রেত-তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যেও আবার অনেক প্রকার দল আছে। প্রকার-ভেদ সর্ব্ব-বিভাগেই দেখা যায়। প্রেত-তত্ত্বের বেলায়ই বা অন্যরূপ হইবে কেন? প্রেত-ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক দল আছে, তাহারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়; আর সেই অবস্থায় ভূত ঘাড়ে চাপিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে থাকে। রবিবারে রবিবারে এই দলের কার্য্য হয়। যাহারা এই দলের ভক্ত, তাহারা ভূতের ঐরূপ কার্য্যগুলিকে বিশ্বাস করিয়া চলাই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া ভাবে। অন্যান্য ব্যক্তি যেমন উপাসনার্থ গির্জ্জায় যায়, এক দল সেইরূপ মহাভক্তির সঙ্গে ভূতের কথা শুনিতে ছুটে। এই দল ঘোর স্বার্থান্ধ; ইহারা নিজের নিজের গুপ্তকথা, গুপ্ত অভিসন্ধি জানিবার জন্য আপন আপন মৃত আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যেই মহাব্যস্ত থাকে। আর একটা দল দেখা যায়, তাঁহারা সৎ ও নিঃস্বার্থ। যাহারা অজ্ঞান, অনুন্নত, পতিত, তাহাদের উন্নতি-সাধন করাই এই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য। আর ইঁহারা এবম্প্রকার উন্নতি করিয়াও থাকেন। ইঁহাদের দ্বারা অনেকেই উপকৃত। আবার অন্য দল আছেন, তাঁহারা কাহারও উপকারে

ব্রতী নহেন। তাঁহারা সূক্ষ্ম-জগৎ, পরলোক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-গুলি বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণের সঙ্গে বুঝিয়া লইতে চাহেন। ইহাতেই তাঁহাদের সুখ ও পরিতৃপ্তি। ইঁহারা অল্পদিনেই বুঝিতে পারেন যে, ইঁহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর ভূতের বৈঠকে মিলে না। তখন আমাদের থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ই তাঁহাদের প্রাণের পিপাসা মিটাইতে অগ্রসর হয়।

অনেক সময় লোকের মুখে একটা প্রশ্ন শুনিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা মরণের পর আসিয়া আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে, তাহারা পুনর্জ্জন্ম বিষয়ে কোন কথা বলে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। প্রথমতঃ, কেহ কেহ পুনর্জ্জন্মের উপদেশ সত্য সত্যই দিয়া থাকে। ফ্রান্সে আংলান্ কার্ডের সম্প্রদায় ইহজীবনের পর পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করেন। ঐ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি মরণের পর আসিয়া দেখা দিলে তাঁহার মুখে আমরা পুনর্জ্জন্ম-বিষয় শুনিতে পাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকার লোকেরা পুনর্জ্জন্ম-বিষয়ে কিছুই জানেন না। তাই, এই দুই দেশের ভূতের মুখে আমরা ঐ বিষয়ের কোন কথাই শুনিতে পাই না। আমরা বহুপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, জীবাত্মা ভুবর্লোকে বেশী দিন থাকে না, কারণ, শরীর ধরিয়া তথা হইতে স্বর্লোকে চলিয়া যায়; সুতরাং পুনর্জন্মের জটিল তথ্যগুলি সে মরণের পরও ভালরূপে জানিতে পারে না। পার্থিব জীবনে যতটুকু জ্ঞান ছিল, মরণের পর ততটুকু জ্ঞানই থাকিয়া যায়। তাই ভূত হইয়া ঐ তথ্য বলিতে আসিলেও সেই আগেকার জ্ঞান অনুসারেই কথা বলিয়া থাকে, নূতন কথা কিছুই বলিতে পারে না। তবে যদি কোন থিওসফিষ্টের বা ভারতীয় মহাপুরুষের জীবাত্মার কাছে ঐ বিষয়ের তথ্য জ্ঞাত হইবার সৌভাগ্য তাহার ঘটে, তাহা হইলে তাহার মুখে অনেক নূতন কথা শুনা যায়।

কখন কখন ভূতের বৈঠকে পুনর্জ্জন্মের সমর্থন-সূচক প্রমাণ পাওয়া যায়। মনসিয়র গেব্রিল ঐরূপ অনেকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া একটা প্রেত-তত্ত্বের সভায় কয়েক বৎসর হইল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃঃ

১৩ই ডিসেম্বরের "প্রগ্রেসিভ-থিঙ্কার" পত্রিকা হইতে আমরা একটি অদ্ভুত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

যে বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, সেটি পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পত্রের আকারে প্রেরিত হইয়াছিল। স্বাক্ষর ছিল—এস্ ও, স্থান—মেক্সিকো ; তারিখ অস্পষ্ট। বিবরণটি এই :—

পূর্ব্বজন্মের কথা

"আমি কোন ধর্ম্ম-মতের সমর্থন করিতে বসিয়া এই পত্রখানা লিখিতেছি না। স্ব-চক্ষুতে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আপনাকে জানাইতেছি। যে ঘটনা বলিতে যাইতেছি, তাহা ২৮ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তখন আমি মিডিয়ম্ কাহাকে বলে, মিডিয়মের কার্য্য কি, এ সব ব্যাপার আদৌ বুঝিতাম না ; পুনর্জ্জন্ম বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহাও জানিতাম না। তখন আমার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। এক বৎসর হইল আমার বিবাহ হইয়াছিল।

"আমার গর্ভ হইল ; আর তখন হইতেই আমার মনে হইতে লাগিল, যেন একটা প্রেত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। আমি যেন বেশ সহজেই বুঝিয়া ফেলিলাম, আমার সঙ্গীটি প্রেত, আর আমার অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড়। প্রেতটা ক্রমেই পরিস্ফুট হইতে লাগিল। আমার গর্ভ যখন তিন মাস, প্রেতটা তখন দেখা দিয়া গল্প স্বল্প আরম্ভ করিয়া দিল। সে আমাকে বলিত, 'তুমি স্বাস্থ্যের দিকে বেশ লক্ষ্য রাখিবে।' তাহার গলার স্বর আমি বেশ সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিতাম, তাহার সঙ্গে অনেক-ক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া বেশ একটু আরাম বোধও করিতে লাগিলাম। আমার কাছে সে তাহার নাম, জাতি ও জীবনের খুঁটি-নাটি সকল কথাই বলিয়াছিল। আমার ভালবাসা পাইবার জন্য সে অস্থির। সর্ব্বদাই সে আমাকে দেখা দিবার চেষ্টা করিত। পরিশেষে জীবিত মানুষের মত আমার সঙ্গিনী হইয়া উঠিল। আমি ঘরটা বন্ধ করিয়া বসিলেই ঘরের

মধ্যে তাহার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিত। তখন আমি তাহাকে বেশ দেখিতে ও তাহার কথাও বেশ শুনিতে পাইতাম।

"আমার প্রসবের ২।৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে সে আমাকে বলিল—'আমার বড় অসময়ে মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর কোন সুখই আমার ভোগ করা হয় নাই; তাই মনে করিয়াছি, তোমার যে সন্তান জন্মিবে, আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পার্থিব সুখ ভোগ করিব। এই উদ্দেশ্যেই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছি।' আমি তাহার কথা খুব ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারিলাম না, মনটাও কেমন অস্থির হইয়া পড়িল, একটা প্রেত আমার সন্তানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে ভাবিয়া মন বড় চঞ্চল হইয়া পড়িল।

"যে রাত্রিতে আমার সন্তানটি জন্মিল, তাহার পূর্ব্ব-রাত্রিতেও আমি সেই প্রেতটাকে দেখিয়াছিলাম। তাহার পর তাহাকে আর দেখি নাই। সেই রাত্রিতে দেখা দিয়া সে বলিল—'আমাদের সময় নিকট হইয়া আসিয়াছে; ভয় করিও না, মঙ্গল হইবে।'

"একটা মেয়ে হইল। দেখিতে অবিকল সেই প্রেতটার মত। আমার মত বা উহার জনকের মত বা আমাদের কুলের কাহারও মতই হইল না। মেয়েটিকে দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিল—'এ কিরূপ মেয়ে রে বাবা! মেয়ে বলিয়াই মনে হচ্ছে না, যেন ২০ বছরের নারী!"

"কিছু দিন পরে সংবাদ-পত্রে আমি একটা স্ত্রীলোকের জীবনী পড়িয়া দেখি যে, সেটা সেই প্রেতেরই জীবনী। সে সব কাহিনী আর কেহই জানিত না, প্রেত আমাকে বলিয়াছিল, তাই আমি পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। আমিও কথাগুলি পেটে করিয়া রাখিয়াছিলাম, কাহারও কাছে উহার বিন্দুবিসর্গ পর্য্যন্ত বলি নাই। আমি অল্পবয়স্কা হইলেও বুঝিয়াছিলাম যে, কথাগুলি সাধারণ্যে ব্যক্ত হইলে প্রেতের নিন্দা রটিবে।

"মেয়েটি পনের বৎসর বয়স্কা হইলে, আমি তাহার নিকটে প্রেতের কথাটা অসাবধানে বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। সে তাড়াতাড়ি আমার কাছে

আসিয়া বলিল—'মা, আমার বাবা আমাকে অমুক নামে ডাকিতেন না কি?' (মেয়ের বয়স যখন এক বৎসর, তখন তাহার জনক মারা যান)! আমি বলিলাম—'না, মা; ও নাম তোমার কখনই ছিল না।' মেয়ে বলিল—'আমার যেন বেশ মনে পড়ছে যে, আমাকে ঐ নামে কেহ না কেহ ডাকিত!'

"পরিশেষে আমি এই বলিতে চাই যে, আমার মেয়ের চরিত্রটাও ঠিক সেই ইতিহাস-প্রথিত রমণীরই মত হইয়াছিল।

"মহাশয়, এই আমার বক্তব্য। ইহাতে যদি কোন ধর্ম্মমতের সমর্থন হয়, খুবই ভাল। বাস্তব ঘটনাই মতের উৎকৃষ্ট পোষক। আমি যাহা সত্য ঘটনা, তাহাই বলিলাম। সত্য ঘটনা নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া নিজেই দাঁড়ায়, উহা মতামত দেখিতে চাহে না। আমি যাহা বলিলাম, তাহা খাঁটী সত্য।"

যত মিডিয়ম্ দেখা যায়, তাহার মধ্যে ম্যাডাম ডি এস্পারান্সই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও বিদুষী। তিনি জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেন। এক জন মৃত বন্ধুর জীবাত্মা না কি তাঁহাকে ঐ ব্যাপার ও থিওসফির আরও অনেক তথ্য জানাইয়াছিলেন। "ছায়া-রাজ্য" নামক পুস্তকে তিনি ঐ কথা লিপিবদ্ধও করিয়া রাখিয়াছিলেন। একবার না কি তিনি স্থূল-শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম-দেহের অবস্থাটা খানিক ক্ষণের জন্য অনুভব করিয়া দেখিয়াছিলেন। এইটিই তাঁহার একটা অদ্ভুত কাণ্ড। তখনই তিনি কার্য্য-কারণ-বাদ, ক্রমোন্নতি, জন্মান্তর এই সব ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন। আর তখনই বুঝিলেন যে, সকলের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। সকলেই একই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। মানুষের এ তথ্যটা খুব পরিস্ফুটভাবে প্রচারিত বা পরিব্যক্ত না থাকিলেও বস্তুতঃ একই সত্তা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। বৈঠকে ভূতেরা যে জীবন-পথের পরিচয় দেয়, তাহাতেও কর্ম্মবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূতেরা বলে—"এ পথ তোমরাই প্রস্তুত কর; ইহা ব্যতীত তোমাদের অন্য পথ নাই।"

ম্যাডাম্ নিম্নলিখিত ব্যাপারে ক্রমোন্নতির তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন। সূক্ষ্মদেহী হইয়া জ্ঞান-নেত্রে তিনি দেখিলেন যে, শত শতবার তিনি শত শত প্রকার দেহ ধারণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার একই জীবন কখন পাহাড়ে, কখন বালুকায়, কখন সমুদ্রে, কখন ঘাসের শীষে, কখন গাছে, কখন ফুলে, কখন বা জীবজন্তু হইয়া পরিভ্রমণ করিয়াছে। ইহাতেই বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন ক্রমোন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে। তিনি দেখিলেন, জগৎটিই ক্রমোন্নতির দিকে ছুটিয়াছে।

জন্মান্তর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"ঐশ আত্মা মানবশরীরে দেখা দিলে প্রথমেই শরীর পূর্ণাঙ্গ হয় না। মানব-দেহেরও তারতম্য আছে। সকল মানুষ সমান উন্নত নহে। অসভ্যদিগের দেহ ধারণ করিয়া জীব তখন হইতেই বহুদর্শিতা ও নূতন নূতন শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এক দেহে যতটা শিক্ষা হইতে পারে, তাহা হইয়া গেলে সে দেহত্যাগ করিয়া অন্য দেহ ধারণ করে। এইরূপে শত শত দেহ ধারণ করিয়া ক্রমেই জ্ঞানের গণ্ডী বর্দ্ধিত করিয়া লয়। প্রত্যেক দেহে একটা একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া যায়, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উন্নতি করিতে করিতে যায়। নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইয়া গেলেই সে দেহ বিনষ্ট হয়। "বিনষ্ট হয়"—অর্থাৎ যে উপাদানে ঐ দেহ গঠিত, সেই উপাদানে যাইয়া মিশিয়া পড়ে। আবার ঐ সব উপাদান দেহ-মুক্ত জীবের ভাবী দেহের গঠনে কাজে লাগে। এইরূপ উন্নত হইতে উন্নততর দেহ ধারণ করিয়া জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করে ও দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।" (৩৭৬ পৃষ্ঠা)।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

স্বর্লোক

সকল ধর্ম্মই বলে যে, স্বর্গ আছে। পৃথিবীতে ভালভাবে জীবন যাপন করিতে পারিলে স্বর্গের সুখ-ভোগে অধিকারী হওয়া যায়, এ কথা সকল ধর্ম্মই ঘোষণা করিয়া থাকে। খৃষ্টান ধর্ম্ম আর মুসলমান ধর্ম্মের মত এই যে, মানুষ ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তিনি মানুষকে পুরস্কারস্বরূপ "স্বর্গসুখ" দান করেন। আর অন্যান্য বেশীর ভাগ ধর্ম্মেই বলে যে, স্বর্গভোগ ইহজীবনেরই পরিণাম; অর্থাৎ ইহজীবন ধর্ম্মপথে কাটাইতে পারিলে তাহার ফলে স্বর্গভোগ ঘটিবেই ঘটিবে, ভগবানের দয়ার কোন কথা নাই, মানুষ আপন জোরেই স্বর্গে যাইবে। আমরা থিওসফিষ্ট, আমরাও এই কথা বলি। সকল ধর্ম্মেই স্বর্গের মনোমোহিনী বর্ণনা আছে, কিন্তু কোন বর্ণনাই মানুষের মনের উপর একটা ছাপ দিতে পারে নাই। কোনটিই যেন মানুষ মনে প্রাণে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতে পারে না। বর্ণনাগুলি এত অস্বাভাবিক যে, আমাদের কাছে তাহা ঘোর অসম্ভব ও কিম্ভূত বলিয়া বোধ হয়; কেন না, ওরূপ ব্যাপার আমরা কুত্রাপি দেখিতে পাই না। সকল দেশেই স্বর্গের গল্প-সল্প প্রচলিত আছে। আমরা বাল্যকাল হইতেই ঐ সকল কাহিনী শুনিয়া আসিতেছি। শুনিয়াও কিন্তু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। এই অসম্ভব ব্যাপারের বর্ণনা সকল জাতির ধর্ম্মেই আছে। নিজেদের দোষ ত্রুটি লোকে বড় একটা দেখিতে চাহে না, তাই পরের ত্রুটির দিকেই বেশী বেশী রকম চোখটা পড়ে। বৌদ্ধ ও হিন্দুরা স্বর্গের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—স্বর্গে খুব বড় বড় বাগান আছে, এত বড়

যে, তাহার পরিমাণ কল্পনা করা যায় না, অনন্ত—অসীম বলিলেও চলে; সেই বাগানে না কি নানাবিধ তরু; তরুগুলি স্বর্ণের, কতকগুলি বা রৌপ্যের। ঐ সকল তরুর ফলও নানাবিধ, আর সেগুলি নাকি মণি-মাণিক্য! এই বর্ণনা শুনিয়া আমাদের হাসি পাইলেও হাসিতে পারি না; কেন না, ঐরূপ ভাবের বর্ণনা আমাদের ধর্ম্ম-পুস্তকেও আছে। আমাদের ধর্ম্মপুস্তকে বর্ণনা আছে যে, স্বর্গের রাস্তাগুলি স্বর্ণের, আর তোরণগুলি মুক্তার!

ঐ সকল বর্ণনার মধ্যে একটা বিবেচনা করিবার কথা আছে। কথাটি এই যে, বর্ণনাগুলির সাদা অর্থ বুঝিতে গেলে উহা অসম্ভবই হইয়া উঠে। উহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সত্যটুকু এই যে, স্বর্গের সুখ অসীম, অনন্ত, অনুপমেয়, অনির্ব্বচনীয়। বর্ণনা করিয়া সে সুখ বুঝাইয়া দিতে না পারিলেও যে যতটুকু পারিয়াছে, যেমন পারিয়াছে, তাহারই চেষ্টা করিয়াছে মাত্র। চেষ্টাই করিয়াছে সত্য, কিন্তু কেহই বুঝাইতে পারে নাই; সকলেই তুল্যরূপে অকৃতকার্য্য। হিন্দুদের মধ্যে যে লেখক স্বর্গের চিত্র আঁকিয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি ভারতীয় নৃপেন্দ্রদিগের মনোরম উদ্যান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া স্বর্গের ঐরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। য়িহুদী লেখকদিগের ভাগ্যে ওরূপ উদ্যান দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। য়িহুদী লেখক হয় ত প্রকাণ্ড সহর দেখিয়া থাকিবেন। হয় ত আলেকজান্দ্রিয়ার মত সহরের অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল। তাই তিনি স্বর্গের কল্পনা করিতে গিয়া লিখিয়া বসিলেন যে, সেখানে বড় বড় সমৃদ্ধ সহর আছে, আর বহুমূল্য সাজ-সজ্জায় সহরগুলি সজ্জিত, তত মূল্যবান্ দ্রব্য না কি পৃথিবীতে নাই! তাই দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে উপমা সংগ্রহ করিয়া স্বর্গের অতুল বিভবের বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। অনেকে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছেন। তাঁহারাই উহার বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু বুঝাইয়া উঠিতে পারেন নাই। আমাদের সম্প্রদায়েরও অনেকে স্বর্গের বিভব দেখিয়াছেন। ইঁহারা যেরূপ

দেখিয়াছেন। ইঁহারা যেরূপ দেখিয়াছেন, তাহার বর্ণনাও আছে। সে বর্ণনা "থিয়সফিক্যাল ম্যানুয়েল" নং ৬ পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে। স্বর্গের বর্ণনা করিতে বসিয়া আমরা আর এখন রজত-কাঞ্চন, মণি-মাণিক্যের কথা বলি না; স্বর্গীয় দ্রব্যের আকার ও বর্ণ অতীব সুন্দর, এইটুকুই আমরা এখন বুঝাইতে চাই; সূর্য্যাস্তকালীন গগনমণ্ডলের শোভা বা তত্রত্য অন্যান্য মাধুরী-বিন্যাস তাই উপমাস্বরূপ হাজির করিয়া বসি। স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মাণিক্য অপেক্ষা ঐ সকল উপমা আরও বেশী দৈবীভাব-সম্পন্ন বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে আমাদের স্বর্গ-বর্ণনার চেষ্টাও বিফল। পুরাকালীন লোকের মণি-মাণিক্যের চেষ্টা যেমন বিফল, আমাদের সূর্য্যাস্ত প্রভৃতির উপমাও তেমনই নিষ্ফল। স্বর্গের কথা আমরা কেহই বুঝিতেই পারি নাই। সে সুখ অনির্ব্বচনীয়; ভাষায় তাহা বুঝান যায় না। কিন্তু মরণের পর সকলেই একদিন-না-একদিন সে সুখ—সে ঐশ্বর্য্যের আস্বাদ পাইবে; সে সম্পদ স্ব-চক্ষে দেখিবে।

"স্বর্গ" কল্পনা নহে, খাঁটী সত্য

স্বর্গ কবির কল্পনা নহে, স্বপ্নের মত মিথ্যা নহে। উহা প্রদীপ্ত সত্য। স্বর্গ সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতে আমাদের যে সকল ধারণা আছে, তাহার একটা ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; নচেৎ স্বর্গ-ব্যাপারটা আদৌ বুঝা যাইবে না। মনে করিতে হইবে—স্বর্গ একটা স্থানবিশেষ নহে, উহা জ্ঞানের অবস্থামাত্র। যদি তোমরা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা কর—"স্বর্গ কোথায়?" আমরা উত্তরে বলিব—উহা এইখানে, বাতাসের মত উহা তোমার চারিদিকে অতি কাছেই রহিয়াছে। বহু কাল পূর্ব্বে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন—"স্বর্গীয় আলোক তোমার চতুর্দ্দিকেই বিদ্যমান রহিয়াছে; তোমার চক্ষুতে বাঁধন আছে বলিয়াই দেখিতে পাইতেছ না; বাঁধন খুলিয়া ফেল, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে।" এই বাঁধন খুলিয়া ফেলাটা কি?

বাঁধন: বলিতে আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? ঐ রূপকের অর্থ—আমাদিগের জ্ঞান-চৈতন্যের উন্নতিসাধন করিতে হইবে, সাধনা করিয়া উহাকে সূক্ষ্ম-জগতের অভিমুখ করিয়া তুলিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা অসম্ভব নহে; বলিয়াছি, ইহজীবনেই অনেকে ভুবর্লোকের ঐশ্বর্য্য দেখিতে সমর্থ হইয়া গিয়াছেন। আর একটু সাধনায় অগ্রসর হইলেই দৃষ্টি-শক্তিকে স্বর্লোক পর্য্যন্ত তুলিতে পারা যায়। মানুষের যেমন একটা আতিবাহিক দেহ আছে, আর সেই দেহে ভুবর্লোকের স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ উহার একটা কারণ-শরীরও আছে। ঐ দেহে স্বর্গের প্রত্যেক স্পন্দনই অনুভূত হয়। জ্ঞান-চৈতন্যের উন্নতি ঘটিলে মানুষ ইহজীবনেই স্বর্গের অতুল বিভবের অনুভব করিতে সমর্থ হয়। ঐ অনুভব ঘটিলে পার্থিব সম্পদ তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা মরণের পর স্বর্গের ঐ অতুলনীয় সুখের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। আর মরিতে মরিতে যে বুঝে, তাহাও নহে। তবে মরিতে মরিতেই স্বর্গে যায়, এমন লোকও আছে। তাহাদের সংখ্যা খুব কম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীব মরণের পর পৃথিবীর মায়া কাটাইতে থাকে, ক্রমেই আত্মস্থ হইতে চেষ্টা পায়। ভুবর্লোকে যত দিন থাকে, তত দিন কেবল ঐ চেষ্টাই করে, তখন অনুক্ষণই পৃথিবী হইতে স্নেহ, ভালবাসা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, চিন্তা সবই গুটাইতে থাকে। যখন সেখানে সমস্ত বৃত্তিটা চূড়ান্তভাবে গুটান হয়, তখন জীব ভুবর্লোকেও আর থাকে না। তখন স্বর্লোকে চলিয়া যায়। ভুবর্লোকেও যেন তখন তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু সে মৃত্যুতে যাতনার লেশও নাই। সে মরণের কথা পার্থিব দেহীরা ধারণাও করিতে পারে না। সে একটা সুখের মরণ। স্বর্লোকে গেলে ভুবর্লোকে একটা দেহ পড়িয়া থাকে। সেটা বাসনা-দেহ। মানুষ ভুবর্লোকে ঐ দেহেই বিচরণ করে। কখন কখন তাহাকে আতিবাহিক দেহও বলে। জীব স্বর্লোকে যাইয়া দেখে, সেখানে জীবের সুযোগ-সুবিধা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরও বেশী:

ভুবর্লোক হইতে স্বর্লোকে যাইবার সময় একটা সুখের তন্দ্রায় জীব যেন ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়ে। তাহার পর ঘুমটা ভাঙ্গিলেই দেখে, সে স্বর্গে, একটা মহা আনন্দ-রাজ্যে যাইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানচৈতন্য যেন শতমুখী হইয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা থিওসফির আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই ঐ অবস্থার আস্বাদটা অনুভব করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ অবস্থাটার জন্য খুবই লালায়িত; কেন না, সেখানকার সুখ অতুলনীয়। পার্থিব মৃত্যুর সময় যেমন একটু অজ্ঞানাবস্থা আইসে, তাহার পরেই জীব ভুবর্লোকে যাইয়া জাগরিত হয়, সেইরূপ ভুবর্লোক হইতে স্বর্গে যাইবার সময়ও একটু অজ্ঞানাবস্থা ঘটে, তাহার পরেই স্বর্গসুখের মধ্যে জাগরণ। লেড্‌বিটার সাহেব "দেবকনিক ভূমি" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে স্বর্গের বিশেষ বিবরণ আছে। স্বর্গের কতটি স্তর, মানুষ কোন্ কোন্ স্তরে কি কি দ্রব্য দেখিতে পায়, উহার একটা তালিকা পর্য্যন্ত ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যোগীরা পারলৌকিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া ঐ সব ব্যাপার অবগত হইয়াছেন; সাধারণকে জানাইবার জন্য শেষে পুস্তকেও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা সে পুস্তকের অতিরিক্ত বিষয়ের আলোচনাই এখানে করিব, ইচ্ছা করিলে পাঠক সে পুস্তকখানিও পড়িয়া দেখিতে পারেন। তাহাতে জ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিতই হইবে।

চিন্তা-রাজ্য

স্বর্গ-রাজ্যটা কিরূপ? এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর এই যে, উহা একটা "ঐশ মনস্তর।" উহা একটা বিশাল মনোরাজ্য। মানুষের যাহা কিছু সৎচিন্তা মনে আইসে, তাহাই মূর্ত্তিমতী হইয়া এই স্তরে বিরাজ করে। সেই চিন্তাগুলি সুস্পষ্ট, সজীব, সত্য। স্বর্গটা সজীব সত্যের চমৎকার রাজ্য। আমাদের একটা বড় মস্ত ভুল ধারণা আছে যে, স্থূল জিনিসগুলিই সত্য, আর যাহা স্থূল নহে, তাহাই স্বপ্নের মত অলীক, অবাস্তব। প্রকৃত তথ্যটা

অনুরূপ। আসল ব্যাপারটি এই যে, যাহাই স্থূল, তাহাই প্রোথিত, লুক্কায়িত। পদার্থের মধ্যে যেটা সার, যেটা সদ্বস্তু, সেটা স্থূলমূর্ত্তির বেলায় স্থূল পরমাণু-পুঞ্জের ভিতরে আবৃত অবস্থায় অবস্থিতি করে। স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া সহজে সেটাকে দেখা যায় না। কিন্তু সেটা সূক্ষ্ম অবস্থার দিকে সূক্ষ্ম-জগতের দিকে উঠিলে অতটা অস্পষ্ট—অতটা লুক্কায়িত আর থাকে না। 'চিন্তা-রাজ্য'—এ কথাটি শুনিলেই কবির মত আমাদের মনে হয়, উহা বুঝি "স্বপ্নের উপাদানে গঠিত," উহা বুঝি একটা অবাস্তব ব্যাপার। মানুষ মরণের পর যখন ভুবর্লোকে যাইয়া উঠে, তখন ভুবর্লোকটা তাহার কাছে খুবই সজীব—খুবই সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহার মনে হইতে থাকে—"বাঁচিয়া থাকা যে কাহাকে বলে, তাহা যথার্থরূপে এই এখনই বুঝিলাম, প্রকৃত জীবনের আস্বাদটা এই প্রথমে পাইলাম; ইহার আগে এ সুখ কখনও বুঝি নাই, এত দিন স্থূল-শরীরে যেন কয়েদী অবস্থায় ছিলাম। আমার অবস্থাটা ঠিক যেন গুটীপোকার মত ছিল। গুটীপোকা অতি ধীরভাবে পাতার উপর নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়, আমিও স্থূল-শরীর লইয়া স্থূল-জগতে বেড়াইতাম আর নিজেকে খুব কর্ম্মঠ, খুব জ্ঞানী, খুব চট্‌পটে ভাবিতাম। এখন দেখিতেছি, ভয়ানক ধীরগতি ও অলসের অধম ছিলাম। গুটীপোকার কিছুদিন পরে পাখা উঠে, তখন সে প্রজাপতি হইয়া মুক্ত গগনে সৌর কিরণে স্ফূর্ত্তির প্রাণে নাচিয়া বেড়ায়। আমিও স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া স্ফূর্ত্তির সঙ্গে বিপুল রঙ্গে বিচরণ করিয়া কতই আরাম পাইতেছি। আবার ভুবর্লোক ছাড়িয়া যখন সে আরও উচ্চতর জগতে অর্থাৎ স্বর্লোকে যাইয়া উঠে, তখন তাহার আরও আরাম বোধ হয়। সে সুখের তুলনায় ভুবর্লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও ঐরূপভাবে তাহার কাছে হেয় বলিয়া মনে হইতে থাকে। সে দেখে—স্বর্গের সুখ এত পূর্ণ, এত বিরাট, এত গভীর যে, তাহার তুলনা হইতে পারে না। সে সুখ অতুলনীয়, অনুপম। আবার স্বর্লোকের অপেক্ষাও ভাল স্থান আছে। সত্য সত্যই আছে। সেখানকার

তুলনায় স্বর্গের সুখও হীনপ্রভ। সৌরকরের কাছে কৌমুদী যেমন, সে সুখের নিকটে স্বর্গ-সুখের অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু এখন সে সব সুখের কথা, সে সব জগতের কথা চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন।

স্থূল-জগৎ অপেক্ষা চিন্তা-রাজ্যটা আরও সত্য, এ কথা শুনিয়া অনেকে হয় ত ভাবিবে যে, ইহা হইতেই পারে না, ঘোর অসম্ভব। ঐ সব লোক যত দিন এ জীবনের অপেক্ষা কোন কিছু উচ্চতর ব্যাপারের পরিচয় না পায়, তত দিন উহাদের ঐরূপ ধারণাই থাকিয়া যায়, তত দিন চিন্তারাজ্য আছে ও উহা খাঁটী সত্য, তাহা মানে না। এখন রাশি রাশি কথা বলিয়া বুঝাইলেও তাহা বুঝিবে না, আর উচ্চতর জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেই মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা বিস্তর তথ্য বিশ্বাস করিয়া বসিবে। যে যত অবিশ্বাসী, সে আবার তত শীঘ্র বিশ্বাসী হইয়া উঠে। সামান্য একটুমাত্র প্রমাণই তাহার মহা পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলে। স্যর হমফ্রে ডেভীর কথাটি আমাদের মনে করা উচিত। "নাইট্রস্ অকসাইড" নামক বাষ্প নিশ্বাসপথে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করায়, তাঁহার একটা অতি অদ্ভুত রকমের সুখবোধ হইয়াছিল। তিনি সেই অনুভূতিটির খুব একটা বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি এইঃ—"বাহ্যবস্তুনিচয়ের অনুভূতি মন হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইল, সজীব দৃশ্যমান মূর্ত্তিপুঞ্জ দ্রুতবেগে আমার মনের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, মূর্ত্তিগুলির মুখে অতি চমৎকার কথা; শুনিলে এক সম্পূর্ণ নূতন ভাবের অনুভূতি প্রাণের মধ্যে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। আমার মনে হইল, এক নবীন ভাবের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি।" যখন বাষ্পের প্রভাব গেল, যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"চিন্তা ব্যতীত আর কিছুর অস্তিত্ব নাই; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই চিন্তা, ধারণা, সুখ ও দুঃখে গঠিত।" হম্‌ফ্রের বর্ণনাটা ঐরূপ। তিনি ভুবর্লোকের খুব সামান্য একটু পরিচয় পাইয়াছিলেন, আর যাহা কিছু অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাও সমস্তটা মনে ছিল না, অল্প অল্প

মনে ছিল। তাহারই ঐরূপ বর্ণনা। ভুবর্লোক তাহা হইলে কত সুখের। আবার স্বর্লোকের সুখ ভুবর্লোক অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ উপাদেয়। অতএব স্বর্লোকের সুখের কল্পনা বা ধারণা করা আমাদিগের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে।

ঐশ মন

স্বর্লোকে একটা অসীম পূর্ণায়ত ঐশ মন বিরাজ করিতেছে। স্বর্লোক একটা খাঁটী মনোরাজ্য। সেই ঐশ মনটা শুধু মন নহে, উহার ভিতর অনন্ত, অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য নিহিত আছে। যে যেরূপ ঐশ্বর্য্য চায়, সে সেইরূপই পায়। যে যত চায়, সে ততই পায়। স্বর্গে যাইয়া আমরা সকলেই যে সমান পরিমাণে সুখ পাই, তাহা নহে। পৃথিবীতে সৎকর্ম্ম দ্বারা যতটুকু পাইবার অধিকারী হইয়াছি, ঐখানে ততটুকুই পাইব। তাহার বেশী নহে। মানুষ যখন পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার মধ্যে ভগবদংশ বীজরূপে নিহিত থাকে। সৎকর্ম্ম দ্বারা সেই বীজকে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে হয়—উৎকর্ষ-সাধন করিয়া লইতে হয়। প্রতি জন্মের উদ্দেশ্যই—উৎকর্ষ-সাধন। যাহার এই উৎকর্ষ সম্যক্‌ভাবে সাধিত হইয়াছে, সে মরণের পর স্বর্লোকের ঐ অফুরন্ত সুখ ও মহিমা উপভোগ করে। ভোগের পূর্ণতা কেবল তাহারই ঘটে। আমরা সাধারণ শ্রেণীর মানব, আত্মার পূর্ণ উন্নতি—পূর্ণ উৎকর্ষ-সাধনের এখনও অনেক বিলম্ব, বহু কোটি বৎসরের পর হয় তো সে সৌভাগ্যের উদয় হইবে, আমরা হয় তো আত্মার সামান্য উন্নতিই করিয়াছি, তাই মরণের পর সম্যক্ সুখ-ভোগ আমাদের ঘটিবে না, সে অনন্ত সুখের পূর্ণ ধারণাও আমাদের পক্ষে এখন অসম্ভব। এ ভিন্ন ভিন্ন লোক মরণের পর ভিন্ন ভিন্ন শক্তি লইয়া স্বর্গে উঠে। এ সম্বন্ধে প্রাচ্য দেশে বেশ একটা রূপক আছে। রূপকটা এই—সকলেই এক একটা বাটি লইয়া স্বর্গে যায়; কাহারও বাটিটা বড়, কাহারও বা

ছোট। তাহারা সেই অফুরন্ত সুখ-সমুদ্র বাটি পূরিয়া পূরিয়া গ্রহণ করে। যায় বাটি যত বড়, সে তত পাইয়া উঠে।

সকল ধর্ম্মেই স্বর্গের এই সুখের কথা বলে। কিন্তু সকলের পক্ষেই ঐ সুখ কেন ঘটে না, সে কথাটা বেশ পরিষ্কার করিয়া কোন ধর্ম্মেই বলে নাই। সেটুকু জানা নিতান্তই আবশ্যক। স্বর্গ একটা মনোরাজ্য; সে মন ভগবানের মন, ভগবানের চিন্তা। অনন্ত, অনির্ব্বচনীয় মহিমায় তাহা পূর্ণ। যে যেরূপ মহিমা বুঝিবার মত সাধনা করিয়াছে, সে সেই রূপটাই সেখানে যাইয়া দেখিতে পায়। স্বর্গে কেহ অনেক দিন থাকে, কেহ বা অল্পদিন থাকে। জীবিতকালে পৃথিবীতে মানুষ যেমন কর্ম্ম করে, সেই অনুসারে তাহার স্বর্গবাসের কাল নিরূপিত হয়। এই পৃথিবীতে মানুষ সাধনাবলে যতটুকু সুখের অধিকারী হইয়া উঠে, ঠিক ততটুকু সুখই স্বর্গে গিয়া পায়। আর যে যেরূপ বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া পার্থিব জীবন যাপন করে, স্বর্গেও ঠিক সেই বিষয়জনিত আনন্দই উপভোগ করিয়া থাকে। স্বর্গে সকলেই আপন আপন সাধনা অনুসারে সুখভোগ করে। সেখানকার সুখের সীমা নাই।

স্বর্গে সুখভোগের প্রণালী

পৃথিবীতে জীবিতকালে মানুষ নানাপ্রকার বাসনা করে, নানাবিধ প্রবৃত্তির পথে ছুটিয়া বেড়ায়। তাহার ফলে মরণের পর তাহার একটা বাসনা-দেহ গঠিত হয়। ঐ দেহে মরণের পরে ভুবর্লোকে তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। পৃথিবীতে যদি সে কাজকর্ম্ম ভাল করিয়া থাকে, তবে বাসনা-দেহেও সে অসুখী হয় না, আর যদি অসৎ কাজ করিয়া থাকে, তবে বাসনা-দেহে তাহার দুঃখের অবধি থাকে না। বাসনাদেহ লইয়া ভুবর্লোকে কষ্টভোগ করাকেই নরকভোগ বলে; ঐটিই পার্থিব পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কষ্ট ভুগিয়া ভুগিয়া যখন বাসনার ক্ষয় হইয়া যায়, তখন তাহার স্বর্লোকে গতি হয়। পৃথিবীতে সে

যে সকল সচ্চিন্তা, নিঃস্বার্থ ভাবনা, উদার আশা-আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, সেইগুলি সব পুঞ্জীভূত হইয়া স্বর্গে তাহার জন্য অপেক্ষা করে। মানুষ স্বর্গে যাইবামাত্র তাহার ঐ প্রকার নিঃস্বার্থ চিন্তাদি তাহার কাছে আসিয়া তাহার চারিদিকে একটা আবরণস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ঐ আবরণের ভিতর দিয়া তখন সে স্বর্গের স্পন্দন অনুভব করিতে থাকে। ঐ সচ্চিন্তারাশির দ্বারাই তখন সে স্বর্গের মহিমা বুঝিতে পারে। উহাই তাহাকে স্বর্গভোগের শক্তি প্রদান করে। তখন সে বুঝিতে পারে যে, স্বর্গ সুখৈশ্বর্য্যের বিপুল আগার, মানুষ পার্থিব জীবনের কর্ম্মানুসারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণমাত্র ভোগের অধিকার পায়। যাহার নিঃস্বার্থভাব যত বেশী, স্বর্গে সে ভাবের শক্তি তত বেশী হয়, সুতরাং সুখভোগের মাত্রাও তাহার তত অধিক হইয়া থাকে। নিঃস্বার্থ স্নেহ, ভালবাসা, নিষ্কাম ভক্তি-অনুরাগ প্রভৃতির ফল এখন ফলিতে থাকে। স্বর্গে ঐ সকল ভাব ব্যতীত আর কিছুই নাই। যাহা কিছু স্বার্থ-বিজড়িত, যাহা কিছু সকাম, তাহা সমস্তই ভুবর্লোকে পড়িয়া থাকে। সেইটিই বাসনাভূমি, সেইটিই নরক।

পৃথিবীতে আমরা যে স্নেহ-ভালবাসা ব্যক্ত করি, তাহা দুই প্রকার। তাহার মধ্যে এক প্রকারকে অমন পবিত্র নাম দেওয়া চলে না। স্নেহ-ভালবাসা হইলেও সেটা অতীব ঘৃণিত। ভালবাসিলাম; বাসিয়া হিসাব-নিকাশ করিতে লাগিলাম যে, ইহাতে আমার কতটুকু স্বার্থসিদ্ধি হইল, আর প্রতিদানস্বরূপই বা কতটুকু পাইলাম। যে ভালবাসার মধ্যে এইরূপ জমাখরচ, এইরূপ হিসাব-নিকাশ, এইরূপ লাভালাভের চিন্তা নিহিত থাকে, সে ভালবাসা অতীব ঘৃণিত। পার্থিব জীবনেই উহার ফলে দ্বেষ ও সন্দেহ দেখা দেয়। মরণের পরও উহার কুফল বড় কম নহে। ঐ প্রকার স্বার্থমাখা ভালবাসার ফলে মানুষকে ভুবর্লোকে যাইয়া দৈন্যদশায় পড়িতে হয়। ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার ভালবাসা আছে; তাহা নিঃস্বার্থ, উদার, অকপট, প্রাণখোলা ভালবাসা। তাহাতে প্রতিদানে কি পাইলাম, না পাইলাম, সে হিসাব থাকে না। সে ভালবাসা অতীব

পবিত্র, উপাদেয়, স্বর্গীয় জিনিস। সে ভালবাসার প্রবল বন্যায় প্রাণ ডুবিয়া ভাসিয়া প্লাবিত হইয়া যায়। ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসিয়াই তৃপ্তি —মহাতৃপ্তি! এই প্রবল ভালবাসার উদ্দাম তরঙ্গ-ভঙ্গ রোধ করিতে পারে, ভুবর্লোকের এমন শক্তি নাই। তাই এই পবিত্র ভাবের মধুর মন্দাকিনী ভুবর্লোক অতিক্রম করিয়া স্বর্লোকে যাইয়া ঐশ মনের মহাপারাবারে মিশিয়া পড়ে। নিঃস্বার্থ ভালবাসার উপাদান অতীব সূক্ষ্ম; তাই তাহা ভুবর্লোকের স্থূলতর উপাদানের মধ্যে মিশ খায় না। ভুবর্লোকের ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যেও উহার স্থান হয় না। স্বর্গের সূক্ষ্ম পরমাণু আর তত্রত্য বিরাট আয়তনই উহার পক্ষে যথার্থ উপযোগী। পূজার্চ্চনার সময় আমাদের ভিতর হইতে যে ভক্তি নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহাও দ্বিবিধ। ঠাকুর-দেবতার কাছে ভক্তি দেখাইয়া আমরা অনেক সময় অনেক দ্রব্য চাহিয়া বসি। আমাদের এই ভক্তিটি বড়ই নিম্নশ্রেণীর কাণ্ড; ইহাকে এক প্রকার ব্যবসাবুদ্ধি বলিলেও চলে। আবার এক প্রকার ভক্তি আছে, তাহা খাঁটী নিষ্কাম, তাহাতে যাচ্ঞা-প্রার্থনা নাই; প্রাণের মধ্যে এই ভক্তির উচ্ছ্বাস আসিলে ভক্ত জগৎ ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া আরাধ্য-দেবের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। তখন তাহার বাহ্য-চৈতন্যের লেশও পরিলক্ষিত হয় না। এই ভাব অতীব পবিত্র।

আমরা সকলেই জানি যে, নিষ্কাম ভক্তির মধ্যে এমন মধুরতা আছে, যাহার তুলনা পৃথিবীতে নাই। নিঃস্বার্থ ভালবাসার মধ্যে এমন তৃপ্তি আছে, যাহা বুঝাইতে হইলে ভাষা মূক হইয়া পড়ে। পবিত্র সঙ্গীত বা শিল্পের মধ্য হইতে প্রাণের অন্তস্তলে এমন গভীর ভাবের ধারা বহিয়া আইসে, যাহার অনুভূতি এই তুচ্ছ জগতের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পার্থিব জীবনে উহার কার্য্যকারিতা না থাকিলেও উহার শক্তি অমোঘ। স্বর্লোকে উহার শক্তি পুঞ্জীভূত থাকে। ঐ সকল শক্তির ফল সেখানেই ফলে। কল-কব্জার শক্তি যেমন বিনষ্ট হয় না, অলক্ষিতভাবে বিদ্যমান থাকে, নিষ্কাম ভক্তি-ভালবাসা প্রভৃতির শক্তিও সেইরূপ অক্ষুণ্ণ অবস্থায়

চিন্তারাজ্যে অর্থাৎ স্বর্লোকে সঞ্চিত থাকে। কখন না কখন তাহার কার্য্য দেখা যাইবে। নিঃস্বার্থ ভালবাসা যাঁহার প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, উহার শুভফল তিনি পাইবেনই। পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ আয়তনে ও স্থূল জড়াংশের মধ্যে সে ফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। তবে কখন্ ও কেমন করিয়া সেই অব্যর্থ ফল ফলিবে? উহা স্বর্গে প্রতীক্ষা করিতে থাকে। যিনি পৃথিবীতে এইরূপ ভালবাসার পরিচয় দেন, তিনি মরণের পর ভুবর্লোকে, তাহার পর স্বর্লোকে যাইয়া উঠেন। তখন তাঁহার সেই ভালবাসার ফল ফলে। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ত্যাগ করিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত উহা সঞ্চিত শক্তির মত স্বর্লোকে অবস্থান করে। প্রতিক্রিয়ার নিমিত্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। নিঃস্বার্থ প্রেমিক যত দিন ভূর্লোকে বা ভুবর্লোকে থাকেন, তত দিন তাঁহার উপর তারই ভালবাসার শুভফল ফলিতে পারে না। যেই তিনি স্বর্লোকে যাইয়া পৌছান, অমনই যেন প্লাবন-তোরণ খুলিয়া যায়, আর পূর্ব্ব-প্রকাশিত নিঃস্বার্থ ভালবাসার স্রোত প্রবলবেগে তাঁহার উপর আসিতে থাকে। পৃথিবীতে আমরা কাহাকেও নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিয়া, তাহার কোন প্রতিদান না পাইয়া হয় তো মনে করি যে, ভালবাসাটা আমাদের নিষ্ফল হইয়া গেল। কিন্তু তাহা নহে। এখানে কিছুই নিষ্ফল হয় না। সমস্তই যথাসময়ের জন্য সঞ্চিত থাকে। ভগবানের রাজ্যে অবিচার নাই। সবই থাকে, কিছুই নষ্ট হয় না। এই তত্ত্বটা কবি "ব্রাউনিং অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমি সুন্দর করিয়া বুঝাইতে পারিলাম না। তাঁহার বর্ণনাটা এই,—

"শুভকার্য্য আর শুভচিন্তারাশি,
বিনষ্ট হবে না কভু; থাকিবে নিশ্চয়।
অশুভ অসৎ, নশ্বর এ সব
শবদ নীরবে যথা, পাইবে বিলয়॥

শুভ আনে শুভ, পরিণামে বৃদ্ধি,
অপূর্ণ হেথায় বটে, পূর্ণাঙ্গ তথায়।
আশা, ইচ্ছা, স্বপ্ন শুভময় যদি
দেখা দিবে মূর্ত্তি ধরি বিধাতৃ-কৃপায়॥
লাবণ্য, শকতি, যাহা কিছু শুভ,
শৌর্য্য-বীর্য্য, উদারতা, মধুর সঙ্গীত।
কিছু নহে নষ্ট, সকলই সজীব,
পরিস্ফুটভাবে হবে প্রকাশিত॥
প্রেমিকের প্রেম-গাথা কল্পনা কবির।
খাঁটী যদি হয় তাহা রহে চির-স্থির॥"

থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ও স্বর্গ সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ ধারণাই করেন। এই সম্প্রদায় পৃথিবীতে না জন্মিতেই কবি তাঁহার ধারণা ঐ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আত্মার জ্ঞান-গবাক্ষ

স্বর্গের ধারণা করিবার সময় সর্ব্বপ্রথমে চিন্তা করিবার প্রয়োজন যে, মানুষ স্বর্গে নিজে সুখভোগের পথ কেমন করিয়া খুঁজিয়া লয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বর্গে সৌন্দর্য্য ও মহিমা অফুরন্তভাবে বিরাজ করিতেছে; মানবের যে কয়টি গবাক্ষ খোলা থাকে, সে কয়টির মধ্য দিয়াই যে যতটা দেখিবার, তাহাই দেখে। মানুষের চিন্তামূর্ত্তিগুলি তাহার পক্ষে যেন এক একটা গবাক্ষ। সেই চিন্তমূর্ত্তির ভিতর দিয়া সুখের স্পন্দন আসিতে থাকে। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে জীবিতকালে শুধু পার্থিব ঐশ্বর্য্যের কথাই ভাবিয়াছে, স্বর্গে তাহার গবাক্ষ প্রায়ই খোলা থাকে না; সুতরাং স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিবার সুযোগ তাহার বড় একটা হইয়া উঠে না। কিন্তু নিঃস্বার্থ চিন্তা একটিবারও করে নাই, এরূপ লোক দেখা যায় না। মানুষ যত পাপীই হউক না কেন, জীবনে অন্ততঃ একটা

চিন্তা-মূর্ত্তিও গবাক্ষস্বরূপ হইয়া আছে। তাহার মধ্য দিয়াই সে একটু স্বর্গসুখের আস্বাদ পাইবে। মানুষ যখন ঘোর অসভ্য ছিল, তখন সম্ভবতঃ সে কোন শুভচিন্তা করিতে পারিত না। সুতরাং সেই অসভ্য যুগের অসভ্য লোকদের পক্ষে সম্ভবতঃ স্বর্গসুখ ভোগ করিবার সুযোগ হইত না। অসভ্যদের কথা ছাড়িয়া দিলে মনে হয়, মানুষমাত্রেরই কিছু না কিছু সুখ-ভোগ সেখানে ঘটে। যে সকল ধর্ম্ম গোঁড়ামীতে পূর্ণ, তাহাতে বলে যে, মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ স্বর্গ আর কেহ কেহ বা নরকে যায়। আমরা তাহা বলি না। আমরা বলি স্বর্গ, নরক এ দুইটিই মানুষমাত্রেই ভোগ করিয়া থাকে। প্রত্যেককেই এ দুইটি ভোগ করিতে হয়। "নরক" এ নামটিই ভয়ানক, নামটা শুনিলেই মানুষ ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে; কিন্তু মরণের পরই আমরা যে অবস্থায় যাইয়া উঠি, সেই অবস্থাটা অর্থাৎ ভুবর্লোকের সর্ব্বনিম্ন স্তরটাই নরক। যতটা ভয়ানক বলিয়া শুনা যায়, বাস্তবিক পক্ষে তত ভয়ানক নহে। সে যাহা হউক, প্রত্যেক মানুষই ঐ স্বর্গ-নরক ভোগ করে। তবে ভোগের কাল সকলের পক্ষে সমান নহে।

আমাদের একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে এই যে, মানুষ নিজেকে যতই উন্নত ভাবুক না কেন, প্রকৃত হিসাবে সে এখনও উন্নতির অতি নিম্ন সোপানেই পড়িয়া রহিয়াছে। মানুষের অনেকগুলি কোষ। অন্নময় কোষটাই—স্থূলদেহ; ইহা ছাড়া জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, মনোময় প্রভৃতি দেহ আছে। এতগুলি দেহের মধ্যে মানুষ কেবল স্থূল-দেহটাকে কতকটা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে মাত্র; বাসনা-দেহেও একটু চলাফেরা করিয়া থাকে; কিন্তু সে চলা-ফেরার কথা মানুষ স্থূল জড়াংশ-গঠিত মস্তিষ্কে স্মরণ রাখিতে পারে না। বাসনা-দেহ অপেক্ষা মনোময় কোষটা সূক্ষ্ম। প্রত্যেকেরই ঐ কোষ আছে; অথচ থাকিয়াও যেন নাই। মানুষ আদৌ উহা ব্যবহার করিতে শিখে নাই। উহার ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম জগতের কোন স্পন্দনও সে লইতে পারে না।

স্বর্লোকে মানুষের অবস্থা

আমরা দেখিয়াছি, মানুষকে ভূর্লোকেই হউক আর ভুবর্লোকেই হউক, খুব ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হয়। স্বর্লোকে তাহাকে সেরূপটি করিতে হয় না। স্বর্লোকে যাইয়া সে যে খুব স্ফূর্ত্তির প্রাণে বেড়াইতে পারে, তাহাও নহে। স্বর্লোকটা কর্ম্মভূমি নহে, সেটি ভোগভূমি। মানুষকে সেথায় কেবল বসিয়া বসিয়া সুখ-ভোগই করিতে হয়। কর্ম্মমাত্রই নাই, কেবল ভোগ—এই অবস্থা। নিজের নিজের জ্ঞান-গবাক্ষের দ্বারা সে তত্রত্য সুখ অনুভব করিতে থাকে। স্বর্গ অতুল সুখের স্থান হইলেও মানুষের ভোগ অপরিমেয় নহে। কারণ, গবাক্ষ যদি বেশী খোলা না থাকে, তবে ভোগের পরিমাণ খুব কমই হয়। ভোগের পরিমাণ উন্মুক্ত গবাক্ষের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে। আর যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তির কর্ম্ম-ক্ষেত্র সেখানেও প্রশস্ত, তাঁহারা সাধারণ ভোগীদিগের সঙ্গে সমান অবস্থায় অবস্থিত নহেন ; তাঁহারা মহিমামণ্ডিত দেবযোনি হইয়া উঠেন, তাঁহারা ক্রম-বিকাশের উন্নত সোপানে আরূঢ়। স্বর্লোকে যাঁহার জ্ঞানচৈতন্য সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট, তিনি তাঁহার মনোময় দেহটাকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করিতে পারেন। স্থূলদেহের উপর যেমন সাধারণ লোকের প্রভাব, মনোময় কোষের উপরে তাঁহার প্রভাবও সেইরূপ। সেই মনোময় দেহের সাহায্যে তিনি তাঁহার সম্মুখে আরও উচ্চতর উপাদেয় জ্ঞানের বিপুল ক্ষেত্র দেখিতে পান।

কিন্তু এক্ষণে আমরা অতটা উন্নত মহাত্মার আলোচনা করিতেছি না। আমরা এমন ব্যক্তির কথা ভাবিতেছি, যাঁহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান-গবাক্ষ উন্মুক্ত আছে। আর সেইগুলি দ্বারা তিনি স্বর্গের সুখ অনুভব করিতেছেন। এরূপ ব্যক্তির বিষয় ভাবিতে গেলে আমাদের মনে হয়, স্বর্গের সঙ্গে ইঁহার দ্বিবিধ সম্পর্ক। স্বর্গের অবস্থাটা ইঁহার কাছে কিরূপ বোধ হয়, এইটি বিবেচনা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তাঁহার অবস্থাটা তখন কিরূপ দাঁড়ায়।

স্বর্গের অবস্থাটা তাঁহার কাছে কিরূপ বোধ হয়, এইটিই আমাদের প্রথম আলোচনার বিষয়। এ কথাটি ভাবিতে গেলে আমাদের দুইটি কথা মনে আইসে। প্রথমে মনে হয়, স্বর্লোকের জড়াংশ তাঁহার চিন্তার প্রভাবে কতটুকু রূপান্তরিত হইয়া উঠে; দ্বিতীয়তঃ মনে হয়, সেখানকার কতটা শক্তি তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দিয়া থাকে। ভুবর্লোকের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, জীবাত্মার চারিদিকে চিন্তা-মূর্ত্তি ফিরিয়া থাকে। ঐ সকল চিন্তা-মূর্ত্তির প্রকৃত উৎপত্তিস্থলই স্বর্লোক। অতএব স্বর্লোকে চিন্তা-মূর্ত্তিই প্রধান আলোচ্য বিষয়। তাহা ছাড়া এখানে সজীব শক্তিনিচয় স্বর্লোকবাসীর চতুর্দ্দিকে অবস্থান করে। বিস্তর শক্তিশালী জীবও দেখা যায়, সেগুলি পরী প্রভৃতি দেবদূতের মত প্রাণী। উহাদের অনেকে মানুষের উপকার করিতে ইচ্ছুক। মানুষ একটু শরণাপন্ন হইলেই তাহার উপকার করে। মানুষ পৃথিবীতে যেমনভাবে জীবন কাটায়, যেমন যেমন ভাবনা ভাবে, স্বর্লোকে সাধারণতঃ সেইরূপভাবেই থাকিতে চায়। স্বর্গের শক্তি ও সজীবতা খুব বেশী—একেবারেই স্বতন্ত্র প্রকার। আমাদের মনে হয়, মানুষ সেখানে যাইবার পর তাহার চিন্তাধারা ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা নহে। পরিবর্ত্তিত হইতে একটু বিলম্ব ঘটে; কেন না, তত্রত্য নূতন ধরণে সে অনভ্যস্ত। কারণ, ভূর্লোকে, ভুবর্লোকে স্থূলদেহ ও বাসনা-দেহই তাহার আয়ত্ত ছিল, মনোময় দেহটির উপর তাহার কখনই কর্ত্তৃত্ব ছিল না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্থূলদেহের ও বাসনা-দেহের ভিতর দিয়া অশেষ প্রকার কার্য্য-প্রবৃত্তি তাহার মনোময় কোষে গিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার মনোময় কোষ পার্থিব জীবনের ভাবেই ভাবিত হইয়া আছে। এ ক্ষেত্রে স্বর্গের নূতন ভাবটা গ্রহণ করিতে পারা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে। মানুষ পার্থিব জীবনে যদি মনোময় কোষ-টাকে স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করিতে পারিত, তবে পূর্ব্ব হইতেই উহাকে স্বর্গে চলিবার উপযোগী করিয়া তুলিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা না পারায় মনোময় কোষ স্বর্গের ভাব-গ্রহণে আপাততঃ অনুপযোগীই থাকিয়া যায়।

সঙ্গীত-গবাক্ষ

স্বর্গবাসীর অনেকগুলি জ্ঞান-গবাক্ষের কথা বলা হইয়াছে। ঐ সকল গবাক্ষ কোন্ দিকে উন্মুক্ত, আর উহাতে কিরূপ কাচ খাটান, তাহা দেখিতে হইবে। এক এক জনের গবাক্ষের কাচ এক এক প্রকার, আবার এক দিকেও উন্মুক্ত থাকে না। মানুষ পার্থিব জীবনে যদি খুব উচ্চ চিন্তা করে, তবে স্বর্লোকে তাহার গবাক্ষ বিশেষ বিশেষ দিকে খুলিয়া যায়। স্নেহ, অনুরাগ প্রভৃতি গুণগুলি মানবীয়। যাহারা এ গুণে মণ্ডিত, তাহাদের গবাক্ষ দিয়া মানবীয় দিক্‌টা চোখে পড়ে। মানবীয় দিক্ ছাড়াও দিক্ আছে। একটা উদাহরণ লইয়া বুঝা যাউক। আমরা যে উদাহরণটা দিতে যাইতেছি, সেটা মানবীয় নহে—স্বর্লোকের খাঁটী সম্পদ্। মনে কর, স্বর্গবাসীর একটা গবাক্ষ সঙ্গীতের দিকে। সে ঐ গবাক্ষ দিয়া বিপুল শক্তির লহরী-লীলা দেখিতে পায়। না পাইবে কেন? আমরা জানি, সঙ্গীতের শক্তি অতীব অদ্ভুত, উহা মানুষকে আত্ম-বিস্মৃত করিয়া নবীন জগতে লইয়া ফেলে। এ জগতে সামান্য সঙ্গীতই যদি অতটা হয়, তবে স্বর্লোকের সঙ্গীত-শক্তি যে অতীব অদ্ভুত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? পার্থিব জীবনে যাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে কখন সঙ্গীত-ঝঙ্কার দিয়া উঠে না, স্বর্লোকে সঙ্গীতাভিমুখী গবাক্ষটা তাহার কখনই উন্মুক্ত হয় না। স্বর্লোকে যাঁহার সঙ্গীতের বাতায়ন খুলিয়া যায়, তিনি সেই পথ দিয়া তিন প্রকার সুর শুনিতে পান। ঐ সুরত্রয় তাঁহার গবাক্ষের পরকলার গুণানুসারে একটু-আধটু পরিবর্দ্ধিত হইয়া আইসে। ঐ পরকলা তাঁহার দৃষ্টি-শক্তির কতকটা বাধা উৎপাদন করে। পরকলা হয় ত রঙ্গীন; এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলোক আইসে না, কিয়ৎ-পরিমাণে আইসে মাত্র। অথবা পরকাল অতীব নিম্নশ্রেণীর; তাই বাহিরের আলোক আসিবার সময় কুৎসিত ও মলিন হইয়া আইসে। এখন দেখ, আমাদের সেই স্বর্গবাসী যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন হয় তো

তাঁহাকে কোন একটা বিশেষ সুরের পক্ষপাতী দেখা যাইত। এই ব্যক্তি যখন স্বর্গে গেলেন, দেখা গেল, ইঁহার সঙ্গীত-গবাক্ষটি বেশ ভাল। এই গবাক্ষের ভিতর দিয়া ইনি কি দেখিবেন ?

তিন প্রকার সুর

স্বর্গবাসীর গবাক্ষ বেশ ভাল হইলে, তিনি তিন প্রকার সুর শুনিতে পাইবেন। স্বর্লোকের শক্তিপুঞ্জের সুশৃঙ্খল গতিবিধিতে একটা সঙ্গীত নিঃসৃত হইতেছে। এইটিই প্রথম সুর। স্বর্গবাসী এইটি শুনিতে পাইবেন। কবিরা বলিয়াছেন যে, গ্রহ-উপগ্রহেরা মহাশূন্যে সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়া ছুটিয়াছে। সে এই সঙ্গীত। কবিদের এই উক্তির মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সত্য বিরাজ করিতেছে। গ্রহগণ ছুটিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার তান-লয়-সঙ্গত মধুর সঙ্গীত ঝরিয়া পড়িতেছে, শুধু তাহাই নহে, সে সঙ্গীত আবার বিচিত্র বর্ণে প্রকাশ পাইতেছে। স্বর্গবাসী দেখিবেন, তাঁহার কাছে সকল চিন্তাই শব্দকরী। তাঁহার নিজের চিন্তাই হউক আর অপরের চিন্তাই হউক, যে চিন্তা-মূর্ত্তিই তাঁহার চোখে পড়িবে, সকলের মুখ হইতেই অতি চমৎকার অনির্ব্বচনীয় সুর-লহরী বাহির হইতেছে ! সে সুর আবার নিরন্তরই মধুর বৈচিত্র্যে মধুময়ী ও বীণাপাণির বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় অমৃত-নিঃস্যন্দিনী হইয়া উঠিতেছে ! তাঁহার কাছে অনুক্ষণই এই চির-আনন্দময় সজীব সঙ্গীত-সুধা ক্ষরিতে থাকিবে। অন্যান্য সুখানুভূতি ঘটিলেও এই মধুর তানের বিরতি ঘটিবে না।

স্বর্গবাসীর দ্বিতীয় সুরটা অন্য প্রকার। স্বর্গে এক শ্রেণীর দেবযোনি আছেন ; তাঁহারা না কি সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, ইঁহাদিগকে "গন্ধর্ব্ব" বলে। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি স্বর্গে গেলে তিনি কোন কোন গন্ধর্ব্বের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ঐ গন্ধর্ব্বের কাছে অতীব বিস্ময়কর সঙ্গীত-কৌশল শিক্ষা করিতে পারেন। অতএব গন্ধর্ব্বকণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর সুরও স্বর্গবাসীর প্রাণটাকে সুশীতল করিয়া তোলে।

আর একটা সুরও আমাদের পূর্ব্বোক্ত স্বর্গবাসী শুনিতে পান।

এইটিই তৃতীয় স্তর। তাঁহার পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে যে সকল জগদ্বিখ্যাত গায়ক মরণের পথ দিয়া স্বর্গে গিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা সেখানেও চমৎকার সুরের আলাপ করেন। তাঁহাদের মধুর সঙ্গীতধ্বনি আমাদের স্বর্গবাসী পরিস্ফুটরূপে শুনিতে পান। পার্থিব গায়ক এ পর্য্যন্ত অল্প যায় নাই। বাক্, বিথোভেন, মেণ্ডেল, হ্যাণ্ডেল, মেজার্ট, রগিনী প্রভৃতি কত লোক গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই স্বর্গে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবিত আছেন। তাঁহাদের সঙ্গীত এখন আরও মধুর, আরও সুশ্রাব্য, আরও বিস্ময়কর হইয়া উঠিয়াছে। এই মহাত্মাদিগের প্রত্যেকেই যেন অদ্ভুত স্বরসুধার নির্ঝর। ইঁহাদেরই করুণা-কণার আভাসমাত্র পাইয়া পৃথিবীর কত গায়ক সুগায়ক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আমাদের এই পৃথিবীতে স্বর্গবাসী ব্যক্তিবর্গের উন্মুক্ত শক্তির প্রভাব ক্রমাগত আসিতেছে। আমরা সকল সময় সেটি বুঝিতে পারি না। এ পৃথিবীটা তাঁহাদের শক্তির প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নহে। এখানে অনেক ব্যক্তি অনেক রকমে স্বর্গবাসী কোন মহাত্মার অনুপম বিভূতি-বিলাস প্রাণের ভিতরে অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই ভাবের প্রতিধ্বনি এখানে চলিতেছে মাত্র। ওস্তাদ গায়কদের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, তাঁহারা নাকি অনেক সময় স্বর্গীয় সুরের ঝঙ্কার প্রাণের ভিতর অনুভব করেন। তাঁহাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে কি যেন এক অপূর্ব্ব রাগ, কি যেন এক চমৎকার তানযুক্ত মোহন সুর মাঝে মাঝে না কি ঝঙ্কার দিয়া উঠে। এই অনুভূতিটা কি প্রকারে ঘটে, তাহা সহস্র পৃষ্ঠা লিখিয়া বর্ণনা করিলেও বুঝান যায় না। তবেই দেখ, পার্থিব সঙ্গীত অপেক্ষা স্বর্গীয় সঙ্গীত কতই শ্রেষ্ঠ। সেখানকার একটি সুরে প্রাণের ভিতরে যে ভাব জাগাইয়া তুলে, পৃথিবীতে বহু চেষ্টা করিয়াও সেরূপ একটি ভাবের স্ফুরণ করা কঠিন।

স্বর্গে চিত্রবিদ্যা

স্বর্গবাসীর গবাক্ষটা যদি চিত্রবিদ্যার হয়, তবে তাঁহার অবস্থাও পূর্ব্বকথিত স্বর্গবাসীর মত হইয়া দাঁড়ায়। তিনিও তিন প্রকার আনন্দ

উপভোগ করেন। স্বর্গ নিরন্তর শব্দে মুখরিত আর রঙে রঞ্জিত হইতেছে। যাঁহারা থিয়সফির আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, দেবতা-দিগের মধ্যে বর্ণ-ভাষা আছে। এক শ্রেণীর দেবতা আছেন, তাঁহারা উহারই সাহায্যে আপনাদিগের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলেন। ঐ ভাষার ব্যবহারকালে অদ্ভুত অদ্ভুত বর্ণ ফুটিয়া উঠে। মধ্যযুগের বিখ্যাত বিখ্যাত চিত্রকরেরা রঙের তুলিকা, কেম্বিস প্রভৃতি লইয়া ছবি আঁকিতেন না। তাঁহাদের আঁকিবার প্রণালী আরও সহজ, আরও তৃপ্তিপ্রদ। চিন্তাশক্তি দ্বারা তাঁহারা মনোময় জড়াংশকে ফুটাইয়া তুলিতেন। এ প্রণালী সাধারণ চিত্রকরের পক্ষে অতীব কঠিন, তিনি ইহার ধারণাও করিতে পারিতেন না। কিন্তু স্বর্গে বসিয়া এরূপ করাটা খুব সহজ। সেখানে এই প্রণালীতে চিত্র করিতে বসিলে অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বর্গে প্রত্যেক বিষয়েরই এইরূপ অদ্ভুত বিকাশ। প্রকৃতপ্রস্তাবে শিক্ষা করিবার ও উপভোগ করিবার অনন্ত বিষয় তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ক্ষুদ্রশক্তি আমরা, তাহার ধারণাও করিতে পারি না।

স্বর্গে গেলে আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে থাকে কি না

স্বর্গে গেলে আত্মীয়দের কথা মনে থাকে কি না, তাহাদের ভাবনা প্রাণে জাগে কি না, তাহাদিগকে দেখিতে পায় কি না, আমরা এক্ষণে সেই বিষয়ের আলোচনা করিব। সকলেই জিজ্ঞাসা করে, স্বর্গে গিয়া আমরা আমাদের প্রাণপ্রিয় মৃত আত্মীয়দিগকে দেখিতে পাইব কি না, দেখিলে চিনিতে পারিব কি না? স্বর্গের সুখ অনুপম হইলেও যদি আমরা সেখানে আমাদের আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজিয়া না পাই, তবে সে সুখও আমাদের নিকটে সুখ বলিয়া মনে হইবে না। তাই লোকে ঐরূপ প্রশ্ন করে। ঐ প্রশ্নের উত্তর খুব সুস্পষ্ট ও সত্যমূলক। উত্তর এই যে,—আমরা মরণের পর স্বর্গে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে দেখিতে পাইব, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারা পার্থিব জীবনে যেমনটি ছিল, তাহাদিগকে

তাহার অপেক্ষা আরও বেশী শ্রী-সম্পন্ন, শক্তি-সম্পন্ন ও মহিমা-মণ্ডিত দেখিব।

আবার লোকে জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা, আমাদের যে সকল আত্মীয় স্বর্গে গিয়াছে, তাহারা কিরূপ অবস্থায় আছে? সেখান হইতে কি তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছে? আমাদের কার্য্যকলাপ কি তাহারা দেখিতেছে? তাহারা কি আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে?" উত্তর—না; তাহা হইলে সে অবস্থাটা তাহাদের কাছে কষ্টকর হইয়া উঠিত। আমরা যদি এখানে দুঃখ পাই, আর সেটা যদি তাহারা স্বর্গে বসিয়া দেখে, তবে কি তাহারা সুখী হইতে পারে? আমরা যদি পাপে লিপ্ত হইয়া পড়ি, আর আমাদের আত্মীয় স্বর্গ হইতে যদি তাহা জানিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণে লাগে। তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পায় না, কেবল আমাদের প্রতীক্ষায় সময় কাটায়, এ অবস্থাটাও তাহাদের পক্ষে সুখের নহে। কেন না, সে ক্ষেত্রে অনেক দিন ধরিয়া আশা করিয়া থাকিতে হয়, কবে আসিবে—কবে আসিবে ভাবিয়া অস্থির হইতে হয়, তাহা ছাড়া পার্থিব আত্মীয়টি বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ হইয়া রোগে-শোকে খিটখিটে হইয়া এমন মূর্ত্তিতে হয় তো যাইয়া উঠিল যে, সে মূর্ত্তিটা স্বর্গবাসী আত্মীয়ের আদৌ ভাল লাগিল না। এ ক্ষেত্রে বিধাতা যে ব্যবস্থাটা করিয়াছেন, সেটা খুবই সুন্দর ও জ্ঞানের পরিচায়ক। সে ব্যবস্থায় কোন পক্ষেরই ক্ষোভ হয় না। আমাদিগের যে মূর্ত্তিটা তাহার কাছে তৃপ্তিকর, সেইটিই দেখে; কোন প্রকার বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন তাহার চোখে পড়ে না। কি সুন্দর ব্যবস্থা! মানুষ সহস্র চেষ্টা করিয়াও এমন সুন্দর ব্যবস্থা কল্পনা করিতে পারিত না। কেমন করিয়া এরূপটি হয়, তাহা আমরা পরে বুঝাইয়া দিতেছি।

স্নেহের প্রভাব

যখনই আমরা কাহাকেও মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসি, তখনই আমাদের মনের মধ্যে তাহার একটা মূর্ত্তি গঠিত হইয়া উঠে। সেই মূর্ত্তিতে সে আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকে। সে মূর্ত্তিটা মনোময় মূর্ত্তি,

স্বর্লোকেই সেরূপ মূর্ত্তির প্রকৃত বাসস্থান। সেইখানেই ঐরূপ মূর্ত্তি বিস্তর দেখা যায়। মরণের পর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঐ মনোময় মূর্ত্তি স্বর্গে উঠে। ভালবাসার শক্তি খুব বেশী। উহার বলে ঐ মনোময় মূর্ত্তি সৃষ্ট হইয়া আমাদের সঙ্গে থাকে। আবার যাহাকে আমরা ভালবাসি, আমাদের ভালবাসার ক্রিয়া তাহার উপরেও হইতে থাকে। আমরা যে তাহাকে ভালবাসিতেছি, তাহার জীবাত্মা সেটা বুঝিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, সে আমাদের ভালবাসার বেগে সাড়া দিয়া উঠে। আর আমাদের মনোময় মূর্ত্তিটার মধ্যে পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে। এই উপায়ে সত্য সত্যই আমরা আমাদের ভালবাসার পাত্রকে পাইয়া বসি। তাহার বেশ সজীব মূর্ত্তিটিই দেখিতে পাই। আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে এই যে, আমরা আত্মাকেই ভালবাসি, দেহটাকে নহে। আর উক্ত উপায়ে আত্মাকেই পাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—"পার্থিব আত্মীয় যদি মারা যায়, তবে তাহার আত্মাকে ঐরূপে আমরা স্বর্গে থাকিয়া আকর্ষণ করিয়া মনোময় মূর্ত্তির মধ্যে পূরিয়া লইতে পারি, কিন্তু আমরা স্বর্গে অথচ আমাদের আত্মীয় পৃথিবীতে জীবিত, এ অবস্থায় সেই আত্মীয় একই সময়ে পৃথিবীতে আর স্বর্গে এই দুই স্থানে কেমন করিয়া থাকিবে?" প্রকৃত কথা এই যে, এইরূপ স্থলে ঐ আত্মীয় একই সময়ে দুইটি স্থানে থাকিতে পারে, সত্য সত্যই পারে। শুধু দুইটি স্থানে কেন, আরও অধিক স্থানেও থাকিতে পারে। আমাদের হিসাবে সে জীবিতই থাকুক আর মৃতই হউক, তাহাতে তাহার একাধিক স্থানে অবস্থান করার বাধা হয় না। আত্মা জিনিসটা কিরূপ, বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। তাহা হইলে একাধিক স্থানে থাকিবার কথাটা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

আত্মা একটা বড় জিনিস—খুব উচ্চস্তরের বস্তু। উহার যতটা অংশ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে উহা তাহার অপেক্ষা খুব বেশী বিরাট। উহার কতকটা অংশ আমরা দেখি মাত্র। একটা রেখা যেমন একটা চতুষ্কের অংশ, অথবা একটা চতুষ্ক যেমন একটা ঘনক্ষেত্রের অংশ, সেইরূপ

প্রকাশিত অংশটা একটি মহান্ অপ্রকাশিত বস্তুরই অঙ্গবিশেষ। কতকগুলি চতুষ্ক একটা ঘন-ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে না; কেন না, চতুষ্কের মাপ দুইটি, আর ঘনক্ষেত্রের মাপ তিনটি। সেইরূপ নিম্নস্তরের রাশি রাশি অভিব্যক্তি দ্বারাও আত্মার সমগ্র অংশটা প্রকাশিত হইতে পারে না; কেন না, উহা উচ্চতর স্তরেও বিদ্যমান আছে। স্থূল-জগতের জ্ঞানলাভার্থ আত্মার খুব সামান্য একটু অংশমাত্র নিম্নে আসিয়া স্থূল-দেহ ধারণ করিয়া থাকে। স্থূল-জগতে না আসিলে স্থূল-জগতের অভিজ্ঞতা জন্মে না। এক সময়ে একটি শরীরই ধারণ করে, কারণ, সেইটিই বিধি। কিন্তু যদি একই সময়ে সহস্র দেহও ধারণ করে, তবুও উহার সমস্ত মূর্ত্তিটা তাহাতে প্রকাশ পায় না। আত্মার কিছু অংশ স্থূলদেহ ধরিয়া তোমার আত্মীয় বলিয়া পরিচিত হইল, মনে কর। তুমি তাহাকে যদি সত্য সত্যই ভালবাস, তবে তোমার মরণের পরও তাহার মনোময় মূর্ত্তি তোমার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্লোকে যাইয়া উঠিবে। ঐ আত্মীয়ের একটা স্থূল-দেহ থাকিলেও উহার অপর অংশ হইতে খানিকটা সেই মনোময় মূর্ত্তির ভিতর যাইয়া উহাকে জীবিত করিয়া তুলিবে। সেটা তাহার পক্ষে আদৌ কঠিন নহে। স্বর্লোক ভুবর্লোক অপেক্ষা আরও দুই ক্রম উচ্চে, সুতরাং আরও সূক্ষ্ম। অতএব সেখানে উহার সূক্ষ্ম গুণের আরও সুন্দর বিকাশ হইয়া থাকে।

মানুষের আত্মা একই সময়ে এই পৃথিবীতে স্থূল-দেহের মধ্যে ও স্বর্লোকে মনোময় কোষের মধ্যে থাকিতে পারে, এ কথাটা প্রণিধান করিয়া উঠা যদি এখনও কঠিন বলিয়া মনে হয়, তবে স্থূল-জগতের একটা খুব সহজ উদাহরণ লইয়া বুঝিয়া দেখ। মনে কর, তুমি চেয়ারে বসিয়া আছ। এ ক্ষেত্রে একই সময়ে তোমার জ্ঞান কত দিকে ফুটিতেছে। চেয়ারের স্পর্শজ্ঞান হইতেছে, পা মাটীতে রহিয়াছে, সে বোধ হইতেছে, হাত দুখানা চেয়ারের বাহুর উপর বিন্যস্ত, তাহা বুঝিতে পারিতেছ, হাতে হয় তো পুস্তক ধরিয়া আছ, তাহারও জ্ঞান হইতেছে। একসঙ্গে এতগুলি বিষয়ের ধারণা করা মস্তিষ্কের পক্ষে কিছুই কঠিন বলিয়া লাগিতেছে না।

মস্তিষ্কের চৈতন্য অপেক্ষা আত্মার সম্বিৎ খুবই শ্রেষ্ঠ। মস্তিষ্কের পক্ষেই যদি কঠিন না হয়, তবে আত্মার পক্ষে কঠিন হইবে কেন? একই ব্যক্তি চেয়ারে বসিয়া একই সময়ে বিভিন্ন অনুভূতি করে; তদ্রূপ একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রত্যেক মূর্ত্তির মধ্যেই সে আত্মা বাস্তব, সজীব ও প্রেমময়। চিন্তা-মূর্ত্তির মধ্যে আত্মার যে অংশটা প্রকাশ পায়, সেইটিই উৎকৃষ্ট অংশ। পার্থিব দেহে যেটুকু ব্যক্ত হয়, সেটুকু উহার মত পূর্ণাঙ্গ নহে। পৃথিবীতে উহার উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি হইলেও তাহা নির্দ্দোষ নহে।

স্বর্গবাসী আত্মীয়েরা যদি আমাদের বিষয় ভাবে আর আমাদের আত্মা যদি মনোময় মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের কাছে উপস্থিত হয়, তবে সেই কার্য্য দ্বারা আমাদিগের ক্রমোন্নতির কিছু সাহায্য হয় কি না, এই প্রশ্নটি অনেকেই করিয়া থাকেন। উত্তর—নিশ্চয়ই হয়। ইহাতে আমার অভিব্যক্ত হইবার সুযোগ ঘটে। আমি যদি পার্থিব দেহেই জীবিত থাকি, তবে স্থূল-দেহের ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মনোময় মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হই ও স্নেহ-অনুরাগ-বৃত্তিরও পরিপুষ্টিসাধন করিতে থাকি। অতএব স্বর্গবাসী আত্মীয়ের স্নেহানুরাগের ফলে আমার নিজেরও কত উপকার। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মা বহু চিন্তা-মূর্ত্তিতে যুগপৎ অধিষ্ঠিত হইতে পারে। যে ব্যক্তিকে অনেকে ভালবাসে, তাহার অনেকগুলি চিন্তা-মূর্ত্তি গঠিত হয়। তাহার আত্মাও একই কালে অতগুলি মূর্ত্তির মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়। এরূপ হওয়াটা সৌভাগ্যের বিষয়। সকলের কাছেই ভালবাসা পাওয়া, আর সকলের মনেই চিন্তা-মূর্ত্তির উদ্ভব ঘটান কম সৌভাগ্যের কথা নহে। এরূপ ভাগ্যবান্ ব্যক্তির ক্রমোন্নতি খুব দ্রুতবেগে হইতে থাকে। যাহার অসাধারণ গুণ, সে-ই বহু ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে। সদ্‌গুণের পুরস্কারস্বরূপ সে বহু লোকের ভালবাসা পায়। শুধু যে পায়, তাহা নহে; তার নিজের প্রাণটাও ভালবাসায় পূর্ণ হইতে থাকে। জীবিতকালে যেমন ভালবাসা যায়, মরণের পরও

তেমনই ভালবাসিতে পারা যায়। যাহারা আমাদিগকে ভালবাসে, তাহারা জীবিতই থাকুক আর মরিয়াই যাউক, তাহাদের ভালবাসায় আমাদের উপকার নিশ্চয়ই সাধিত হয়।

মনে কর, তুমি স্বর্গবাসী। তোমার আত্মীয় পৃথিবীতে জীবিত। তুমি আত্মীয়ের সঙ্গে মিশিতে ইচ্ছা করিতেছ। এ ক্ষেত্রে দুইটি অন্তরায় আছে। তাই মিশামিশিটা ষোল আনা রকম হইতে পারে না। প্রথমতঃ তুমি স্বর্গে বসিয়া আত্মীয়ের যে মূর্ত্তিটি মনে মনে গড়িয়া তুলিলে, সেটি হয় তো আংশিক বা অসম্পূর্ণ। তাহা হইলে তাহার উচ্চতর গুণের বিকাশ না-ও হইতে পারে। ঐ অসম্পূর্ণ মনোময় কোষে সে সব গুণের বিকাশ হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ তোমার আত্মীয়ের দিক্ দিয়াও অসুবিধা আসিয়া জুটিতে পারে। তুমি যে মনোময় মূর্ত্তিটি গড়িয়াছ, হয় তো সেটি ঠিক হয় নাই। তোমার আত্মীয় উন্নত নহে, অথচ তুমি তাহাকে উন্নত ভাবিয়া সেইরূপ মূর্ত্তিই গড়িয়াছ। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়ের অনুন্নত আত্মা ঐ মূর্ত্তির মধ্যে আসিয়া উঠিতে পারে না। এরূপ ঘটনা খুব বেশী ঘটে না। যখন কোন অপদার্থ আত্মীয়কে স্নেহের চক্ষুতে খুব গুণবান্ মনে করিয়া তাহার একটা উচ্চ রকমের মনোময় মূর্ত্তি কোন আত্মীয় গঠন করিয়া বসে, কেবল তখনই ঐরূপ ব্যাপার ঘটে। অবিবেচনা পূর্ব্বক তুমি যদি কোন আত্মীয়ের ঐরূপ উচ্চ রকমের মনোময় মূর্ত্তিই গড়িয়া বইস, তাহাতেও তাহার কোন-রূপ পরিবর্ত্তন বা ত্রুটি ঘটিবে না; কেন না, ঐ মূর্ত্তির মধ্যে তাহার আত্মা সম্পূর্ণভাবে যাইতে না পারিলেও কতক কতক যাইবে আর ঐরূপ-ভাবে যাইতে যাইতে তাহার উন্নতিও হইতে থাকিবে। সে উন্নতি পার্থিব উন্নতির অপেক্ষা অনেক বেশী; সুতরাং আত্মীয়ের দিন দিন উন্নতি দেখিয়া তুমি সুখী হইবে। তোমার আত্মায়ের বাস্তবিকপক্ষে যে গুণগুলি আছে, তাহা সে সহস্র সহস্র মূর্ত্তিতে পরিব্যক্ত করিতে পারে। কিন্তু যে গুণ নাই বা এখনও যেটি অপ্রকাশিত, তুমি যদি সেটির সমাবেশ তোমার মনোময় মূর্ত্তির মধ্যে করিয়া বইস, তবে সে তখনই তখনই ঐগুণটির বিকাশ

দেখাইতে পারিবে না। যাঁহারা আত্মীয়-স্বজনের যথার্থ গুণের চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না—হতাশ হইতে হয় না। কারণ, সেরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল গুণ সত্য সত্যই তাঁহাদের নিকটে মনোময় কোষে ফুটিয়া উঠে। যাহারা মিথ্যাগুণের আরোপ করিয়া আত্মীয়ের ভাবনা ভাবে, তাহাদিগকে হতাশ হইতে হয়; কেন না, মনোময় মূর্ত্তিতে সে গুণ তখন-তখনই দেখা যায় না। থিয়সফিষ্টরা জানেন যে, আমরা যদি গুরুর চিন্তা করিয়া তাঁহার সকল গুণ আমাদের মনের মধ্যে দেখিতে না পাই, তবে সেটা গুণের ত্রুটি নহে, সেটা আমাদেরই ত্রুটি। গুরুর শক্তি ও ভালবাসা অতীব গভীর, আমরা সে গভীরতা মান-রজ্জু দ্বারা মাপিয়া উঠিতে পারি নই।

স্বর্গে যাইবার পর কিরূপে আত্মার উৎকর্ষ হইতে পারে?

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন—আত্মা স্বর্গে গিয়া সেখানকার সুখভোগেই যদি মত্ত থাকে, তবে তাহার উৎকর্ষ কখন্ হয়? ঐ সুযোগগুলি তিন ভাগে বিভক্ত। আবার প্রত্যেক ভাগেও অনেকগুলি করিয়া প্রকার আছে। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি স্বর্গে গিয়া উঠে, তাহার নিজের সদ্গুণ দ্বারা জ্ঞানের অনেকগুলি গবাক্ষ খুলিয়া যায়। বহুকাল যাবৎ ঐ গুণের অনুশীলন হওয়ায় উহারা বেশ শক্তিমান্ হইয়া উঠে। স্বর্গবাসী যখন আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন ঐ গুণগুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিপুলভাবে বর্দ্ধিত হইয়া আইসে। যদি পুনঃ পুনঃ একটা চিন্তা করা যায়, তবে সে চিন্তাটা নিবিড়ীভূত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। যিনি সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ নিঃস্বার্থ ভালবাসার অনুশীলন করেন, কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানেন।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান-গবাক্ষ দিয়া স্বর্গবাসীর শুভ নিঃস্বার্থ ভাবগুলি বাহিরে যায়। তাহাতে সময় সময় দেব-যোনিরা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিত্রতা করেন। তাঁহাদের সাহচর্য্যে তাঁহার নিশ্চয় উন্নতি

সাধিত হইয়া থাকে। গন্ধর্ব্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটিলে তাঁহাদের নিকট স্বর্গবাসী বিবিধ সুর-স্বর শিখিয়া লয়েন। পৃথিবীতে সেরূপ স্বরবিভূতি কল্পনারও অতীত। এইরূপে কোন দেবের নিকট হয় তো চিত্রবিদ্যা শিখিতে পারেন। সে এমন সুন্দর চিত্র যে, তাহার কল্পনাও মানুষ কখন করিতে পারে না। ঐরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত বিদ্যার আলোচনা করিতে করিতে সে সকলের ছাপ তাঁহার উপর পড়িয়া যায়। সেই ছাপ লইয়া তিনি পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গে যাইবার সময় যেমনটি হইয়া গিয়াছিলেন, সেখান হইতে পুনরায় আসিবার সময় তাঁহার অবস্থা অনেক উন্নত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ স্বর্গবাসী তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের যে সকল মনোময় মূর্ত্তি চিন্তা দ্বারা গড়িয়া তুলেন, তাহাতেও তাঁহার উপকার হইয়া থাকে। উহাতেও অনেক উন্নত সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখিয়া নিজেকে উন্নত করিয়া লইতে পারেন। এই উপায়ে অনেক থিয়সফিষ্ট চিন্তা-মূর্ত্তির ভিতর দিয়া বহু সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ উপায়ে খুব অল্প লোকই উপকৃত হয়।

যদি কেহ কোন পৌরাণিক বীরের ভক্ত হইয়া মনে মনে তাঁহার চিন্তাই করিতে থাকে, তবে তাহাতেও তাহার উপকার হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে কোন দেবযোনি বা কোন অদৃশ্য সহায় তাহার গঠিত মনোময় মূর্ত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সুখী ও উন্নত করিতে থাকে।

আত্মার প্রকৃত মূর্ত্তি

এখন আমরা আত্মার আসল মূর্ত্তিটির কথা বলিব। আত্মার একটা খুব সূক্ষ্মদেহ আছে, সেটা পরিবর্ত্তিত হয় না; উহাকে কারণদেহ বলে। আত্মা বহু বহু স্থূল-দেহে জন্মগ্রহণ করিলেও ঐ কারণ-দেহটা একরূপই থাকে। স্বর্গবাসও চিরদিনের জন্য নহে। কিছুদিন পরে জীবাত্মাকে স্বর্গ হইতে চলিয়া আসিতে হয়। তখন তাহার মনোময় দেহটা পরিত্যক্ত হয়। ভূর্লোকে যেমন স্থূল-দেহ ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, ভুবর্লোকে যেমন বাসনা-দেহ ত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ স্বর্গত্যাগের সময় মনোময় দেহটাও ত্যাগ করিতে হয়। কেবল কারণ-দেহটা থাকিয়া যায়। কারণ-দেহধারী

হইলে আর জ্ঞান-গবাক্ষের প্রয়োজন হয় না। ঐটিই তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি-মুক্ত আবাস। ঐ সময় তাহার নিকটে কোন প্রকার প্রাচীর, কোন প্রকার অবরোধ থাকে না। তখন সমস্ত অবরোধের বিলয় ঘটে। স্বর্গের পরে মানুষ যখন এই অবস্থায় যাইয়া উঠে, তখন অধিকাংশ লোকেরই অতটা বোধশক্তি থাকে না। তাহারা যেন একটু তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে বিশ্রাম করিতে থাকে। এই ভাবের পরই আসিয়া আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রতি জন্মেই সে উন্নত হইতে হইতে যায়, অজ্ঞানাবরণ প্রতি জন্মেই হ্রাস পাইতে থাকে, কারণ-দেহে বিশ্রাম করিবার সময়টাও প্রতি জন্মের পর বর্দ্ধিত হয়। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কারণ-দেহে বাসের কাল বাড়ে। উন্নতির লক্ষণ কি ? মানুষ যতই উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহার লইবার পরিবর্ত্তে দিবার প্রবৃত্তি বাড়িতে দেখা যায় : পরিশেষে যীশুর মত মহান্ ভাব আসিয়া পড়ে। তখন সে মানবের জন্য নিজের যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি, নিজের জীবনটা পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক হয়। এইটিই শ্রেষ্ঠতম গৌরব—সাধনার চরম সিদ্ধি—আনন্দের ঘন মূর্ত্তি। আমাদের ভ্রাতৃ-বৃন্দ মুক্তির জন্য নিরন্তর ছটফট করিতেছে। তাহাদিগকে সাহায্য করা অপেক্ষা আর কি মহান্ ব্রত থাকিতে পারে ? মনে-প্রাণে মানবের উপকার করা ও মানবের সেবা করাই প্রকৃত সাধনা। এই শিক্ষা তখন সে অনুভব করে। এই সেবা-ধর্ম্মের কথা সকলে জানে না। যাঁহারা উচ্চ জগতের বিষয় অবগত হইয়াছেন, সেখানকার অলৌকিক বিভূতি-বিলাসের মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, জগদ্বাসীকে সেই সকল সম্পদ্‌রাশির সংবাদ দেওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য জগতের থিয়সফিষ্টগণ এই মহান্ ব্রত পালন করিতেছেন; থিয়সফি জীমূতমন্দ্রে ঘোষণা করিতেছে—মানবমাত্রেই স্বর্লোকে যাইয়া সেই বিপুল সমৃদ্ধি ভোগের অধিকারী হইবে, সকলেরই ভবিষ্য আশাপ্রদ। থিয়সফির এই ঘোষণা-বাণী সত্য ; স্বর্গ তো আমাদের কাছেই রহিয়াছে। কেবল সাধনা দ্বারা আমাদিগকে ভোগের অধিকারী হইয়া উঠিতে হইবে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

পরলোকের প্রমাণ

মরণের পর মানুষের কিরূপ অবস্থা দাঁড়ায়, আমরা থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক, তাহা একটু বেশী জানি। যখন আমরা আমাদের মতের যুক্তি দিয়া লোককে বুঝাইতে যাই, তখন অনেকে জিজ্ঞাসা করেন,—"তোমাদের কথা যে সত্য, তাহার প্রমাণ কি? আর আমরাই বা কি উপায়ে তোমাদের মত অতটা জানিতে শুনিতে দেখিতে পারিব?" আমরা পরলোকের কথা এমন করিয়া বুঝাইয়া দিই যে, শুনিলেই লোকের শুনিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু অতটা কি সত্য? এই সন্দেহ কাহারও কাহারও মনে আইসে, তাই ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া বসেন। যিনি বাস্তবিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আমাদের কাছে আইসেন, তাঁহাকে আমরা সমাদরে বুঝাইতে চেষ্টা করি। কিন্তু বজ্জাতি বুদ্ধি লইয়া যে নাস্তিক বিরোধ করিতে আইসে, আমরা তাহাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের কথা মানিয়া লইয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিলেন বলিয়া যদি কাহারও ধারণা হয়, আর তিনি যদি আমাদিগকে বলেন—"এইরূপ এইরূপ ভাবে আমার বিশ্বাস জন্মাও" তাহা হইলে আমরা বলি—"প্রিয় মহাশয়! আপনাদের বিশ্বাস জন্মাইতে যাওয়ার আমাদের গরজ কি? আপনার বিশ্বাসে অবিশ্বাসে আমাদের যায় আইসে কি? আমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাই ঘোষণা করিয়া থাকি; আমরা যে সকল তথ্য সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি সেগুলিকে আমাদের মত সত্য বলিয়া বুঝিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করুন, না হয় না করুন। আপনার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে আমার ঘোষিত তথ্যের কিছুমাত্র লাভলোকসান নাই। তবে আপনার লাভালাভ যথেষ্টই আছে। সে লাভালাভ দেখা আপনারই কার্য্য, আমার কার্য্য নহে।"

যে ব্যক্তি বিশ্বাসের কারণ বুঝিয়া বিশ্বাস করিতে চায়, আর বাস্তবিক আগ্রহের সহিত ঐ কারণ অনুসন্ধান করে, তাহাকে আমরা খুবই আদরের সঙ্গে আনন্ত্রণ করিয়া আমাদের যুক্তি-প্রমাণ জানাইয়া থাকি। আমরা ঐরূপ সৎশ্রেণীর উদ্দেশেই এই অধ্যায়ের বক্তব্য বিষয়গুলির অবতারণা করিব। পরলোকের বিশ্বাসটা লেড্‌বিটার সাহেবের কিরূপভাবে হইয়াছিল, সেইটি বলিতে আরম্ভ করিলেই ভাল হইত। তাহাতে ঐ পথানুসারী অনেক ব্যক্তির কিছু-না-কিছু উপকার হইতে পারে। অবান্তর কথা বলিয়া আমরা এ অধ্যায়ের প্রথমে খানিকটা সময় একরূপ নষ্ট করিলাম।

পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে ব্যক্তিগত জ্ঞান

লেড্‌বিটার বলিয়াছেন—"আমি যখন প্রথমে 'থিয়সফি' জিনিসটা বুঝি, তখন আমি ইংলণ্ডের এক জন ধর্ম্মযাজক। আমি যদি অন্য গোঁড়াদের মত লোক হইতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, ঐরূপ একটা ধর্ম্ম-যাজকই থাকিয়া যাইতাম। কিন্তু আমার প্রকৃতি একটু অন্যরূপ ছিল। আমার প্রাণে একটু স্বাধীন চিন্তা আসিত, অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিটা আমার একটু বলবতী ছিল। সাধারণ লোককে ধর্ম্মবিশ্বাসী করিয়া তোলা আমার কতকটা কাজ ছিল। অনেকে আমার নিকটে অনেক সংশয় মিটাইতে আসিত। তাহাদের সন্দেহ দূর করা, তাহাদের প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেওয়া আমার কাজ ছিল, টমাস্ পেন্ অথবা ব্রাডল্ প্রণীত গ্রন্থের মতানুযায়ী অনেকে অনেক প্রশ্ন গড়িয়া আমাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত। প্রষ্টারা আমার উত্তর শুনিয়া পরিতুষ্ট হইত। আমি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর অনায়াসেই দিতে পারিতাম। তাহাদিগকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতাম বটে, কিন্তু যে তর্কধারা অবলম্বন করিয়া আমি উত্তর দিতাম, তাহা আমার আছে কখন কখন ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হইত। তাই আমি নিজে ঐরূপ উত্তর দিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম না। ধর্ম্ম-পুস্তকের

কাহিনীর সমর্থন করিতে বসিয়া আমি যে প্রমাণ দিতাম, যদি অন্য কেহ ইতিহাস-ঘটিত কোন বিষয়ের জন্য ঐরূপ প্রমাণ আনিয়া হাজির করে, তবে আমি তাহাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিয়া থাকি। খৃষ্টান ধর্ম্মে 'চিরমুক্তির' কথা আছে; ঐ সম্বন্ধে বেশ খানিকটা বক্তৃতা আছে। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ কিছু নাই। তাই আমার মনে হইত যে, আমি সকলকেই চিরমুক্তির আশা দিয়া থাকি অথচ সেটা যে সত্য কথা, তাহার কোন প্রমাণই নাই। তাহা হইলে আমি একটা ধর্ম্মধ্বজী সাজিয়া একটা মিথ্যা কথাই এ পর্য্যন্ত কহিয়া আসিতেছি। তাহা হইলে এরূপ না করিয়া বড় বড় মহাত্মারা তাঁহাদের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কি বলিয়া গিয়াছেন, এখন আমাকে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে তাহাই পড়িয়া দেখিতে হইবে।

আমি পড়িতে লাগিলাম। পড়িয়া আশা পূর্ণ হইল না—কোন প্রমাণের কথাই পাইলাম না। তাঁহারা এমন কথাই বলেন নাই, যাহাতে অনুসন্ধিৎসুর পিপাসা মিটে। দেখিলাম, তাঁহাদের পুস্তকে অনেক কঠোর আদেশ আছে। যাহারা কিছু মানিতে চাহে না, যাহারা প্রাণের ভিতর সংশয় পোষণ করে, তাহাদের খুব নিন্দাবাদ আছে, কিন্তু প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, এমন কোন কথা নাই। যাহার প্রাণে জটিল প্রশ্ন আসিবে—যে মীমাংসার জন্য ব্যাকুল হইবে, সে ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া কোন উপকারই পাইবে না, উহাতে একটি সন্দেহেরও নিরসন হইবে না, প্রমাণের লেশও উহাতে নাই। সে দেখিবে, পুস্তকগুলি গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ—ঘোর অযৌক্তিক। উহাতে যেগুলিকে প্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, প্রকৃত তার্কিকের কাছে তাহা অতীব নগণ্য—তুচ্ছ। সে ইচ্ছা করিলেই উহা চুরমার করিয়া ফেলিতে পারে। খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচলিত যাবতীয় পুস্তকগুলির মধ্যে এমন একটি স্থলও নাই, যেখানে কোন একটি বিষয় নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা হইয়াছে। যে ধর্ম্ম নাড়ী-নক্ষত্রের সঙ্গে জড়িত, তাহা এমনই

অসম্পূর্ণ! কি দারুণ ক্ষোভের কথা! কি ভয়ানক ব্যাপার! যখন মানুষ ধর্ম্মের এরূপ অসারতা দেখিতে পায়, তখন তাহার মনে হয় যে, তাহার যাবতীয় ধর্ম্মবিশ্বাস সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল, আর ধর্ম্মের 'ধ' পর্য্যন্ত বিশ্বাসের মূলে থাকিল না।

ধর্ম্মের প্রতি অনেকের ঐরূপ ঘৃণা জন্মিলেও আমার অবস্থা অতটা শোচনীয় হয় নাই। আমি ধর্ম্মপুস্তকগুলি পড়িয়া দেখার পূর্ব্ব হইতে প্রেত-তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। তাহার ফলে বুঝিয়াছিলাম,—সবই মিথ্যা নহে, কিছু কিছু সত্য আছে। কিন্তু যখনই বেশ ধীর-ভাবে, ঠাণ্ডা মাথায়, যুক্তির সঙ্গে সৃষ্টির গল্পটা, সৃষ্টিকর্ত্তার দারুণ ক্রোধের কাহিনীটা, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহার ক্রোধের হাত হইতে, নিষ্কৃতি পাইবার কথাটা আলোচনা করিতাম, তখনই মনে হইত এ সব ব্যাপার ঘোর যুক্তি-বিরুদ্ধ, অদ্ভুত ধর্ম্মভাববিবর্জ্জিত ও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। ঐ অসার ধর্ম্মমত আলোচনা করিয়া কিছুমাত্র আনন্দ পাই-তাম না। ঐরূপ আলোচনায় আমার মত অনেকেই বিরক্ত হইয়াছেন।

প্রকৃত জ্ঞান কিরূপ করিয়া পাইলাম

ঠিক এই সময়ে—দৈবাৎ ("দৈব" বলিয়া আমরা কিছু মানি না, কথার মাত্রাস্বরূপ বলিতেছি) এক দিন মিঃ সিনেট্ প্রণীত "সূক্ষ্ম-জগৎ" নামক একখানি পুস্তক আমার চোখে পড়িল। পড়িয়া দেখি, উহাতে অতি চমৎকার দার্শনিক তত্ত্ব। বহিখানি আমার খুবই ভাল লাগিল। এই পুস্তকে যে কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা গ্রন্থকারের অন্য একখানি গ্রন্থে দেখিলাম। সেখানির নাম—"বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তথ্য।" এই পুস্তকে দেখিলাম, আমি এ পর্য্যন্ত কোন কোন বিষয়ে ভ্রান্ত মত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি। এ পর্য্যন্ত আমার দুইটি ভুল মত জানা ছিল। একটি জড়বাদ—অপরটি—গোঁড়ামিপূর্ণ প্রচলিত মত। জড়বাদ বলে—সবই আপনা

আপনি ঘটিতেছে, সবই অন্ধ ভাগ্যের ফল। গোঁড়ামিপূর্ণ প্রচলিত মতে বলে—মানুষের সুখ-দুঃখ, সভ্য হওয়া বা অসভ্য হইয়া থাকা, সম্মান-অসম্মান, সবই ভগবানের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে।

ঐ দুইটি মতই আমার কাছে বিশ্রী লাগিত। কারণ, উহার একটিও যুক্তিযুক্ত নহে। যুক্তির লেশও উহার ভিতরে দেখা যায় না। এমন অনেক ঘটনা ঘটে, ঐ মত দ্বারা তাহার কিছুমাত্র মীমাংসা করা যায় না। ভগবানের মর্জ্জিতে সব হয়, এ মতের বিরুদ্ধে বিস্তর আপত্তি আছে। আমি উহা বলিতে চাহি না। কেন না, কর্ণেল ইংগারসন্ ও অন্যান্য অনেকে ঐ মতটি সম্পূর্ণভাবে উড়াইয়া দিয়াছেন। আমার কাছে "জড়বাদ" মতটিও অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইত। কেন না, উহার সাহায্যে আমি অনেক ঘটনার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতাম না। কিন্তু সিনেটের পুস্তকে যে মত দেখিলাম, সে অতি সুন্দর। তাহার সাহায্যে অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হয়। যাহা পূর্ব্বোক্ত দুইটি মতে ব্যাখ্যা করিতে অপারগ, তাহার সুন্দর ব্যাখ্যা ইহার সাহায্যে হইতে পারে। আমরা দেখি, জগতে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন। এইরূপ বৈষম্যের কারণ কি, তাহার অতি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ইহার নিকটে পাওয়া যায়। এই পুস্তক পাঠে আরও জানিলাম, মানুষের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান অতি সুন্দরভাবে ক্রমোন্নতির শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত আছে। আর সেই ক্রমোন্নতি-বিধির বিচক্ষণতা দেখিলে অতি সহজেই ভগবৎ-সত্তার অনুভব হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, ঐ পুস্তকখানির সকল কথাই বিজ্ঞানসম্মত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও প্রেমময়, এ কথার যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা ঐ পুস্তকে আমি প্রথম পাইলাম।

এ মতটি স্বভাবতঃই আমার ভাল লাগিল। পূর্ব্বের দুইটি মত আর এই একটি, এই তিনটির মধ্যে এইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমি এই মতটির বিষয় আরও জানিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, আমি মিঃ সিনেটের

কাছে গিয়া উঠিলাম। তিনি খুব ভদ্র, সকলকেই সম্মান প্রদর্শন করিতেন। আমি গেলেও যথেষ্ট আদর করিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় আমি থিয়সফিক্যাল সম্প্রদায়ের সদস্য হইলাম। "থিয়সফি"-সংক্রান্ত পুস্তক সে সময় খুব বেশী ছিল না। এখন ঐ সম্বন্ধে বিস্তর পুস্তক ও রাশি রাশি বিশদ ব্যাখ্যা হইয়াছে, এখন উহার সাহায্যে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তখন এ সব পুস্তকাদি কিছুই ছিল না। সিনেটের ঐ দুইখানা পুস্তক ব্যতীত আর দুইখানি মাত্র ছিল। একখানির নাম—"আইসিস্ আন্ভেল্ড", অপরখানি "প্রশস্ত পথ।"

সিনেটকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—ভারতের কোন কোন সিদ্ধ পুরুষের কাছে এই তথ্য ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কি জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনিই ইহা পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করেন। তখন আমরা দেখিলাম—ভারতের জ্ঞান আমাদের দেশের জ্ঞান অপেক্ষা খুব বেশী উন্নত—আমাদের গোঁড়ামি-পূর্ণ ধর্ম্মমত অপেক্ষা খুব বেশী শ্রেষ্ঠ। তবে পুরাকালের মহাত্মারা খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা ভারতীয় মত উন্নত নহে। কিন্তু সাধারণ লোকই অজ্ঞান। তাই তাহারা ঐ মহাত্মাদিগের মত গ্রহণ করে নাই, উহা উপেক্ষাই করিয়াছে। তখন হইতেই খৃষ্টান ধর্ম্মের অধোগতি; এখন আর উহাতে বুঝিবার শিখিবার কিছুই নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই দুইটি করিয়া দিবার জিনিস থাকা চাই। দরিদ্র ও মূর্খ ব্যক্তি বুঝিতে পারে, এমন ভাবের কথাও থাকিবে, আবার শিক্ষিত উচ্চ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি শুনিয়া তৃপ্তি পাইবে, এমন উপদেশও থাকিবে। এ দুইটিরই প্রয়োজন। অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই এই দুইটি করিয়া সম্পৎ আছে। দুই শ্রেণীর লোকই পরিতৃপ্ত হয়। এক প্রকার সহজ নৈতিক শিক্ষা—তাহা স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিরাও বুঝিতে পারে। আবার আত্মা, পরলোক প্রভৃতি লইয়া গভীর আধ্যাত্মিক উপদেশ আছে—তাহা মনীষিগণের তৃপ্তিসাধন করে। খৃষ্টান ধর্ম্মের এ দুইটি দিক্ই ছিল। অন্য কোন ধর্ম্ম অপেক্ষা ইহা হীন ছিল না। প্রথম ইহা বেশ ভালই ছিল। কোন

সময়ে ইহাতেও মনীষিগণ তৃপ্তি পাইতেন। কিন্তু মানুষের এই অবনতির দিনে উহার সেই আধ্যাত্মিক উপদেশ লোকে প্রায়ই ভুলিয়া গিয়াছে। "খৃষ্টানধর্ম্মমত" নামক পুস্তকে আমি খৃষ্টান্ ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক গভীর উপদেশগুলির আলোচনা করিয়াছি। অ্যানি বেশান্তও "খৃষ্টান্ ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব" নামক একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রণয়ন করিয়া খুবই দক্ষতার সঙ্গে গভীর বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

উন্নতির সম্ভাবনা

ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কির কাছে আমরা শুনিয়াছি যে, এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা প্রকৃতির মহান্ সত্যগুলি জানেন; আর অপরকে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে তাঁহারাই উপযোগী। তাঁহারা যে সত্যগুলি প্রচার করিতে বলেন, তাহা কিছুমাত্র নূতন নহে; পরন্তু খুবই পুরাতন। এত পুরাতন যে, সৃষ্টির আদি হইতে আছে বলিলেও চলে। উঁহাদের কাছে আমাদের শিখিবার অনেক আছে। ঐ সকল জ্ঞান-গুরু সময় সময় শিষ্য করিয়া থাকেন। মানুষের মধ্যে যাঁহারা সেবা-ধর্ম্মে নিরত, যাঁহারা প্রাণপণে নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার-ধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই উঁহাদের শিষ্য হইবার আশা করিতে পারেন। পরোপকারী ব্যক্তিদের উপরেই তাঁহাদের কৃপা-কটাক্ষ আসিয়া পড়ে। আমরা চেষ্টা করিলেই যে উঁহাদের করুণা লাভ করিতে পারিব, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই; কেন না, কৃপা করা না করা তাঁহাদেরই হাতে। কিন্তু তাঁহারা অপরকে শিষ্য করিয়াছেন, এমনটি দেখা গিয়াছে। তাই মনে হয়, শিষ্য হইবার আশা করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তবে ঐরূপ আশা করিতে হইলে কষ্ট স্বীকার করিয়া, সাধনা করিয়া, চরিত্রে উপযুক্ত গুণ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আমি এক জন সাধারণ শ্রেণীর লোক; এ জন্য যে আমি জ্ঞান-গুরুর শিষ্য হইবার সৌভাগ্য পাইব, সে আশা আমার নাই, সে আশা আমার পক্ষে দুরাশা। ভাবিলাম, শিষ্য হইতে না পারিলেও পড়িয়া শুনিয়া জ্ঞানলাভ অবশ্যই করিতে পারিব, আর

ব্লাভাট্স্কি-প্রচারিত মহান্ সত্যগুলির অনুশীলনের নিমিত্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেও পারিব। প্রবৃত্ত হইব ; কেন না, এরূপ মহান্ সত্য আর কোন মতে দেখি নাই। এইরূপ স্থির করিয়া, আমি ধর্ম্মযাজকের চাকরী ছাড়িয়া দিলাম। ছাড়িয়া দিয়া, ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কির সঙ্গে ভারতে গেলাম। থিয়সফি সমিতির প্রধান কার্য্যস্থলই ভারতে। ভাবিলাম, সেখানে কাজ-কর্ম্ম করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিব। কাজ করিব, মাত্র এই আশাই প্রাণে ছিল ; আরও কিছু সৌভাগ্য আমার হইবে, তখন তাহা আমি ভাবি নাই।

ভারতে যাইয়া আমি কয়েক জন সিদ্ধপুরুষের সাক্ষাৎ পাই। তাঁহাদের নিকট হইতে আর তাঁহাদের শিষ্যবর্গের কাছ হইতে আমি বিস্তর জ্ঞান লাভ করিলাম। সে সকল জ্ঞানের কিছুই পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না। আমি তখন "থিয়সফি" ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম। কেমন করিয়া সূক্ষ্ম-জগতের জ্ঞান লাভ করা যায়, সে বিষয়ের ইঙ্গিতও পাইলাম। এরূপ সৌভাগ্যের আশাও আমি কখন করি নাই ; কারণ, আমার জানা ছিল যে, বিশেষ শক্তি লইয়া না জন্মিলে ঐরূপ অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করা যায় না। কিন্তু পরে শুনিলাম যে, অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি সকলের মধ্যেই নিহিত আছে, ঐ শক্তির উন্মেষ করিয়া তুলিতে পারিলে সকলেই ঐ জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। আমি মহাত্মাদের উপদেশমত সাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পরে দেখিলাম, যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য। দেখিলাম, সাধনা দ্বারা ভুবর্লোক ও স্বর্লোক দেখিবার শক্তি লাভ করা অসম্ভব নহে। ঐরূপে দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়া গেলে থিয়সফির সমস্ত উপদেশই খাঁটি সত্য বলিয়া জানিতে পারিলাম।

আমি যেমন সাধনা দ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে, ভুবর্লোক স্বর্লোক প্রভৃতি ব্যাপারগুলি সত্য, সেইরূপ যাঁহারা সাধনা করিবেন, তাঁহারাই আমার মত জানিতে পারিবেন। তখন তাঁহারাও মরণের পর মানুষের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা জানিতে পারিবেন। যাহাদিগকে আমরা মৃত ভাবিতেছি,

তাহাদিগকে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, তাহাদের সঙ্গে গল্প-সল্প করিতে সমর্থও হইবেন। তখন উন্নত হইয়া তাঁহাদের কাছে যাইবারই ইচ্ছা হইবে, তাহাতেই বেশী আনন্দ হইবে; তাহাদিগকে স্থূলীভূত করিয়া বৈঠকে আনিয়া দেখিয়া লইব, তখন আর এ প্রবৃত্তি আসিবে না। তখন তাঁহারা জন্মান্তর-বাদের গভীর সত্যও জানিতে পারেন; কেন না, তখন নিজেদেরই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের দৃশ্য স্মৃতিপথে ফুটিয়া উঠে। পুস্তকের মধ্যে যেমন পাতার উপর পাতা সাজান থাকে, সেইরূপ মানুষের বহু জন্ম পর পর বিন্যস্ত আছে। দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় তাঁহারা অলঙ্ঘ্য ক্রমোন্নতি-বিধির সত্যতা নিঃসংশয়িতরূপে জানিতে পারেন; আর কোন স্থলেই ভগবানের অবিচার নাই, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। আমি নিজে অতগুলি ব্যাপার সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, যিনিই আমার মত একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া এই পথে আসেন, তিনিই ঐ সকল মহান্ সত্য অবগত হইতে পারেন। অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়া ঐ সব ব্যাপার বুঝিতে পারা সহজ, আমি এমন কথা বলিতেছি না। খুব শীঘ্রই ঐরূপ সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহাও বলিতেছি না। আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতেছি যে, অনেকেই ঐরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ঐ সিদ্ধিলাভের শক্তি সকলের অন্তঃকরণেই নিহিত আছে, আর ইচ্ছা করিলে সকলেই সফলমনোরথ হইতে পারেন। কিরূপ ভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহা আমি পরে বুঝাইয়া বলিব।

পরলোকের ব্যাপার ভ্রান্তি নহে

আমি পরলোকের অমুক অমুক কথা জানি বলিলে হয় তো অনেকে মনে করিবে, আমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাই ভ্রান্তি হইতেছে। অনেকেই ভাবে, যে এই সব গাঁজাখুরি কথা লেখে, সে-ও পাগল, যাহারা পড়ে, তাহারাও পাগল। অনেকে আমাদিগকে একদল বিকৃতমস্তিষ্ক পাগল বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আমার বাঁচিয়া

থাকাটা যদি মিথ্যা না হয়, আমি লিখিতেছি, আর অপরে পড়িতেছে, ইহাও যদি মিথ্যা না হয়, তবে আমি যে কথাগুলিকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। পরলোকের ব্যাপারগুলি আমার অনুমান নহে, স্বচক্ষে দেখা। সে দেখাও একবার দেখা নহে, শত সহস্র-বার দেখিয়াছি। শত সহস্রবারই বা কেন, আমি উহা প্রত্যহই দেখিয়া থাকি, আমার কাছে উহা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। একটা সহরের রাস্তাগুলি যেমন আমাদের কাছে পরিচিত, ভুবর্লোক প্রভৃতি সূক্ষ্ম-জগৎগুলিও আমাদের নিকটে তেমনই খুবই চেনা। সহরে বাস করিয়া সেই সহরের অস্তিত্বে সন্দেহ করা যেমন বাতুলের কার্য্য, ভুবর্লোক প্রভৃতির অস্তিত্বে সন্দেহ করাও সেইরূপ পাগলামি। থিয়সফি যদি ভ্রান্তিই হয়, তবুও ইহা মহীয়ান্; কেন না, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, পিথাগোরস্ প্রভৃতির মত প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মারা এই মতের সেবক, এই পথের পথিক। থিয়সফিকে ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা নিতান্ত গর্হিত। আমি যতদুর জানি, ইহা সত্য। ইহার আলোচনায় আমি খুবই পরিতৃপ্ত। অবশ্য এ কথা স্বীকার করি যে, আমি সত্য বলিতেছি বলিয়াই যে ইহা সত্য হইবে, তাহা হইতে পারে না। আমার কথাই যে প্রমাণ, তাহারও কোন অর্থ নাই। তবে যাঁহারা প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন বা করিবেন, তাঁহারা অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত দর্শনাদিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন।

অনেকে থিয়সফি আলোচনা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক অথচ ভারতে যাওয়াও তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। আবার ভারতে গেলেই যে থিয়সফির জ্ঞানে মণ্ডিত হওয়া যায়, তাহাও নহে। আমি ভারতে থাকিয়া যতটুকু জানিয়াছি, অনেকে হয় তো সারাটা জীবন সেখানে কাটাইলেও সে জ্ঞানটুকু লাভ করিবার সুযোগ পান না। তাই তাঁহারা বলেন—"যাঁহারা স্বচক্ষুতে সাধনার বলে সূক্ষ্ম-জগৎ প্রভৃতি দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহা ছাড়া আর কি প্রমাণ আছে? আমার বিশ্বাস, চোখে

দেখিবার মত অমন সুন্দর সুস্পষ্ট প্রমাণ আর নাই। সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও প্রমাণ বিস্তরই আছে। আমরা বিজ্ঞানের তথ্যগুলি যেমন যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, স্বীকার করিবার সময় কোনরূপ প্রশ্ন করি না—কোনরূপ অবিশ্বাস করি না, সেইরূপ প্রণালীতে পরলোকের তথ্যও মানিয়া লইতে পারা যায়। যাঁহারা থিয়সফির প্রমাণ চান, তাঁহারা যেন মিঃ ফুলারটন্ প্রণীত "থিয়সফির প্রমাণ" নামক অতীব বিখ্যাত পুস্তকখানি মনোযোগের সঙ্গে পড়েন। পড়িলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, গ্রন্থকারের তর্কগুলির উত্তর দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, বিষয় যেমন যেমন হইবে, তাহার প্রমাণও বিষয়ের প্রকৃতির সঙ্গে সুসঙ্গত হইবে; অতএব যাঁহারা উন্নত ও সিদ্ধ, কেবল তাঁহারাই থিয়সফির নিগূঢ় প্রমাণগুলি প্রাপ্ত হইবেন, অপরে নহে। নিগূঢ় প্রমাণ সকলে না পাইলেও বিশ্বাসজনক প্রমাণের অভাব নাই। আমরা এখনই সেইরূপ প্রমাণের কথা বলিতেছি।

প্রাচী ধর্ম্মমতের প্রমাণ

অনেকে বলেন—"আমরা সুসঙ্গতি-বিধি মানি না, দার্শনিক মত বা বিষয়ের মীমাংসার জন্য আমরা গণিত প্রভৃতির প্রমাণ চাই, বা এমন প্রমাণ চাই, যাহা আমরা হাতে-কলমে বুঝিয়া লইতে পারি।" এরূপ ব্যক্তিগণকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, ইঁহারা কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন মত মানিয়া আসিতেছেন? প্রচলিত ধর্ম্মের যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে ইঁহারা কোন প্রমাণ দিতে পারেন কি? প্রমাণ কোথায়? একটি প্রমাণও নাই। প্রমাণ আছে—এ কথাটি পর্য্যন্ত কেহ বলে না; বরং বলে যে, প্রমাণ চাওয়া মহা পাপ, যাহারা সয়তান, তাহারাই প্রমাণ দেখিতে চায়।

যুক্তিকে পদ-দলিত করিয়া মানুষগুলিকে নিজের সিদ্ধান্ত বলপূর্ব্বক স্বীকার করাই প্রাচীন ধর্ম্মের চিরন্তন ধারা। উহা অন্য ধর্ম্মের সত্য মতও মানিবে না, নিজের ভ্রান্ত মতকেই সত্য বলিয়া ঘোষণা করে।

উহার না কি ভুলভ্রান্তি হইতে পারে না, উহাই না কি সব-জান্তা, দুনিয়ার আর কাহারও না কি জানিবার শুনিবার অধিকার নাই? যাহারা প্রাচীন ধর্ম্মে বিশ্বাসী, আমি সেরূপ কোন লোকের প্রাণে বেদনা দিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আমি খাঁটী সত্য কথাই বলিতেছি। খৃষ্টান ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া অনেকেই আমার এ কথার সত্যতা বুঝিয়াছেন। খৃষ্টান ধর্ম্ম যে কেতাবখানির উপর দণ্ডায়মান, তাহার কথাগুলির মধ্যে সুসঙ্গতি নাই। মনীষিমাত্রেই ঐ পুস্তকখানি ভ্রমপূর্ণ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। যাঁহারা জগতে ঐ পুস্তকের শিক্ষা ঘোষণা করেন, তাঁহারা না কি বলিয়াছেন—"উহা অসম্ভব বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।" ঐ উক্তিই না কি তাঁহাদের "মূল সূত্র।" ঐ পুস্তকে বিস্তর কথা আছে, যাহার কখনও মীমাংসা হইবে না। মীমাংসা হইলেও তাহাতে মানুষের কখনও উপকার হইবে না।

যে সকল বিষয় আমাদের পক্ষে অর্থাৎ মানবের কাছে খুবই প্রয়োজন, তাহার অনুকূলে বিন্দুবিসর্গ প্রমাণও ঐ পুস্তকে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে এক জনকেও বলিতে শুনা যায় না যে, তিনি নিজে স্বর্গে বা নরকে গিয়া অমুক অমুক স্থান বা অমুক অমুক ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছেন; নিজে দেখিয়া আসিয়া ঘোষণা করিতেছেন; এমন কথাটি কেহই বলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন,—"আমাদের ধর্ম্ম এই এই কথা বলে।" কিংবা "বাইবেলে এইরূপ লেখা আছে।" শুধু বাইবেলের কথা প্রমাণ হইতে পারে না, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। বাইবেল্ "চিরমুক্তির" কথা বলে, কিন্তু প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ ব্যতীত অত বড় একটা গুরুতর বিষয় কি করিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়? আমাদের থিয়সফিষ্ট দল কদাচ ওরূপ ঘোষণা করেন না। যাহা আমরা নিজে না দেখি, যাহার বিশেষ প্রমাণ না পাই, তাহা প্রচার করিতে যাই না।

প্রচলিত ধর্ম্ম প্রমাণ তো দিতেই পারে না, কিন্তু দৈনন্দিন ঘটনার কারণই কি নির্ণয় করিতে পারে? জীবনের গুরুতর সমস্যার স্থলে প্রশ্ন করিলে উহা বেশ সুস্পষ্ট যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাই কি করিতে পারে? পারা দূরে থাকুক, উহারা সেরূপ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টাও করে না। ওরূপ স্থলে উহারা ঐ একই কথা বলে যে,—"ইহা ভগবানের ইচ্ছা, মানুষকে ইহা ভোগ করিতেই হইবে, কারণ অনুসন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন।" জীবনের সমস্যাস্থলে যদি আমরা ইহা ব্যতীত আর কিছু জানিতে বা শুনিতে না পাই, তবে আমাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় বলিতে হইবে। জড়বাদ-মতে আমরা আদৌ তৃপ্তি পাই না; কেন না, উহাতে কোন ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু উহাতে একটা দৈববিধির কথা আছে। সবই দৈবাৎ হইতেছে, আপনা-আপনি হইতেছে, এইরূপ কথা আছে। অন্ততঃ উহাতে এটুকু আছে যে, সকলকেই সদ্‌ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহাতে ভবিষ্যতে ভাল হউক না হউক, এ জন্মেও উপকার। জড়বাদের এ ভাবটা মহৎ ও নিঃস্বার্থ।

থিওসফি কাহাকেও কোন-কিছু অন্ধের মত বিশ্বাস করিতে বলে না। উহা এমন কথা বলে, যাহা খুবই যুক্তি-যুক্ত। তাহা ছাড়া, আমাদের চারিদিকে যে সকল রহস্য-জড়িত ঘটনা ঘটে, তাহারও সুমীমাংসা করিয়া দেয়। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে সকল উপদেশ চলিয়া আসিতেছে, থিয়সফি তাহার ভিতর হইতে সত্য অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, যে সকল ঘটনার বিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপরেও থিয়সফির বেশী আস্থা। জড়-বাদ, প্রচলিত ধর্ম্ম আর থিয়সফি—এই তিনটির মধ্যে তবে কোন্‌টি গ্রহণ-যোগ্য? সুস্পষ্ট উত্তর এই যে, যেটি খুব যুক্তি-যুক্ত, সেইটিই গ্রহণ করিতে হইবে, গ্রহণ করিয়া উহা সত্য কি না, অহরহঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ করিলে প্রত্যেকেই থিয়সফির সত্য জ্ঞাত হইয়া বিস্মিত হইয়া পড়িবে।

অলৌকিক ঘটনা

এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যাহা সাধারণের কাছে মহা রহস্য বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ধর্ম্মমত ঐ ঘটনা হয় উপেক্ষা করে, নয় অস্বীকার করিয়া বসে। থিয়সফি এইরূপ ঘটনা হইতে অদ্ভুত সত্য বাহির করিয়া দেয়। এইরূপ স্থলে থিয়সফি অতি সুন্দর যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রকৃত তথ্য বুঝাইয়া থাকে। ভূতের বৈঠকের ব্যাপারগুলি, স্থূল-দেহের বাহিরে আসিয়া লিঙ্গদেহের কার্য্য করা, ভূত-প্রেতের কাণ্ড-কারখানা, কাহাকেও তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া তাহার মুখে নানারূপ কথা বাহির করা, কাহাকেও স্মরণ-বিদ্যাবলে কিছু জানাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি ব্যাপার খুবই অদ্ভুত। জড়-বাদ এ সব স্থলে উহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইতে চাহে। উড়াইতে যাওয়া নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। হয় তো কেহ ভাবিতে পারে—'উহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাওয়া নিরর্থক, কেবল সময় নষ্ট।' যে অতটুকু সময় নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহে, সে অন্যের পরীক্ষিত মীমাংসাকে ভুল বলিবার অধিকার লইতে আইসে কেন? অন্যকে প্রতারক প্রভৃতি বলিবার তাহার অধিকার কি? অন্য সম্বন্ধে সে সমালোচনা করিতে আইসে কেন? সেরূপ ব্যক্তির ব্যবহার দেখিয়া আমাদের উট পাখীর কথা মনে আইসে। উট পাখী যখন দেখে যে, তাহার নিকটে মহা বিপদ, তখন সে বালির মধ্যে চোখ-মুখ ঢুকাইয়া দিয়া পড়িয়া থাকে। নিজে কিছু দেখিতে পায় না বলিয়া মনে করে, জগতে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। উট পাখীর উপমাটা আমরা ইহার পূর্ব্বে আর একবার মিঃ ষ্টেড্ সাহেবের "প্রকৃত ভূতের গল্প" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। যাঁহারা সৎ ও অনুসন্ধিৎসু, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, ঐরূপ অদ্ভুত ঘটনা মিথ্যা নহে, উহা সত্য সত্যই দেখা যায়; তবে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্ণয় করেন মাত্র।

খৃষ্টানধর্ম্ম ঐ সকল অদ্ভুত ঘটনার স্থলে কোন কারণ নির্দ্দেশ করিয়া

উঠিতে পারে না। ঐরূপ ক্ষেত্রে উহা কখন কখন মিথ্যা বলিয়া উড়াইতে চাহে, আবার কখন কখন সয়তানের কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে বসে। খৃষ্টধর্ম্মের কাছে যাহাই দুর্ব্বোধ্য, তাহাই তাহার মতে সয়তানের কার্য্য। বহুকাল হইতে যেখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সেখানকার অতি চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিও সয়তানের কাণ্ড বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। "হ্যাম্প-সায়ার" নামক স্থানে একটা ঠিক গোলাকার হ্রদ আছে; হ্রদটা কত কালের, তাহা কেহ বলিতে পারে না। লোকের ধারণা, ওটা সয়তানের "সরবত-পাত্র"; ইয়র্কসায়ার নামক স্থানে একটি জায়গার কয়েকটা শৈল-শিখর ক্রমসূক্ষ্ম মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। লোকের ধারণা—উহা "সয়তানের বাণ।" একপ্রকার গুল্মের ছিন্নান্ত শিকড়গুলিকে কৃষকেরা "সয়তানের বেধন-যন্ত্র" বলিয়া থাকে। এইরূপ বিস্তর প্রবাদ আছে। মধ্যযুগের লোকেরা খুবই অজ্ঞ ছিল। তাহাদের মত অজ্ঞান এখনও আমাদের মধ্যে অনেক আছে। এখন এই জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিত বিংশ শতাব্দীতেও লোকে "সয়তান" "সয়তান" করিয়া কাকাতুয়া-বুলি বলিতে থাকে, এইটুকুই আশ্চর্য্য ব্যাপার। যাহারা প্রমাণ প্রমাণ করিয়া চীৎকার করে, তাহারা তাহাদের এই সয়তানের অস্তিত্ব বিষয়ে কি প্রমাণ দিতে পারে? কথায় কথায় সয়তানের দোহাই দেয়, কিন্তু সয়তানের প্রমাণ কোথায়? এ পর্য্যন্ত কে সয়তানকে দেখিয়াছে? কিন্তু প্রমাণ চাহিলে প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্গে কাহারও বনি-বনাও হইবে না।

আমরা দেখিয়াছি বলিয়া যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত করি, তাহার একটিও অবৈজ্ঞানিক নহে। পরলোকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যে সকল তথ্য সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহার পরীক্ষা আমরা নিজেরা করি নাই, বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞেরাই তাহার পরীক্ষা করিয়া সেগুলিকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। একই ব্যক্তি নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারে না, কারণ, মানুষের জীবন তত দীর্ঘ নহে, বহুকাল সাধনা না করিলে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায় না। তাই, আমরা বহু বিশেষজ্ঞের মতের উপর

নির্ভর করিয়াছি। আমরা পরীক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেও বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে পারি; কেন না, উহা ক্রমোন্নতি-বিধির সহিত সুন্দর-ভাবে সুসমঞ্জস, আর আমাদের পরীক্ষিত ব্যাপারেরও প্রতিকূল নহে। থিয়সফি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বলিলাম।

একটা দার্শনিক মত

থিয়সফির মতগুলি যে সত্য, তাহার অন্য প্রমাণ কি আছে? বিস্তর প্রমাণ আছে। থিয়সফির মত আমরা দুই দিক্ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। বাস্তবিকপক্ষে কিরূপ ঘটে না ঘটে, সে দিক্ দিয়া আলোচনা না করিয়া দার্শনিক তত্ত্বের দিক্‌টা আলোচনা করা যাউক। অন্যান্য দর্শনের মত ইহার আলোচনা হইবে। তাহা হইলে, ইহার কাছে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিতে পারি না। পাটীগণিতের অঙ্কের মত দর্শন-শাস্ত্রটাকে একখানি শ্লেটের উপর অতি সহজেই বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। দর্শন বুঝিতে হইলে, উহার ভিতরে যে সঙ্গতি আছে, সেটুকু চিন্তা করিতে হইবে; তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঘটনার যুক্তি-যুক্ত ব্যাখ্যা আসিয়া পড়িবে। এইরূপ পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিলে, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, থিয়সফি ধর্ম্ম-মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।

থিয়সফির মধ্যে আমরা ক্রমোন্নতি-বিধির অতি সুন্দর পরিচয় পাই। এই বিধি মঙ্গল-মূলাধার শ্রীভগবানের অলঙ্ঘ্য বিধি। ইহার অতিক্রম করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। থিয়সফি কি বলে, একবার ভাবিয়া দেখ। উহা বলে—"যাহাকে আমরা মানব-জীবন বলি, উহা এক দিন আরও মহীয়ান্ হইয়া উঠিবে; সেই মহীয়ান্ জীবনটা আবার আর একটা পূর্ণায়ত জীবনের সঙ্গে সুসম্বদ্ধ হইয়া অনুক্ষণই উন্নতির দিকে ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত হইবে।" এই কথা—এই মত নিশ্চয়ই "অন্ধ দৈব-বিধির" মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "দৈব-বিধির" মতানুসারে আমরা কেবলই ঘূর্ণিত

হইতেছি, তাহাতে সুফল কিছুই নাই, কেবল যন্ত্রণা। "মুক্তির' কল্পনাত্মক মতও ওরূপ সুন্দর নহে; উহাতে বলে, দশ ভাগের নয় ভাগ লোক অবাক্‌শিরাঃ হইয়া দারুণ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া থিয়সফি বুঝিয়া লইতে যাঁহারা ভয় করেন, যাঁহারা সে দিক্ দিয়া অনুসন্ধান করিতে চান না, তাঁহারা আমাদের ব্যাপারটা দার্শনিকভাবেই চিন্তা করিয়া দেখুন। আমাদের মতের দার্শনিক ভাগটা আলোচনা করিয়া যদি ভাল লাগে, তবে সমগ্র মত পরে যেন আলোচনা করেন। মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা কোন একটা বিশেষ ধর্ম্ম প্রচার করিতে বসি নাই। আমরা কাহাকেও কিছু বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করি না, কেবল আলোচনার একটা প্রণালী উপস্থাপিত করিয়া সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলি। আমাদের প্রণালীর যে কোন ভাগের আলোচনা যে কোন ব্যক্তি করিয়া দেখিতে পারেন, ইচ্ছা হইলে যে কোন দিক্ ফেলিয়া রাখিতে পারেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তিই নাই।

আমাদের মনোবিজ্ঞান

আমাদের মনোবিজ্ঞান অতীব সরল, বাস্তব ঘটনায় পূর্ণ; তাই অনেকে গবেষণা না করিয়াই উহা গ্রহণ করিয়া লয়। আমাদের দার্শনিক মতও যেমন সহজ, মনোবিজ্ঞানও সেইরূপ। আমরা যে ব্যাখ্যা প্রদান করি, তাহা অতি সরল। লোকে শুনিবামাত্রই বিশ্বাস করিয়া লয়। আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন,তাঁহারা নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক। তাঁহাদের পক্ষে কিরূপভাবে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য? আমি যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, আমি যেমন যেমনভাবে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাঁহারাও সেইরূপ করিতে পারেন। তাঁহারা বৈঠকে যাইতে পারেন, যাঁহারা সূক্ষ্ম-জগতের ব্যাপার খুব ভাল করিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহারা দেখা-সাক্ষাৎ করিতে বা পত্র লেখা-লেখি করিয়া জানিয়া লইতে পারেন। এতটা সময় নষ্ট করিতে যদি ইচ্ছা না হয়, তবে

তাঁহারা ভূত-প্রেতের কাহিনী-বিষয়ক বা প্রেততত্ত্ব-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পড়িয়া দেখিতে পারেন ; তত্তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট বহি আছে। পড়িয়া শুনিয়া অনেকটা জ্ঞান হইবে। অবশ্য সেটা পরোক্ষজ্ঞান। আমরা অন্যান্য দিকে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পরোক্ষজ্ঞানেই সন্তুষ্ট থাকি। যখন আমরা ভূগোল পড়ি, তখন পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেশ পর্ব্বত-নদী প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিতে যাই না। অথচ, মাত্র পড়িয়াই জ্ঞানলাভ করি, আর তাহাতে আনন্দও পাই। আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই অন্যের লেখা পড়িয়া বিশ্বাস করিয়া লইতে প্রস্তুত।

আমরা অপরের কথা খুব বিশ্বাস করিয়া লইয়া থাকি। অপরের মুখে শুনিয়াই জানি বলিয়া মনে করিয়া লই। প্রকৃতপ্রস্তাবে হয় তো সেটা আদৌ জানি না। একটা উদাহরণ দেখ। আমরা সকলেই বলি—পৃথিবী ঘুরিতেছে। আমরা বলিয়া থাকি, "আমরা জানি, পৃথিবী ঘুরিতেছে।" কিন্তু বস্তুতঃ পৃথিবীর ঘূর্ণন আমরা কেহই অনুভব করিতে পারি না। সত্য বলিতে গেলে বলিতে হয়, ও ব্যাপারটা আমরা জানি না। আমরা এই যে পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া আছি, বা এই যে বসিয়া আছি, কৈ, পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে কি ? বোধ হইতেছে, পৃথিবীটা স্থির রহিয়াছে। পৃথিবীটাকে আমাদের এতই নিশ্চল বলিয়া বোধ হয় যে, কোন কিছুকে স্থায়ী বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে আমরা "পৃথিবীর মত নিশ্চল" বলিয়া উপমা দিই। আমাদের মনে হইতেছে, যেন সূর্য্য ও নক্ষত্রনিকর আমাদের চারিদিকে ঘুরিতেছে। কার্য্যতঃ আমরা উহাদের ঘূর্ণনই দেখিতে পাই। পৃথিবীর ঘূর্ণনটা আমরা বুঝিতেই পারি না। তবে পৃথিবী ঘুরিতেছে, এই কথাটি আমরা বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি মাত্র। পৃথিবীর ঘূর্ণন কোন কোন যন্ত্র দ্বারা বুঝা যায়। যদি ঐ যন্ত্রের সাহায্যে বুঝিবার সুযোগ হয়, তখন বলিতে পারি যে, পৃথিবীর ঘূর্ণন জানি। আর যত দিন যন্ত্রের সাহায্যে বুঝা না হয়, তত দিন "জানি" অর্থে বিশ্বাস করি, বুঝিতে হইবে। "ফোকল্ট পরিদোলক" ও "জাইরোস্কোপ" নামক যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর

আবর্ত্তনের প্রকার দেখা যায়। এই দুই যন্ত্রের সাহায্যে যে পৃথিবীর আবর্ত্তন দেখিয়াছে, কেবল সেই বলিতে পারে যে, "আমি জানি, পৃথিবী ঘুরিতেছে।" ঐ যন্ত্র ব্যতীত কিছুতেই প্রমাণ করা যায় না যে, পৃথিবী ঘুরিতেছে। ঐরূপ প্রমাণ না পাইলেও সকলেই পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া রাখিয়াছে।

ঐরূপ অনেক ব্যাপার বস্তুতঃ আমরা জানি না, দেখি নাই অথচ জানি বলিয়া পরিচয় দিই। আমাদের সে জানাটা জানা নহে, শুধু বিশ্বাসমাত্র। স্পিটজ বার্জেন্ নামক দ্বীপ আছে, মধ্য-আফ্রিকায় ষ্টান্‌লে সাহেব বামনবীরের রাজ্য দেখিয়াছিলেন—এই সব ব্যাপার কয় জন দেখিয়াছেন? এ সব যদি সত্য হয়, তবে সূক্ষ্ম-জগৎ নিশ্চয়ই সত্য; কেন না, যত লোক ঐ রাজ্য দেখিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা বেশী লোক সূক্ষ্ম-জগতের সংবাদ পাইয়াছেন। "ডিউ চেল্লু" নামক এক ব্যক্তি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ষ্টানলের কাছে যখন বামন-বীরের জাতির বর্ণনা করেন, তখন সকলেই গাঁজাখুরী উপন্যাস বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ বর্ণনা মিথ্যা নহে, খাঁটি সত্য। বর্ণনা শুনিয়া সত্য কি মিথ্যা বুঝিয়া লইবার জন্য কেহই তখন আফ্রিকায় যাওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। বামন জাতিকে দেখিবার নিমিত্ত যখন কেহই গেলেন না, তখন সত্যদর্শী "ডিউ চেল্লুর" কথাগুলিকে অবিশ্বাস করিবার তাঁহাদের কি অধিকার ছিল? তাঁহাদের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করা উচিত ছিল, তাহা না করিয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উঠা কখনই উচিত হয় নাই। নিজের নিজের মতামত নিজের নিজের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই উচিত। অন্যের বেলায় মতামত প্রকাশ করিতে গেলে একটু সাবধান হইয়া করা আবশ্যক। থিয়সফি সম্বন্ধেও আমাদের ঐ কথা। যাঁহারা থিওসফির কথাবার্ত্তা শুনিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের কথা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পীড়াপীড়ি করি না। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা এ কথাটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে চাই যে, না বুঝিয়া সুঝিয়া তাঁহারা যেন আমাদের কথা মিথ্যা বলিয়া মত প্রকাশ না করেন।

আর একটি কথা বলিতে চাই এই যে, আমাদের কথার প্রমাণ চাহিতে আসিয়া যেন অসম্ভব অস্বাভাবিক প্রমাণ চাহিয়া না বসেন।

সূক্ষ্মজগতের অপ্রত্যাশিত প্রমাণ

বহুকাল পূর্ব্বে ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কি যে সকল কথা বলিয়া উপহসিত হইয়াছিলেন, লোকে যে সকল কথাকে ঘোর অসম্ভব অবৈজ্ঞানিক বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল, আমরা নিরন্তর সেই সকল ব্যাপারের প্রমাণ পাইয়া থাকি। তাহার পরে স্থূক্ষ্ম-জগতের গবেষণা করিতে গিয়া আমরা তাঁহারই কথার সত্যতা বুঝিতে পারিয়াছি। একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে মিঃ সিনেট্ তাঁহার "আত্মার উন্মেষ" নামক গ্রন্থে দুইটি গ্রহের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রহ না কি নেপচ্যুন গ্রহের কক্ষসীমারও বাহিরে অর্থাৎ অতি দূরে। ঐরূপ দূরে যে ঐ গ্রহ আছে, থিয়সফি সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত আর কেহই তাহা বিশ্বাস করিল না। তখন সকলেই ঐ কথাটি অসার বলিয়াই মনে করিল। কিন্তু ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের "টাইমস্" নামক সংবাদ-পত্রে খবর বাহির হইল যে, অধ্যাপক ফরবেশ্ নেপ্চ্যুনের অপেক্ষাও দূরে ধূমকেতুর মত কি যেন কিসের সমষ্টি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, সে দুইটি নাকি দুইটি গ্রহ। থিয়সফির কথা যে সত্য, এটি তাহার একটা সামান্য প্রমাণমাত্র। সামান্য হইলেও ইহাতে থিয়সফির পরিচয় কতকটা পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বিস্তর প্রমাণ আছে। আর একটা ব্যাপার দেখ। এবার শুক্রগ্রহের কথা বলিব। শুক্রগ্রহকেই শুকতারা বলে। যখন আমি স্কুলে পড়িতাম, তখন শুনিয়াছিলাম যে, ঐ গ্রহের দিন-রাত্রিটা ঠিক আমাদেরই পৃথিবীর অনুরূপ। কিন্তু পরে জ্যোতির্ব্বিদ্যার গবেষণায় জানা গেল যে, চন্দ্রের একটা দিক্ যেমন সর্ব্বক্ষণই পৃথিবীর দিকে ফিরানো থাকে, অর্থাৎ পৃথিবীবাসীরা চাঁদের একটা পিঠই বরাবর দেখিতে পায়, সেইরূপ শুক্রগ্রহেরও না কি একটা পিঠ বরাবর সূর্য্যের দিকে ফিরান থাকে। তাই যদি হয়, তবে ঐ গ্রহে

আমাদের মত জীব কখনই বাস করিতে পারে না। তাহা হইলে আমাদের যে ধারণা ছিল, "উহাতে আমাদের অপেক্ষা উন্নততর জীব আছে," তাহাও বিনষ্ট হইয়া যায়। আবার, স্যর রবার্ট বল্ প্রমাণ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বের কথাটাই সত্য, সূর্য্যের দিকে এত পিঠ ফিরান থাকার কথা মিথ্যা। তাহা হইলে আমাদের কথাই সত্য দাঁড়াইল।

থিওসফির ভাবে অনুপ্রাণিত এক জন বৈজ্ঞানিকের কথা

থিওসফি যে উপদেশ দিয়াছে, যে মত প্রকাশ করিয়াছে, বিজ্ঞানও ধীরে ধীরে নিঃসংশয়িতরূপে সেই দিকেই আসিতেছে। বিজ্ঞানের প্রাণে থিওসফিরই ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছে। স্যর অলিভার লজ বার্ম্মিংহাম্ সহরে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমরা কতকটা উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক! একটু লক্ষ্য করুন। তাঁহার কথা এই :—"লোকের ধারণা, সূর্য্য যদি না থাকে, তবে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। কে বলিল? আমাদের দেখিবার শক্তি যদি বর্দ্ধিত হয়, তবে ওরূপ ক্ষেত্রে হয় ত আমরা মহাশূন্যে কত কি দেখিয়া ফেলিতে পারি। কিছুই অসম্ভব নহে। আমরা এখন যাহা দেখিতেছি, তাহা তো কিছুই নহে; এত দেখিবার, জানিবার বিষয় আছে যে, তাহার সহস্রাংশের একাংশও আমরা দেখিতে পাইতেছি না। আমরা সর্ব্বত্রই জীবন দেখিতে পাই। তবে যে সকল গ্রহের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই, তাহাতে জীবন বলিয়া পদার্থ কি থাকা সম্ভবপর নহে? কেহ কেহ ভাবেন, মানুষের অপেক্ষা উন্নততর জীব থাকিতে পারে, এমন কথা বিজ্ঞান সম্ভব বলিয়া স্বীকার করে না। আমি যতটুকু বিজ্ঞান বুঝিয়াছি, তাহাতে এই বুঝিয়াছি যে, বিজ্ঞান কোন স্থানে ওরূপ অস্বীকার করে নাই। মানুষ যে বিষয় জানে না, সে বিষয়ে তাহার 'হাঁ বা না' এরূপ কোন কথা বলা ঠিক নহে। সেরূপ স্থলে কোন প্রকার মতামত দিতে যাওয়া তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা। কেমন করিয়া পৃথিবীতে আদৌ 'জীবন' জিনিসটির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা বিজ্ঞান আজিও জানে না।

বিজ্ঞানের কাছে সেটা ঘোর রহস্য। আমার মনে হয়, শীঘ্রই এ রহস্যের উদ্‌ঘাটন হইবে। ক্রমোন্নতি-বিধি আছে বলিয়া যে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহা নহে। আমার মনে হয় যে, ক্রমোন্নতি-প্রথা ভগবানের কার্য্যপ্রণালীর অভিব্যক্তি। যাহা আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার ভিতর শৃঙ্খলা আসিল কোথা হইতে? কোন বুদ্ধিমান্ পরিচালক কি উহার অন্তরালে নাই? শ্রীভগবানের একটা কার্য্যধারা আছে; সেটা আমাদিগকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে। ধারাটি এই যে, তিনি স্বয়ং আসিয়া সোজাসুজিভাবে কাজ করিতে বসেন না। দেবযোনি প্রভৃতি কার্য্যকারকেরা তাঁহার আদেশ ও ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন; আর ধীরে ধীরে সেই কার্য্য হইতে থাকে। ক্রম-বিকাশের যেরূপ ধারা এখন চলিতেছে, তাহা অন্য সময়ে যে অন্যরূপ ছিল, তাহা আমার মনে হয় না। যাঁহারা শ্রীভগবানের কার্য্যকুশলতা দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের শুধু অতীত কালের দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না; বর্ত্তমান কালের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ঐ সকল দেবযোনি প্রভৃতি কার্য্যকারকেরাই শ্রীভগবানের বিরাট সঙ্কল্প কাজে পরিণত করিতেছেন। যাঁহারা এই মহান্ সত্য জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাও শ্রীভগবানের সঙ্কল্প-সিদ্ধির পক্ষে সহায়স্বরূপ বলা যাইতে পারে। একযোগে পরস্পরকে সাহায্য করিলে তাঁহারাও ঐশী কাজের অনেকটা সহায় হইয়া উঠিতে পারেন। পৃথিবীটা আমাদের শিক্ষাগার। এখানে নানাবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশা। ইহার মধ্যেও যদি আমরা পরস্পরকে সাহায্য করিতে না শিখি, তবে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?”

পাঠক! লজের কথা শুনিলেন ত? খুব আধুনিক বিজ্ঞান যে থিয়সফির সঙ্গে একমত, তাহা আমরা সুন্দররূপে দেখিলাম।

অন্ধবিশ্বাস নহে

অনেকে ভাবেন, থিয়সফির পথে আসিয়া যাঁহারা দিব্যচক্ষুতে দেখিবার শক্তিলাভ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে প্রচলিত

ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মত এখন শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই সময় কাটাইতে হইতেছে। আর এরূপ লোকের সংখ্যাও খুব বেশী। এ কথাটি কতকাংশে সত্য; কিন্তু ইঁহাদের বিশ্বাস এত স্বতন্ত্র প্রকার যে, তাহাতে তুলনাই হইতে পারে না। কোন কিছু না দেখিয়াও যদি তাহাকে আমাদের কোন ব্যক্তি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তবে তাঁহার সে বিশ্বাসটি অন্ধ-বিশ্বাস নহে। সে বিশ্বাসের মধ্যে যুক্তি আছে। সে বিশ্বাসের মূল মাত্র ধর্ম্ম-পুস্তক নহে। ধর্ম্ম-পুস্তকের দ্বারাও আমরা আমাদের বিশ্বাস সমর্থন করিতে পারি। আমরা যে ধর্ম্ম-পুস্তকের বলে বলীয়ান্, তাহা য়িহুদী-জাতির ধর্ম্ম-পুস্তকের মত অর্ব্বাচীন নহে। তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার নাম—বেদ ও উপনিষদ। উহা সেই জাতির নিকট হইতে কালসহকারে আমরা পাইয়াছি, যে জাতি সভ্যতার অত্যুচ্চ শিখরে অধিরূঢ় ছিলেন। যখন য়িহুদীরা নগণ্য অসভ্য আরব জাতি বলিয়া পরিচিত, তখনও সেই সভ্য জাতির মধ্যে ঐ অমূল্য ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রচলিত। আগেই বলিয়াছি, শুধু ধর্ম্ম-গ্রন্থই আমাদের বিশ্বাসের মূল নহে। শুধু বেদ-উপনিষদ্ হইতেই যে আমাদের বিশ্বাস উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে। পরবর্ত্তী মাহাত্মাদের জ্ঞান ও শিক্ষাও আমাদের বিশ্বাসের মূল। যাঁহারা জ্ঞান ও শক্তিতে সাধারণকে অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহাদিগকে আমাদিগের সম্প্রদায়ের অনেকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া জানেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মহাত্মা, তাঁহাদের মত নিশ্চয়ই আদরণীয়। এই সকল ব্যতীত আমাদের বিশ্বাসের অন্য কারণও আছে। ইউরোপবাসী অনেক ভ্রাতা আমাদের এই আলোচনায় যোগ দিয়া তত্ত্ব-অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা যে সকল ব্যাপার আবিষ্কার করিতেছেন, সে সমুদয় আমাদেরই উপদেশের পদে-পদে পৃষ্ঠ-পোষক।

মহাত্মাদের গবেষণার ফল খুব মূল্যবান্ সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু উহাই আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের একমাত্র হেতু নহে। থিয়সফি-মতটাই বস্তুতঃ খুব যুক্তি-যুক্ত ও সন্তোষজনক। বিজ্ঞানের ধারা এই যে, যতক্ষণ না

কোন একটা মতের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মত জানা যাইতেছে, ততক্ষণ সেই মতটিকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া মানিয়া চলিতে হইবে। এই সূত্র ধরিয়া আমরাও বলিতে চাই যে, আমাদের মতটি দুর্ভেদ্য, অবিনশ্বর। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মত যদি কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে আমরা তাহা গ্রহণ করিতে রাজি আছি। কিন্তু কেহ তাহা পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই; কেন না, আমরা বহু ধর্ম্ম-মত আলোচনা করিয়া তাহাদের প্রকৃতি অবগত হইয়াছি। আমাদের মতের কোন ত্রুটি আমাদের চক্ষুতে পড়া দূরে থাকুক, আমরা নানাবিধ মতের যতই আলোচনা করিতেছি, ততই আমাদের মতেরই পোষক মত দেখিতেছি। বিস্তর ব্যক্তির দিব্যশক্তি ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকসিত হইয়াছে। অতএব এখন আমাদের অনুকূল প্রমাণ আরও পাইব বলিয়া আশা করিতে পারি। আমাদের মধ্যে অনেকেই অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভ করিয়াছেন; তদ্‌ব্যতীত অনেকের আত্মীয়-স্বজনও ঐরূপ উন্নত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহারা বিস্তর অলৌকিক ঘটনা দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন। থিয়সফি সেরূপ ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে। বেশ যুক্তির সঙ্গে উহাদিগের জন্য নিসর্গের মধ্যে স্থানও নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু অন্য কোন ধর্ম্ম-মত উহা অপেক্ষা ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারে কি ?

কষ্টসহিষ্ণু, যত্নশীল, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে আমি একটি উপদেশ দিতে চাই। তিনি যেন অতীন্দ্রিয় শক্তির ও সূক্ষ্ম-জগতের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে থাকেন। প্রথমে তিনি যেন কিছু দিন ধরিয়া ঐরূপই করেন। তিনি যেন স্মরণ-বিদ্যা ও "মেস্‌মেরিজম্" কি না মোহিনী-বিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রমাণ লইতে থাকেন। যদি সম্ভব হয়, তবে যেন নিজেই হাতে-কলমে করেন, নচেৎ যেন ঐ দুই বিষয়সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পড়িতে থাকেন।

ঐ পুস্তক পড়িয়া কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করিয়া তাহার পর যেন ভুবর্লোক প্রভৃতি সূক্ষ্মজগতের চিন্তা করিতে বসেন। এইরূপ প্রণালীই ভাল। ভুবর্লোক প্রভৃতির চিন্তা করিতে গেলেই কোথায় উহা আছে,

তাহার প্রমাণ খুঁজিবার ইচ্ছা হইবে। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে ভুবর্লোকের জ্ঞান হইবে।

ভুবর্লোক স্বভাবতঃ আমরা দেখিতে পাই না। উহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহাকে অস্বাভাবিক ব্যাপারের পরীক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ করিতে গেলেই ভূর্লোক ও ভুবর্লোক এই দুইটি জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহাকে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। তখন তাঁহাকে ভূত-প্রেতের ব্যাপার, বৈঠকের কাণ্ড-কারখানা সমস্তই আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। এ আলোচনা নিজে পরীক্ষা দ্বারা করিলেও চলে, বা অপরের পরীক্ষা-ফল পাঠ করিয়াও হইতে পারে। আমি নিজে হাতে-কলমে সমস্ত করিয়া বুঝিয়াছিলাম।

সূক্ষ্ম-জগতের আলোচনায় দুইটি কার্য্য একই সময়ে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাতে কোন বাধা জন্মে না। আলোচনাকারী নিজের উন্নতিসাধন করিয়া লইতে পারেন, তাহাতে ভুবর্লোকের স্বাভাবিক দৃশ্য তাঁহার চক্ষুতে পড়িবে। আবার ওখানকার অলৌকিক ব্যাপারগুলিও অবগত হইবার সুবিধা ঘটে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

দিব্যদৃষ্টিলাভের উপায়

দিব্য-দৃষ্টির আলোচনা করিয়া মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে, উহার ক্ষমতা অদ্ভুত, তখন সে ঐ ক্ষমতা লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া উঠে। ঐরূপ ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করে,—"মহাশয়, কি উপায়ে আমি দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিতে পারিব? আপনারা বলেন যে, ঐ শক্তি মানুষমাত্রেই নিহিত আছে; যদি তাহাই হয়, তবে কিরূপ কাজ করিলে তাহার বিকাশ ঘটান যাইতে পারে? আপনাদিগকে কিরূপভাবে উন্নত করিয়া তুলিলে আমরা সকলেই ঐ শক্তি লাভ করিতে পারি?" এইরূপ প্রশ্ন শুনিলে আমরা প্রষ্টাকে বলিয়া থাকি যে, মানুষ সত্যই ঐ শক্তির উন্মেষ-সাধন করিতে পারে, আর অনেকে বাস্তবিকই করিয়াছে। ঐ শক্তি নানা উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু সকল উপায়গুলিই নিরাপদ নহে। কতকগুলি প্রণালীতে খুবই বিপদ আছে; সুতরাং সেগুলি বাঞ্ছনীয় নহে। দিব্য-দৃষ্টিলাভের পক্ষে মাত্র একটা নিরাপদ প্রণালী আছে। আমরা সকলকেই সেই প্রণালীটি অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিই। দিব্য-দৃষ্টিলাভের যতগুলি পথ আছে, আমরা সকলগুলিরই আলোচনা করিব। তাহা হইলে, উহার বিপদ-আপদের কথাও জানা যাইবে। তখন সকলেই সে পথ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইবেন।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে এ কথা বলিয়া আসিয়াছি যে, পৃথিবীর উন্নত জাতির উন্নত ব্যক্তিদিগের অনেকেই ভুবর্লোক দেখিবার মত শক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সে শক্তি পূর্ণ বিকাশই প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভ করিয়াও আমরা উহা ব্যবহার করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহি। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ শক্তি ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে ফুটিয়া

উঠিয়াছে। এত ধীরে ধীরে ফুটিয়াছে যে, আমরা নিজেরাও উহার প্রভাব অনুভব করিয়া উঠিতে পারি নাই। অব্যবহার্য্য অস্ত্রের মত উহা আমাদের হস্তেই রহিয়াছে মাত্র। স্থূলদেহের বৃত্তি লইয়াই আমরা ঘোর ব্যস্ত। এই স্থূলদেহের স্থূল বৃত্তির প্রভাবেই আমাদের সেই সূক্ষ্ম শক্তি হীনপ্রভ হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের কিরণে যেমন বহুদূরবর্ত্তী নক্ষত্র-নিকরের আলোক ফুটিতে পারে না, সেইরূপ দৈহিক বৃত্তির প্রভাবে সূক্ষ্মশক্তির অস্তিত্ব জানিতে পারা যায় না। সূক্ষ্মশক্তি মানুষমাত্রেই আছে। উন্নত মানুষমাত্রই উহা লাভ করিয়া থাকেন। এই শক্তি পাইতে হইলে, আমাদিগকে দুইটি কার্য্য করিতে হইবে। সূক্ষ্মশক্তিলাভের চেষ্টাকে সাধনা বলা যাইতে পারে। এই সাধনা-সময়ে আমাদিগকে অতিশয় বলবতী দৈহিক বৃত্তি-গুলির বেগ কমাইতে হইবে; আর সঙ্গে সঙ্গে অ-জানা সূক্ষ্মশক্তির ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবার চেষ্টা পাইতে হইবে।

দৈহিক বৃত্তির, দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলির অব্যবহারের চেষ্টাই প্রথম কার্য্য। এটি করিবার পক্ষে অনেক প্রণালী আছে। আমরা সেই প্রণালীগুলিকে মোটামুটি হিসাবে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে পারি। আমাদের যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, বল-প্রয়োগ করিয়া আমরা সেগুলিকে কিছুদিনের জন্য নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি, এইটি একটি ভাগের কথা। আর একটি ভাগের কথা এই যে, আমরা জ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে আমাদের ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া তুলিতে পারি। এই শেষের প্রণালীতে একটু বিলম্ব ঘটে বটে, কিন্তু ফল খুবই ভাল হয়। প্রথম প্রণালীর ফল অস্থায়ী; দ্বিতীয় প্রণালীর ফল স্থায়ী। বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় দমন করিবার অনেক উপায় আছে। তাহার অনেকগুলিতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে স্থূল-দেহের অপকার হইয়া থাকে। ঐরূপ চেষ্টা করিলে অনেক প্রকার কু-ফল ফলিতে আরম্ভ করে। একটি কু-ফল এই যে, মানুষ জড়ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। হইতে পারে, তখন তাহার সূক্ষ্ম-জগতের দিকে দৃষ্টি বেশ খুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু স্থূলদেহ অসুস্থ হইয়া উঠিলে সে তাহা নিবারণ করিতে পারে না।

আর একটি কু-ফল এই যে, বল-প্রয়োগ দ্বারা ইন্দ্রিয়দমনের শুভ ফল খুবই অস্থায়ী। ঐ শুভ ফল অনেক সময় খুব অল্পদিনই থাকে, কখন বা আ-মরণ-স্থায়ী হয়। ইহার বেশী থাকে না। ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভের চেষ্টা বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ঐ সকল দেশেও ঐ শক্তিলাভের পক্ষে দুইটি পথ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। একটি উপায়—লৌকিক; অপরটি—লোকত্র। প্রথমটির ফল অস্থায়ী; এটি মাত্র বর্ত্তমান জীবন-ব্যাপী হয়। দ্বিতীয়টির ফল জীবাত্মার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে; উহা জীবাত্মার সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া চলে। উহা স্থায়ী ফল; প্রকৃতপক্ষে উহাতে জীবাত্মা নিজেই উন্নত হইয়া উঠে। প্রথম প্রণালীতে শিক্ষা-সাধনার বিশেষ প্রয়োজন হয় না; যেটুকু শিক্ষার প্রয়োজন হয়, সেটুকুও দেহের; আত্মার নহে। যে পাঁচটা দেহ লইয়া আমরা চলা-ফেরা করিতেছি, উহারাই উহার প্রভাব ভোগ করে। পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলে আমাদের আবার নূতন পাঁচটা কোষ তৈয়ারী হইবে, তাহারা ঐ ফল পাইবে না। এখনকার কষ্টভোগ তখন বিফল হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় উপায়ে আত্মার উন্নতি হয়। তখন নূতন জন্মেও আত্মা সেই স্থায়ী ফল প্রকাশ করিতে পারে। বল-প্রয়োগ দ্বারা ইন্দ্রিয়-দমন করিয়া দিব্য-শক্তিলাভের অনেক প্রকার প্রণালী আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঐ সকল ব্যাপার দেখা যায়। আমরা নিম্নে ঐ প্রণালীর কথা বলিতেছি।

দিব্য-শক্তিলাভের অ-বাঞ্ছনীয় প্রণালী

দিব্য-শক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত ভারতের অনার্য্যজাতিরা ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া থাকে। উহার ফলে সত্য-সত্যই দিব্যদৃষ্টি কিয়ৎপরিমাণে খুলিয়া যায়। কোন কোন ঔষধে শরীরটাকে অসাড় করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভাঙ্গ প্রভৃতিতে স্থূল-দেহ সংজ্ঞাহীন হইয়া উঠে। তখন লিঙ্গ-শরীরটা স্বাধীনভাবে ভুবর্লোকে বিচরণ করিতে থাকে।

আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি, তখনও আমাদের লিঙ্গ-শরীর ঐরূপভাবে ভুবর্লোকে বেড়ায়। আমাদের নিদ্রিত অবস্থায় লিঙ্গ-শরীরের বাহির হইয়া যাওয়া, আর নেশার অবস্থায় যাওয়া এ দুইটি যাওয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে। ঘুমের অবস্থায় গেলে জাগিয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে; আর নেশার অবস্থায় গেলে সে সম্ভাবনা নাই। লিঙ্গ-শরীরে সূক্ষ্ম-জগতে বেড়াইব, বেড়াইয়া অতীন্দ্রিয়-শক্তিবলে অনেক অনেক বিষয় জানিব, ইহা মনে করিয়াই এক জন যদি নেশা করে, তবে নেশা হওয়ায় লিঙ্গ-শরীর মুক্ত হইবামাত্র সে সূক্ষ্ম-শক্তির ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। এইরূপ করিতে করিতে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিলাভে কতকটা সমর্থও হয়। নেশা ছুটিয়া গেলে সে সূক্ষ্মজগতের কথাগুলি স্মরণ করিতে চেষ্টা করে। সূক্ষ্ম-জগতের সেই অতীন্দ্রিয়-শক্তি তখনও কিছু কিছু তাহার মনে থাকে। ঐ শক্তি-বলে সে অনেকের অনেক কথা বলিয়া দেয়। তখন দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন বলিয়া তাহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। নেশার প্রভাবে সংজ্ঞাহীন হইলে তাহার ঘাড়ে কখন কখন ভূত আসিয়া চাপিয়া বসে, আর কথাবার্ত্তা বলিতে থাকে। মিডিয়মের ঘাড়ে যেমন চাপে, উহাদের ঘাড়েও তেমনই চাপে। দিব্য-শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে অনেকে আবার নেশা না করিয়া এক প্রকার ধুঁয়া নিশ্বাস-পথে গ্রহণ করে। কোন কোন গাছের ধুঁয়া নাকে গেলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া আসে। উহারা ঐ প্রকার ধুঁয়া নাকে টানিয়া লয়। পুরাকালীন যাদুকরী-দিগের যে অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানের কথা শুনা যায়, তাহা সম্ভবতঃ এই উপায়ে লাভ করা হইত। ঐ যাদুকরীরা ধর্ম্মমন্দিরে পুরোহিতের কার্য্য করিত। একটি বিবরণে এইরূপ জানা গিয়াছে যে, এক দিন একটা যাদুকরী একটি ত্রি-পদ আসনে বসিয়াছিল। ঐ আসনটা না কি একটি পর্ব্বতের উপর বিন্যস্ত, আর আসনের নীচে পর্ব্বত-গাত্রে একটা ফাটল ছিল। সেই ফাটল দিয়া বাষ্প বাহির হইয়া আসিতেছিল। ঐ বাষ্প নাকে যাইবামাত্র রমণী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। তখন একটা পরিচিত ভূত উহার ঘাড়ে চাপিয়া

উহার মুখে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। পরিচিত, কেন না, অনেক বৈঠকে লোকে তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল। ভাঙ্গ প্রভৃতির নেশাই হউক, আর সংজ্ঞা-নাশক ধূঁয়া নাকে লওয়াই হউক, এ দুইটি প্রথাই নিন্দনীয়। ইহার কোনটিতেই বাস্তবিক শক্তির উন্মেষ-সাধন হয় না।

অনেকে হয় ত নৃত্যকারী দরবেশদিগের কথা শুনিয়াছেন। উহারা উন্মত্তভাবে এক অদ্ভুত রকমের নাচ নাচিয়া থাকে। ঐরূপ নাচ না কি উহাদের ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ। সে নাচ পাগলের মত একটা বিকট ভঙ্গীর নাচ। নাচিবার সময় কেবলই পাক দিয়া দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে। নাচিতে নাচিতে বিশ্রী মাথা ঘুরিয়া উঠে। তখন অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া যায়। ধর্ম্ম-ভাব প্রাণে লইয়া নাচিয়াছিল বলিয়া এই অজ্ঞান অবস্থায় উহারা অলৌকিক ব্যাপার দেখিতে থাকে। এই প্রণালীতে উহারা ভুবর্লোকের নিম্নস্তরের অনেক কাণ্ড জানিতে পারে। তাহার পর সজ্ঞান অবস্থায় কতক কতক স্মরণ করিয়াও বলিয়া থাকে। দরবেশদিগের এরূপ ব্যাপার আমি স্বচক্ষুতে কিছু কিছু দেখিয়াছি। আমি আর এক ব্যাপার দেখিয়াছি। সেটা "ভূডু"দিগের কাণ্ড। কাফ্রিদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর পুরোহিত আছে, তাহাদিগকে "ওবে" বা "ভূডু" বলে। ইহারা যাদুব্যবসায়ী। ইহারা এমন সকল ব্যাপার দেখায় যে, সেগুলি অতীব ঘৃণিত, লজ্জাকর ও ভয়াবহ। সেরূপ ব্যাপার আমরা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি না। ঘৃণিত ব্যাপার হইলেও উহাতে কিছু কিছু দিব্য-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপের কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব-কথিত উপায়ে দিব্য-শক্তিলাভের চেষ্টা করিলেও আমরা ওরূপ উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ কাহাকেও দিই না।

দিব্য-জ্ঞানলাভের নিন্দনীয় প্রণালী যে শুধু প্রাচ্য দেশেই আছে, তাহা নহে। পাশ্চাত্য দেশেও কম নহে; যাঁহাদের প্রাণের পিপাসা পবিত্রতার উন্মেষ-সাধন করিয়া নিরাপদ হইয়া উঠে, তাঁহারা যেন সেগুলি পরিহার

করিয়া চলেন। পাশ্চাত্যেরাও অনেক উপায়ে আপনাদিগকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া তুলেন। সেরূপ করা অতীব গর্হিত। একটা উজ্জ্বল পদার্থের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে, মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ অসাড় হইয়া উঠে। যাহার মস্তিষ্ক ঐরূপভাবে—ঐরূপ প্রাণালীতে অসাড় হয়, সে একেবারে জড়বৎ হইয়া পড়ে। তখন তাহার লিঙ্গ-দেহ ভুবর্লোকের নিম্নস্তরে বিচরণ করিয়া কতকটা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার দেখিতে থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে সে অমুক জিনিস দেখিব, বা অমুক বিষয় জানিব, এরূপ কোন সঙ্কল্প করিতে পারে না। ভালই হউক আর মন্দই হউক, যেরূপ দেখে বা শুনে, তাহাতেই তাহাকে সন্তুষ্ট হইতে হয়। এরূপ ব্যাপারের ফল খুব বেশী সময় মন্দই হইয়া থাকে। কোন সাঙ্কেতিক কথা জপ করিয়াও অনেককে দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিতে দেখা যায়। ইহারও কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রকার। জপ করা অর্থ পুনঃ পুনঃ একটা কথা মনে মনে উচ্চারণ করা। এরূপ করিতে করিতে মনের বৃত্তি অসাড় হইয়া উঠে। উজ্জ্বল বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যেমন মস্তিষ্ক অসাড় হয়, মনের আলোড়ন করিতে করিতে মনের শক্তিও সেইরূপ বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন লিঙ্গ-দেহভূত চৈতন্য ভুবর্লোকের অতীন্দ্রিয় ব্যাপার জ্ঞাত হইতে থাকে।

লর্ড টেনিসন্ দিব্য-দৃষ্টির একটা ব্যাপার বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি নিজের নামটা ঘন ঘন জপ করিয়া দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি "ফেয়ারিং ফোর্ড ফ্রেস্ওয়াটার ওয়াইট্ দ্বীপ" নামক স্থান হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে স্বহস্তে ঐ ব্যাপার লিখিয়া গিয়াছেন। এক জন ভদ্রলোক সংজ্ঞা-নাশক দ্রব্য ব্যবহার করায় অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন। তাই টেনিসন্ প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন। টেনিসন্-প্রদত্ত বিবরণটি এইরূপ :—

"সংজ্ঞা-নাশক ঔষধ-প্রভাবে মানুষ অজ্ঞান হইয়া গেলে, তাহার অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ হয় শুনিয়াছি। আমার কিন্তু ওরূপ জ্ঞান-লাভের

সুযোগ কখনও ঘটে নাই। অন্যভাবে আমি ঐ জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়াছি। বাল্যকাল হইতেই আমি দিব্য-দৃষ্টির ব্যাপার জানি। আমি একা হইলেই নিজের নামটি মনে খুব একাগ্রতার সঙ্গে ঘন ঘন জপ করিতাম, ফলে মনটা সব দিক্ হইতে গুটাইয়া আমার মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইত, তাহার পর আমার মূর্ত্তি বিলীন হইয়া যাইত, তখন আমার স্থানটি অন্য জগতের অসীম সত্তায় যাইয়া মিশিয়া পড়িত। সে এক অপূর্ব্ব, মহান্ সত্য; মহাসুস্পষ্ট অবস্থা; ভাষায় সে অবস্থাটা একেবারেই বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। মরণ বলিতে সেখানে কিছু নাই, মরণ কথাটাও সেখানে যেন উপহাসের কথা; ব্যক্তিগত অবস্থার নাশ বলিতে ব্যক্তিগত জীবনের অবসান বুঝিতে হইবে না, ঐটিই প্রকৃত জীবন—জীবনের প্রকৃত অবস্থা। আমি বুঝাইতে গিয়া বুঝাইতে পারিতেছি না। পারিতেছি না বলিয়া লজ্জা আসিতেছে। কি করিব? ভাষায় উহা বুঝান যায় না। আসল কথা এই যে, পৃথিবী ছাড়া অন্য জগৎ আছে, মানুষ চেষ্টা করিলে সে জগৎ এই দেহেই দেখিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, সে জগৎ অতি ধ্রুব, অতি সত্য, অতীব মহীয়ান্ ও শাশ্বত।"

পাঠক! টেনিসনের কথা ত শুনিলেন? উহাতে আমরা বুঝিলাম, টেনিসন্ সূক্ষ্মজগতের আভাষ সত্য সত্যই পাইয়াছিলেন। সূক্ষ্মজগতের সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য যে কত বেশী, তাহা বুঝান যায় না। তিনি উহার কিছুই দেখেন নাই বলিলেও হয়। তিনি সূক্ষ্মজগতের মাত্র দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা সেখানকার ব্যাপার জানিয়াছেন, তাঁহারা টেনিসনের ঐ বর্ণনার একটি বর্ণও অবিশ্বাস করেন না। টেনিসন্ সাধারণ অনুশীলনকারীদের অপেক্ষা একটু বেশী বেশী রকম অতীন্দ্রিয় ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহার বিশ্বাসও দৃঢ়তর দেখা যায়। দেহাতিরিক্ত যে আত্মা আছে বা থাকিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার অটল বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি নিজের নাম জপ করিয়াই ঐরূপ শক্তি লাভ করেন, এরূপ করাও আমাদের মতে যুক্তিযুক্ত বা নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না।

শ্বাসপ্রশ্বাস সংযত করিয়া যোগসাধনের কথা

আমরা কখন কখন শুনিয়াছি যে, শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া নির্দ্দিষ্টভাবে পরিচালন করিলেও দিব্যশক্তি লাভ করা যায়। ভারতের লোক এই প্রণালীটির খুব বেশী বেশী ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই প্রথার খুব পক্ষপাতী; ইহা দ্বারা যে দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়, যে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কুফলও ফলে। এই শ্বাসক্রিয়া নিয়মিত করিতে গিয়া অনেকে অনেক সময় শরীর ও মন দুইটিই অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিস্তর ব্যক্তি এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন। আমি এইরূপ অনেককে স্বচক্ষুতেও দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, অনেকের দেহ অকর্ম্মণ্য ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে; অনেকের অবস্থা প্রায় উন্মাদের মত; তাঁহারা আমার কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন—"মহাশয়! এখন আমাদিগের আরোগ্যলাভের উপায় কি বলুন?" উঁহাদের মধ্যে অনেকের দিব্যদৃষ্টি বেশ খুলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা নিরন্তরই সূক্ষ্মজগৎ দেখিতে পান। আবার কাহার কাহার অতটা উপকার হয় নাই, অথচ দেহ ও মন দুর্ব্বল হইয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; তাই তাঁহারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। তবে দুই এক জনের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের উপকারই হইয়াছে।

ভারতের হঠযোগীরাই ঐরূপ করিয়া থাকেন। মনের উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে দিব্য-শক্তি লাভ হয়, সেইটিই স্থায়ী। হঠ-যোগীরা তাহা না করিয়া দৈহিক ব্যাপার দ্বারা অতীন্দ্রিয়-শক্তি লাভ করিতে যান। কিন্তু তাঁহারাও উপযুক্ত গুরুর উপদেশ ব্যতীত উহাতে প্রবৃত্ত হন না। গুরু যেরূপ যেরূপ বলেন, শিষ্যও সেইরূপ সেইরূপ করেন। শিষ্যের কোন অনিষ্ট হইতেছে কি না, গুরু সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। যদি দেখেন, শিষ্যের অনিষ্ট হইতে যাইতেছে, তবে তখনই তাহাকে নিরস্ত করেন। যাঁহারা ইহার কু-ফলের ভাবনা না ভাবিয়া, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়াই

গুরু না লইয়াই, ইহার অনুশীলন করিতে যান, তাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞান। তাঁহারা মহা বিপদে পড়েন। কাহারও কাহারও উপকার হইতে পারে বলিয়াই যে-সকলেরই উপকার হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যাহা আমার পক্ষে উপকারী, তাহা হয় তো তোমার পক্ষে অপকারী হইয়া উঠে। গুরু না পাইলে, কেহ যেন উহা করিতে না যান। গুরু হইলেই হইবে না, উপযুক্ত ও সিদ্ধ গুরু হওয়া চাই। এই হঠ-যোগের পথে দুই এক জন মাত্র সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, খুব বেশী লোককেই বিফল-মনোরথ হইতে দেখা গিয়াছে। এই পথে সিদ্ধি অপেক্ষা অসিদ্ধির ভাগই বেশী। এই পথে গেলে অতি সহজেই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি ঔষধ-পত্রের গুণাগুণ বুঝে না, সে যদি কোন ঔষধের দোকানে যাইয়া আপন খেয়ালমত একটা ঔষধ লইয়া খাইয়া বসে, তবে তাহার উপকারের অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনাই খুব বেশী; দৈবাৎ একটা ঠিক ঠিক ঔষধ লইয়া বসিতে পারে বটে, কিন্তু সেটা কখনই ধর্ত্তব্য নহে। হঠ-যোগীদের অবস্থাও সেইরূপ। দৈবাৎ কখন কাহারও হয় ত উপকার হইয়াছে, কিন্তু অপকারের দিকই খুব বেশী।

মেস্‌মিরিজম্ বা মোহিনী বিদ্যা

মোহিনী বিদ্যা দ্বারাও দিব্য-দৃষ্টি লাভ করা যায়। এই প্রথায় এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। ঐ তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি ভুবর্লোকের অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করে। যিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন, তিনি ঐ মোহাভিভূত ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলিকে কিছু সময়ের জন্য আড়ষ্ট করিয়া ফেলেন। আড়ষ্ট হইয়া গেলে সূক্ষ্ম-জগতের ব্যাপার জানিবার, জানাইবার সুবিধা হইয়া উঠে। তখন মোহকারী ব্যক্তির লিঙ্গ-শরীরে শক্তি সঞ্চার করিতে থাকেন। এ প্রথায় বেশ সুন্দর ফল হয়; কিন্তু মোহকারীর পক্ষে এতটা করিয়া উঠা নিতান্ত সহজ নহে। মোহাভিভূত আর মোহকারী এই উভয়কেই পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে হয়। উভয়েরই সাধনা চাই। উভয়েরই চরিত্রবান্ হওয়া আবশ্যক। সৎচিন্তা ও

সৎ উদ্দেশ্য দুই জনের মনেই জাগরূক রাখিতে হইবে, তবেই সুফল ফলে। মোহাভিভূত ব্যক্তি মোহকারীর একেবারে আয়ত্ত হইয়া পড়ে, অথচ তাহা টের পায় না। মোহকারীর হৃদয় বা মনের যে কোন গুণ, সবই তখন মোহাভিভূতের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। এ ক্ষেত্রে মোহকারী যদি নির্ম্মলচরিত্র না হন, তবে দর্শকদিগের বিপদ ঘটিতে পারে। অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, মানুষ আর মানুষ থাকে না; নিজের উপর তখন আর কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না। সে অবস্থাটা সূক্ষ্ম-জগতের অনুসন্ধান পক্ষে সুবিধাজনক নহে। তদ্‌ব্যতীত কার্য্যে, মনে, বাক্যে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র না হইয়া এইরূপ করিতে গেলেও ভয়ানক বিপদ ঘটিয়া থাকে। এরূপ কাণ্ড করিতে হইলে, মোহ-কারী ব্যক্তিকে খুবই পবিত্র হইতে হইবে। কিন্তু অতটা পবিত্র হওয়া যে কত কঠিন, তাহা আমরা সকলেই বুঝি। আমি নিজেও এরূপ ব্যাপার কথন করিতে চেষ্টা করি নাই। আর ঐরূপ করিতে কাহাকেও উপদেশ দিই নাই।

অনেকে মোহিনী বিদ্যার প্রভাবে অনেক রকম ব্যারাম আরোগ্য করিয়া দেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। সে ব্যাপারটা একেবারেই স্বতন্ত্র প্রকারের; কেন না, সে ক্ষেত্রে তাঁহারা কাহাকেও তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন না, ঐরূপ করিবার আবশ্যক হয় না। মোহ-কারী মোহাভিভূত ব্যক্তির দেহের উপর শূন্যে হস্তসঞ্চালন করিতে থাকেন। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার শক্তি চৌম্বক শক্তির মত মোহাভিভূতের দেহে সঞ্চালিত হয়। এই প্রথায় ঐ ব্যক্তিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন না করিয়াও তাহার দেহের কোন স্থানের যাতনা উপশমিত হইতে পারে, তাহার পীড়াও দূর করিয়া দেওয়া যায়, কিংবা তাহার দুর্ব্বল দেহে জীবনীশক্তি পূর্ণ করিয়া দেওয়া চলে। এরূপ ব্যাপারে কাহারও কিছু আপত্তি থাকিতে পারে না। যিনি মোহকারী হইয়া ঐরূপ ব্যপোরে প্রবৃত্ত হন, মোহিনী বিদ্যার পুস্তকাবলী শুনিয়া পড়িয়া যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়া লওয়া তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। খুব ভাল রকম জানিয়া শুনিয়াই সকল কাজ করিতে

হয়। সূক্ষ্ম-জগতের শক্তি মানুষের কাছে বরাবরই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। ভাল উদ্দেশ্যে উহা লইয়া কাজকর্ম্ম করিতে গেলেও অনেক সময় বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। তাই উহার তথ্য বিশেষরূপে জানাই ভাল। দিব্য-দৃষ্টিলাভের যতগুলি উপায় বিবৃত হইল, ইহার কোনটিকে প্রকৃত উৎকর্ষ বলা চলে না। আমরা কোন ব্যক্তিকেই এ সব করিয়া দেখিতে উপদেশ দিই না।

দিব্য-দৃষ্টিলাভের একটি ভাল উপায়

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"যখন অতগুলি উপায় সবই মন্দ, তখন কোন্ উপায় অবলম্বনীয় ?" যে সকল উপায়ে দেহের উপর অত্যাচার নাই, অথচ আত্মার সুশিক্ষা ঘটে; তাহাই ভাল। আত্মা সু-শিক্ষিত হইলে, দৈহিক বৃত্তি দমন করিতে পারে, তাহাতে বাহ্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। উপযুক্ত গুরুর উপদেশে পরিচালিত হইয়া দিব্য-শক্তিলাভের চেষ্টা করাই সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ ও নিরাপদ। তাঁহার উপদেশ ভিন্ন কিছু করা উচিত নহে। কিন্তু তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন গুরু কোথায় ? কোথায় সেরূপ গুরু মিলে ? যাঁহারা আপনাদিগকে সদ্‌গুরু বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন, যাঁহারা শিক্ষা দিয়া নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা-কড়ি লইয়া থাকেন, তাঁহাদের কেহই গুরু নামের যোগ্য নহেন। যাঁহারা বরাবর অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান দিয়া আসিতেছেন, জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি এখনও তাঁহাদের কাছে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। সেই মহাত্মাদের জ্ঞানভাণ্ডার অসীম, অনন্ত। আমরা সামান্য একটু জানিয়াছি মাত্র।

ঐ সিদ্ধ গুরুদিগের একটি সঙ্ঘ আছে। উপযুক্ত পাত্র পাইলে উঁহারা তাহাকে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দান করিয়া থাকেন। মানবের উপকার করাই তাঁহাদের ব্রত। যে ব্যক্তি এই ব্রতের নিঃস্বার্থ ব্রতী, সে-ই উঁহাদের কৃপালাভে সমর্থ হয়। উঁহাদের দর্শন পাইবার উপায় কি ? আমরা স্থূল-দেহে উঁহাদের সমীপে যাইতে পারি না, বা উঁহাদিগকে দেখিলেও সিদ্ধ

মহাত্মা বলিয়া চিনিতে পারি না। কিন্তু তাঁহারা আমাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, আর আমাদের দ্বারা পৃথিবীর উপকার সাধিত হইতে পারে—যখন তাঁহারা আমাদিগকে ততটা উপযুক্ত বলিয়া বোধ করেন। তখন আসিয়াও থাকেন। আমরা উপযুক্ত হইলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই আসেন। ক্রমোন্নতির ব্যাঘাত না ঘটে, সে দিকে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাহা ছাড়া মানবের সহায়তা করা তাঁহাদের জীবনের ব্রত। তাঁহারা এইরূপ সেবা-ধর্ম্মী শিষ্য চান; নিরন্তরই তাঁহারা ঐরূপ শিষ্য খুঁজিতেছেন। অতএব সেবা-ধর্ম্মে ব্রতী হইয়া গুরুর কৃপা পাইব না বলিয়া কাহারও হতাশ হইবার বা ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। যিনি মাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বা স্বকার্য্যসাধনের অনুকূলে শক্তিলাভের নিমিত্ত ঐরূপ গুরু চান, তিনি সেরূপ গুরু পান না। ঐ সিদ্ধ মহাত্মারা তাদৃশ চপল-প্রকৃতি স্বার্থান্ধ জীবকে দেখা দেন না। কিন্তু যিনি বহুকাল সাধনা করিয়া, আপন হৃদয় ও মন পবিত্র ও শক্তিশালী করিয়াছেন, যিনি মানবের উপকারার্থে মন-প্রাণ-শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, যিনি আপনাকে ঐশী কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন, মাত্র তিনিই ঐ সকল মহাত্মার দর্শন পাইয়া থাকেন। উঁহারা অযাচিত, অপ্রত্যাশিতভাবে ঐরূপ ব্যক্তির কাছে আসিয়া উপস্থিত হন।

ঐ সিদ্ধ মহাত্মারাই "থিয়সফি সমিতির" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে কোন ব্যক্তি উহার সদস্য হইলেই যে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন, তাহার কোন অর্থ নাই। ঐ সমিতির আবার গুপ্ত অধিবেশনও আছে। যাঁহারা খাঁটি ধর্ম্মপ্রাণ, সেই অধিবেশনে তাঁহারাই কেবল যোগদান করেন। সেই গুপ্ত অধিবেশনে গেলেও মহাত্মাদিগের সদস্যেরাই কেহ কেহ উঁহাদিগকে দর্শন করিবার অধিকার পান। কিন্তু সদস্য হইলেই যে সে অধিকার জন্মিবে, তাহার কোন হেতু নাই। দর্শন দেওয়া না দেওয়া মহাত্মাদেরই ইচ্ছা। তাঁহারা মানুষের হৃদয় দেখিতে পান। কে উপযুক্ত, কে অনুপযুক্ত, হৃদয়ের অন্তস্তল দেখিয়া তাঁহারাই

তাহা স্থির করেন। কিন্তু এ কথাটি খুব সত্য যে, যিনি উচ্চতর জীবনে উন্নীত হইতে ইচ্ছুক, তিনি তাঁহাদের কৃপালাভে বিফলমনোরথ হন না। উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রকেই তাঁহারা শিষ্য দ্বারা উপদিষ্ট করিয়া তুলেন। যে যে প্রকার উপদেশ পাইবার যোগ্য, তাহার জন্য তাঁহারা সেইরূপ ব্যবস্থা করেন। উৎকর্ষ-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা এমন সব কার্য্য করিতে পারি, যাহাতে দিব্যদৃষ্টির অনুকূল অবস্থা অনেকটা আমাদের কাছে আসিয়া পড়ে। দিব্যদৃষ্টি লাভ করা উৎকর্ষলাভের পরিচায়ক হইলেও উহাই একমাত্র পরিচয় নহে। পূর্ণ মানব হইতে হইলে আরও অনেক গুণ একসঙ্গে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। এক দিকের একটা উৎকর্ষ হইলেই হইবে না; উৎকর্ষ যৌগপদিকভাবে সকল দিকেই হওয়া চাই। এক জন হয় তো খুব বড় বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানে খুব উৎকর্ষ জন্মিয়াছে; কিন্তু তিনি ভক্তিমার্গের কিছুই জানেন না। তাঁহাকে আমরা পূর্ণ মানব বলিব না। এক জন সাধু ভক্তি-মার্গে খুবই উন্নত, ভক্তির মহিমায় তিনি মহীয়ান্; হয় তো বুদ্ধি-বৃত্তির হিসাবে খুবই নীচ। তিনিও পূর্ণ নহেন। যে গুণ ইঁহার আছে, সে গুণ উঁহার নাই। সকলকেই সকল গুণে মণ্ডিত হইতে হইবে। তবেই পূর্ণ মানবত্ব জন্মিবে।

এখনকার মানুষ সকলেই অপূর্ণ; ইহাদের কেহই সকল দিকে উৎকর্ষ করিতে পারে নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে যে দিকে কাজ করিয়াছে, সাধনা করিয়াছে, এ জন্মে তাহার সেই উৎকর্ষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা যদি ভক্তি-মার্গে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া সাধনা করিতে থাকি, তবে এই জন্মেই আমরা অনেকটা উন্নতি করিতে পারি; আর ভাবী জন্মে বিখ্যাত ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিব। ভক্তিমত্তাই সে জন্মের পরিচায়ক হইয়া উঠিবে। বুদ্ধিমত্তা বা অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যাপার। দিব্যজ্ঞানের উৎকর্ষও ঐরূপে হয়, অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া সাধনা করিবার প্রয়োজন। যাঁহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হন, তাঁহারা এই জন্মেই অনেকটা সুফল পান। তাঁহাদের সুপ্ত শক্তি এই

জন্মের সাধনাতেই অনেকটা জাগিয়া উঠে। আমি অনুমান করিয়া ঐ কথাগুলি বলিতেছি না, ও কথাগুলি খাঁটি সত্য। আমাদের সমিতির কয়েক জন কয়েক বৎসর ধরিয়া আত্মার উৎকর্ষ-সাধনে নিরত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রায় সকলকেই সফলপ্রযত্ন দেখা যাইতেছে। একাগ্রতার সঙ্গে যিনিই সাধনা করেন, তিনিই কৃতকার্য্য হইয়া উঠেন। উঁহাদের কেহ কেহ মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক্ উন্নতি করিয়াছেন, কাহারও কাহারও উন্নতি আংশিকভাবে ঘটিয়াছে, কিন্তু সকলেই সাধনার ফল বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই সংযমের সুন্দর ফল অনুভব করিতেছেন।

সাধনার প্রথম অনুষ্ঠান

তোমার যদি দিব্যদৃষ্টিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে উঁহাদের মত কার্য্য আরম্ভ কর। প্রথম মনের বল ও নৈতিক বলের সঞ্চয় করিয়া লও। সাধনার পথে গেলে যদি তুমি অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়া বইস, তখন সেই শক্তির অপব্যবহার না ঘটে, এই জন্যই নৈতিক বলের সঞ্চয় পূর্ব্ব হইতে আবশ্যক। মনের বল আয়ত্ত না করিয়া যদি তুমি অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভ করিয়া ফেল, তবে হয় তো কোন দিন উহার অপব্যবহারও করিতে পার। ঐরূপ দশায় শক্তিলাভ করা অপেক্ষা শক্তিহীন হইয়া থাকাই অধিকতর শ্রেয়ঃ। যখন দেখিবে যে, মনের বল আয়ত্ত হইয়াছে, যেরূপ অবস্থাই দাঁড়াক, পরোপকার করিতে পারিবে, শত্রুরও উপকার করিতে পারিবে; যখন দেখিবে যে, প্রাণে একটা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, তোমার প্রাণের ভিতর হইতে একটা প্রেমের মন্দাকিনী স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে, আর সেটা জগৎকে প্লাবিত করিতে চাহিতেছে; যখন দেখিবে, পরের মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিবার বাসনা হইতেছে, তখনই বুঝিবে, তুমি দিব্যদৃষ্টিলাভের অধিকারী হইয়াছ। তখন তোমার দুইটি কার্য্য আছে। তাহা দ্বারা তোমার দিব্যদৃষ্টি-লাভ ঘটিবে। ঐ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় শক্তি হাতে না আসিলেও তাহাতে কোন অনিষ্ট হইবে না। দুইটি কার্য্যের

কথা বলিলাম, তাহার প্রথমটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও উপকারী হইলেও সকলে করিয়া উঠিতে পারে না। দ্বিতীয়টি সকলেরই সাধ্য। আমি নিজে দুইটিকেই সাধ্য বলিয়া মনে করি।

চতুর্থ মাপ

প্রথম কার্য্যটি সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির ব্যাপার। এ ব্যাপারের কথা আমি ইহার পূর্ব্বেও কয়েকবার বলিয়াছি। ইহা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধের অতিরিক্ত একটা নূতন দিকের আলোচনা। আমাদের স্থূল মস্তিষ্ক ঐ আলোচনায় এখনও অনভ্যস্ত, তাই আমরা ঐরূপ নবীন মাপটাকে অসম্ভব বলিয়া মনে করি। তাই মনে হয়, ভাবিয়া ভাবিয়া আমরা উহার আবিষ্কার করিতে পারিব না। অনুশীলন দ্বারা দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেমন অসাধারণ উৎকর্ষসাধন করা যায়, মস্তিষ্কের বেলায়ও সেরূপ করা যাইতে পারে। অনুশীলনে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়িয়া গেলে নূতন জগৎ, নূতন মাপ, নূতন দিক্, সবই তখন চোখে পড়ে। এ সকলের অতি সুস্পষ্ট অনুভূতি তখন মস্তিষ্কে ফুটিয়া উঠে। ওয়াশিংটন সহরনিবাসী সি, এইচ, হিণ্টন্ই এই "নূতন মাপ" মন্ত্রের ঋষি। তাঁহার শ্রীমুখ হইতেই এই নূতন মাপের নূতন তথ্য প্রথমে বিঘোষিত হইয়াছিল। তিনি আমাদের সমিতির সদস্য নহেন। কিন্তু আমাদের অনেক সভ্য তাঁহার ঐ অদ্ভুত তথ্যের বিশদ ব্যাখ্যা পড়িয়া প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইয়াছেন। তিনি নিজে মস্তিষ্কের উৎকর্ষসাধন দ্বারা ঐ নূতন মাপের ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার সমর্থ হইবার কথা তাঁহার পুস্তকাবলীতেই লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের সমিতির অনেকেই তাঁহার পদানুসরণ করিয়াছেন।

আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি মস্তিষ্কের উন্নতি করিতে করিতে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া বসিয়াছেন। ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে লাগিলেন, শেষে ভুবর্লোক চোখে ফুটিয়া উঠিল। মস্তিষ্কের উৎকর্ষসাধনে তাঁহার সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় শক্তি জাগিয়া পড়িল। মস্তিষ্কের উৎকর্ষ বলিলে 'কি বুঝিতে

হইবে? ধারণ করিবার শক্তির নামই উৎকর্ষ। মস্তিষ্কের বুঝিবার অর্থাৎ গ্রহণ করিবার একটা সাধারণ সীমা আছে। ঐ সীমাটাকে বর্দ্ধিত করা যায়। অনুশীলন দ্বারা উহা প্রশস্ত হইতে থাকে, শেষে এমন বর্দ্ধিত হইয়া যায় যে, মস্তিষ্ক তখন ভুবর্লোকের অলৌকিক ব্যাপারও গ্রহণ করিতে পারে। ইহারই নাম উৎকর্ষ। হিণ্টন্ সাহেব অনুশীলন দ্বারা মস্তিষ্কের ঐ গ্রহণ করিবার সীমা বর্দ্ধিত করিয়া পরিশেষে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধের অতিরিক্ত একটা নবীন মাপ বুঝিয়া ফেলিলেন, তাঁহার দেখাদেখি অনেকেই ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক কুড়ি জনের মধ্যে এক জনও তাঁহার মত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার মত অতটা সুফল না পাইলেও তাঁহারা একেবারে বিফলমনোরথ হন নাই। যাঁহাদের গণিতের দিকে ঝোঁক আছে, তাঁহাদের কাছে এই নূতন মাপটা ভাবিয়া বাহির করিবার চেষ্টা খুবই ভাল লাগে। ভাবিয়া বাহির করিতে না পারিলেও তাঁহাদের লাভ, কেন না, চেষ্টা করিবার ফলেই তাঁহাদের ধারণাশক্তি খুব বর্দ্ধিত হয়। তখন তাঁহারা সাধারণের অপেক্ষা সব ব্যাপারই ভাল করিয়া দেখিতে পান। এটাও নেহাত কম লাভ নহে। সাধনায় সিদ্ধ হইয়া যাঁহারা ভুবর্লোক দেখিতে পান, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের কথা বাদ দিলে মনে হয়, সাধারণের মধ্যে এই পথের পথিকেরাই ভুবর্লোকের যথার্থ ধারণা করিতে কতকটা সমর্থ। যাঁহারা এই নূতন মাপের চিন্তা করিতে থাকেন, বাস্তবিক-পক্ষে তাঁহাদের চিন্তাশক্তি অনেকটা অনাবিল। সূক্ষ্মজগতের কল্পনা করা যদি সম্ভব হয়, তবে ইঁহাদের পক্ষেই সম্ভব।

আর একটি কার্য্য

প্রথম কার্য্যটি অর্থাৎ নূতন মাপের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে দিব্যশক্তি ফুটাইয়া তোলা কঠিন ব্যাপার। সকলে উহা পারেন না। দ্বিতীয় কার্য্যটি সকলেই করিয়া দেখিতে পারেন। দ্বিতীয় কার্য্যটি যে খুব সহজ, তাহা নহে। কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও প্রভূত উপকার। এ পথের এইটুকুই

একটা মহা সুবিধা। এই দ্বিতীয় কার্য্যটি দ্বারাও মানুষ দিব্যদৃষ্টির দিকে যাইতে থাকে। কেহ এই পথে শীঘ্রই উহা লাভ করে, কেহ বা বিলম্বে করে। এই পথের পথিকেরা কত দিনে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে পারে, সেটা উহাদের পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলের উপর নির্ভর করে। তাই এ পথের সাধকদিগকে কেহই নিশ্চিতভাবে বলিয়া দিতে পারেন না যে, এত দিন পরে সাধনার সিদ্ধি হইবে। তবে এ কথাটা খুবই সত্য যে, সাধনার প্রত্যেক ক্রমেই সাধক উন্নত হইতে হইতে যায়। সাধক যদি সারাটি জীবনেও দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে না পারে, তথাচ তাহার লাভ। কেন না, তাহার অবস্থা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সকল দিকেই সাধারণের পক্ষে আদর্শস্বরূপ হইয়া উঠে। অনেক ধর্ম্মে এই কার্য্যটিকে "ধ্যান" বলে। এই ব্যাপারটি ভাল করিয়া বুঝিবার নিমিত্ত আমরা ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। প্রথম ভাগ অপেক্ষা দ্বিতীয় ভাগটি উচ্চতর; দ্বিতীয়টি অপেক্ষা তৃতীয়টি আরও ভাল। সাধককে পর পর তিনটি স্তরেরই অনুশীলন করিতে হইবে। আমরা তিনটি ভাগেরই নাম দিয়াছি। প্রথম স্তর বা ভাগের নাম—একাগ্রতা বা ধারণা; দ্বিতীয়টির নাম—ধ্যান; তৃতীয়টির নাম—নিদিধ্যাসন। পরে আমরা এই তিনটি ভাগের ব্যাখ্যা করিব।

পাঠককে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ ধ্যান-ধারণা-নিদিধ্যাসনের চেষ্টায় একটা দিকের উৎকর্ষ হয় মাত্র। উহাতে পূর্ণ মানবত্ব ফুটে না। তাহা ছাড়া ঐ পথে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সাধককে আরও কিছু কাজ করিতে হইবে। সেই কাজই ঐ সিদ্ধিলাভের কৌশল। নির্ম্মল চরিত্রে চরিত্রবান্ হইয়া ধ্যান-ধারণার পথে যাইতে হইবে, এইটিই সেই কার্য্য, এইটিই সেই কৌশল; ইহাতেই ফল ফলিবে। সাধনার পথে অগ্রসর হইবার বিস্তর উপদেশ আছে। পুরাকাল হইতে এই উপদেশ চলিয়া আসিতেছে, সকলেই উহা শুনিয়াছে। জীবনের কোন্ অবস্থায় কোন্ উপদেশ পালন করিয়া চলিতে হইবে, বুদ্ধের উপদেশমধ্যে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

"অদৃশ্য সহায়" নামক পুস্তিকার মধ্যে সে বিষয়ের একটা তালিকা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। সাধন-মার্গে যাইয়া আমাদিগকে কি করিতে হইবে, সেটা জানা বিশেষ কঠিন নহে, উপদেশগুলিকে কার্য্যে পরিণত করাই শক্ত।

একাগ্রতা বা ধারণা

উচ্চ অঙ্গের দিব্যদৃষ্টি লাভ করিবার পক্ষে প্রথম কার্য্যই—একাগ্রতা। একাগ্রতা অর্থে অনেকে বুঝেন যে, আমাদিগকে বুঝি কোন একটা উজ্জ্বল বস্তুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া মনের বৃত্তিগুলিকে আড়ষ্ট অকর্ম্মণ্য করিয়া বোধশক্তিকে সূক্ষ্মজগৎদর্শিনী করিয়া তুলিতে হইবে। না, আমি সেরূপ কথা বলিতেছি না। অভ্যাস দ্বারা মনের উপর এমন একটা ক্ষমতা আনিতে হইবে যে, মনকে যাহা বলিব, মন তাহাই করিবে। যতক্ষণ ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা, মনকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিব। ইহাকেই আমি ধারণা বা একাগ্রতা বলিতেছি। এটি খুব সহজ কার্য্য নহে; যত কঠিন কাজ আছে, এটিও তাহার মধ্যে একটা। মনকে আটকাইয়া রাখা কঠিন হইলেও আট্‌কাইতে পারা যায়, কারণ, অনেকে ঐরূপভাবে আট্‌কাইয়াছেন। প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে মন আট্‌কা পড়িয়াছে, এরূপ শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মন যে আমাদের অনায়ত্ত, এ কথাটি বোধ হয় আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না বা কোন দিন ভাবেনও নাই। যখন তুমি একটা বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছ বা ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়া চলিয়াছ, তখন হঠাৎ "কি চিন্তা করিতেছ, আর কেনই বা করিতেছ" এইটি অনুসন্ধান করিবে। তোমার ঐ চিন্তার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। তখন দেখিবে, গত ৫ মিনিটের কত রাশি রাশি বিশৃঙ্খল চিন্তা আসিয়া তোমার মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে; ঐ রকম কত চিন্তা তখনও মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, আবার কতকটা সেখান হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহাদের ছাপ পর্য্যন্তও মস্তিষ্কের মধ্যে পড়িতেছে না। চিন্তার প্রকৃতি অনুসন্ধান করিতে

বসিলে তুমি ধীরে ধীরে বেশ বুঝিতে পারিবে যে, ঐ বিশৃঙ্খল চিন্তাগুলি আদৌ তোমার চিন্তা নহে, ঐগুলি অপরের চিন্তার পরিত্যক্ত টুক্‌রা-টাক্‌রা।

প্রকৃত কথা এই যে, চিন্তা একটি শক্তি ব্যতীত আর কিছু নহে। চিন্তা করিলেই ব্যোমের উপর একটা ছাপ পড়ে। আমরা যখন কোন এক ব্যক্তির সম্বন্ধে তীব্র চিন্তা করিয়া বসি, তখন সেই চিন্তা তাহার কাছে গিয়া উঠে। আমরা যদি আমাদিগের নিজের চিন্তা করি, তাহা হইলে সেই চিন্তা আমাদের কাছে কাছেই ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু আমাদের অনেক চিন্তাই তীব্র নহে, বা কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া করি না। সেইগুলি বিশৃঙ্খলভাবে অদৃশ্যমান অবস্থায় ব্যোমের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। উহারা যে স্থানে অবস্থান করিতেছে, যদি কোন ব্যক্তি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহার মস্তিষ্কের ভিতর উহারা প্রবেশ করিতে থাকে। আমরা একটি রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে কত কি ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে যাই, আর সেই পাতলা পাতলা চিন্তার মূর্ত্তিগুলি বিশৃঙ্খলভাবে আমাদের পিছনে রাস্তার উপর ব্যোমের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকে। পরে অন্য কোন লোক যেমন ঐ পথে আইসে, অমনই ঐ বিশৃঙ্খল চিন্তামূর্ত্তিগুলি তাহার মনের মধ্যে যাইয়া হাজির হয়। আগন্তুকের মনে যদি অন্য কোন তীব্র চিন্তা না থাকে, তবে উহারাই তাহার মনটাকে অধিকার করিয়া বসে। আবার অনেক সময় তাহার মনের মধ্যে না থাকিয়া, খুব শীঘ্রই বাহির হইয়া যায়, যাইবার সময় তাহার মস্তিষ্কের উপর খুব পাতলা একটা ছাপ রাখিয়া যায় মাত্র। কিন্তু আগন্তুক ঐ বিশৃঙ্খল চিন্তার কোন-কোনটায় একটু আনন্দ বা একটু তৃপ্তি বোধ করে। সেইগুলি মনের মধ্যে অনেকক্ষণ তোলাপাড়া করে; তাই সেগুলি মন হইতে যাইবার সময় আগন্তুকের চিন্তাশক্তির প্রভাবে অনেকটা শক্তিশালী হইয়া যায়। অপরের চিন্তা হইলেও আগন্তুক খানিকটা সময়ের জন্য তাহাকে নিজের চিন্তাই করিয়া লয়। তাই তাহার নিজের ভাবে উহাকে ভাবিত বা রঞ্জিত করিয়া তুলে।

একটা ঘরে হয় তো কত লোকের কত ভাল মন্দ বিশৃঙ্খল চিন্তা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা কোন ঘরে প্রবেশ করিলেই অপরের ঐ চিন্তা-রাশির মধ্যে যাইয়া উঠি। ঐ চিন্তাগুলির অধিকাংশই খুব পাতলা কুয়াসার মত হইয়া থাকে।

দিব্যশক্তি লাভ করিতে হইলেই মনকে আয়ত্ত করিতে হইবে। মন কাজ না পাইলে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। তাই উহাকে কিছু কাজ দিতে হইবে। কাজ না পাইলে, যে সকল চিন্তা আমাদের নহে, মন সেইগুলি টানিয়া নিজের মধ্যে আনে, আর তাহাদের সঙ্গে খেলিতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অপরের সেই সকল চিন্তা আমাদের আদৌ আবশ্যক নহে। দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে গিয়া প্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মন আমাদের প্রভু নহে, মন আমাদের ভৃত্য। আমরা উহার আয়ত্ত হইব না, উহাকেই আয়ত্ত করিব। মনই আমাদের প্রধান অস্ত্র। উহা দ্বারাই কার্য্য করিতে হইবে।

এই যে একাগ্রতার কথা বলিলাম, এটি অতীব কঠিন; সাধারণ শ্রেণীর লোক সহজে এটুকু করিয়া উঠিতে পারে না। ওরূপ করা তাহার অভ্যাস নাই, আর ওরূপ যে করা যাইতে পারে, তাহাও সে জানে না। আচ্ছা, একটা কথা ভাবিয়া দেখ। মনে কর, তোমার মনটি যেমন তোমার অনায়ত্ত, হাত একখানিও যদি ঐরূপ হইত; তুমি মনে কর, একটি দ্রব্যের উপর তোমার হাতখানি রাখিতে যাইতেছ, হাতখানি অন্য দিকে চলিয়া গেল, যদি এইরূপ ব্যাপার হইত, তাহা হইলে তুমি কিরূপ ভাবিতে? তোমার মনে হইত, হাতখানিতে পক্ষাঘাত হইয়াছে, তাই ওরূপ অকর্ম্মণ্য হইল। মন যদি অনায়ত্ত হয়, তবে সেটাও একটা ভয়ানক মানসিক পক্ষাঘাত সন্দেহ নাই। এ ক্ষেত্রে মনের ঐ পক্ষাঘাত দূর করিতে হইলে, যত দিন না মন বশে আইসে, তত দিন তোমাকে অভ্যাস করিতে হইবে। তত দিন মনকে বশ করিবার, আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবে। যখন আপন ইচ্ছামত মনকে ব্যবহার করিতে পারিবে, তখনই বুঝিবে যে

মন বশে আসিয়াছে। সুখের বিষয়, আমরা সারাটা জীবনই সংসারের সাধারণ কাজকর্ম্মের মধ্যেও এই একাগ্রতার অভ্যাস করিতে পারি। তুমি যাহা কিছু করিবে, বেশ ভাল করিয়া করিবে। কাজ করিবার সময় সমস্ত মনটুকু কাজে নিয়োগ করিবে। যখন তুমি একখানা পত্র লিখিবে, তখন প্রতি অক্ষরটির কথা ভাবিবে, যতক্ষণ ঐ অক্ষরটি লেখা শেষ না হয়, ততক্ষণ অন্য ভাবনা ভাবিবে না; এইরূপভাবে লিখিলে লেখা খুব ভাল হইয়া উঠিবে। একখানা পুস্তক পাঠ করিবার সময় মনটিকে উহার উপর নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থকারের মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবে। যখনই কোন চিন্তা করিবে, তখনই বেশ হুঁস করিয়া দেখিবে যে, কোন্ বিষয় চিন্তা করিতেছ, আর কেনই বা করিতেছ। বেশ ভাল বিষয়ে মনটাকে নিযুক্ত রাখিবে। উহাকে অলস হইতে দিবে না। যে সময় মনের হাতে কাজ থাকে না, তখনই অসৎ চিন্তা আসিয়া জুটে।

তোমার সম্পূর্ণ একাগ্রতা কখন কখন দেখা যায়। বল দেখি, সে কখন্? যখন কোন একটা বিষয় তোমার খুব ভাল লাগিয়া যায়, তখন তুমি উহাতে তদ্গত-চিত্ত হইয়া পড়। তখন তোমার কাছে কে কি বলিল বা কে কি করিল, সে দিকে তোমার লক্ষ্যই থাকে না। ইহারই নাম যথার্থ একাগ্রতা।

পারিষদ্‌বৃন্দ ও জলের কলসীর গল্প

প্রাচ্যদেশে বেশ একটা গল্প আছে। গল্পটা এই;—এক রাজার কতকগুলি পারিষদ নাস্তিক শ্রেণীর লোক ছিল। তাহারা কিছু বিশ্বাস করিত না। তাহারা শুনিয়াছিল, সাধু-সন্ন্যাসীরা যখন ধ্যাননিরত থাকেন, তখন তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া সেনা-বাহিনী চলিয়া গেলেও তাঁহারা টের পান না। এই কথাটি পারিষদরা বিশ্বাস করিল না। রাজা বলিলেন—এ কথা খাঁটি সত্য। আমি তোমাদিগকে এক দিন ইহার প্রমাণ দিব। কিছু দিন পরে রাজা এক দিন পারিষদগুলিকে বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে

এক একটি জলের কলসী মাথায় করিয়া নগরভ্রমণ করিয়া আইস, কলসীতে জল কানায়-কানায় পূরা থাকিবে, তোমাদের সঙ্গে উলঙ্গ তরবারি হস্তে প্রহরী থাকিবে, যাহার কলসী হইতে এক ফোঁটা জল টল্‌কাইয়া মাটীতে পড়িবে, তখনই প্রহরী তাহার শিরশ্ছেদ করিবে। সাবধান! জল যেন একটুও পড়ে না।" তাহারা আর কি করে! তখন প্রত্যেকে এক একটি জলপূর্ণ কলসী মাথায় লইয়া সহরের বড় একটা রাস্তা ঘুরিতে চলিল। তরবারি হস্তে প্রহরীও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিছু সময় পরে তাহারা ঘুরিয়া আসিল। রাজা সহাস্যবদনে তাহাদিগকে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা তো খুব বড় একটা রাস্তা ঘুরিয়া আসিলে, কিন্তু কে কি দেখিয়া আসিলে, বল দেখি?" সকলেই বলিল—"কিছুই দেখি নাই; কেন না, আমাদের সমস্ত মনটা জলের দিকে ছিল, কখন্ জল পড়িয়া যাইবে, আর আমরা কাটা পড়িব, কেবল তাহাই ভাবিতেছিলাম। জল যাহাতে না পড়ে, কেবল সেই বিষয়ে সাবধান হইতেছিলাম। তাই অন্য কিছু চোখে পড়ে নাই।" শুনিয়া রাজা বলিলেন—"তবেই দেখ, কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট হইলে একাগ্রতা আসে কি না! সাধু-সন্ন্যাসীরা ধ্যান-নিরত হইলেও তাঁহাদের ঐরূপ দশা ঘটে।

ধ্যান

যখন তোমাদের ঐ প্রকার একাগ্রতা আয়ত্ত হইয়া আসিবে, তখন তোমরা সাধনার দ্বিতীয় স্তরে যাইতে পার। পারিষদ্দের ঐ একাগ্রতা ভয়জনিত! সাধকের একাগ্রতা ইচ্ছাশক্তি-জনিত হওয়া চাই। দ্বিতীয় স্তরের নাম—ধ্যান। এটিও সহজসাধ্য নহে। এটি অতীব কঠিন। কিন্তু তাহা হইলেও করা যায়। আমাদিগের অনেককে ইহা করিতে হয়। মন আয়ত্ত হইয়া আসিলে ধ্যানের সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। ধ্যান করিবার জন্য নিজের সুবিধামত একটা সময় ঠিক করিয়া লইবে। খুব

ভোরবেলাটা হইলেই ভাল হয়। সেই সময় মাথা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। ধ্যান করিবার সময় মন প্রশান্ত থাকা আবশ্যক। ভোরের সময়টাই ধ্যানের পক্ষে উপযুক্ত সময় বলিলাম বটে, কিন্তু সকলের পক্ষে ঐ সময় করিয়া উঠা সহজ নহে। পূর্ব্বের মত এখন তাহার রীতি-নীতি নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার হেঁপায় পড়িয়া আমরা সময়ের ভাগ বিশ্রী করিয়া তুলিয়াছি। আগে দুপুর-বেলাটাকেই দিনের মধ্যভাগ বলা যাইত, এখন তাহা বলা চলে না। এখন রৌদ্র উঠিলেও আমরা বিছানায় পড়িয়া থাকি, আবার বহু রাত্রি পর্য্যন্ত আলোর সম্মুখে জাগিয়া বসিয়া চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলি। এখনকার সভ্যতার ইহাই রীতি। তুমি যদি সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে ধ্যানের একটা সময় ঠিক করিয়া লইবে। সময়টা যেন প্রত্যহ একই সময়ে হয়। আর, প্রত্যহই যেন কার্য্যটা করা হয়; এক দিনও বাদ না পড়ে। আমরা জানি, প্রত্যহ যদি ব্যায়াম করা যায়, তবে বেশ সুফল ফলে। আজ অনেকটা ব্যায়াম করিলাম, দুই দিন আর কিছুই করিলাম না, আবার এক দিন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া কুস্তী করিলাম, এরূপ প্রণালীতে ব্যায়াম করিলে কোন ফলই হয় না। "ধ্যান" অভ্যাসের বেলায়ও সেই কথা। বাদ পড়িলে কোন সুফল ফলিবে না, প্রত্যহই অভ্যাস চাই।

ধ্যান করিবার সময় প্রশান্ত-মনে বেশ আরামের সঙ্গে একটি স্থানে বসিবে। কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে না পারে, এমন একটা নির্জ্জন স্থানে হইলেই ভাল হয়। বসিয়া, কোন একটা উচ্চ, উদার ও আবশ্যক বিষয়ের প্রতি একাগ্রতার সঙ্গে তোমার মনটিকে নিবিষ্ট করিবে। আমরা থিয়সফি সম্প্রদায়ের লোক কোন্ বিষয়ে মন স্থির করিব, তাহা ঠিক করিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন নহে। আমাদের ওরূপ বিস্তর বিষয় জানা আছে। তুমি তোমার চিন্তার বিষয় ঠিক করিয়া লইবে। ক্যাথলিক্ সম্প্রদায় সকল নৈতিক গুণের উপদেশ দেন, ইচ্ছা হইলে তুমি ঐরূপ একটি গুণের বিষয় চিন্তা করিতে পার। যদি ঐরূপ গুণই চিন্তার বিষয়ীভূত

বলিয়া পছন্দ কর, তবে ধ্যানে বসিয়া মনের মধ্যে পুনঃ পুনঃ গুণটির কথা ভাবিতে থাকিবে। ভাবিতে থাকিবে, উহা স্বর্গীয় গুণ, নিসর্গের মধ্যে তোমার চতুষ্পার্শ্বে উহার অভিব্যক্তি হইতেছে, ঐ অভিব্যক্তি কোথায় হইতেছে, কিরূপভাবে হইতেছে, তাহা ভাবিতে থাকিবে। পুরাকালে মহাত্মারা এ গুণ কখন্ কেমন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিবে, দৈনিক জীবনে নিজে কেমন করিয়া উহার পরিচয় দিতে পার, কোন্ সময় দেওয়া উচিত ছিল, অথচ দাও নাই বা দিতে পার নাই, তাহা চিন্তা করিবে। ধ্যানে বসিয়া এইরূপ এইরূপ ভাবে চিন্তা করিতে থাকিবে। কোন একটা গুণের বিষয় লইয়া ধ্যান করায় বিশেষ সুফল ফলে; কেন না, উহাতে নিজের মন ঐ গুণে অঙ্কিত ও শিক্ষিত হইয়া উঠে। সর্ব্বদার জন্য সচ্চিন্তা মনের সম্মুখে বিরাজ করিতে থাকে। শুধু গুণের চিন্তা করিয়া উঠা একটু কঠিন। তাই, ঐ গুণমণ্ডিত কোন মহাত্মার চিন্তা করিলে ধ্যানের প্রণালীটা আরও সহজ হইয়া আইসে। এরূপ করিয়া একটু বেশী শক্তি লাভ করিতে পারিলে তখন তুমি খাঁটি গুণের ধ্যান করিতে পার।

এইরূপভাবে "ধ্যান করা" প্রণালীটা যখন তোমার অভ্যাস হইয়া উঠিবে, যখন কিছুতেই ঐ অভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটিবে না, ঐরূপ সাধনায় যখন কোনরূপ কষ্টবোধ হইবে না, কোন প্রকার বাহিরের চিন্তা মনের ভিতর আসিবে না, তখন তুমি তৃতীয় ক্রমের দিকে চেষ্টা করিতে পার। সেই তৃতীয় ক্রমটির নাম—নিদিধ্যাসন। স্মরণ রাখিবে, মন যত দিন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে, যত দিন মনের চলা-ফেরা বন্ধ করিতে না পারিবে, তত দিন নিদিধ্যাসনের সাধনায় সু-ফল ফলিবে না। ধ্যান করিতে বসিলেই তুমি দেখিতে পাইবে যে, তোমার মন চিন্তা-বৃত্তের বাহির দিয়া পলায়ন করিতেছে, মন বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, হয় তো টের পাও নাই। হঠাৎ জানিয়া ফেলিলে যে, মন তোমার বিষয়ে নাই, তখন দেখিলে যে, উহা দূরে গিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া হয়

তো চমকিত হইয়া উঠিবে। অনেক দিন ধরিয়া এইরূপ হইতে থাকিবে। কিন্তু তাহাতে হতাশ হইবে না। যাঁহারাই ধ্যানের পথে গিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই এ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। ঐরূপ স্থলে সেই চঞ্চল মনটাকে আবার ফিরাইয়া আনিবে, আবার তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। একবার আধবার নহে, শত শতবার এইরূপ করিতে হইবে। এইরূপ না-ছোড়বান্দা হইয়া লাগিলেই তুমি চিত্তজয়ী হইতে পারিবে। কৃতকার্য্য হইবার পক্ষে না-ছোড়বান্দা হওয়াই একমাত্র উপায়। এইরূপ করিতে করিতে যখন মন আয়ত্ত হইয়া আসিবে, তখনই তৃতীয় স্তরের জন্য প্রস্তুত হইবে।

নিদিধ্যাসন

তৃতীয় স্তরের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে কোন গুণের পরিচিন্তন করার পরিবর্ত্তে তুমি কোন মহাত্মাকে আদর্শরূপে ভাবিতে থাকিবে। আদর্শ যিনিই হউন বা তাঁহার নাম যাহাই হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। আমরা থিয়সফি সম্প্রদায়ের লোক, আমরা অনেক সিদ্ধ মহাত্মার নাম জানি, আমরা তাঁহাদের যে কোন এক জনকে আদর্শ করিয়া লইতে পারি। আমাদের মধ্যে যদি কেহ ঐরূপ কোন মহাত্মার দর্শন পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকেই আদর্শ করা তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক। ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা "মেরী" বা কোন সাধুকে আদর্শরূপে লইতে পারেন। সাধারণ খৃষ্টানরা খৃষ্টকে, হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণকে, আর বৌদ্ধেরা বুদ্ধকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন। নামের পার্থক্যে কিছু আইসে যায় না; কেন না, তখন আমরা প্রকৃত সত্যে ব্যাপৃত হই। নিদিধ্যাসনে বসিয়া তুমি যে আদর্শটিকে গ্রহণ করিবে, সেটি যেন তোমার বুদ্ধি-বিবেচনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়, তোমার প্রাণে যত ভালবাসা আছে, সমস্তটা যেন তাহার উপর যায়। তাই বলিতেছি, আদর্শটি যেন তোমার কাছে খুবই উচ্চ হয়। ধ্যান করিতে বসিয়া আদর্শের একটা মূর্ত্তি মনে মনে গড়িবে। তাহার পর

তোমার সমস্ত চিন্তা ঐ শক্তির উপরে বিন্যস্ত করিবে। সমস্ত শক্তির সঙ্গে তাঁহার সৌন্দর্য্যে ও তাঁহার মহিমায় ডুবিয়া মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে, তাঁহার সঙ্গে বেমালুম মিশিয়া পড়িবার চেষ্টা পাইবে। প্রত্যহ এইরূপ করিতে করিতে এমন এক দিন আসিবে—যে দিন হঠাৎ তোমার চোখ খুলিয়া যাইবে। তখন তুমি দেখিবে যে, ঐ আদর্শের সঙ্গে তুমি অভিন্ন। তখন তুমি ঐ আদর্শকে নূতন ভাবে দেখিতে থাকিবে—সে রকম ভাব তোমার চোখে আর কখনই পড়ে নাই। তোমার উপর যেন একটা নবীন ও বিস্ময়-কর আলোক আসিয়া পড়িবে। তখন সমগ্র জগৎ তোমার চক্ষুতে অন্য-রূপ বোধ হইতে থাকিবে। তখনই তুমি প্রকৃত জীবনের আস্বাদ পাইবে, বাঁচিয়া থাকার অর্থ কি, তখনই তাহা বুঝিবে, তখন আগেকার জীবনটা তোমার কাছে অন্ধকার ও মৃত্যুর মত বলিয়া বোধ হইবে।

ঐ ভাবটি অল্পসময়ের মধ্যেই চলিয়া যায়। আবার এই পার্থিব জ্ঞান আসিয়া পড়ে। তুলনায় মনে হয়, আবার একটা অন্ধকার রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। সাধক! হতাশ হইও না, নিদিধ্যাসন প্রত্যহই করিতে থাক। তাহা হইলে ঐ সুখের অবস্থা আবার আসিবে। প্রত্যহই আসিবে, প্রত্যহই চলিয়া যাইবে। কিন্তু দিন দিন ঐ অবস্থাটা স্থায়ী হইতে থাকিবে। পরিশেষে তোমার সম্মুখ হইতে ঐ স্বর্গীয় ভাবটা আর যাইবে না। তখন আর স্বর্গীয় সুখটা ক্ষণ-প্রভার মত ক্ষণিক বলিয়া মনে হইবে না। তখন অনুক্ষণই স্বর্গের অনুপম শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তি তোমার সম্মুখে প্রকট থাকিবে। দিবারাত্র একটা অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের আস্বাদ পাইতে থাকিবে, তখন জীবনটি সেবা-ধর্ম্মে অনুরঞ্জিত হইয়া সুখময় ও সুন্দর হইয়া উঠিবে। তখনকার সে অবস্থাটি অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়। তবুও সেটা পূর্ণ সুখের চিত্র নহে। উহা অপেক্ষা সহস্র গুণ সুখের অবস্থা আরও আছে। মানুষ পরে তাহাই ভোগ করে। চেষ্টা করিলে, সাধনা করিলে, সকলেই সেই অনুপম সুখের অধিকারী হইতে পারে। নিদিধ্যাসন করিতে করিতে যখন ঐরূপ জ্ঞান ফুটিয়া উঠে, তখন যদি তুমি চারিদিকে

চাহিয়া দেখ, তাহা হইলে বিস্তর অলৌকিক ব্যাপার তোমার চক্ষুতে পড়িবে। সে সব ব্যাপার যে আছে, তাহা তুমি পূর্ব্বে কখনই ভাব নাই। যাঁহারা সূক্ষ্ম-জগতের গবেষণাকারীদের গবেষণা-ফল নিজেরা বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করেন, কেবল তাঁহারাই নিদিধ্যাসনের পূর্ব্বেও ভুবর্লোকে কিছু কিছু ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া থাকেন।

সাধক, অক্লান্ত চেষ্টা কর, তাহা হইলে তুমি দিন দিন উন্নত হইয়া উঠিবে। ক্রমে ভুবর্লোক অপেক্ষাও সুখের জগৎ তোমার সমক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সেই নবীন জগতের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তুমি বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া পড়িবে। ভুবর্লোক ভূলোক অপেক্ষা যত বেশী মধুর, সেই নূতন জগৎটা ভুবর্লোক অপেক্ষাও তত চমৎকার। সেখানে দৃষ্টি পড়িলে ভুবর্লোকের জীবনটি তোমার কাছে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। তখন আর একবার মনে হইবে যে, এইবারই যথার্থ জীবনের আস্বাদ পাইলাম। তখন মনে হইবে, জীবনটা যে এত মধুর, তাহা ইহার পূর্ব্বে জানিতাম না। উন্নত হইতে হইতে তুমি ভগবানের কাছে যাইয়া উঠিবে। তিনিই একমাত্র বিশ্বব্যাপী জীবন, তিনিই পূর্ণ সত্য ও অখণ্ড সৌন্দর্য্য।

তোমরা বলিতে পার, এতটা উৎকর্ষলাভ করিতে হইলে বহু বৎসরের সাধনা আবশ্যক। হাঁ, সে কথা অসম্ভব নহে; কেন না, বহু জন্মে যে ক্রমোন্নতি ঘটিত, তাহা এক জন্মেই তোমরা লাভ করিতে চাহিতেছ। কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়া বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও যদি অতটা উৎকর্ষ করিয়া লওয়া যায়, তবে সেটাও খুব বেশী লাভ মনে করিতে হইবে। এক জীবনে যদি বহু জীবনের কাজ করিয়া লওয়া যায়, তবে কি সেটা কম লাভ? সে অবস্থায় সময় ও শ্রমের হিসাব করিলে চলিবে কেন? কোন এক ব্যক্তি কত দিনে সিদ্ধিলাভ করিবে, তাহা কেহই বলিয়া দিতে পারে না। সিদ্ধিলাভের পক্ষে দুইটি ব্যাপার বিবেচ্য। একটা অবিদ্যার আবরণ, অপরটা সাধকের উৎসাহ ও সঙ্কল্প। মায়া-মমতা প্রভৃতির আবরণ ছিন্ন করিয়া প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া যাইতে হয়। যাহার আবরণ

যত পুরু, তাহাকে তত শ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহার তত সময় লাগে। আবার, যিনি যত উৎসাহী, যাঁহার সঙ্কল্প যত দৃঢ়, তিনি তত শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করেন। যাঁহার উৎসাহ, সঙ্কল্প শিথিল, সিদ্ধিলাভে তাঁহার বিলম্ব ঘটে। সাধক ! তুমি এত দিনে সাধন-মার্গে সফলমনোরথ হইবে, আমি এমন কোন অঙ্গীকার করিতে পারি না। আমি শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, তোমার পূর্ব্বেও অনেকে সাধন-মার্গে আসিয়াছিলেন, আর তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এখন মহিমা-মণ্ডিত জ্ঞানগুরু, তাঁহারা সকলেই এক দিন আমাদের মত সাধারণ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তাঁহারা যখন উঠিয়াছেন, তখন আমরাও উঠিব। নিশ্চয়ই উঁহাদের মত হইব। আমরা ক্ষীণতর শক্তি-সম্পন্ন হইলেও, আমাদের মধ্যে অনেকে সাধন-মার্গে যাইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহার কাহার সুফল বেশী হইয়াছে, কাহার কাহার বা কম। কিন্তু সাধন-মার্গে আসিয়া কেহই অনুতপ্ত নহেন ; কেন না, অল্প হউক, অধিক হউক, যিনি যতটুকু উপকার পাইয়াছেন, ততটুকুই তাঁহার শাশ্বত সম্পদ্। সেই উৎকর্ষ, উন্মেষটুকু জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিবে। কেন না, সেটা আত্মার উন্নতি। স্থূল-দেহের সঙ্গে তাহার বিলোপ ঘটে না। ঐ উৎকর্ষ তন্দ্রাচ্ছন্ন মিডিয়মের জ্ঞান-দৃষ্টির মত অস্থায়ী ও শিথিল নহে। উহা আত্মার উন্নতি ; তাই স্থায়ী। তাই পূর্ণপ্রভাবে আমরা ঐ উৎকর্ষের সুবিধা ভোগ করিতে পারি। ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি দ্বারা যে উৎকর্ষ জন্মে, তাহা মহিমা-মণ্ডিত উন্নত-জীবনের শক্তি। মানুষমাত্রেই কোন দিন না কোন দিন ঐ শক্তি লাভ করিতে পারিবে।

সাধন-মার্গে যাইবার পূর্ব্বে প্রস্তুত হইতে হয়

সাধন-মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া যিনি নিজের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন করিতে চান, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে নিজের হৃদয়ের পবিত্রতা-সাধন করিয়া লইতে হইবে। মনে প্রাণে সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ, নির্ম্মল, পবিত্র না হইলে কেহ যেন সাধনমার্গে না যান। পবিত্র হওয়াই প্রথম

ও প্রধান কার্য্য। পবিত্রতা-সাধন করিতে হইলে সাধককে স্থূল-দে[হ] লিঙ্গ-দেহ অর্থাৎ বাসনা-দেহ, আর মানস-দেহ এই তিনটিকেই পবি[ত্র] করিয়া তুলিতে হইবে। তাঁহাকে দেহের অশুচি ও প্রিয় পাপগুলি ত্যা[গ] করিতে হইবে। মাছ-মাংস আহার করিলে ও মদ্য, তামাক প্রভৃ[তি] মাদকদ্রব্য সেবন করিলে শরীর অপবিত্র হইয়া উঠে। তাই এগুলি ত্যাগ করিবার প্রয়োজন। সাধকের সম্পূর্ণভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, শু[দ্ধ] ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক। ভূলোক, ভুবর্লোক সর্ব্বত্রই তাঁহাকে পবি[ত্র] থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশুচি ত্যাগ করিবেন কি ন[া] তাহা সাধক নিজেই যেন ভাবিয়া দেখেন। সেটা তাঁহার নিজের উপরে নির্ভর করে। একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, মানুষ একই সম[য়ে] ভগবান ও সয়তান দুজনেরই কার্য্য করিতে পারে না। পৃথিবীতে কদাচারী ব্যক্তিরা যে একেবারেই জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিতে পারে না, এম[ন] কথা আমি বলিতেছি না। তবে সুস্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতেছি যে অশুচির অবস্থায় সাধন-মার্গে গেলে কখনই বিপন্মুক্ত হওয়া যায় না। আ[র] অপবিত্র হস্তে পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিলে ভয়ানক বিপদে পড়িতে হয়।

সাধন-মার্গীকে মনের খুঁটি-নাটী ত্যাগ করিতে হয়। সংসারের তু[চ্ছ] বিষয় লইয়া মনে অশান্তি ঘটাইতে নাই। কর্ত্তব্যজ্ঞানে পৃথিবীর কার্য[্য] প্রাণপণ-যত্নে করিয়া যাইতে হয়। কার্য্যের মধ্যে স্বার্থের চিন্তা আনিয়া ফেলিতে নাই। ফলভোগ করিব, এমন চিন্তা মনে আনিবে না। কার্য্যে[র] ফল ভগবানের উপর ন্যস্ত করিতে হয়। সাধক যদি এইরূপ ভাবে চলেন, তবে তাঁহার চারিপার্শ্বে পবিত্রচেতা সহায়ক দেবযোনিরা আসিয়া সমবেত হইবেন। এবম্প্রকার সাধকের দেহ হইতে একটা স্বর্গীয় জ্যোতি বাহির হইতে থাকিবে; তাহার সাহচর্য্যে শোকী, তাপী, সকলেই শান্তি পাইবে। এইরূপ সাধক জিতেন্দ্রিয়, নিষ্পাপ, পবিত্র ও নিঃস্বার্থ। ইনি অতীন্দ্রি[য়] শক্তিসম্পন্ন হইলেও, স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে সে শক্তির ব্যবহার করেন না। সে শক্তি যাবতীয় মানুষের উপকারার্থে ও উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করেন।

ল মানুষই তাঁহার ভ্রাতা। সকলেই তাঁহার মত উন্নত হউক, এইটুকুই হার ইচ্ছা। সকলেই অজ্ঞান ও স্বার্থের কুয়াসা ভেদ করিয়া ভগবানের িমা বুঝুক, বিমল শান্তির সৌর-কিরণে স্নাত হউক, এইটুকুই ইনি খিতে চাহেন।

অতএব পাঠক, অন্ধবিশ্বাস করিতে বলি না। কেন না, অন্ধবিশ্বাসের ল জগতে অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখ, আর রিয়া লও যে, থিয়সফির উপদেশ ও ঘোষণা সত্য কি না। আলোচনা র, অনুসন্ধান কর, পরীক্ষা কর। যদি সন্তুষ্ট হইতে না পার, তাহাতেও মার ক্ষতি নাই। আর যদি সন্তুষ্ট হইতে পার, তাহাতে প্রভূত উপকার ইবে। আমরা সকলেই থিয়সফির সাধনায় উপকৃত হইয়াছি। আমাদের ষণা সত্য কি না, পরীক্ষা করিতে হইলে আমাদের কথাগুলির উপর শ্বাস রাখিয়া অনুসন্ধান করিবে; সেইটিই উৎকৃষ্ট উপায়। থিয়সফি রূপভাবে জীবনযাপন করিবার পরামর্শ দেয়, সেইরূপ ভাবে চল আর াহার ফল কিরূপ দাঁড়ায় দেখ। থিয়সফি চিন্তার সংযম করিতে বলে, রিয়া দেখ, তাহার ফল ভাল হইল কি মন্দ হইল। থিয়সফি সকলকেই াইয়ের মত ভালবাসিতে আর শ্রীভগবানকে পিতার ন্যায় দেখিতে ও াবিতে বলে। ঐরূপ করিয়া দেখ। উহার উপদেশে নিঃস্বার্থ হইয়া দেখ, বাস্তবিক উন্নত হইতেছে কি না। যাঁহারা শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে লেন, তাঁহারাই জানেন, থিয়সফির উপদেশ সত্য কি না। যিনি সত্যপথে লেন, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন, প্রাণপণে পরোপকার করেন, তিনিই থিয়সফির সত্যতা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তাঁহারই সম্মুখে একটা প্রয়োজনীয় সুখের নবীন ক্ষেত্র প্রকট হইয়া উঠে। ঐ গুণগুলি আয়ত্ত হইলে ধীরে ধীরে অন্যগুলির সাধনা কর। তখন ক্রমেই থিয়সফির সত্যতার প্রমাণ পাইতে থাকিবে। সকলেই যদি শ্রীভগবানকে পিতা আর আপনাদিগকে পরস্পর ভ্রাতা মনে করিয়া চলে, তাহা হইলে জগতের অবস্থা কতই সুন্দর হইয়া উঠে! সকলের

প্রাণেই যদি পরার্থপরতা ফুটিয়া উঠে, তবে পৃথিবীর সে অব
কিরূপ হয়? ভাল, না মন্দ? থিয়সফির উপদেশ সর্ব্বাং
মহিমামণ্ডিত। আমরা এখনও উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি না
এখনও আমরা উহার প্রাথমিক অবস্থারই আলোচনা করিতেছি। ত
সাধক! আমরা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতেছি—"এস, আমাদের সঙ্গে যে
দিয়া উহার আলোচনা কর; তাহা হইলে যে শান্তি ও বিশ্বাস আমা
প্রাণে আসিয়াছে, তাহা তোমার প্রাণেও আসিবে। উহার আলো
করিতে করিতে তোমার জীবন তোমার কাছে আরও সুখের বলিয়া বে
হইবে। তাহা ছাড়া অন্যান্য মানব তোমার দ্বারা আরও বেশী উপ
হইয়া উঠিবে।"

পরিশিষ্ট

ছোট ছোট ছেলে-পুলের মৃত্যু

ছোট ছোট ছেলে-পুলে মারা যায় কেন, এ বিষয় লইয়া খুব ভাবনা-চিন্তা চলিতেছে। ছোট ছোট ছেলে-পুলে মরিলেও প্রাণে আঘাত কম লাগে না। উহাতেও অনেকের জীবন মরুতুল্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণে শোকের আগুন সর্ব্বদাই ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে! তাই অনেকে জিজ্ঞাসা করে,—"শৈশবেই যদি মরণ হইল, তবে অত কম দিনের জীবনের উদ্দেশ্য কি? উহাতে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? যাঁহারা প্রাণাধিক সন্তান হারাইয়া শোকে অধীর, প্রচলিত ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া থাকে যে, ঐ শিশু পৃথিবীর কোন পাপে লিপ্ত না হইতেই মারা যাওয়ায় সটান আনন্দ-নিকেতনে চলিয়া যায়। যাহারা দীর্ঘজীবন ভোগ করে, তাহারা নানাবিধ পাপে জড়িত হইয়া পড়ে। তাহারা মরণের পর শিশুদের মত অতটা সুখী হইতে পারে না। স্বর্গে শিশুরাই বেশী সুখী হইয়া থাকে।" এই কথাগুলিতে মানুষ প্রবোধ লইতে পারে না। উহাতে প্রাণের আগুন নিভে না। থিয়সফি-তত্ত্বজ্ঞেরাও প্রথম প্রথম ভালরূপ বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেন না। শিশু মরে কেন, এরূপ প্রশ্ন হইলে আমরাও পূর্ব্বে সেই একঘেয়ে পুরাতন কথাই আওড়াইতাম; বলিতাম—স্বভাবের নিয়মই এই যে, যত জন্মে, তত থাকে না। উদাহরণ দিতাম যে, ওক্ গাছের রাশি রাশি ফল হয়, তাহার সবই ধ্বংসপুরে যায়, কেবল ২।৪টাতে বৃক্ষ জন্মে। নৈসর্গিক নিয়মের ঐরূপ একটা দোহাই দিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু মনে মনে বুঝিতাম যে, আমাদের বুঝানটা ঠিক হইল না; প্রকৃত কারণ দেখাইতে পারিলাম না। আমরা মনে মনে

বুঝিতাম, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই মানুষ সন্তানশোক পায়; পূর্ব্বজন্মের পাপফল না থাকিলে সন্তান মারা যায় না। আবার ভাবিতাম, মাতাপিতা পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফলে শোক পাইলেন, কিন্তু শিশুদেহে জীবাত্মা মরণের অধীন হইয়া যাতনা পাইল কেন? এ সব কথার বেশ একটা ভাল মীমাংসা আমরা অনেক দিন ধরিয়া করিতে পারি নাই। তবে এটুকু বুঝিতাম যে শিশুর মরণের মধ্যে খুবই একটা রহস্য আছে, আর সেটির উদ্ঘাটন আমরা এখনও করিতে পারিতেছি না।

প্রকৃত তথ্য কেমন করিয়া জানা গেল

শিশুর মরণ হয় কেন, এ সম্বন্ধে আমাদের অনেকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রকৃত ব্যাপার তাঁহারা জানিতেও পারিলেন। কিরূপ করিয়া জানিলেন, সেইটুকু বলিলেই সাধারণে শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে। এক জন যুবকের মরণ হইতেই আমরা প্রকৃত তথ্যের প্রথম আভাস পাই। প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইবার জন্য আমরা অনেকের অনেকগুলি করিয়া জন্মের আলোচনা করিতে লাগিলাম; কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে, কিরূপ অবস্থার মধ্যে, এক একটা জন্ম হইতে লাগিল, তাহা নিরূপণ করিয়া তুলনা করিয়া, তথ্যের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপ করিতে করিতে অনেক জানিয়া ফেলিলাম।

পুনর্জ্জন্ম

প্রাচীনকালে গ্রীসদেশে দুইটি সহোদর বাস করিত। পিথাগোরস প্রবর্ত্তিত দার্শনিক আলোচনায় তাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে খুব বেশী সৌহৃদ্য ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শুধু দর্শন লইয়া ব্যস্ত, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুইটি দিকের আলোচনা করিত। দর্শনের আলোচনাও করিত, তাহা ছাড়া স্থপতিবিদ্যারও পক্ষপাতী ছিল। সময় সে এক জন বিখ্যাত শিল্পী বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠে।

কলা-বিত্তার অনুশীলনে কনিষ্ঠকে প্রায় অর্দ্ধেকটা সময়েরও বেশী নিয়োজিত করিতে হইত। অবশিষ্টাংশ দর্শনে দিত। বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে সময় কাটিতে লাগিল। শেষে বৃদ্ধ হইয়া তাহারা মারা গেল। তাহাদের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, পুনর্জ্জন্মের সময় তাহাদের একসঙ্গে জন্মান আবশ্যক না হইয়াই পারে না। কিন্তু সেটা লইয়া বড় গোল বাধিল। মরণের পর ভুবর্লোক হইয়া দুই জনই স্বর্গে গেল। কিন্তু এক জন সেখানে বেশী দিন থাকিবার অধিকার পাইল। আর এক জনের অল্পদিন পরেই ফিরিবার কথা। এ ক্ষেত্রে দুই জন কি করিয়া একসঙ্গে জন্মায়? ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই কনিষ্ঠকে আসিয়া জন্মিতে হইল। জ্যেষ্ঠ আরও তিন শত বৎসরের অধিককাল স্বর্গে থাকিল।

আমাদের মনে হয়, কর্ম্ম-ফল-বিধাতৃগণের পক্ষে এ দুইটি সহোদরকে পুনরায় একত্র করিয়া তোলা বড়ই কঠিন কার্য্য। কিন্তু এটি তাঁহাদের কাছে খুবই সহজ। পৃথিবীতে আমরা শুভকার্য্য করিয়া যে শক্তি লাভ করি, যত দিন সে শক্তি ক্ষয় হইয়া না যায়, তত দিন আমরা স্বর্গে থাকি। জ্যেষ্ঠ সহোদর একাগ্রতার সঙ্গে দর্শনের আলোচনা করিয়া যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সে স্বর্গে থাকিবার অধিকার পাইল। স্বর্গভোগ মানুষের অর্জ্জিত শক্তির উপরই নির্ভর করে। কেহই ঐ ভোগের কাল ইচ্ছা করিলে কমাইতে বা বৃদ্ধি করিতে পারে না। কখন কখন ঘনীভূত সুখের ভোগ দ্বারাও স্বর্গে থাকিবার কালকে কমাইয়া আনা হয়। কিন্তু সেটা বিশেষ ঘটনায় হইতে দেখা যায়। ইহাদের বেলায় সেরূপ কিছু হইবার কথা নহে। সহোদর দুইটিকে একত্র করা বাহ্যতঃ কঠিন হইলেও অতি সহজে তাহাদিগকে একত্র করা হইয়াছিল। কনিষ্ঠের স্বর্গভোগের কাল ফুরাইয়া গেলেই তাহাকে ইউরোপের মধ্য-অঞ্চলে জন্মিতে হইল। জন্মের পর বাল্যজীবনেই তাহার শিল্পের দিকে ঝোঁক দেখা গেল। কিন্তু এবারকার শিল্পটা অন্যরূপ। এবার তাহাকে নক্শা-শিল্পে প্রবৃত্ত হইতে হইল; কেন না,

এ জন্মের পিতা ঐ কাজ করিতেন। এ দিকেও তাহার যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখা গেল। সকলেই ভাবিল, ছেলেটি কালে নকৃশায় খুবই উন্নতি করিবে। এমন সময় হঠাৎ সে দেশব্যাপী মড়কে মারা গেল। তখন তাহার বয়স ২০ বৎসরও হয় নাই। এত অল্পবয়সে তাহার মৃত্যু হওয়ায় সকলেই বিলাপ করিতে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিল—"এই যুবক মারা যাওয়ায় শিল্পটার খুবই ক্ষতি হইল।" এরূপ একটা রত্ন নষ্ট হওয়ায় সকলেই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল।

এই ব্যাপারটি আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। কুড়ি বৎসর মাত্র বাঁচিয়া থাকায় যুবক নকৃশা-শিল্পে যথেষ্টপরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে নাই অথচ নকৃশার উন্নতি করিবে বলিয়াই প্রাণের ইচ্ছাও খুব বেশী; ইহার ফলে পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক দিন তাহাকে ভুবর্লোকে থাকিতে হইল, স্বর্গে আর বেশী দিন থাকিতে হইল না, কাজে কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্মিতে হইল। এ দিকে এই জন্মটার প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে যুবকের পূর্ব্বজন্মের সেই স্বর্গবাসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও জন্মিয়াছিল। দুই ভাই আবার একই মায়ের পেটে আসিয়া জন্মিল।

শৈশবকালে মরা একটা সৌভাগ্য

সাধারণ লোকে মনে করে, যাহারা অল্পবয়সে মরে, তাহারা বড়ই হতভাগ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। উপরের ঘটনায় দেখা যায়, বাল্যকালে মরিলে তাহাতে শুভ ফলই ফলে। কুড়ি বৎসর বয়সে না মরিয়া যুবক যদি অনেক দিন বাঁচিত, তবে নকৃশা-বিদ্যার খুব উন্নতি করিত সন্দেহ নাই; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সেই দর্শন শিখিবার ও অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান লাভ করিবার বৃত্তির অনুরূপ উন্নতি ঘটিত না। সে বৃত্তিটা মলিন হইয়া যাইত। দর্শন শিখিবার ইচ্ছাটাও পূর্ব্বজন্মে কম ছিল না সে জন্মে যুবক দার্শনিক তথ্য জানিবার জন্য জোহান্ টলার, নিকোলাস্ অব্ ব্যাসেল্, খৃশ্চিয়ানা মার্গারেথা

লনার ও হেন্‌রিচ্‌ শুশোর উপদেশে উপদিষ্ট ও ভাবে অনুপ্রণিত হইয়া ঠিয়াছিল। নক্‌শা লইয়া দীর্ঘ জীবন ভোগ করিলে দর্শনের পিপাসা মিটিবার সুযোগ আসিত না। তাই অল্পবয়সে মৃত্যু হইল। মৃত্যু হওয়ায় সে পিপাসা মিটিবার সুযোগ ঘটিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ রিয়া থিওসফি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। এই উপায়ে তাহারা দার্শনিক থ্য ও অতীন্দ্রিয়-শক্তি লাভের প্রশস্ত সরণী দেখিতে পাইল। অতএব াড়শ শতাব্দীর সেই তরুণ বয়সের মৃত্যুটা যুবকের পক্ষে উপকারজনকই ইয়াছিল।

পরিবর্ত্তিত জীবন

এই ঘটনা হইতেই আমরা অকাল-মৃত্যুর কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে ারি। চেষ্টা করিলে তাহাতে মৃত ব্যক্তির শুভও দেখিতে পাই। াবার অনেক সময় শুধু এই বিবরণটিতেই সকল মরণের মীমাংসা করিয়া ওঠা যায় না। আরও উদাহরণ-স্থলের প্রয়োজন হয়। আমরা আর একটি বরণ বলিতেছি। এক জন থিয়সফি সম্প্রদায়ের যুবক একই পরিবারে ইবার আসিয়া জন্মিয়াছিল। যুবক প্রথম জন্মে মাত্র কয়েক সপ্তাহ ীবিত ছিল। তাহার পর মরিল। কয়েক বৎসর পরে ঐ মা-বাপের াছেই আবার আসিয়া জন্মিল। প্রথম জন্মে তাহার এত শীঘ্র মরণ হইল কন, জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না কেন? এ বিষয়ের গবেষণা চলিতে াগিল। অনুসন্ধানকারীরা প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তত্ত্বজ্ঞেরা ভাবিতে লাগিলেন,—"প্রথম জন্ম হইতেই দি যুবক বাঁচিয়া থাকিত, তাহাতেই বা কি দোষ হইত? মরিয়া কয়েক বৎসরের ছোট হইয়া আসায় বিশেষ লাভটা কি হইল?" অল্প চিন্তার ফলেই আমরা সুন্দর মীমাংসা করিতে পারিলাম। যুবকের মাতা-পিতা পূর্ব্বে থিয়সফির সংবাদ পান নাই, তখন তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে অন্যরূপ ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। পরে থিয়সফির মত জ্ঞাত হইয়া সকলেই একযোগে এই মত গ্রহণ করেন। প্রথম জন্ম হইতে বাঁচিয়া থাকিলে যুবক এত কম

বয়সে থিয়সফির জ্ঞান লাভ করিতে পারিত না। উহাদের পরিবারে জ্ঞান আসিতে যুবকের যৌবন উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। সুতরাং মরিয়া আ জন্মগ্রহণ করায় যুবক থিয়সফির জ্ঞানে খুবই লাভবান্ হইয়াছিল। এইটু দুইবার জন্মের পার্থক্য। যাহারা থিয়সফির পথে না আসিয়া প্রচ ধর্ম্মের পথে চলে, তাহারা ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতির কথা বড় একটা ভাবে যুবকের মাতাপিতার হয় তো অনেক রকম মন্দ স্বভাব ছিল। থিয়স পথে আসায় হয় তো তাঁহারা সংযত হইয়াছিলেন। যুবক প্রথম হইতে বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খল আদর্শ দেখিয়া অধঃপাতে যা পড়িত। মরণ হওয়ায় এই দুর্গতির হাত হইতে নিস্তার পাই দ্বিতীয়বার জন্মিলে শৈশব হইতেই থিয়সফির জ্ঞানে মণ্ডিত হইয়া পড়ি তখন প্রলোভনে পড়িলেও তাহার আর ভয় নাই!

এই ঘটনাটি হইতে আমাদের চোখ আরও ফুটিয়া গেল। তখন আ আরও অনেক অকাল-মৃত্যুর রহস্য বুঝিতে সমর্থ হইলাম। আলোচ প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম যে, দ্বিতীয় জন্মটা অনেকাংশে প্রথমটির অপেক্ষা ও উপকারজনক। দ্বিতীয়টিতেই উৎকর্ষের সুযোগ-সুবিধা খুব বে অকাল-মরণে, যে মরে, তাহারও লাভ, তাহার মাতা-পিতারও লাভ। মরে, সে অধিকতর সুযোগ-সুবিধার মধ্যে আসিয়া জন্মায়; আবার তা মরণে দারুণ আঘাত পাইয়া শোকসন্তপ্ত মাতা-পিতার পূর্ব্বজন্মের স পাপের ক্ষয় হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত অকাল-মরণের হয় তো আ অনেক উদ্দেশ্য, শুভ ফল আছে, সেগুলিকে আমরা আজও জানিতে নাই। তবে বেশী স্থলেই বোধ হয় যে, যত দিন না উপযুক্ত ক্ষেত্র তত দিন পার্থিব হিসাবে জীবাত্মার অকাল-মরণই হইতে থাকে। অ মরণ মরিয়া মরিয়া শুধু সময় কাটায় মাত্র। মনে কর, এক ব্যক্তি পা জীবনে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শুভ-শক্তি সঞ্চয় করিয়া মরণের পর ভুব হইয়া স্বর্গে গেল। সেখানে ঐ শক্তির ক্ষয় হওয়ায় আবার আসিয়া জ বাধ্য হইল। কিন্তু পার্থিব জীবনের সেই মাতা-পিতার কাছে ঐ

এত ঋণী যে, জন্মিলে তাঁহাদেরই কাছে জন্মিতে হয়। এ দিকে ঐ মাতা-পিতাও হয় তো ভুবর্লোকে বা স্বর্লোকে রহিয়াছেন। সেরূপ ক্ষেত্রে উহার জন্মান্তরটা কিরূপভাবে নিয়মিত হয়? এরূপ স্থলে উহার ঐ স্বর্গবাসী মাতা-পিতা যত দিন না পৃথিবীতে আসিয়া জন্মান, তত দিন উহাকে পৃথিবীতে আর একটিবার অল্পদিনের জন্য জন্মিয়া লইতে হয়। তাহার পর উপযুক্ত সময়ে সেই পূর্ব্ব মাতা-পিতার কাছে জন্মিয়া দীর্ঘ জীবন ভোগ করে। গবেষণায় আমরা জানিয়াছি, ২।১ বৎসরের জন্য বাঁচিয়া মরিলেও তাহার ভাবী জীবনের পরিবর্ত্তন খুব বেশী রকম হইতে পারে। একটা উদাহরণ লইয়া দেখ। মনে কর, একটি শিশু কোন একটি বিশেষ সময়ে জন্মগ্রহণ করায় কোন একটি বিশেষ গুরুতর প্রভাব পাইয়া উন্নত হইয়া উঠিল। সেই উন্নতির ফলে হয় তো শিশু পৃথিবীপ্রথিত হইল। কিন্তু ঐ শিশু ঐ পরিবারের মধ্যে যদি আরও ২।১ বৎসর আগে জন্মিত, তাহা হইলে সে হয় তো অন্য আর এক জন শিক্ষক পাইত, তখন তাহার শিক্ষা অত ভাল না হইলে অত খ্যাতি-প্রতিপত্তিও হইত না। অতএব ভাগ্য সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র প্রকার মূর্ত্তি ধরিয়া বসিত। জন্মের ২।১ বৎসর এদিক্ ওদিক্ হইলেই ভাবী জীবনের এতটা তারতম্য ঘটিতে পারে। ২।১ বৎসর অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে শুধু যে শিক্ষা-প্রাপ্তিরই তারতম্য ঘটে, তাহা নহে। সামাজিক, নৈতিক, পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক অনেক দিকের অনেক প্রকার সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়।

ছোট ছোট ছেলেপুলে মরণের পর কিরূপ অবস্থায় থাকে ?

আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মরণের পর ভুবর্লোকে যাইয়া ছোট ছোট ছেলে-পুলেরা মহাসুখে থাকে। যে সব শিশু কয়েক মাসের হইয়াই মরিয়া যায়, তাহারা যেমন স্থূল-দেহও আয়ত্ত করিতে পারিত

না, মরণের পর তাহাদের লিঙ্গ-দেহ ও বাসনা-দেহও সেইরূপ অনায়ত্ত থাকে। তাই তাহারা ভুবর্লোকে কতকটা অজ্ঞানই হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহারা কয়েক বৎসরের হইয়া মরিয়া যায়, যাহারা খেলাধূলা করিতে, আমোদ-আহ্লাদ করিতে শিখিয়াছে, তাহারা সেখানে বিস্তর খেলার জিনিস পায়। ভুবর্লোকে ছেলেপুলের সংখ্যা খুব বেশী। তাহাদের খুব স্ফূর্ত্তির প্রাণ, কেহই ম্রিয়মাণ নহে। যাঁহারা ভাল লোক, স্নেহ-পরায়ণ, তাঁহারা মরিয়া ভুবর্লোকে গেলেও তাঁহাদের স্নেহ কমে না। এইরূপ অনেকে ভুবর্লোকের ছেলেপুলেগুলিকে লইয়া খেলা-ধূলা করেন। শুধু তাহাই নহে, ছোট ছোট ছেলেপুলেরা যদি কোন কিছুতে ভয় পায়, তবে তাঁহারা উহাদিগকে রক্ষা করেন। ছেলেরা গল্প শুনিতে ভালবাসে। গল্পের কত বীরের কথা তাহারা মনে মনে কল্পনা করে। কেহ রবিন্‌সন ক্রুসোর কথা, কেহ আলাদীনের কথা, কেহ বা রিচার্ডের কথা ভালবাসে। পার্থিব জীবনে ছেলেপুলে ঐ সব ব্যক্তি সাজিয়া খেলা-ধূলা করে। ঐ সাজের মধ্যে কত শত অসঙ্গতি থাকিয়া যায়। কিন্তু মরণের পর যখন আবার ঐরূপ সাজিয়া খেলা আরম্ভ করে, তখন তাহাদের সাজা ঠিক ঠিক রকমের হয়। ভুবর্লোকের সূক্ষ্ম জড়াংশে সে মূর্ত্তি অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠে। সেখানে খেলার সময় নিজেদের নিখুঁত সাজ-সজ্জা দেখিয়া তাহাদের কতই আনন্দ হয়। কখন সে "আর্গো" জাহাজের বীরবর জেসন্ সাজিতেছে, কখন বা পারসিউস্ সাজিয়া অদ্ভুত জুতার গুণে উড়িয়া চলিয়াছে। এইরূপ অবিকল মূর্ত্তি ধরিয়া তাহারা খেলায় মত্ত থাকে।

আমরা জানি, ছেলেপুলেরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া থাকে। এটি তাহাদের স্বভাব। সবই তাহারা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে চায়। আমরা তাহাদিগকে অনেক সময় একটা কথা হয় তো ভালরূপ বুঝাইয়া দিতে পারি না ; তাই বিরক্ত হইয়া উঠি। ভুবর্লোকে তাহাদিগকে কোন কিছু বুঝান খুবই সহজ ; কেন না, সেখানে আলোচ্য বিষয়ের মূর্ত্তি

গড়িয়া তোলা যায়। আর মূর্ত্তি দেখিলে তাহারা অতি সহজেই বুঝিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে যাহা বর্ণনা করিতে হয়, ভুবর্লোকে তাহা দেখাইয়া দেওয়া চলে। শুনার চেয়ে দেখার আনন্দ বেশী। তাই দেখিতে পাওয়ায় তাহাদের মহা আনন্দ হয়।

অনেকে ভাবেন, ছেলেদের এত আনন্দ উপভোগের সুবিধা থাকিলেও হয় তো তাহারা সুখী নহে; কেন না, তাহারা মা বাপ, আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও সেখানে দেখিতে পায় না। তাহারা বাঁচিয়া থাকার সময় যে সকল বিড়াল, কুকুর, পাখী প্রভৃতি লইয়া খেলা-ধূলা করিত, সেগুলি-কেও সেখানে দেখিতে পায় না। এ জন্য বোধ হয়, খুবই কষ্ট বোধ করে। যাঁহারা এইরূপ ভাবেন, তাঁহারা ভুবর্লোকের অবস্থাটি ঠিক ঠিক বুঝেন না। আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা সময় সময় মনে করি, আমাদের অমুক অমুক আত্মীয় মারা গিয়াছে, তাহাদিগকে হারাইয়াছি, আর কখন দেখিতে পাইব না, ইত্যাদি ইত্যাদি; কিন্তু সেই মৃত আত্মীয়েরা সেরূপ মনে করে না। আমাদিগকে হারাইয়াছে বলিয়া তাহারা একটিবারও ভাবে না। তাহারা আমাদের অতি নিকটেই থাকে, আমাদের সূক্ষ্ম-দেহ দেখিতে পায়। তফাতের মধ্যে এই যে, তাহারা আমাদিগকে রাত্রিতে পায়, দিনের বেলায় তাহাদের নিকট আমরা নিদ্রিত। তাহারা সকল সময়ই আমাদের সূক্ষ্ম-দেহ দেখিতে পাইতেছে। রাত্রিকালে আমাদের স্থূল-শরীর ঘুমাইয়া পড়িলে সূক্ষ্ম-দেহ তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বেড়ায়। দিনের বেলায় আমাদের সূক্ষ্ম-শরীর তাহারা দেখিতে পাইলেও উহা তাহাদের কথায় সাড়া দিতে পারে না; তাই উহা তখন তাহাদের কাছে নিদ্রিত বলিয়া বোধ হয়। দিনের বেলায় আমরা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারি না, রাত্রিকালে পারি। তাহাদের নিকট হইতে অল্পসময়ের জন্য প্রত্যহ একটু করিয়া বিরহ সহ্য করি মাত্র। পার্থিব জীবনেও তো ইহা করিয়া থাকি। যখন আমরা ঘুমাই, তখন কি কিছু সময়ের জন্য জীবিত আত্মীয়গুলিকে ভুলি না? অতএব, ছেলেপুলেরা

মরণের পর মা-বাপকে খুবই দেখিতে পায়। তাহাদের খেলার সাথী, তাহাদের কুকুর-বিড়াল, সমস্তই পূর্ব্বের মতই দেখে। কেন না, খেলার সাথী কুকুর, বিড়াল প্রভৃতিরাও ঘুমাইয়া পড়িলে, তাহারাও ভুবর্লোকে যাইয়া উঠে। তখন ছেলেপুলেরাও তাহাদের সঙ্গে আসিয়া মিশে। ভুবর্লোকে দেখিবার শুনিবার শক্তি খুব বাড়িয়া যায়। তাই ছেলে-পুলেরা পার্থিব আত্মীয় প্রভৃতির আরও মধুর ভাব দেখিয়া খুব বেশী আনন্দিত হয়। আর আমরা যখন পৃথিবীতে জাগি, অর্থাৎ তাহাদের কাছে যখন আমরা নিদ্রিতের মত থাকি, তখন তাহারা সেখানকার খেলার সাথীদের লইয়া খেলিয়া বেড়ায়। ভুবর্লোক-বিহারী অনেক মহাত্মাও তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহাদিগকে এটা-ওটা দিয়া ভুলান। যাহাতে তাহারা মহাস্ফূর্ত্তিতে থাকে, উঁহারা তাহাই করেন।

ভুবর্লোকে যাইবার পর কি ছেলে-পুলেরা বড় হয় ?

মরণের পর ছেলে-পুলেরা ভুবর্লোকে যাইয়া মহাসুখে থাকে, তাহা তো দেখা গেল। কিন্তু সেখানে যে পরিমাণ আকারে যায়, ততটুকুই থাকে, না সেখানে বাড়ে ? অনেকেই ঐ প্রশ্নটি করিয়া বসেন। আমাদের প্রেততত্ত্বজ্ঞ ভায়ারা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখেন না। তাঁহারা বলেন—"হাঁ, ভুবর্লোকে ছেলে-পুলে খুব বাড়িতে থাকে।" তাঁহারা প্রেত-বৈঠকে এরূপ বিস্তর ছেলেপুলে-ভূত আনিয়া ফেলেন যে, তাহাদের মা-বাপও তাহাদের বড়-সড় চেহারা দেখিয়া চিনিয়া উঠিতে পারেন না। আমরা থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় প্রেত-তত্ত্বজ্ঞদিগের এই মীমাংসা বিশ্বাস করি না। আমরা জানি, ছেলে-পুলেরা পরিণতবয়স্কদিগের অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। আমরা উপরের ঐ কথাটি ভুল বলিয়াই মনে করি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ছেলেপুলেরা ভুবর্লোকে চিন্তাশক্তি দ্বারা মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে। এ কথাটি আমাদিগের ভুলিলে চলিবে না। অতএব, তাহারা ইচ্ছামত যে কোন মূর্ত্তিতে দেখা দিতে পারে। যে সমস্ত

ছেলে মরণকালে একটু বড় ছিল, যাহাদের প্রাণে বড় হইবার সাধ ছিল, বড় হইতেছি বলিয়া যাহাদের ধারণা হইয়াছিল, তাহারা মরণের পরও ঐ ধারণার বশবর্ত্তী থাকে। তখনও তাহারা ভাবে যে, আমরা খুব বড় হইতেছি। তাই তাহাদের সূক্ষ্ম-দেহটাও তাহাদের চিন্তার অনুরূপ হইয়া উঠে। আত্মীয়-স্বজনের কাছে স্থূল-মূর্ত্তিতে দেখা দিতে হইলেও তাই বড়সড় হইয়াই দেখা দেয়। অতএব বৈঠকে যে বড় হওয়াটা দেখি, তাহা তাহাদের রূপের প্রকৃত বৃদ্ধি নহে ; সেটা একটা বাহ্য ব্যাপার, চোখের ভ্রম।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভুবর্লোকের সূক্ষ্ম-দেহগুলির অধিকাংশই পূর্ব্বেকার স্থূলশরীরেরই অনুরূপ। স্থূল-শরীর বিনষ্ট হইয়া গেলেও ঐ সূক্ষ্মদেহটা অনেক দিন সেখানে বিচরণ করে। জীবাত্মা চিন্তা দ্বারা সে দেহটার একটা পরিবর্ত্তন করিতে পারে বটে, কিন্তু চিন্তার প্রভাব অপসারিত হইবামাত্র দেহটা আবার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন মূর্ত্তিটি আগে ছিল, ঠিক তেমনিটিই আবার হইয়া পড়ে। পার্থিব জীবনে একটি শিশু শনৈঃ শনৈঃ বাড়ে, তাহার সূক্ষ্ম-দেহটারও তখন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। ইহাই নিয়ম। শিশু মরিয়া গেলে সূক্ষ্মদেহের পরিবর্ত্তন হওয়া থামিয়া যায় ; তখন উহা আর বাড়ে না ; সুতরাং মরণকালে যতটুকু বাড়িয়াছিল, যেমনটি হইয়াছিল, সেইটিই তাহার স্বাভাবিক মূর্ত্তি ; অতটুকু হইয়া থাকাই তাহার প্রকৃতি, কেবল বড় হইয়া উঠার ঝোঁক আসিলে মূর্ত্তিটি খানিক সময়ের জন্য একটু পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র। বৈঠকে যে অনেক ছেলেপুলেকে বড় হইয়া আসিতে দেখা যায়, এইটিই তাহার একমাত্র হেতু। বড় হইবার সাধ উহাদের খুব বেশী, তাই সেই সাধের প্রভাবে আকারের ক্ষণিক পরিবর্ত্তন ঘটে।

নাম ধরিয়া আসা

এমন ব্যাপার আমরা অনেক দেখিয়াছি যে, অন্য এক জন ভূতযোনি ছেলের মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া শোকাতুর মাতাপিতাকে সান্ত্বনা দেয়। এই

ভূতগুলির উদ্দেশ্য ভাল। পরোপকারই উদ্দেশ্য। আমি অল্পদিন আগে ঐরূপ একটা ভূতযোনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তুমি ঐরূপ করিতেছ কেন? তুমি ছেলে সাজিয়া আসিয়াছ কেন?" সে যে উত্তর করিল, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। বহু দিন পূর্ব্বে ভূতটা ঐ মৃত শিশুর মায়ের উপপতি ছিল। রমণী এখন অপরের পত্নী হইলেও উহার উপর হইতে ভূতের ভালবাসাটি যায় নাই। তাই উহাকে এই শোকের সময় প্রবোধ দিতে না কি আসিয়াছিল। যে শিশুর শোকে রমণী কাতরা, ভূত বলিল, সে এখন আর ভুবর্লোকে নাই, সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, বা অন্য স্থানে গিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রমণী শিশুটিকে দেখিবার জন্য আকুল, তাই তাহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে সে না কি ঐরূপ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছিল। সে বলিল—"এই জন্যেই আমি এরূপ করিয়াছি; ইহাতে আমার অপরাধ হয় হউক।" শিশুর মূর্ত্তিটি যেমন ছিল, সে ইচ্ছাশক্তির বলে অবিকল সেইরূপ মূর্ত্তি ধরিত। বৈঠকে আসিয়া ঐরূপ বালিকা-মূর্ত্তিতে রমণীকে দেখা দিত। রমণী তাহাকে নিজের মেয়েটি মনে করিয়া কতই সুখ ও আনন্দ পাইত। ভূত বলিল—"এরূপ কার্য্যে আমার নিজেরই ক্ষতি, ইহাতে অপর কাহারও ক্ষতি নাই; আমার উদ্দেশ্য যখন ভাল, তখন ভগবান্ নিশ্চয়ই এ জন্য আমাকে শাস্তি দিবেন না।" সে সরল প্রাণে আবার বলিল—"মহাশয়! একটা সামান্য মিথ্যা বলিলেই যখন রমণী সান্ত্বনা পাইতে পারে, তখন তাহাকে আমি শোকাতুরা দেখিব কেন?" তাহার পরোপকার-বৃত্তিটা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। প্রতারণাটা নিন্দনীয়। ভাবিলাম, ন্যায়-অন্যায় ভগবান্ বিচার করিবেন। সে বিচার আমরা করিতে যাই কেন? ভাল উদ্দেশ্যে এইরূপ ভাবে নাম ধরিয়া আসা বিস্তরই দেখা যায়। যাহার নাম ধরিয়া আসে, ভূত অবিকল তাহার দেহ গড়িয়া লয়। প্রেত-তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে, যে সকল শিশু মৃতাবস্থায় প্রসূত হয়, তাহারাও নাকি অনেকে বৈঠকে দেখা দিয়া থাকে, আবার যে ভুবর্লোকে বাঁচিয়া

আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক, আমরা ওরূপ ব্যাপার সহজেই বুঝিতে পারি। মৃতাবস্থার যে দেহ প্রস্তুত হয়, সে দেহে আদৌ আত্মা আইসে না। তবে জীবাত্মা আসিয়া দেখা দিবে কিরূপে? ঐরূপ ঘটনাস্থলে বুঝিতে হইবে, অন্য কোন ভূত ঐরূপ অভিনয় করিতেছে।

চমৎকার প্রবোধ

এইরূপ সকল ব্যাপারে থিয়সফিই খাঁটী তথ্য বলিয়া দেয়। থিয়সফির কথায় প্রাণে চমৎকার প্রবোধ পাওয়া যায়। প্রাণপুত্তলী সন্তান মারা গেলে মা-বাপের হৃদয়ে শেল বিঁধিয়া যায়। সে দারুণ শোক সর্ব্বদার জন্য প্রাণে জাগিয়া থাকে। কিন্তু থিয়সফির কথা শুনিলে শোকের বেগ অনেকটা কমে। থিয়সফি বলিয়া দেয়—"তোমার সন্তান মরে নাই, স্থূল-শরীরটা গিয়াছে মাত্র, সে কিছু দিন পরে আরও উন্নত হইয়া, আরও বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে, আরও ভাল ভাল সুখ-সুবিধার ভিতরে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে, এই জন্যই তাহার আপাত-মরণ হইয়াছে।" কেমন, থিয়সফির এ কথা কি তৃপ্তিকর নহে? শিশুর মরণ আপাত-দৃষ্টিতে শোচনীয় বলিয়া বোধ হইলেও উহার পরিণাম ভাল। ঐরূপ অনেক ঘটনারই পরিণাম শুভ অথচ আপাত-দৃষ্টিতে বড়ই সাংঘাতিক বলিয়া বোধ হয়। শিশুর মরণ হওয়ায় ভগবান্‌কে নিষ্ঠুর নির্দ্দয় বলিয়া আমাদের মনে হয়; কিন্তু তিনি মঙ্গলময়। তাঁহার কাছে অন্যায় হইতে পারে না। আমরা অজ্ঞান বলিয়াই তাঁহাকে নির্দ্দয় ভাবি।

"কে বুঝিবে বল কার্য্য-ধারা তাঁর
অতীব মহান্ অতি চমৎকার।
অজ্ঞান মানব বৃথা করে শোক,
বুঝে না তাঁহার করুণা অপার"—(কেবার।)

ভাঙ্গা গড়া যত যা দেখিছ ভবে
সকলি তাঁহার নিয়মের ফল।
উন্নতির তরে ভাঙ্গা হয় শুধু
প্রতি কার্য্যে তাঁর সুন্দর কৌশল॥
ন্যায়বান্ তিনি ন্যায়ের মূরতি
ন্যায়ের স্ফুরণ তাঁহার বিধান।
প্রেম-শান্তি ঝরে জগতের তরে
পালহ আদেশ কর অবধান॥"

(স্যার এড্উইন্ আর্ণল্ড্)

সমাপ্ত